শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা

শৃঙ্খলিত মৃত্তিকা

শিশির দাস

পরিবেশক :
কথামালা
১৮ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা - ৯

প্রকাশক শিশির দাস
ডায়মণ্ডহারবার

মুদ্রক শ্রীগৌরমোহন ঘোষ
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, ডায়মণ্ডহারবার
ফোন নং ডি. এইচ. ১৪১

প্রচ্ছদ শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম প্রকাশ ১৫ই আগস্ট ১৯৫৯

কাকদ্বীপ কৃষক-আন্দোলনের

জীবিত ও মৃত বীর কৃষক ও কৃষক-রমণীদের উদ্দেশে

ভূমিকা

এই উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সাল। এই কুড়িটি বছর বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর ও দুর্যোগময় কাল। এই বিক্ষুব্ধ কালের প্রেক্ষাপটে এ কাহিনী রচনা করবার চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাসকে বিকৃত না করার আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি করি নি। জন-মানসের স্মৃতিতে বিধৃত অনেক কাহিনীও সংগ্রহ করেছি। ইতিহাসের রেখাচিত্রের সঙ্গে আমার কল্পনাও মিলে মিশে গেছে। অনেক ঘটনা এবং চরিত্রই লেখকের কল্পনা-প্রসূত। অতএব কেউ যদি কোনো চরিত্রের সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পান তাহলে তা কাকতালীয় বলেই ধরে নিতে হবে।

শিশির দাস

॥ ১ ॥

১৯৩০ সালের অঘ্রান মাসের প্রথমদিকে এক রোদ ঝকঝকে দুপুর বেলায় মেদ্‌নীপুর থেকে নৌকায় করে সুন্দরবনে যাচ্ছিল গণপতি। হাজার-মনী মস্ত বোট। অনেক লোক ছিল নৌকাতে। গণপতি বসেছিল বাইরের দিকে ছইয়ের ছায়ায়। বসে বসে গঙ্গার আকাশ পর্যন্ত ঢেউ-খেলানো রূপ দেখছিল সে। মেদিনীপুরের তটরেখা ক্রমশ ধোঁয়াটে হয়ে আসছে। ওদিকে সুন্দরবনের দিক্‌রেখার গাছ-গাছালির অস্পষ্ট আভাস তুলির পোঁচের মতো ফুটে উঠছে। গণপতি চলেছে একেবারে নতুন জায়গায়, নতুন জীবনে। সে জানে সুন্দরবন তখনও বাসের যোগ্য হয়ে ওঠে নি, সব জায়গাতেই তখনও বন-জঙ্গল, নদী-নালা, থক্‌থকে কাদা, কুমীর, বাঘ, সাপ, বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের ভয়। জঙ্গল-হাসিল কাজ তখনও চলছে। জমির লোভে, জমির ক্ষুধায় গণপতি পাড়ি দিচ্ছে সেই সুন্দরবনে। মেদিনীপুর থেকে তার মতো আরও অনেক ভূমিহীন চাষী, দিনমজুর, ক্ষেতমজুর সুন্দরবনে গিয়েছে, এতদিনে সেও চলেছে সেই সুন্দরবনে। যেন সে নির্বাসনে চলেছে। আন্দামান আর সুন্দরবন যেন একই ব্যাপার তখন।

আসলে জীবনের ছন্দ পরিবর্তন হলে, নদী এক খাত থেকে অন্য খাতে ঝাঁপিয়ে পড়লে বড় উত্তাল ঢেউ জেগে ওঠে। জীবনে নতুন ও অজানা পথ ধরতে হলে অনেক ভাবনা সংশয় মনে চেপে বসে। বিচিত্র ও বহুবিধ ভাবনা কাবু করে ফেলতে চায়। নিজের আজন্ম-পরিচিত ঘর-সংসার ও জীবনযাত্রা ছেড়ে নতুন জায়গায় পাড়ি দিতে হলে কত সংশয়, কত কথা মনে জেগে ওঠে! গণপতি দুঃসাহসী বেপরোয়া মানুষ। তবু সুন্দরবনের জঙ্গলে একলা নতুন জীবনকে বরণ করতে চলেছে বলে ওর মনেও সংশয় ও দুশ্চিন্তার সীমা নেই। কোথায় আশ্রয় পাবে, রাত্রি এলে কোথায় যাবে কিছুই সে জানে না। সবই ওকে খুঁজে নিতে হবে।

কোমরে ওর একখানা খাপে ঢোকানো ছোটো ভোজালি বাঁধা আছে, জামার পকেটে আছে কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি, একটা দেশলাই আর গোটা পাঁচেক টাকা। আর গামছার খুঁটে বাঁধা আছে কিছু শুকনো চিঁড়ে আর ভেলিগুড়ের ঢেলা।

নিঃস্ব কৃষক পরিবারের ছেলে গণপতি। ছেলেবেলাতেই বাবা মারা গিয়েছিল। ওরা সাত ভাই, তিন বোন। ছেলেবেলায় স্কুলে পড়তে পড়তে গ্রামের যাত্রাদলের আকর্ষণ ওকে পেয়ে বসে। সেই আকর্ষণ স্কুলের বন্দী জীবনের চেয়ে অনেক বেশি কাম্য বলে মনে হয়েছিল ওর। স্কুলে যাবার পথে খেজুর গাছে উঠে বই রেখে দিয়ে যাত্রার রিহার্সালে যেত। তারপর স্কুল ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকি যাত্রার দলেই ঢুকে পড়েছিল। এই যাত্রার দলের অধিকারী ছিলেন মহাদেব মণ্ডল। মহাদেব মণ্ডল গণপতিকে ভালোবাসতেন, পছন্দ করতেন। যখন গণপতির বয়েস সতের তখন মহাদেব মণ্ডল তাঁর ছ'বছরের মেয়ে মোহিনীর সঙ্গে গণপতির বিয়ে দিলেন। মোহিনী হলো গণপতির স্ত্রী।

বিয়ের পর গণপতির উড়োউড়ো ভাবটা খানিক কেটে গেল। দায়িত্ববোধ এল। চোখ খুলে দেখল গণপতি, মা ধান ভাঙ্গে, ভাইরা কেউ মাছ ধরে বিক্রি করে, কেউ লোকের বাড়ীতে রাখালের কাজ করে, ভিক্ষাও ধরেছে কেউ কেউ। মোহিনী বৌ হবার পর এসব খেয়াল হলো গণপতির। পরিবার এবং সংসার সম্পর্কে সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করে ভবঘুরের মতো ঘুরলে তো চলবে না আর। এবং অধিকারী মহাদেব মণ্ডল তাঁর মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই বোধ হয় গণপতিকে আর যাত্রাদলে থাকতে উৎসাহ দেন নি। সতের বছর বয়েসে কাজ খুঁজতে বেরিয়ে পড়েছিল গণপতি। নানান চেষ্টা চরিত্র করে কাজ কোনোরকমেই যোগাড় করতে না পেরে ব্যারাকপুরের এক হাই-স্কুলের হেডমাষ্টারকে ধরেছিল। বলেছিল, "কাজ বাবু আমাকে একটা যোগাড় করে দিতেই হবে।" হেডমাষ্টারমশাই তাঁর স্কুলে মালী-দারোয়ানের কাজ দেন তাকে। মাসিক তের টাকা বেতন।

স্কুলে ছুটি থাকে অনেক। লম্বা ছুটিতে বাড়ী এলে মা বোন ভাইরা বলত, 'দাদা ও-চাকরি করে মাসে তের টাকা মাইনে নিয়ে কি হবে।

চাষ আবাদ কর। ঘরে লক্ষ্মী আসবে, আমাদের অভাব ঘুচবে।' কিন্তু স্কুলের চাকরি ছাড়তে ইচ্ছা করত না গণপতির। দেশে ফিরলে দেখা হতো মোহিনীর সঙ্গে। সে মেয়ে তখনও নিতান্ত অবুঝ। গণপতিকে সে কোনো পাত্তাই দিত না। গণপতি তাকে ধরে আদর করবার চেষ্টা করলে মুখ ভেংচে পালাত। পাড়া গাঁয়ের মেয়ে, রঙিন গামছা পরে মাথায় বুরুলিবুরুলি কাকের বাসার মতো চুল নিয়ে, নাকে পোঁটা নিয়ে ঘুরে বেড়াত। গণপতির নব-যৌবনের তৃষ্ণা নায়িকার এ হেন কাণ্ড দেখে বড়ই আহত হতো।

স্কুলের কাছেই ছিল একটা তাঁতের কল আর গোটা কয়েক সুরকির কল। তাঁতের কলের এক মুসলমান শ্রমিকের সঙ্গে গণপতির বন্ধুত্ব হয়। বন্ধুটি থাকত শ্রমিক-বস্তিতে। সুরকির কলের মালিক প্রভাসবাবু আর শ্যামলবাবুর সঙ্গেও পরিচয় হয় গণপতির। তাঁতের কলের শ্রমিক বন্ধুটি একদিন গণপতিকে বলল, "তুমিও তাঁতের কলে কাজ করতে লেগে যাও। আগে তাঁতের কাজটা শিখে নাও।" গণপতি বন্ধুর পরামর্শমতো স্কুলের কাজের অবসরে তাঁতের কাজ শিখতে লাগল। একদিন শ্রমিক বন্ধুটি খাচ্ছিল, গণপতি কাছেই বসেছিল। ওর খাওয়া দেখতে দেখতে গণপতি বলল, 'বাঃ তোমরা খাও তো ভালো।'

'তুমি খাবে? আমি যদি তোমাকে নেমন্তন্ন করি?'

গণপতি বলল, 'খাবনা কেন?'

'কিন্তু আমি মুসলমান, আমার বাড়ীতে খেলে তুমি বিপদে পড়বে।'

'আমি ও সব জাত ফাত মানি না বাপু। আমি বুঝি সংসারে দুটো মাত্র জাত আছে, গরীব আর বড়লোক। তুমি গরীব, আমিও গরীব, আমরা একজাত। তুমি বড়লোক হলে তোমার সঙ্গে খেতে আমার আপত্তি হতো।'

একটু থেমে ওর স্বভাবমতো মিষ্টি হেসে কুণ্ঠিত স্বরে বলেছিল গণপতি, 'কিন্তু গোরুর মাংসটা দিও না। অভ্যেস নেই তো, খেয়ে তৃপ্তি পাব না।'

শ্রমিক বন্ধুটি একদিন গণপতিকে নিমন্ত্রণ করল।

শ্রমিক-বস্তিতে টিফিনের সময় শ্রমিকটি আর গণপতি যখন একসঙ্গে পাশাপাশি বসে খাচ্ছে তখন স্কুলের কয়েকটি ছাত্র দেখে ফেলল।

একটা ছেলে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একি গণদা, তুমি বস্তিতে মুসলমানদের রান্না খাচ্ছ !'

মুচকি হেসে গণপতি বলল, 'হ্যাঁ, তাতে হয়েছে কি ? ও আমার বন্ধু, বন্ধুর সঙ্গে খাব না ? তোমরা তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে খাও না ?'

একটি ছেলে বিস্মিত হয়ে বলল, 'তাই বলে মুসলমানদের সঙ্গে বসে মুসলমানের রান্না খাবে ?'

'খাবই তো, ওযে আমার বান্ধব।'

'দাঁড়াও বলি হেডমাষ্টারমশাইকে।'

মুহূর্তে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল সমস্ত স্কুলে, আশেপাশের পাড়াতে। সংবাদটা শহরের ঘরে ঘরে রটে গেল।

টিফিনের পর স্কুলে ফিরলে স্কুলের মুসলমান মাষ্টাররা গণপতিকে গোপনে ডেকে নিয়ে গেলেন মুসলমান ছাত্রদের হোষ্টেলে। (তখন ও-স্কুলে দুজন মুসলমান শিক্ষক ছিলেন) বললেন, 'গণপতি তুমি ওখানে খেলে কেন ?'

'তাতে হয়েছে কি ?'

'তুমি দেখনা স্কুলে হিন্দু মাষ্টাররা অবিরত আমাদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করে, আমাদের ঘেন্না করে, ছুঁই ছুঁই করে।'

গণপতি জবাব দিল, 'আপনারা আসলে অশিক্ষিত তাই হিন্দু মাষ্টাররা ওইরকম করে।'

'অশিক্ষিত ! কি বলছ তুমি গণপতি ?'

'অশিক্ষিত নয় ? আপনাদের মধ্যেও ছুঁইছুঁই বাই আছে। আপনারাও হিন্দুদের ঘেন্না করেন, গরীব মুসলমানদের ঘেন্না করেন, তাই ওরা অমনি করে। দেখে লিবেন, আমাকে কেউ কিছু বলতে পারবে নি। আমি ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে দিব।'

কিছুক্ষণ পরেই হেডমাষ্টার ডেকে পাঠালেন। গণপতি হেডমাষ্টার মশায়ের অফিসঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে রইল। হেডমাষ্টারমশায় কঠোর দৃষ্টিতে গণপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি হিন্দু ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হিন্দুর ঘরেই জন্মেছি আমি।'

'তাহলে কেন মুসলমানদের ঘরে মুসলমানের রান্না খেলে?'

'আজ্ঞে ও আমার বন্ধু যে।'

দরজায় জানলায় ছেলেরা উঁকি মারছে। ক্লাস থেকে সব পালিয়ে এসে ভিড় জমিয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে অদ্ভুত সব কথার গুনগুনোনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষকরাও একে একে এসে হেডমাষ্টারের চেম্বারে জমতে লাগলেন। ধমকেও ছেলেদের ক্লাসে পাঠানো যাচ্ছে না। তাদের কলরব বেড়েই চলেছে।

তখন এ্যাসিষ্ট্যান্ট-হেডমাষ্টার হেডমাষ্টারমশায়কে বললেন, 'স্যার, এখন তো দারুণ ভিড় জমে যাচ্ছে। ক্লাস চালানো সম্ভব হচ্ছে না, ছুটির পর গণপতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বোধহয় ভালো হয়।'

হেডমাষ্টার বললেন, 'ঠিকই বলেছেন।'

গণপতির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এখন তোমার কাজ করগে, ছুটির পর দেখা করবে।'

ছুটির পর ছেলেরা আবার ভিড় জমাতে শুরু করল। সবাই ব্যাপারটা দেখে যেতে চায়। কিছুতেই তাদের নিরস্ত করা গেল না। তারা বলল, 'আমরাও দেখব ব্যাপারটা কি হয়। গণপতিদা কি বলে।'

তখন হেডমাষ্টারমশাই বললেন স্কুলের উঠোনে বেঞ্চ সাজাতে। তাই করা হলো। টেবিল পাতা হলো। টেবিলের ধারে সারি সারি চেয়ার দেওয়া হলো। সামনে থাকল বেঞ্চ। সেখানে ছাত্ররা বসল। বাইরে থেকেও অনেক লোক এসেছে খবর পেয়ে। তারাও বসল বেঞ্চিতে। ইতিমধ্যে হেডমাষ্টারমশাই স্কুল কমিটির মেম্বারদের এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের খবর দিয়েছেন। তাঁরাও একে একে এসে চেয়ারে বসলেন। হেডমাষ্টারমশাই এবং শিক্ষকরাও বসলেন চেয়ারে। প্রভাসবাবু, শ্যামলবাবুও এলেন। দেড় হাজার ছাত্র আর অন্যান্য লোক মিলে প্রায় দু'হাজার লোক জমে গেল। তারপর ডাকা হলো গণপতিকে। গণপতি গিয়ে দাঁড়াল সারি সারি চেয়ারে-বসা হেডমাষ্টার এবং ভদ্রলোকদের সামনে।

হেডমাষ্টারমশাই জেরা শুরু করলেন, 'তুমি হিন্দু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হিন্দু পরিবারেই আমার জন্ম। তবে আমি গরীবের ছেলে গরীব।'

'লাইনে (বস্তি লাইনে) মোল্লার বাড়ীতে খেয়েছিলে তুমি?'

গণপতি পাল্টা প্রশ্ন করল. 'একথা আপনি জানতে চাইছেন, না, অন্য কেউ জানতে চাইছে?'

'আমিই জানতে চাইছি।'

গণপতি প্রশ্ন করল, 'আপনি তো বিলাত গিয়েছিলেন? নিশ্চয়ই গোরুর মাংসও খেয়েছিলেন? তাছাড়া গোরুর মাংস আপনারা সবাই খান। মোল্লারা জীবন্ত গোরু কেটে খায়, আর আপনারা খান পচিয়ে পচিয়ে।'

'তার মানে কি বলতে চাইছ তুমি?'

'আমি দেখেছি এখানকার ধানকলে সুপারির বস্তা আর গোরুর চামড়া একসঙ্গে ভেজে। গোরুর চামড়ার কষ লাগে সুপারিতে। চুনে থাকে গোরুর হাড় গুঁড়ো, চুনে গোরুর হাড় থাকে, জলের কলে চামড়া থাকে। আমি জানি আপনার মা আপনার ছোঁয়া খান না। কেননা আপনি বিলাত-পাশ। যখন বড় লাট আসেন, গরমেণ্টের লোক আসেন তখন আপনারা এক টেবিলে খান। আমি অন্তত গোরু খাই নাই।'

হেডমাষ্টারমশাই বিরক্ত হয়ে সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এবার কি জবাব দেবেন দিন গণপতির কথার?'

এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাষ্টারমশাই বললেন, 'শহরে আর পল্লীগ্রামে অনেক তফাত আছে। তুমি পল্লীগ্রামের মানুষ। তুমি কেন মোল্লার ছোঁয়া খাবে? তুমি তো বাপু বিলেত যাওনি?'

গণপতি স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি হেসে রাগ চেপে বলল, 'তার মানে বড় লোক হিন্দু আর বড়লোক মুসলমানরা মিলতে পারবে। একসঙ্গে এক টেবুলে খেতে পারবে। কিন্তু গরীব হিন্দু, গরীব মুসলমান যাতে মিলতে না পারে, সেইজন্যে তাদের একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া নিষেধ। তাদের মধ্যে যাতে মারামারি লাগে সেই চেষ্টা করতে হবে আমাদের, কি বলুন?'

দুহাজার লোক গণপতির কথা শুনে অবাক হয়ে চুপ করে রইল। হেডমাষ্টার এবং ভদ্রমণ্ডলী মেদিনীপুরের এই গেঁয়ো চাষীটিকে খুঁটিয়ে দেখতে

লাগলেন। এবং গণপতি একটুখানি চুপ করে থেকে সিদ্ধান্ত টানল 'বড়লোক ভদ্রলোক হিন্দু আর মুসলমানরা যদি একসঙ্গে খেয়ে একসঙ্গে মিশে নিজেরা একজোট হতে পারে তাহলে গরীব হিন্দু মুসলমানরাও একসঙ্গে খাবে, একসঙ্গে মিশবে।'

হেডমাষ্টারমশাই গম্ভীরভাবে উঠে চলে গেলেন। গণপতি ধীর পদক্ষেপে ওখান থেকে চলে গেল। কলরব করতে করতে ছাত্র ও জনতা ফিরে গেল।

গণপতি সেইদিনই ঠিক করে ফেলল, সে আর ইস্কুলে থাকবে না। সে বুঝতে পেরেছিল তার কথায় হেডমাষ্টারমশাই রাগ করেছেন। স্কুল কমিটির মেম্বাররাও খুশি হন নি। তবে হেডমাষ্টারমশাই গণপতিকে খুব পছন্দ করতেন। গণপতি ছিল হেডমাষ্টারের অনুগত। এবং তাঁর প্রধান ভৃত্য। তবু ইস্কুলে বোধ হয় আর তার চাকরি থাকবে না।

পরের দিন গণপতিকে ডেকে পাঠালেন হেডমাষ্টারমশাই। অফিসে ঢুকে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে রইল গণপতি। হেডমাষ্টার বললেন, 'আজ বিকালে আমার কোয়ার্টার্সে আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

বিকালবেলা গণপতি গেল হেডমাষ্টারের কোয়ার্টার্সে। হেডমাষ্টার-মশাই তখন তাঁর বাইরের ঘরে বসেছিলেন। দেখতে পেয়ে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। একটা টুল দেখিয়ে তাতে গণপতিকে বসতে বললেন। একটা ইজিচেয়ার পাতা ছিল তাতে বসলেন নিজে।

গণপতি দুরুদুরু কম্পিত বুকে মাথা নিচু করে বসে রইল। কাল অত লোকের সামনে রোখের বশে অনেক কথা বলেছে কিন্তু এমনিতে মাষ্টারমশাইকে সে শ্রদ্ধা করে, ভয় পায়।

হেডমাষ্টার বললেন, 'গণপতি, তুমি স্কুলের কাজ ছেড়ে দাও। তোমার পক্ষে আর স্কুলে না থাকাই ভালো। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি আর এখানকার বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা তোমার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন।'

'আমি কি করব স্যার?'

'আর ইস্কুলে এসো না।'

গণপতি বলল, 'বাবু, আমি আগেই বুঝতে পেরেছি আমার চাকরি আর থাকবে নি। একটা কথা বলব বাবু?'

'বলো।'

'আমার একটা ভাইকে নেবেন আমার জায়গায়?'

'সে আবার তোমার মতো কিছু করে বসবে না তো?'

'না বাবু, সে খুব শান্তশিষ্ট ভালো ছেলে। অনেকটা লেখাপড়াও করেছে।'

'আচ্ছা আনবে তাকে।'

একটু থেমে বললেন, 'তা তোমার এখন চলবে কেমন করে?'

'বাবু, আমি মিলে একটা কাজ হয়তো পেতে পারি।'

'তা দেখ যদি পাও।'

একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, 'আচ্ছা এখন এসো তাহলে।'

গণপতি উঠে এসে হেডমাষ্টারমশাইকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন বাবু, আমি আপনাকে কোনো খারাপ কথা বলতে চাই নাই। আমি তো আপনাকে চিনি। আপনি বত বড় শিক্ষিত মানুষ।'

'ঠিক আছে।' বলে তিনি উঠে ঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন। একটা মুক্তির আনন্দ নিয়ে গণপতি ফিরে এসেছিল।

গণপতি দেশ থেকে নিজের ভাইকে নিয়ে এসে স্কুলের কাজে লাগিয়ে দিল। নিজে কাজ নিল মিলে। কিন্তু বাড়ী গেলেই বিধবা মা আর অন্য ভাইরা বলত, চাষের কাজ করো, তাতে সংসারটা খেয়ে পরে বাঁচবে। ও কটা টাকায় আর হবে কি? এতগুলো পেটের অন্ন যোগাড় হবে কোথা থেকে? শহরে পড়ে থেকে কি হবে? গাঁয়ে এসে চাষবাসের চেষ্টা দেখ।"

এই ব্যারাকপুরে আরও একটা দারুণ ব্যাপার ঘটেছিল গণপতির জীবনে। গণপতি ওর এক ভাইকে সুরকি কলে ঢুকিয়েছিল প্রভাসবাবুকে ধরে।

প্রভাসবাবু তার সুরকির কারখানায় খাসকামরায় বসে বোতল বোতল মদ গিলত। মেয়েমানুষ নিয়ে এসে ফূর্তি করত। তা একদিন সন্ধের পর মাতাল হয়ে টলতে টলতে বাড়ী যাবার জন্যে মোটর গাড়ীতে

`য়ে উঠল। প্রভাসবাবু চলে গেলে একটা চালার থামের মাথায় গণপতির
ই একটা ছোট পুঁটুলি পেল। খুলে দেখে গাদা গাদা টাকার বাণ্ডিল।
খেই গেল মাথা ঘুরে। তাড়াতাড়ি পুঁটলিটা কাপড়ের নীচে লুকিয়ে
য়ে বাসায় ফিরে গণপতির হাতে দিয়ে ব্যাপারটা বলল। গণপতি
ণ্ডিলগুলো খুলে খুলে টাকাগুলো গুনে দেখল দশ হাজার টাকা আছে।
ন্তু সব ব্যাপারেই গণপতির মাথা ঠাণ্ডা থাকে। গণপতি উত্তেজিত
। না, হৈচৈ করে না। নম্র ধীর প্রকৃতির মৃদুভাষী মানুষ সে।
য়েদের মতো ওর কণ্ঠস্বর, সলজ্জ হাসি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে টাকাগুলি
ছিয়ে বাণ্ডিলটি বেঁধে বাক্সের মধ্যে রেখে দিল ও। ভাইকে বলল,
াউকে কিছু বলবি না।'

দিনকয়েক পর খবর পেল প্রভাসবাবু টাকা খুঁজছে, সুরকির
ারখানার প্রত্যেককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কয়েকদিন পর খবরের
াগজে বেরুল, দশ হাজার টাকা হারিয়েছে, কেউ ফেরত দিলে তিন
জার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

গণপতি ক'দিন গভীর চিন্তায় তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে লাগল।
কাটা মেরে নিলে দারিদ্র্য দুঃখ সব ঘুচে যাবে। ইচ্ছে করলে জমি
নে রাতারাতি ও বড়লোকও হয়ে যেতে পারে। শুধু ওর নয়, ওর সমগ্র
রিবারের দুঃখ-দারিদ্র্যের অবসান হবে। আবার মনে হয়েছে, এ টাকা
াপের টাকা। এ টাকায় জমে আছে শ্রমিকের রক্ত, ঘাম, চোখের জল
ার অভিশাপ। এ টাকা প্রভাসবাবুরাই মদ খেয়ে, বেশ্যা নিয়ে ফূর্তি
বে খরচ করতে পারে। গ্রামের গরীব চাষীর ছেলে গরীব গণপতির
ধিকার নেই এই টাকা নিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেবার। তাহলে
নে ও কখনো শান্তি পাবে না। এমনি করে কয়েকদিন তীব্র তিক্ত
ন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে লোভকে পরাজিত করল গণপতি। তারপর
দিন সকালবেলা প্রভাসবাবুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো ও।

প্রভাসবাবু জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার গণপতি?'

গণপতি বলল, 'বাবু আপনার টাকার এই পুঁটলিটা নিন। দেখে
ন ঠিক দশ হাজার টাকাই আছে কিনা।'

প্রভাস গণপতির দিকে বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল

তারপর বাণ্ডিলটা হাতে নিয়ে ওর কর্মচারীদের গুনতে বলল। গণপতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'গণপতি এইখানে বসো।'

চাকরকে ডেকে বলল, 'ওরে গণপতির জন্যে চা বিস্কুট মিষ্টি যা পাস নিয়ে আয়।'

গণপতি বলল, 'না, না, ওসব আনতে হবে না বাবু, আমি খাব না। আমার খাবার একেবারেই ইচ্ছা নাই।' বলে বসল সে।

প্রভাসবাবু জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি পুঁটলিটা কোথায় পেলে গণপতি?'

'আপনার সুরকির এই কারখানাতেই গুড়িয়ে পেয়েছি।'

'কবে বলো তো?

'শনিবার সন্ধে বেলা।'

'ও যেদিন সন্ধে বেলায় আমি একটু বেশী মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম সেইদিন বোধহয়। যেদিন আমাকে গাড়ী করে ম্যানেজারবাবু বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন, আমি পা ঠিক রাখতে পারছিলাম না, সেদিন বোধহয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'গণপতি, তোমাকে আমি কি বলে যে ধন্যবাদ দোব। গণপতি, তুমি সামান্য মানুষ নও। আমি বলছি তুমি বিরাট লোক হবে। তোমার নাম একদিন চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। লোকে তোমাকে সম্মান করবে গণপতি।'

একটু থেমে বলল, 'আমি তিন হাজার টাকা দোব বলে কাগজে ঘোষণা করেছিলাম। তোমাকে আমি এক হাজার টাকা দোব। কেমন তাতেই তো তুমি সন্তুষ্ট হবে। তাই না গণপতি? আমি এক্ষুনি তোমাকে দিয়ে দোব।

'আমি টাকা নোব না বাবু। টাকাতে আমার দরকার নাই। আপনার টাকা জানতে পারি নাই বলেই ফেরত দিতে পারি নাই, নইলে দিয়ে যেতাম। জানতে পেরে টাকাটা দিতে এলাম। দিতে একটু দেরি হয়ে গেল অবিশ্যি। তা মনটা একটু চঞ্চল হয়েছিল তো।'

'কিন্তু তুমি টাকা নেবে না কেন?'

'আজ্ঞে না, টাকা আমি নোব না। টাকা পাব বলে তো টাকা ফেরত দিতে আসি নাই।'

কর্মচারীরা গোনা শেষ করে বলল, 'পুরো দশ হাজার টাকাই আছে।'

প্রভাসবাবু আবার বলল, ,গণপতি, হাজার টাকা তুমি নিয়ে যাও। অন্য কোনো লোক হলে টাকা ফেরত দিত না। তুমি যে ফেরত দিয়েছ, এতেই আমি তোমার কাছে ঋণী। টাকাটা তুমি নেবে না কেন?'

'আমি টাকা নিতে পারব নি বাবু। আমাকে ক্ষমা করবেন।' বলে গণপতি নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এল।

দুপুরে সে কাজ করছে কলে, এমন সময় স্কুলের পিয়ন এসে গণপতিকে বলল, 'হেডমাষ্টারমশাই তোমাকে একবার ডাকছেন।'

গণপতি অবাক হলো, তবু কাজ ফেলে চাকরের সঙ্গে স্কুলে হেড-মাষ্টারের অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পর্দা ঝুলছে। গণপতি বলল, 'ভিতরে আসব স্যার?'

'কে গণপতি? এসো এসো, তোমার জন্যেই তো অপেক্ষা করছি।'

গণপতি ভিতরে ঢুকে দেখল হেডমাষ্টারের পাশে প্রভাসবাবুও বসে আছে। হেডমাষ্টার একটা বেঞ্চি দেখিয়ে বললেন, 'বসো গণপতি, এইখানে বসো।' গণপতি বসলে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে গম্ভীর বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'গণপতি, প্রভাসবাবু তোমাকে এক হাজার টাকা দিতে চান, তুমি নেবে না কেন?'

'আজ্ঞে না স্যার, ও টাকা আমি নিতে পারব নি।'

হেডমাষ্টার আবার বললেন, "উনি তিন হাজার টাকা দোব বলে ঘোষণা করে এক হাজার টাকা দোব বলেছেন, সেইজন্যেই কি তুমি অভিমান করে নিতে চাইছ না? তা যদি হয় তো বলো, উনি তোমাকে তিন হাজার টাকাই দেবেন।"

গণপতি বলল, "আজ্ঞে না স্যার, ও জন্যে আমি নোব না বলি নাই।"

গণপতির ভিতরে ভিতরে এই সময়ে একটা দুর্নিবার আবেগ ও বিচিত্র অনুভূতি জন্ম নিচ্ছিল। ওর মনে একটা চিন্তা জাগছিল, যে চিন্তা সম্বন্ধে ও আগে তত সচেতন ছিল না। সে চিন্তা হলো, তাহলে দশ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে সে তো এক বিরাট ব্যাপার করেছে, সে তো এক অচিন্তনীয় কাজ করেছে, তা না হলে প্রভাসবাবু, হেডমাষ্টার এমন করে বিস্মিত, চিন্তিত, নম্র হয়ে পড়ছেন কেন? ওকে অত খাতির করছেন

কেন? কিন্তু তীব্র এবং বেদনাদায়ক অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগে দ্বন্দ্বের এক পক্ষ লোভকে পরাজিত করে ও দ্বন্দ্বের সমাধানে এসেছিল। তাই প্রভাসবাবু আর হেডমাষ্টারের পীড়াপীড়িতে নিজে সে ভিতরে ভিতরে পীড়িত হয়ে উঠছিল। ক্রোধ জ্বলছিল ওর ভিতরে। কেন ক্রোধ, কিসের ক্রোধ, ও নিজেও ঠিক বুঝতে পারছিল না। ও স্বভাবতই নম্র প্রকৃতির, ধীর ওর কথা। ঠাণ্ডা ওর মাথা। কিন্তু সেই মুহূর্তে একজন ডাকসাইটে ধনী আর একজন পণ্ডিত ও খ্যাতিমান মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে, ঘৃণা, আত্মসচেতনতা এবং অহঙ্কারের মিলিত এক প্রবল আবেগ ওর মনে ফেটে পড়তে চাইছিল। আর তাই ও উঠে দাঁড়াল আর বলতে লাগল, 'আমার কোনো অভিমান কোনো ছলাকলা নাই। আমি ও টাকা ঘেন্না করি। কেননা ও টাকার প্রতিটি পয়সাতে আছে গরীব খেটেখাওয়া মানুষের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, রক্ত-জল-করা মেহন্নত, মাথার ঘাম, চোখের জল, দুঃখ-কষ্ট, অভিশাপ। ও টাকা তো মজুরদের শোষণ করে জমানো। আমিও গরীব, আমিও মজুর, আমি ভূমিহীন নিঃস্ব চাষীর ছেলে। আমরা বহু পুরুষ ধরে গরীব। আমি গরীব হয়ে গরীবের রক্তে তৈরী টাকা নোবই বা কেমন করে, ভোগই বা করব কেমন করে। ও টাকা আমি নোব নি, ও টাকা আমি হজম করতে পারব নি।"

কথা শেষ হলে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও। কেননা ও আশঙ্কা করছিল এইবার হেডমাষ্টার ওকে ধমকে উঠবেন। প্রভাসবাবু কটু কথা বলবেন। কিন্তু হেডমাষ্টার তা করলেন না। ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

প্রভাসবাবু কিছুক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তবে তুমি কি চাও?'

'কিছুই চাই না।'

হেডমাষ্টার, প্রভাসবাবু ওর দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। তারপর হেডমাষ্টার বললেন, 'আচ্ছা তুমি এখন যাও গণপতি।'

গণপতি হেডমাষ্টারকে দুহাত জোড় করে তুলে প্রণাম জানিয়ে দোরের পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল।

এইসব বিভিন্ন ধরণের উদ্ভট ঘটনার পর ব্যারাকপুরে থাকতে আর ইচ্ছা হলো না গণপতির। ওদিকে বিধবা মা আর ভাইরা বারবার উপরোধ করছিল জমি ভাগে নিয়ে চাষবাস করবার জন্যে। কিন্তু চাষ করেই যদি বাঁচতে হয় তাহলে দুএক বিঘে জমি ভাগে নিলে তো চলবে না। অল্প জমি নিলে জোতদারের ভাগ দিয়ে নানানরকম আওয়াব দিয়ে কিছুই আর ভাগ্যে থাকবে না। অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ বিঘে জমি ভাগে পেলে তবেই সংসারের অভাব ঘুচবে। কিন্তু অত জমি ওদের গ্রামে তো ভাগে পাওয়া যাবে না। সমস্ত মেদিনীপুরেই পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কেননা বর্গাদাররা গণপতির অনেক আগে থেকেই সব জমি ভাগে নিয়ে বসে আছে। গণপতি শুনেছিল গঙ্গার ওপারে সুন্দরবনে জঙ্গল হাসিল করে জমি তৈরী হচ্ছে। এখনও সেখানে যথেষ্ট কৃষক যায় নি। এখনও ও-অঞ্চলে বন আছে, জলা জায়গাই বেশি। বাঘ আছে, বিষধর সাপ আছে, জলে আছে কুমীর। জল নোনা, অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর জায়গা। তবু বেশী জমি ভাগচাষের জন্যে পেতে হলে সেই ভীষণ সুন্দরবনেই যেতে হবে।

তাই আজ সে সুন্দরবনে যাচ্ছে। নানান সংশয়, ভয় ও দুশ্চিন্তা অগ্রাহ্য করেই সে চলেছে সুন্দরবনে।

॥ ২ ॥

হুগলী নদী পার হয়ে সুন্দরবনের মাটিতে পা দিল গণপতি। পায়ে বুটজুতো। মালকোঁচা করে কাপড়-পরা। গায়ে ঘন নীলরঙের ফুলসার্ট। কোমরে বাঁধা আছে ছোটো ভোজালি, সুরকি কারখানার নেপালী দারোয়ান ওর জন্যে স্বদেশ থেকে আনিয়ে দিয়েছিল।

প্রথমে গেল সূর্যপুর-মথুরাপুরের মাঠে। মাঠে তখন আসন্ন-পক্ক ধান। হাতে একটি খাতা একটি পেনসিল গণপতির। জমির আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রত্যেক জমিতে এক একটি ধান গাছে কতগুলি করে শিষ আছে গুনে দেখে খাতাতে টুকে নিতে লাগল।

গদা মথুরাপুর দ্বিতীয় খণ্ডে প্রত্যেক চারায় মোটামুটি একশ'পঞ্চাশটা

করে শিষ হয়েছে। মনে মনে হিসেব করে দেখল গণপতি, এখানে বিঘে প্রতি আঠার-কুড়ি মন ধান হবে। অর্থাৎ জমি খুব উৎকৃষ্ট। ঠিকমতো জমির মাটিতে মানুষের ঘাম মিশিয়ে দিতে পারলে এসব জমিতে তো সোনা ফলানো যায়। খোঁজ নিয়ে জানল ওখানকার জোতদার মেদিনীপুরের গুংগরের নব বারিক, লছমন বারিক।

নব বারিক, লক্ষ্মণ বারিকের সঙ্গে দেখা করে গণপতি বলল, 'আমি আপনাদের জমি ভাগে নিতে চাই।'

গণপতির সমস্ত পরিচয় জেনে নিয়ে নব বারিক বলল, "জমি তোমাকে আমরা ভাগে দিতে পারি। তবে জঙ্গল সাফ করে জমি তৈরী করে নিতে হবে। চাষ হলে বিঘে প্রতি দুমন করে ধান প্রত্যেক বছরে সেলামী দিতে হবে। এ ছাড়া অন্যান্য আদায় মিটিয়ে দিতে হবে তোমার আধাআধি ভাগ থেকে। ভেবে দেখ যদি এই শর্তে রাজী হও, তাহলে জমি তুমি পাবে।"

গণপতি বলল, "আমি ঐ শর্তেই রাজী আছি ; তবে আমাকে বেশি পরিমাণে জমি দিতে হবে। জমি আমার জন্যে ঠিক করে রাখবেন। যদি আমি না নিতে পারি ঠিক সময়ে জানিয়ে দোব।"

এই কথা বলে মোটামুটি কথা পাকা করে গণপতি চলে এল।

আবার আল ধরে পথ চলতে লাগল। যেতে যেতে সামনে পড়ল জঙ্গল। সে-জঙ্গল কেওড়া, গর্জন, হেঁতাল, বাণী, গরান, গোলপাতা, গেঁয়ো প্রভৃতি সুন্দরবনের বুনো গাছের। গণপতি ভাবতে লাগল বনের ভিতর দিয়ে যাওয়া উচিত হবে কিনা। সূর্য অনেকক্ষণ পশ্চিমে ঢলেছে। বনে ঢুকে বিপদে পড়লে মুস্কিল হবে। কিন্তু খানিকটা দোনামনা করে বন পেরিয়ে যাবে বলে মন স্থির করে ফেলল। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভোজালিটা খাপ থেকে খুলে হাতে নিয়ে বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল। বনের ভিতরে পড়ন্ত রোদের আলোছায়ার খেলা। গাছের তলায় মাটি প্রায় শুকিয়ে এসেছে। জায়গায় জায়গায় জল জমে আছে, কোথাও বা তলতলে কাদা। গাছের মূলের শূল জেগে আছে অনেক জায়গায়। মশা ভন্ ভন্ করছে। আর ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে কানে তালা ধরিয়ে দিয়ে।

বন পার হয়ে বাইরে এসে দেখল সূর্য একেবারে পশ্চিম দিগন্তে নেমে

গিয়েছে। রাঙা ম্লান আলোয় সবুজ মাঠ, ঘন সবুজ বন অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। আশ্রয়ের সন্ধান করা দরকার। চারদিকে তাকিয়ে দেখল ধূ ধূ করছে মাঠ। কোথাও ধানের ক্ষেতে, কোথাও ঝোপ ঝাড় জঙ্গল। মানুষের বসতির চিহ্নমাত্র নেই। এখানে সেখানে ঝুপড়ির মতো এক একখানা খড়ের চালের টং দেখা যাচ্ছে। উত্তুরে হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে বইতে লেগেছে। সুতির চাদরটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে একটা টং লক্ষ্য করে জোরে পা চালাল গণপতি। সেই টংয়ের কাছে গিয়ে ডাক দিল, 'কে আছেন?'

একজন লোক বেরিয়ে এল। বলল, 'কে আপনি? কি চাই?'

গণপতি বলল, 'আমি মেদিনীপুরের লোক। রাতের জন্যে একটু আশ্রয় চাই।'

লোকটা বলল, 'এটা কাছারি বাড়ী, এখানে থাকা হবে না।'

'কার কাছারি?'

'বীরেন দাসের'

'বীরেন বাবু আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'একবার ডেকে দেবে?'

'তা দিব।' বলে লোকটা ভিতরে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে বলল, 'কে আপনি? কি দরকার?'

গণপতি বলল, 'আমি মেদিনীপুর থেকে আসছি। আপনার কাছারিতে রাতের মতো একটু থাকতে চাই।'

বীরেন দাস বলল, 'না, রাত্রে তো আমি থাকতে দিতে পারব না। অপরিচিত পথিককে হঠাৎ বাড়ীতে আশ্রয়টাশ্রয় দিতে পারব না। আপনি অন্যদিকে দেখুন। থাকবার জায়গা একটা যোগাড় হয়ে যাবে।'

বীরেন দাসের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে গণপতি দিগন্ত-ছোঁয়া মাঠে দৃষ্টি বুলিয়ে কোনো ঘর খুঁজতে লাগল। খানিক দূরে একটা টং দেখতে পেল। (টং উঁচু জায়গায় তৈরী কুঁড়ে ঘর বিশেষ)। টংয়ের কাছে গিয়ে একজন প্রৌঢ়া কৃষক মেয়েকে দেখতে পেল।

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কোথায় রাত্রির মতো থাকার জায়গা পাওয়া যাবে বলো দেখি মা?'

'আপুনি কোথা থিনে আসছেন গো বাবু?'

গণপতি সব কথা খুলে বলল। শুনে সে বলল, 'এখানে তো কাছা-কাছি আর কোনো ঘর-দোর নি। তুমি আমাদের এখানে থাকতে চাও তো দেখো।'

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কে আছে?'

'এখন কেউ নাই। আমি আছি আর আমার মেয়ে।'

জানা গেল বাড়ীর কর্তার নাম শ্রীচরণ আড়ি।

'এত উঁচুতে ঘর করেছ কেন গো মা?'

'এখানে বাঘ আর সাপের ভয় আছে, তাই উঁচুতে টং বেঁধেই এখান-কার লোক বাস করে।' প্রৌঢ়া বলল, 'উপরে উঠে এসে বসো।'

উঠে গিয়ে জুতো খুলে দাওয়ায় বসল গণপতি। ছোট একখানি ঘর, ঘরের সঙ্গে ঘেরা দাওয়া। প্রৌঢ়াও বসল। ঘর থেকে মেয়েও বেরিয়ে এসে খুঁটি ধরে দাঁড়াল। গণপতি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখল। আসন্ন গোধূলির অস্পষ্ট সোনার আলোয় ভারি মিষ্টি লাগল মেয়েটাকে। হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান মেয়ে। মাথায় কত বড় চুলের গোছা! টানা টানা চোখ, বাঁশীর মতো নাক। আর বুক দুটো কি উঁচু দেখ! গণপতি মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে প্রৌঢ়া বলল, 'বস লক্ষ্মী, এখানে বস।'

গণপতি বলল, 'এই আপনার মেয়া?'

'হ্যাঁ, বাবা এই আমার মেয়া। মেয়ে নিয়ে আমার দুর্ভাবনার শেষ নাই। এ বনের রাজ্যি। এখানে মানুষও বুনো হয়ে যায়।'

গণপতি বলল, 'এই ফাঁকা মাঠে এমনিভাবে থাকতে তোমাদের ভয় লাগে না মা?'

'ভয়ে বুক কাঁপে বাবা। ভাগে জমি পাবার আশায় মেদনীপুর থেকে ছিচরণ আমাকে আর লক্ষ্মীকে নিয়ে এখানে এল। তা জমি কোথায়। জঙ্গল পস্কার করে জমি তৈরী করতে হবে। একা মানুষ ছিচরণ জঙ্গল সাফ করতে পারে না। তা তিন জমিদারের নায়েব মহিম ঘোষ বলেছেলো জমি দেবে। তা কেবলই ঘোরাচ্ছে। তার কাছেই তো গিয়েছে ছিচরণ।'

'কেন ভাগে জমি পাওয়া যায় না ?'

'জঙ্গল সাফ করে জমি তৈরী করে নিলে তবে ভাগে পাওয়া যায়। তা আমাদের হাল নাই, লাঙ্গল নাই জমি চষব, কি দিয়ে। আর ভাগে এক বিঘে জমি তুলতে পারলেও ধান তো আর কিছুই পাওয়া যাবে না। সব জমিদারের ঘরে গিয়ে উঠবে।'

'কেন জমিদারের ঘরে কেন উঠবে ?'

'অ্যানেক রকমের সব খাজনা আছে যে। তাই খাজনা করে কিছু জমি যদি একবারে পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করছে ছিচরণ। জমি পাবে বলেই তো দেশগাঁ ছেড়ে এই শ্মশানে এলাম। তা জমি যে কিছুতেই দিতে চায় না নায়েব।'

'ভাগে জমি চষলে কি কি খাজনা দিতে হয় জমিদারকে ?'

'সে অ্যানেক রকম। আমি তো সব জানি না। তবু যা শুনিছি তাই বলি শোনো। সালা, মাওলা, রাখনি, ছেলের জন্ম, ভাতখাওয়ানি, বিবাহ, পুনর্বিবাহ, খামারহিলা, খামার-ঘেরা, দারোয়ানি, ঈশ্বরবৃত্তি, কয়ালি। আবার জমিদারের কাছে ধান ধার করলে নতুন ধান উঠলে দেড়গুণ দিতে হবে। এ বাদে কত রকমের যে বায়নাক্কা আছে তা শেষ নি। বেগার খাটতে জহয় মিদারের বাড়ীতে। তার চেয়ে নিজের বলতে কিছু জমি থাকলে খাজনা দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। অত ঝঞ্ঝাট থাকে না।'

সুন্দরবনের ভাগচাষীদের অবস্থা খানিক আঁচ করতে পারল গণপতি। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করে বসল, 'তা মেয়ার বিয়া কেন দেন নাই গো ?'

'দুবেলা পেটের ভাত জোটে না, বে কেমন করে দিই বলো দিনি বাবা ? তা দোব এবার।'

লক্ষ্মী তাকাল গণপতির চোখের দিকে। গণপতির চোখে আকাঙ্ক্ষা ঘনিয়ে উঠল। অন্ধকার হয়ে এসেছিল। লক্ষ্মী ঘরে ঢুকে প্রদীপ জ্বেলে বাইরে নিয়ে এল।

মা জিজ্ঞাসা করল, 'আপুনি কি জাত ? আমরা জাতিতে বাগদি।'

গণপতি বলল, 'তা সে যে-জাতই হোক না কেনে আমার খেতে কোনো বাধা নাই। তুমি রান্না চাপাও।'

'না বাবা তোমাকে দেখে তো আমাদের স্বজাতি বলে মনে হয় না। তুমি কি জাত বলো।'

গণপতি জাতিতে মাহিষ্য। কিন্তু সে মিথ্যা বলল, 'আমি বাগদি।'

'আমার বাপু বিশ্বাস হয় না। তা আমরা চাল ডাল দিই, তুমি নিজে বেঁধে খাও।'

'যা ভালো বোঝ কর মা, আমার কিছুতেই আপত্তি নাই। তবে আমার শরীর খুব ক্লান্ত হয়ে আছে। এখন রাঁধতে হলে ভারি কষ্ট হবে। তোমরাই রাঁধ, আমি জাতটাত মানি না।'

মা বলল, 'ছিচরণ আজ বোধহয় ফিরবে নি। তুমি এলে বলে মনে বল পেলাম।'

সে রাত্রে গণপতি ঘেরা বারান্দায় শুয়ে রাত কাটাল।

পরের দিন ভোর বেলায় উঠে মাঠে নেমে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আকাশ ছোঁয়া ধূ ধূ করছে চারদিক। অনেক জায়গায় কাঁচা পাকা ধান বাতাসে হেলছে দুলছে। অনেক জায়গায় শুধু বন আর বন। বহু জায়গা বড় বড় ঘাসে ভর্তি, আর কিছু কিছু জায়গায় সামান্য চাষ-দেওয়া জমি পড়ে আছে। আর দূরে দূরে ছড়ানো ছিটোনো দু একটা টং।

সূর্য উঠলে গণপতি যাত্রার জন্যে তৈরী হলো। বলল, 'মা, আমি একটু ঘুরে ঘুরে দেখি, এদিকের জমি কেমন।'

হাতে খাতা পেন্সিল নিয়ে সে মাঠে নেমে গেল। দেখল এক একটা ধানের গোছে পনের যোলটি করে চারা। শিষ হিসেব করে দেখল, এক একটা গোছে অন্তত একসের দেড়সের করে ধান হবে। আরে বাপরে এখানে যে সোনা ফলেই আছে। এ জমি সোনা প্রসব করে। লক্ষ্মী এখানে ঝাঁপি নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। লক্ষ্মীর চরণাশ্রিত ভূমি এ। ও টংয়ে ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, এখানকার জোতদার কে?'

'মেদিনীপুরের কলাগাছির হরেন সামন্ত।'

গণপতি বিস্মিত হয়ে বলল, 'কলাগাছি তো আমাদের গাঁয়ের কাছে। তা ওকি হরি সামন্তর ভাই?'

'হাঁ, তাই বটে।'

'তা হরেন সামন্ত থাকে কোথায়?'

প্রৌঢ়া আঙ্গুল দিয়ে দূরে একটা ঘর দেখিয়ে দিল।

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে কে কে থাকে?'

'থাকে হরেন আর তার রাখ্‌নি বিষ্টুপিয়া আর নায়েব পেয়াদা।'

'ওর পরিবার থাকে না?'

'না, সে সব দেশে থাকে। এখানে থাকে বিষ্টুপিয়া।'

গণপতি লক্ষ্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলল হরেন সামন্তর কাছে। মনে মনে ভাবছিল গণপতি, হরেন সামন্তের বসতবাটী দেনার দায়ে নিলেম হয়ে গিয়েছিল। হরেনের বাবা ওখানকার রামবাবুর কাছে প্রচুর ঋণ করেছিল। সে-ঋণ শোধ করতে পারে নি হরেনের বাবা। বাবার মৃত্যুর পর সেই দেনার দায়েই তো হরেনের ভিটেমাটি পর্যন্ত নিলেম হয়ে গিয়েছিল। সেই হরেন সুন্দরবনের মস্ত জোতদার হয়ে বসে আছে! কি করে এত সম্পত্তি করল হরেন? এই সব কথা ভাবতে ভাবতে ও হরেন সামন্তর টংয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

টংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল গণপতি, 'বাবু আছেন নাকি?'

ডাক শুনে হরেনের উপপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া বেরিয়ে এল। গণপতি বুঝল এই বিষ্ণুপ্রিয়া।

জিজ্ঞাসা করল, 'হরেনবাবু আছেন নাকি?'

বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর দিল, 'না নাই, ফ্রেজারগঞ্জে গিয়েছে।'

হরেনের ফ্রেজারগঞ্জের ঠিকানা নিয়ে গণপতি গেল ফ্রেজারগঞ্জ। সেখানে গিয়ে শুনল হরেন গেছে ঘুঘুডাঙ্গা। ঘুঘুডাঙ্গা গিয়ে জানল হরেন গিয়েছে দেশে—মেদিনীপুরে। গণপতিও দেশে ফিরল।

দেশে গিয়ে হরেন সামন্তের সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য যোগাড় করল। হরেন রামবাবুর কাছে টাকা ধার নিয়েছিল আর অন্যান্য দিক থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করে সুন্দরবনে গিয়ে বিঘে চার পাঁচ জমি নিয়ে গুছিয়ে বসে। কিছু জঙ্গল জমি ভাগ-চাষেও নিয়েছিল। তারপর হরেনরা চার ভাই মিলে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ আবাদ করে। ধান উঠলে জমির মালিককে ধান না দিয়ে চার পাঁচখানা বোট বোঝাই করে ধান নিয়ে সুন্দরবন থেকে পালিয়ে গিয়ে সেই ধান বিক্রি করে প্রচুর টাকা পায়। তারপর রামবাবুর কাছে

আরও কিছু টাকা ধার নিয়ে লয়ালগঞ্জ নামখানায় আড়াইশ' তিনশ' বিঘে জঙ্গল জমি জমিদারের কাছ থেকে খাজনা হিসেবে নেয়।

সুন্দর বেরাকে সঙ্গে নিয়ে গণপতি গেল হরেন সামন্তর কাছে।

হরেন বলল, 'লয়ালগঞ্জে চলো, সেখানে তোমাকে ভাগচাষের জন্যে জঙ্গল দোব। আর দেড়শ বিঘে জঙ্গল সাফ করে জমিকে চাষের যোগ্য করলে তোমাকে পঞ্চাশবিঘে জমি লিখে দোব। জমিটা দোব তোমাকে জরিপের সময় বিঘে প্রতি পঁচিশ টাকা হিসেবে। তবে জায়গাটা এখনও বাপু জঙ্গুলে। ওখানে গিয়ে তেঁতুল গুলে প্রতিদিন জল খেতে হবে। তা না হলে টিকতে পারবে নি।'

গণপতি লয়ালগঞ্জে যেতে রাজী হয়ে গেল। এক ভাই আর এক বোনকে নিয়ে সুন্দরবনের লয়ালগঞ্জে গিয়ে টং করল গণপতি। তখনও লয়ালগঞ্জে হরিপুর অঞ্চলে অনেক জঙ্গল। চন্দনপিঁড়ি নদীর দুই তীরে গভীর জঙ্গল। খালে নদীতে আছে কুমীর, ডাঙ্গায় বনে আছে বাঘ। দারুণ সাপের দৌরাত্ম। স্যাঁতসেঁতে অস্বাস্থ্যকব মাটি। মশা আর পোকামাকড়ের শেষ নেই। দেড়শ' বিঘে জমি হরেন তাকে দিল পরিষ্কার করবার জন্যে। বলল, 'এই জমিটাকে পরিষ্কার করতে পারলে, তোমাকে পঞ্চাশ বিঘে জমি দান করব।'

গণপতিরা দুই ভাইয়ে মিলে কোদাল, শাবল, গাঁইতি, দা, কাস্তে নিয়ে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাজ শুরু করল, কিন্তু শুধু দুজনে এই বিশাল জায়গা পরিষ্কার করতে অনেক দিন লেগে যাবে। জমি পেতে পাঁচবছর লেগে যাবে। তাছাড়া বন পরিষ্কার করে ফেললেও নোনা মাটির এমনি গুণ যে শিকড় থেকেই আবার অজস্র চারা গজিয়ে ওঠে। আরও লোক না হলে দেড়শ' বিঘে জঙ্গল সাফ করা যাবে না। দেশ থেকে লোক আনবাব জন্যে ভাইকে পাঠিয়ে দিল গণপতি। একদিন গেল শ্রীচরণ আড়ির কাছে।

শ্রীচরণের মা বলল, 'এসো বাবা এসো, শুনলাম তুমি হরেনের ঠেঁয়ে অনেক জমি ভাগে নিয়েছ, তা আমার ছিচরণের একটা কিছু করে দাও।'

'সেইজন্যেই তো এয়েছি। ছিচরণ কোথা?'

'সে কোনো তালে বার হইছে।'

'তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। আমার সঙ্গে জমি পরিষ্কার করুক, তা'পর যতটা জমি ও ভাগে চষতে পারে, দোব ওকে।'

ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল লক্ষ্মী। চোখে চোখ পড়ল গণপতির।

গণপতি বলল, 'কি গো লক্ষ্মী ভালো আছ তো? আমার বোন এসেছে দেশ থিনে। যেয়ো কেনে। আলাপ সালাপ করে এসো। সঙ্গী-সাথী কেউ নাই। একা থাকতে কষ্ট হয় বোনটার।'

লক্ষ্মী বলল, 'যাব, আজ বিকেল বেলায় যাব তোমাদের বাড়ী।'

'তাহলে ছিচরণকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলো মা', বলে গণপতি লক্ষ্মীকে ওদের বাড়ীতে যাবার নিমন্ত্রণ করে ফিরে এল।

বিকালে গণপতি ওর ঘরের সামনে বসেছিল। দেখল লক্ষ্মী আসছে।

গণপতি বলল, 'এসো লক্ষ্মী এসো; তোমার নাম লক্ষ্মী। তুমি আমার ঘরে এলে আমার ঘরেও লক্ষ্মী আসবে।'

লক্ষ্মী লজ্জায় হেসে বলল, 'হ্যাঁ দাদার ঘরে খুব লক্ষ্মী এনেছি, এবার তোমার ঘরে লক্ষ্মী আনব। আমি অলক্ষ্মী।'

'ছি, ওকথা বলো না। দেখো না এবার ছিরণের একটা ব্যবস্থা আমি করে দিব। তা তোমার দাদা আসবে কখন?'

'আসবে তো বলেছে। দাদা বলছে, আমার এখুনি জমি চাই, না হলে উপোস দিয়ে মরতে হবে। মহিম ঘোষ জমি দোব বলেছে, ভাগে নয়, একেবারে দেবে।'

গণপতি ওর বোনের নাম ধরে ডাকল, 'ও কালী বেরিয়ে আয়, দেখ, আমাদের লক্ষ্মী এয়েচে রে।'

কালী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লক্ষ্মীকে অভ্যর্থনা করল। গণপতি লক্ষ্মী আর কালীর সঙ্গে বসে বসে গল্প করতে লাগল। ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্মীর লজ্জায় ভারি চোখে চোখ পড়ে গণপতির। সুন্দরবনের এই বুনো পরিবেশে অন্তরে অন্তরে গভীর প্রীতি জমাট বেঁধে ওঠে। বারে বারে আড় চোখে চায় লক্ষ্মী। গণপতির মনের ছটফটানি টের পায় সে।

দেখতে দেখতে অন্ধকার নেমে এল শীতার্ত শূন্যমাঠে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকতে লাগল চারদিকে হাজার হাজার নূপুর ধ্বনির মতো। শেয়ালের ডাক

ভেসে আসতে লাগল। বন্যজন্তুর ভয় আছে, সাপের ভয় আছে।

লক্ষ্মী বলল, 'রাত হলো, আমাকে এবার যেতে হবে।'

কালী বলল, 'আমাদের ঘরে থেকে যাওনা আজ।'

লক্ষ্মী আপত্তি কবল। গণপতি বলল, 'চলো তোমাকে দিয়ে আসি।'

হাতে একগাছা লাঠি নিয়ে লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে পথ ধরল গণপতি। দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে। বিরাট আকাশে তারাগুলি একে একে ফুটে উঠছে। কি ঝক্ ঝক্ করছে। মশার ঝাঁক উড়ছে ভনভনিয়ে। লক্ষ্মী চলেছে পাশে পাশে। গণপতির বালিকা বৌ সবে কৈশোরে পা দিয়েছে। তাকে এখন সুন্দরবনে পাঠাতে চায় নি তার মা। আর এখনও মোহিনীর সঙ্গে তেমন ভাবও হয় নি গণপতিব। দেশে গাঁয়ে থাকত না বলে দেখা সাক্ষাতের সুযোগও বেশি ঘটেনি। আর সে-মেয়ে সবে কৈশোরে পা দিয়েছে। সুন্দরী সে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন এই নির্জন মাঠে যেখানে কোনো বাধা নেই, বন্ধন নেই, সমাজ নেই, গণপতির মনে হচ্ছে এই পৃথিবীতে লক্ষ্মী আব সে ছাড়া যেন কেউ নেই। আর লক্ষ্মী যুবতী। তার খাটিয়ে শরীরেব কানায় কানায় যৌবনের বন্যা দুলছে, হাসছে, কলকল ছলছল করছে।

'আঃ, বলে আর্ত শব্দ করে বসে পড়ল লক্ষ্মী।

'কি হলো লক্ষ্মী?'

'পায়ে হোঁচট লাগল গো।'

গণপতি লক্ষ্মীর এক হাত ধবে বলল, 'আমার হাত ধরে চলো।'

চলতে চলতে হঠাৎ গণপতি বলে বসল, 'জানো লক্ষ্মী, তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি। তোমাকে দেখবার জন্যে আমার মন কেমন করে।'

লক্ষ্মী চুপ করে থাকে।

গণপতি বলে যায়, 'তুমি প্রতিদিন আমাদের টংয়ে আসবে, কেমন? তুমি যদি না আস তাহলে আমাকে যেতে হবে কিন্তু।'

লক্ষ্মী এবারও চুপ করে রইল।

'কথা বলছ না যে?'

'কি বলব?'

'আমাকে তোমার কেমন লাগে?'

'ভালো'

'এই বিদেশে বিভূঁয়ে তোমাকে নইলে আমি থাকতে পারব নি লক্ষ্মী। উপায় থাকলে আমি তোমাকে বিয়ে করে ফেলতাম।' বলে হঠাৎ লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরে গণপতি। লক্ষ্মী আপত্তি করে না। গণপতি লক্ষ্মীকে ছেড়ে দিয়ে বলে, 'তাড়াতাড়ি চলো, তোমার মা নইলে ভাববে।'

সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত সারাদিন জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ করত গণপতি। সঙ্গে থাকত ভাই, দেশ থেকে নিয়ে আসা দুজন মজুর আর শ্রীচরণ। শ্রীচরণ এখন গণপতির সঙ্গে কাজে যোগ দিয়েছে। তখন মজুরদের দিনমজুরী ছিল দু আনা চার আনা। গণপতি হরেনের কাছে টাকা ধার নিয়ে মজুরদের মজুরী দিত, খোরাক চালাত। শ্রীচরণকে সে সাহায্য করত সেই ধারের টাকা দিয়ে।

সারাদিনের কাজের পর লক্ষ্মীকে না দেখলে থাকতে পারত না গণপতি। কোনদিন শ্রীচরণের সঙ্গে ওদের টংয়ে চলে যেত, কোনোদিন কাজ থেকে ফিরে দেখত লক্ষ্মী ওদের ঘরে এসে কালীর সঙ্গে গল্প করছে। সেদিন আর গণপতি শ্রীচরণের সঙ্গে যেত না। ঘরে বসেই লক্ষ্মীর সঙ্গে হাসি ঠাট্টা তামাসায় সময় কাটাত। রাত হলে লক্ষ্মীকে সঙ্গে করে ওদের টংয়ে পৌঁছে দিয়ে আসত। সুন্দরবনের এই নির্বাসিত আনন্দহীন জীবন গণপতির কাছে স্বর্গ-সুখের মতো মনে হয়। দিগন্তে-মেশা বাধাহীন বিরাট আকাশ, ধূ ধূ করা অশেষ মাঠ বন তার কাছে এক বিশাল ফুলের মতো যেন বিকশিত হয়ে আছে বলে মনে হয়। কি এক গভীর রসাবেশে সে বুঁদ হয়ে থাকে। লক্ষ্মীর কটাক্ষ-সুধা গণপতির প্রাণে অসীম শক্তি ও আনন্দ যোগায়।

গণপতির বয়স এখন চব্বিশ। যাকে বলে দৃপ্ত যৌবন। লক্ষ্মীর বয়েস হবে উনিশ। লক্ষ্মী যৌবনের উদ্দামতায় ভরপুর, চঞ্চল। ওদিকে দেশে তার বালিকাবধূ মোহিনী সবে বুঝি তের বছরে পা দিয়েছে। পুনর্বিবাহ মানে ঋতু-উৎসব হয়েছে কি হয়নি। তার অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের ঢেউ সবে আসতে শুরু করেছে বুঝি। মোহিনীকে মনেই পড়েনা গণপতির। লক্ষ্মী তার মন ভরে রইল এ সমাজ বন্ধনহীন সুন্দরবনে। এখানে স্বাধীনতার মধ্যে, অবাধ মুক্তির মধ্যে লক্ষ্মীকে ও সমস্ত মন দিয়ে

গ্রহণ করল।

একদিন জঙ্গল হাসিলের কাজ চলছিল। শ্রীচরণের মা এসে দাঁড়াল সেখানে।

গণপতি শুধোল, 'কি ব্যাপার মা, কিছু বলবে?'

মা বলল, 'ছিচরণকে একবার ডাকতে এয়েচি। বিশালাক্ষীর থানে লক্ষ্মী আজ পূজা দিতে যাবে। দূর তো অনেকটা। একজন কেউ সঙ্গে গেলে হোত। আমাকে তো বাড়ীতে রাঁধাবাড়া করতে হবে।"

গণপতি বলল, 'তুমি যাও মা, আমি বা ছিচরণ কেউ একজন যাব।'

মা চলে গেলে গণপতি শ্রীচরণকে বলল, 'চরণ, লক্ষ্মী বিশালাক্ষীর থানে পূজা দিতে যাবে। আমিই ওর সঙ্গে চললাম, নাকি তুমি যাবে?'

বিশালাক্ষীর থানে যেতে ইচ্ছা করছিল না শ্রীচরণের। কাজ ছেড়ে গেলে সমস্ত দিনটাই নষ্ট হবে। তাছাড়া গণপতির সঙ্গে লক্ষ্মীর যে মধুর সম্পর্ক তৈরী হয়েছে তাও জানতে বাকী নেই শ্রীচরণের।

ও বলল, 'তুমিই যাও গণ, আমার যেতে ইচ্ছা করছে না।'

গণপতি চলে গেল। লক্ষ্মীদের বাড়ী গিয়ে দেখল লক্ষ্মী চান করে একখানা নতুন শাড়ী পরে হাতে নৈবেদ্য সাজানো ছোটো পিতলের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিঠে ওর ভিজে চুল ছড়ানো। গণপতি গিয়ে পৌঁছতেই লক্ষ্মী ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আমি কখন থে অপেক্ষা করে বসে আছি, ওর এতক্ষণে আসবার সময় হলো।'

'কি করব, কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে তবে তো আসতে হলো।'

'কত রাস্তা হেঁটে যেতে হবে তা জানা আছে তো, আমি যেতে যেতে যদি পুজা শেষ হয়ে যায় তখন কি হবে। পুরুত তো আর আমার জন্যি বসে থাকবে নি।'

'বেশ হয়েছে চ'লো।'

হাতে পুজোর নৈবেদ্যের থালা নিয়ে চলতে লাগল লক্ষ্মী। গণপতি ওর পাশে পাশে চলছে। খানিক পথ পেরিয়ে মাঠে পড়ল ওরা। শ্রীচরণ, বীরেন দাস, গণপতিদের টং অনেক দূরে পড়ে রইল।

লক্ষ্মী বলল, 'তুমি যে এলে, দাদা কিছু মনে করবে নি?'

'তোর দাদা তো সব জানে, কি আবার মনে করবে?'

'তোমার বাপু লজ্জা টজ্জা বড্ড কম। কি বলে তুমি আমার পেছন পেছন চলে এলে?'

'তোর কাছে আমার সব সময়েই আসতে ইচ্ছা করে। মনে হয় দিনরাত তোর কাছে পড়ে থাকি। লক্ষ্মী তোকে দেখে আমার এমন হলো কেনে?'

'তা আমি কেমন করে জানব? তোমার কাছে থাকতে আমারও খুব ইচ্ছা করে।'

'কিন্তু দেশে আমার যে বৌ আছে।'

'তোমার বৌ তো এখনও কচি মেয়ে।'

'সে তো চিরকাল কচি থাকবে নি। আমার সতের বছর বয়েসে বিয়ে হয়েছিল তখন তার বয়েস ছিল ছয়। আজ আমার বয়েস চব্বিশ তার মানে হলো গে তার বয়স হলো তের।'

'তোমার বৌয়ের পুনঃবে (পুনর্বিবাহ) হয় নি?'

'কে জানে, জানি না।'

'তাহলে বৌ যদি আছে, তা আমার সঙ্গে ঘুরছ কেন তুমি?'

'তোকে নইলে আমি থাকতে পারব নি মাইরি।'

'আমার বে থা হবে নি? ছেরকাল তোমাকে নিয়ে থাকলেই হবে।'

'হ্যাঁ তাই থাকবি তুই, ছিরকাল আমাকে নিয়ে থাকবি।'

বড়নদী থেকে বেরিয়ে আসা শাখা নদী প্রবাহিত হয়ে গেছে সুন্দরবনের উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা ভঙ্গীতে। এ নদীর কূলে নিবিড় বন। সেই বনের রৌদ্র ছায়ায় চলেছে দুজনে। লক্ষ্মী ওর মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছে রৌদ্র তাপ থেকে মুখখানা আড়াল করবার জন্যে। তবু ওর শ্যাম মুখখানি রৌদ্রের ঝাঁঝে রাঙা দেখাচ্ছে। মুখ টিপে টিপে হেসে হেসে ও পথ চলছে। ওর মধুর কণ্ঠস্বর আর অদ্ভুত উচ্চারণ গণপতির কানে সুধাবর্ষণ করছে।

বিশালাক্ষীর থানে গিয়ে পৌছতে সূর্য উঠল মাথার উপরে। জঙ্গলের মধ্যে একটা ঝাঁকড়া বটগাছের নীচে একটা মাটির বেদীতে একখানা খড়ের চালের মাটির ঘরে বিশালাক্ষীর মাটির মূর্তি। পুজো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দু একজন মেয়ে এখনও আছে। পুরুত পুজো

করছে। নানান গ্রাম থেকে অনেক লোক এসেছিল। একে একে পুজো সেরে তারা ফিরে গেছে। লক্ষ্মী ওর পুজোর নৈবেদ্য ঠাকুরের সামনে নামিয়ে দিয়ে মন্দিরের বাইরে বটতলায় বসল। গণপতিও একপাশে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। গাছের উপরে নানান পাখি কলকল করছে। ওদের বিষ্ঠা পড়ে আছে এখানে সেখানে। বিষ্ঠার মধ্যে বটফলের পোস্ত-দানার মতো অজস্র দানা। শীতের বাতাস ঝির্ ঝির্ করে বইছে। অনেকটা পথ হেঁটে এসে বিশ্রাম করতে লাগল গণপতি।

পুজো শেষ করে পুরুত মস্তবড় পুটুলি কাঁধে ফেলে চলে গেল। আর যে দু একজন ছিল তারাও চলে গেল। গণপতি তখনও শুয়ে রইল।

লক্ষ্মী গিয়ে ডাকল, 'কি হলো উঠবে নি?'

গণপতি বলল, 'লক্ষ্মী একটা কথা বলব তোকে?'

'কি কথা?'

'আয় আজ এইখানে বিশালাক্ষীকে সাক্ষী রেখে তোকে আমি বিয়ে করি।'

লক্ষ্মী বলল, 'সে কেমন করে হবে?'

'বিশালাক্ষীর পায়েব সিঁদুর আমি তোর মাথায় পরিয়ে দিই। কেউ না জানুক আমরা দুজনে জানব আমবা স্বামী স্ত্রী।'

লক্ষ্মী বিস্মিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গণপতিব দিকে। আর গণপতি লক্ষ্মীর একটা বাহু ধরে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বিশালাক্ষীর মন্দিরের ভিতরে। লক্ষ্মী অবাক হয়ে চুপ করে রইল। কোনো কথাই ওর মুখ দিয়ে বেবল না। গণপতি বিশালাক্ষীর চরণের সিঁদুর নিয়ে লক্ষ্মীর সিঁথিতে কপালে পরিয়ে দিল। দিয়ে বলল, 'আয় আমবা একসঙ্গে প্রণাম করি।' একসঙ্গে বিশালাক্ষীর সামনে প্রণাম করল ওরা। প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়াল দুজনে। তারপর গণপতি সহসা নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল লক্ষ্মীকে।

লক্ষ্মী বলল, 'ছাড়ো, এই মন্দিরে ও সব করে না।'

গণপতি বলল, 'বিশালাক্ষীকে সাক্ষী রাখলাম। তুই আর কোনো-দিন আমার পর হতে পারবি নি।'

রৌদ্র-ছায়ায় খচিত পথ ধরে ধরে মদালস দুজন ফিরতে লাগল।

লক্ষ্মীর আঁচলটা নিজের ধুতির খুঁটে বেঁধে নিল গণপতি। সূর্য ঢলে পড়লে পড়ন্ত বেলায় দুজনে ফিরে এল।

॥ ৩ ॥

মাঠে মাঠে ধানকাটা শুরু হয়ে গেল। ধান কেটে ভাগচাষীরা ধান তুলতে লাগল জোতদারদের খামারে খামারে। তারপর পৌষের শেষা-শেষি মাঠ যখন শূন্য হয়ে গেল, ধূসর বিবর্ণতা সমস্ত মাঠে মাঠে হা হা করতে লাগল তখন ধান যে কত দুঃখ আর চোখের জলের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাই দেখতে লাগল শুনতে লাগল গণপতি।

হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি দিয়ে তৈরি কত কষ্টের ধান উঠল জমিদার জোত-দারদের খামারে। ধান ঝাড়ল ভাগচাষী। কিন্তু ধান ভাগের পর দেখা গেল কোনো ভাগচাষীর ভাগে পড়েছে কয়েকবস্তা. কেউ কয়েক মুষ্টি পেয়েছে, কেউ কেউ ফিরে এসেছে শূন্যহাতে। জমিদার-জোতদারদেব সঙ্গে ভাগচাষীদের ধান ভাগের নানান রকম শর্ত থাকে। সাধারণতঃ আধাআধি ভাগ হয়। চাষের সময় পেটে খাবার জন্যে যে ধান ভাগচাষী জোতদারের কাছে ধার নিয়েছে তার দেড়া আদায় করে জোতদার ভাগচাষীর কাছে। বর্ষার সময় ভাগচাষী যে ধান ধার নিয়েছে ধান উঠবার সময় তার অর্ধেক হবে সুদ। সুদ সমেত আসল শোধ দিতে হবে। তার উপর ভাগচাষীর ভাগ থেকে দিতে হয় অনেক রকমের জমিদার-জোতদারদের পাওনা। ভাগচাষীকে দিতে হয় সালা, মাওলা, রক্ষিতা মানে জমিদার-জোতদারের রক্ষিতার ভরণ-পোষণের খরচ, ছেলের জন্ম মানে জমিদার-জোতদারের ছেলের জন্মের বাবদ খরচ, ভাত-খাওয়ানি মানে জমিদার-জোতদারের ছেলের অন্ন-প্রাশনের খরচ, বিবাহ-জমিদার-জোতদারের বাড়ীর ছেলেমেয়ের বিয়ের খরচ এবং ভাগচাষীর ছেলেমেয়ের বিয়ের জন্যে জমিদারের পাওনা, পুনর্বিবাহ মানে জমিদার-জোতদারের পুত্রবধূর প্রথম ঋতুউৎসবের খরচ, খামারছিলা-জমিদার-জোতদারের যে খামারে ধান ওঠে সেই খামার পরিষ্কার করার খরচ, খামার-ঘেরা মানে ধান তুলবার খামার ঘিরবার খরচ, দারোয়ানি—জমিদার-জোতদারের

দারোয়ানের মাইনে, জমিদার-জোতদারের স্কুলের জন্য চাঁদা, ঈশ্বরবৃত্তি মানে জমিদার-জোতদারের বাড়ীর ঠাকুর-সেবার খরচ, কয়ালিঃ যে ধান মেপে ভাগ করে দেয় তার পাওনা। এই ভাবে অজস্ররকম ভাবে ভাগচাষীর প্রাপ্য ধানের ভাগ থেকে জমিদার-জোতদাররা ধান কেটে নেয়। এবং তখন দেখা যায় ভাগচাষী হয় রিক্ত হাতে অথবা কয়েক বস্তা ধান নিয়ে ঘরে ফেরে। মাঝখান থেকে খাটুনি সার হয় অথচ তাতে কোনো সুরাহা হয় না।

এমনি একটি ঘটনা দেখল গণপতি এক খামারে। জমিদারের কাছারি বাড়ীর খামারে ধান তুলেছিল অর্জুন মণ্ডল। বিঘে দশেক জমি সে ভাগে চষেছিল। ধান হয়েছিল একশ'মন। বর্ষার সময় খোরাকি টান পড়াতে, জমিদারের নায়েবের কাছ থেকে দশমন ধান ধার নিয়েছিল। অতএব এই ধান ভাগাভাগির সময় জমিদারের পাওনা হয়েছে সুদে আসলে পনের মন ধান। গণপতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধান ভাগাভাগির বহরটা দেখছিল।

অর্জুনের অর্ধেক ভাগ পঞ্চাশ মন থেকে পনের মন গিয়ে থাকল পঁয়ত্রিশ মন। তার থেকে ১। সালা ২। মাওলা ৩। রক্ষিতা ৪। ছেলের জন্ম ৫। ভাত-খাওয়ানি ৬। বিবাহ ৭। পুনর্বিবাহ ৮। খামারছিলা ৯। খামার-ঘেরা ১০। দারোয়ানি ১১। ঈশ্বরবৃত্তি ১২। স্কুলের চাঁদা ১৩। কয়ালি ইত্যাদি কুড়ি রকম বাজে আওয়াব (আদায়) দরুন বাদ গেল পনের মন ধান। অর্জুনের কাছে থাকল শেষ পর্যন্ত কুড়ি মন ধান। ধানের দাম তখন খুবই কম। আর এই ধান টুকুর উপরে অর্জুনের সমস্ত সংসার নির্ভর করছে। তাছাড়া এই ধান থেকে বাদ দিতে হবে বর্ষার সময় আর ধানকাটার সময় মজুরদের জন্যে সে যা খরচ করেছে, বীজ সার হালের জন্যে সে যা খরচ করেছে সেই খরচ। এ ছাড়া নানান জায়গায় তার সম্বৎসরের দেনা আছে। অনেক পাওনাদার খামারে এসে দাঁড়িয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত মন দশেক ধান নিয়ে উদ্ভ্রান্ত মূর্তিতে দাঁড়িয়ে রইল অর্জুন। হঠাৎ সে জমিদারের নায়েবের সামনে হাত জোড় করে বলল, 'বাবু বাজে আওয়াবগুলো নেবেন না। ছেলেপিলে নিয়ে না খেয়ে মরব বাবু। সারাবছরের পরিশ্রম আমার ভাগে এইটুকু এলে আমরা বাঁচব নি বাবু।'

নায়েব ধমকে উঠল, 'যা যা ওসব প্যানপ্যানানি রাখ দেখি। দরকার হয় কাছারি থেকে ধান ধার নিবি।'

অনেক সময় এমন হয় একেবারে শূন্য হাতে ঘরে ফিরতে হয় চাষীকে। তারপর সারা বছর জমিদারের কাছে ধান ধার নিয়ে নিয়ে সংসার টানতে হয়। আবার ধান উঠলে শূন্যহাত বরং ঘাড়ে মোটা রকম ঋণ চাপিয়ে ফিরে আসতে হয়। কেননা উৎপন্ন সমস্ত ফসল মালিককে দিয়ে দিলেও ঋণ শোধ হয় না।

গণপতি দেখতে লাগল শুনতে লাগল ক্ষেতমজুরদের অবস্থা আরও সঙীন। শ্রীচরণের মতো যারা ক্ষেতমজুর যারা ভাগচাষী বা জোতদারদের জমিতে ধান-পোঁতা আর ধানকাটার সময়ে কাজ পায় তারা দিনে মাত্র দুআনা ক'রে মজুরি পায়। আর আষাঢ় শ্রাবণ আর অগ্রাণ পৌষ মাস ছাড়া ওদের কোনো কাজ নেই। বছরে সাড়ে তিনমাস কাজ, বাকী সময়টা শূন্য। তখন কি করে যে ওরা দিন চালায় বুঝে উঠতে পারে না গণপতি। হাওয়া খেয়ে থাকে? হাওয়া কিছুটা খায়ই, সুন্দরবনের ফাঁকা মাঠের হাওয়া। কিন্তু পেটের জ্বালায় নিজেদেরকে বিক্রি করে। জোতদারদের কাছে ধান বা টাকা ধার নেয় চাষের সময় খেটে দেবার শর্তে। কিন্তু ধার করবার সময় অর্ধেক মজুরি পায়। চাষের সময় সুদসহ পাওনাদারের প্রাপ্য হয় বলে, অসময়ের অর্ধেক মজুরি সুদে আসলে পুরো মজুরির সমান হয়ে যায় বলে বিনা মজুরিতে জোতদারের জমিতে খাটতে হয় ওদের। তাহলে পেটের আগুন নেভায় কেমন করে? শূন্য পেট ভরাট করে কি দিয়ে? সেটা গভীর সমস্যার কথা। খায় মাঠের পুকুরের শাক, গুগুলি, শামুক। সরকারী রিলিফের ছিটেফোঁটা ভিক্ষা জোটে কখনও। কখনও টেষ্টরিলিফের কাজ পায়। জমিদার জোতদারদের বাড়ীতে কিছু কাজ মেলে। মেয়েরা ঝিয়ের কাজ করে। দেহ বেচতেও বাধ্য হয় অনেকে। আর এক দুঃসাহসী কাজে নামে এই নিঃস্ব মানুষেরা। তারা সুন্দরবনের সংরক্ষিত জঙ্গলে বিনা ছাড়পত্রে যায় মোম, মধু, মাছ ও কাঠ সংগ্রহ করতে। সেই মোম, মধু, কাঠ নিয়ে শহরে গিয়ে বিক্রি ক'রে জীবিকার সন্ধান করে। কিন্তু বিনা নিরাপত্তায় বনের মধ্যে ঢুকে বহু লোক প্রাণ হারায় বাঘের থাবায়।

অনেকের আর কোনো খোঁজই পাওয়া যায় না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর শয়ে শয়ে ভূমিহীন নিঃস্ব ক্ষেতমজুর এমনি ভাবে বিভিন্ন তালে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে বিভিন্ন জায়গায় পাক খেয়ে প্রতিনিয়ত উপবাস আর ভয়ের শিকার হয়ে তাড়া-খাওয়া জানোয়ারের মতো বাঁচে, পরিশ্রম আর ঘাম মাটিতে ঢেলে ধান উৎপন্ন করে, সে ধানে তাদের কোনো দাবীই থাকে না।

জঙ্গল হাসিল ক'রে যবে থেকে সুন্দরবনে চাষের জমি তৈরী হলো, মেদিনীপুর ছোটনাগপুরের ভূমিহীন অভাবী কৃষকরা অনেক আশায় যেদিন থেকে দলে দলে এখানে এসে ভিড় করতে লাগল সেদিন থেকেই এমনি ব্যাপার শুরু হয়ে গেল। এর প্রতিকারের যেন কোনো উপায় রইল না।

॥ ॥

এদিকে গণপতির জঙ্গল হাসিলের কাজ ধীরে ধীরে আগাতে লাগল সত্তর বিঘে মত জঙ্গল সাফ করতে চারজন লোক প্রাণ হারাল। একজন মারা গেল সর্পদংশনে। দুজন মারা গেল ভীষণ রক্ত আমাশয়ে ভুগে, আর একজন মারা গেল ম্যালেরিয়াতে। এখানে ডাক্তার কবিরাজ নেই। মিঠে জল নেই। নোনা জল খেয়ে, দিনরাত অসম্ভব পরিশ্রম করে, মশা আর পোকামাকড়ের কামড় সহ্য করে চারজন শ্রমিক মারা গেল। তারা এসেছিল জঙ্গল হাসিল হলে গণপতির ভাগ থেকে তারা কিছু ভাগ-চাষে জমি পাবে বলে। মেদনীপুর থেকে আবার নতুন মজুর আনল গণপতি। সত্তর বিঘে জমি আবাদ যোগ্য করে ফেলেছে দেখে কার্ত্তিক সামন্ত, ব্রজ সামন্ত, কার্ত্তিক পাত্র, হরিপদ মজুমদার প্রভৃতি জমির মালিকরা তাকে পঁচিশ বিঘে করে মোট একশ বিঘে জায়গা দিল জঙ্গল হাসিল করবার জন্যে, শর্ত রইল প্রত্যেকের কাছ থেকে ও পাঁচ বিঘে ক জমি পাবে আর বাকি জমিটা সে ভাগে চষবে।

গরান, কেওড়া, হেতাল, গর্জন, বলি, গোলপাতার অরণ্য কুড়ুলের ঘায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। শতাব্দীর অরণ্য-অন্ধকারে আকাশে

আলো এসে পড়ল। বুনো ঘাসে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে লাগল। ক্বচিৎ বাঘের সামনেও পড়তে হয়েছে, অজস্র সাপ বিছে মারতে হয়েছে। একদিন আর একটু হলেই কুমীরের মুখে জীবনটা দিতে হতো গণপতিকে। বন কাটতে কাটতে একটা জলাতে নামতেই এঁকে বেঁকে নাচুনী ভঙ্গীতে একটা কুমীর-বাচ্ছা ছুটে এসেছিল ওর দিকে। হাতে ছিল কুড়ুল, প্রাণপণ শক্তিতে তাই বসিয়ে দিয়েছিল কুমীরেব মুখে। লুকিয়ে পড়েছিল কুমীরটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে মেরে তবে ছেড়েছিল গণপতি। বনের ভিতরের স্যাঁতসেঁতে ছায়াচ্ছন্ন মাটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা থেকে থেকে গাছ লতাপাতা বুনো ঘাস ঝোপঝাড় পরিষ্কার কবতে করতে শ্রমিকদের পায়ে হাজা ধরে যেতে লাগল। সর্দি কাশিতে ভুগতে লাগল সবাই। তবু কাজ আগিয়ে যেতে লাগল। ঝিল্লিঝঙ্কৃত, ছায়াচ্ছন্ন প্রাচীন অরণ্য মানুষের দুর্জয় সংগ্রাম শক্তির কাছে পরাজিত হতে লাগল। আলো এসে পড়তে লাগল সুন্দরবনের-অরণ্য-আবৃত মাটিতে ।

দেখতে দেখতে চারিদিকে বনকাটা শুরু হয়ে গেল। সাঁওতাল পরগণা থেকে আসতে লাগল সাঁওতালরা। মেদনীপুর থেকে আসতে লাগল নিঃস্ব কৃষকেরা। জমির ক্ষুধা তাদের চিরদিন। জঙ্গল হাসিল করতে পারলে বাঘ-ভাল্লুক-কুমীর-সাপের বিরুদ্ধে কিছুদিন লড়ে অরণ্যকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে নিজের বলে কিছু জমি পাওয়া যাবে একথা শুনে শত শত ভূমিহীন সম্বলহীন কৃষক সুন্দরবনে আসতে লাগল। আর তাদের শত শত কুঠারের ঘায়ে অরণ্য ধ্বংস হয়ে মুখ থুবড়ে পড়তে লাগল মাটিতে।

সুন্দরবন নদী নালা খাল বিলের দেশ। অজস্র ছোট বড় নদী মাকড়সার জালের মতো সুন্দরবনকে আচ্ছন্ন করে আছে। এই নদী নালা খালগুলিকে বাঁধের বাঁধনে না বাঁধতে পারলে, গর্জন-হেতাল-গোলপাতার বংশ ধ্বংস করলে কিংবা সুন্দরবনেব পরিচয় যে রক্তবর্ণের দীর্ঘাঙ্গী গাছের নামে, সেই সুন্দরী গাছকে সুন্দরবন থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেও ধান বোনা যাবে না। কেননা বঙ্গোপসাগরের জোয়ার এই নদী নালা খাল বিলে ঢুকে সমস্ত মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে। আর নোনা জলে জমি প্লাবিত হলে ধান হবে না। তাই বাঁধ দিয়ে দিয়ে এই নদী নালাগুলিকে

ঘিরে ফেলতেই হবে। বাঁধ অনেক হয়েছে, স্লুইস গেটও তৈরী হয়েছে অনেক তথাপি এখনও আরও অনেক বাঁধ দিতে হবে।

গণপতি আড়াইশ বিঘে জঙ্গল সাফ করেই তাই নিস্কৃতি পাবে না। এই জমির পাশে যে নদী আর খাল সেগুলিকে উঁচু বাঁধ দিয়ে দিয়ে আড়াল করে দিতে হবে।

তাই জঙ্গল পরিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ তৈরী আর অনুচ্চ দুর্বল বাঁধগুলিকে শক্ত করবার কাজেও হাত দিতে হলো গণপতিকে।

অপরিসীম পরিশ্রম, ক্লান্তিহীন কাজ চলতে লাগল দিনে রাতে। হরেনের কাছে ধার জমতে লাগল গণপতির। কেননা এই বিরাট কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে টাকাব দরকার। আর হরেন পাই-পয়সার হিসেব রেখে দেনা দিতে কাপ´ণ্য করে না।

॥ ৫ ॥

একদিন দুপুর বেলা জঙ্গল হাসিলের কাজ করছে গণপতি। সঙ্গে আছে দশ বারো জন মজুর। শ্রীচরণও আছে। এমনি সময় একজন ধনী লোক ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। পরনে দামী ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি। তখন ফাল্গুনের বাতাস বইতে শুরু করেছে তবু তার গায়ে আছে নক্সা-করা শাল। হাতে একখানা ডবল ব্যারেলের বন্দুক। পিছনে আছে একজন চাষী গোছের লোক, হাতে অনেকগুলি মানিক জোড়-হরিয়ালের রক্তাক্ত দেহ ঠ্যাংয়ে দড়ি বেঁধে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে। শ্রীচরণ গণপতির পাশেই ছিল। বলল, 'তিন জমিদারের নায়েব মহিম ঘোষ। আমাকে যিনি জমি দোব বলেছে।'

শ্রীচরণ দেঁতো হাসি হেসে বলল, 'বাবু শিকারে বেরিয়েছিলেন?'

মহিম জবাব দিল, 'হ্যাঁ, তা তুই দেখি জঙ্গল হাসিলের কাজে লেগে গিয়েছিস। হরেন বাবু তোকে জমি দোব বলেছে নাকি?'

শ্রীচরণ বলল, 'মেদনীপুর থেকে গণপতিদা এয়েছে। তাকেই জমি দিয়েছে হরেনবাবু। গণপতির কাজ করছি আমি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাম শুনেছি বটে, তা গণপতিটা কে?'

শ্রীচরণ গণপতিকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'এই যে বাবু।'

'তুমি গণপতি? তা বাড়ী কোথা হে।'

গণপতি অভিমানী লোক মহিমের কথার ধরণ-ধারণ দেখে সে ভিতরে ভিতরে রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমিই গণপতি, বাড়ী আমার মেদনীপুরে, খেজুরী থানায়।'

'শুনলাম নাকি তুমি অনেক জমি পেয়েছ?'

মহিম সাধারণতঃ চাষীদের 'তুই' বলেই কথা বলে। কিন্তু গণপতির চেহারা এবং দৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু ছিল যে, যেন সে বাধ্য হয়েই তুমি বলে কথা বলতে লাগল। গণপতি কোনো জবাব দিল না।

মহিম এবার রূঢ় কণ্ঠে ধমকে উঠল, 'কি হে শুনতে পাও না।'

গণপতি জবাব দিল, 'না শুনতে পাই না।'

'আরেপ্ বাপ্রে খুব যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা দেখছি। তা কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করে কি জলে থাকতে পারবে বাওবা। এর নাম সুন্দরবন।'

গণপতি উত্তর করল, 'কদিন আগেই একটা কুমীরের বাচ্চাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে মেরেছি। ঐ যে এখনো পড়ে আছে। কুমীরের ভয় দেখাতে আসবেন না।'

'বা, বা, বা, মুখেব দেখি বেশ বুলিও আছে। তা চাবুক টাবুক এখনও পিঠে দু একঘা পড়ে নি বোধ হয়।'

'বুলি তো থাকবেই। হাইস্কুলে চাকরি করতাম, একেবারে মুখ্যু তো নই, আর চাবুক? কে কত চাবুকওয়ালা হয়েছে দেখা যাবে।'

শ্রীচরণ অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, 'এই গণপতিদা চুপ যাও, চুপ যাও।'

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে নায়েব মহিম ঘোষ খানিকক্ষণ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গণপতির দিকে। তারপর বলল, 'এই হারামজাদা, দেখছিস হাতে আমার বন্দুক আছে, গুলি করে এই মাটিতে পুঁতে দিলে তোর চৌদ্দপুরুষ খবর পাবে না। ফের যদি কোনোদিন ছোটমুখে বড় কথা শুনি চাবকে তোকে সিধে করে দোব বলে দিচ্ছি।'

গণপতি দারুণ ক্রোধে জ্বলে উঠল, বলল, 'দেখ মহিমবাবু, তুই তোকারি করে কথা বলবে নি। আর আমি তোমার প্রজা নই, তোমার জমিদারীর চাষীও নই। ওসব নায়েবী চাল নিজের জমিদারিতে গিয়ে দেখাবে।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। জমিদারের চেয়ে জমিদারের চাকরের দেখি তেজ বেশি। কথায় আছে না—'

ঠিক এমনি সময় লক্ষ্মী শ্রীচরণের জন্যে জল খাবার নিয়ে এসে দাড়িয়েছিল। সে চিৎকার করে উঠল, 'চুপ কর না তুমি, কেন মানী লোকের ছামুতে অমন করে কথা বলছ। তোমার দেখি এতটুকু জ্ঞান গম্যি নি।'

লক্ষ্মীর ধমকে চুপ করে গেল গণপতি। তার কথা অসমাপ্তই রয়ে গেল। নায়েব মহিম ঘোষ লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে দেখল লোভাতুর দৃষ্টিতে, একটিমাত্র ঠেঁটি শাড়ীতে অকুলান লক্ষ্মীর সুগঠিত ঢেউ খেলানো শরীরখানা পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চোখ দিয়ে চেটে চেটে দেখল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুই আবার কে রে ?'

লক্ষ্মী বলল, 'আমি শ্রিচরণ আড়ির বোন।'

শ্রীচরণকে লক্ষ্য করে মহিম বলল, 'তোর বোন ? বাঃ, বলে একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, 'শ্রীচরণ চল তোর বাড়ীতে গিয়ে একটু বসি ; তেষ্টা পেয়েছে, রোদে কষ্টও হচ্ছে খুব।'

শ্রীচরণ ভয়ে, বিস্ময়ে, বিনয়ে হতবুদ্ধি হয়ে বলল, 'আমার বাড়ী যাবেন বাবু।'

'হ্যাঁ, তোর বাড়ী যাব বলেই তো এদিকে এলাম।'

শ্রীচরণ বলল, 'গণপতিদা তাহলে আমি এখন বাবুকে লিয়ে যাই। এ বেলায় তো আর কাজ বেশী হবে না।'

গণপতি বলল, 'চলো আমিও যাব, তোমার সঙ্গে।'

'যাবে ? চলো।' তারপর লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে শ্রীচরণ বলল, 'লক্ষ্মী তাহলে ফিরে চল, বাড়ী গিয়ে জল খাব।'

মহিম ওর সঙ্গের চাষাটাকে বলল, 'তাহলে তুই পাখী গুলো নিয়ে কাছারিতে চলে যা। আমি শ্রীচরণের বাড়ী থেকে একটু ঘুরে যাই।'

শ্রীচরণ নায়েববাবুর স্তাবকতা করতে করতে পিছনে পিছনে যেতে লাগল।

আর অনেকখানি পিছনে লক্ষ্মীর সঙ্গে চলতে লাগল গণপতি।

লক্ষ্মী আস্তে আস্তে বলতে লাগল, 'ওরা সুন্দরবনের বাঘ। ওদের সঙ্গে

বিবাদ করতে নি। আর এই মহিম নায়েব ভীষণ ছুঁচো। ওর সঙ্গে লড়াই করতে গেলে তুমি পারবে কেন? তোমার যে দেখি আগুন পারা রাগ।'

গণপতি বলল, 'লোকটার কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে ওঠে। ও এসেছে আমাকে চোখ রাঙাতে। যেন আমি ওর বাবার খেয়ে থাকি। আমাকে চাবুক দেখাচ্ছে, বন্দুক দেখাচ্ছে, ওর মুখে আমি মুতে দিই।'

লক্ষ্মী বলল,'চুপ কর শুনতে পাবে। তুমি তো গোঁয়ার কম নও।'

'আমার অত প্রাণের ভয় নাই লক্ষ্মী। কারো দাঁত খিঁচুনি সহ্য করতে নারব আমি।'

'সোঁদরবনে ওরাই বাঘ গো। ওদের পুজো করে চলতে হয়। থাক না কিছুদিন। আস্তে আস্তে সবই দেখতে পাবে।'

গণপতি আর কোনো কথা না বলে রাগে ফুলতে লাগল। হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্ছা, খানকির ছাওয়াল নায়েবকে মুখে একটা চড় কষিয়ে ওর দাঁত ছাড়িয়ে দিতে পারলে কিছুটা রাগ কমত গণপতির। নিরুপায় হয়ে ও ভিতরে ভিতরে জ্বলতে লাগল।

শ্রীচরণের টঙয়ের সামনে গিয়ে মহিম উপস্থিত হতেই শ্রীচরণের মা মাথার ঘোমটা টেনে টঙয়ের দাওয়া থেকে নেমে এসে মহিমের পায়ের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে জিবে ঠেকাল। শ্রীচরণও হাঁটু গেড়ে বসে মহিমের পায়ের ধুলো নিয়ে চাটল। লক্ষ্মীও গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকাল। বুকে হাত ভেঁজে দাঁড়িয়ে থেকে গণপতি ব্যাপারগুলি সর্প-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগল।

দেখল শ্রীচরণের মা ঘরে ঢুকে কলাব বাসনার তৈরী আসন পেতে দিল দাওয়াতে। শ্রীচরণ ঘর থেকে একখানা কাপড় নিয়ে এসে ভাঁজ করে সেই আসনের উপর পেতে দিল। লক্ষ্মী একখানা কাঠের পিঁড়ি নিয়ে এসে নায়েবের সামনে পেতে দিল। নায়েব জুতো খুলে তাতে উঠে দাঁড়াল। তখন একঘটি জল নিয়ে এসে লক্ষ্মী নায়েবের পা দুখানা হাত দিয়ে ধুইয়ে দিতে লাগল। আর নায়েব অতি স্বাভাবিক ভাবেই এই সব সেবা যত্ন গ্রহণ করতে লাগল। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি সারাক্ষণই লক্ষ্মীর গায়ে যেন লেপটে থাকে। নায়েবের পায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে

ভালো করে পা ধুইয়ে দিয়ে মাথার বিরাট চুলের গোছা দিয়ে নায়েবের পা দুটো মুছে নিতে লাগল লক্ষ্মী। চুল দিয়ে পা মোছা হলে নায়েব দাওয়ায় উঠে গিয়ে সেই কাপড় ঢাকা আসনে বসে ক্রূর দৃষ্টিতে গণপতির দিকে তাকাল। শ্রীচরণের মা একটি 'সিকি' নায়েবের পায়ের কাছে রেখে আবার নায়েবের পায়ে প্রণাম করল।

ব্যাপারটা দেখে রাগে জ্বলতে জ্বলতে গণপতি সেখান থেকে হন্ হন্ করে চলে গেল।

গণপতির মূর্তির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে মহিম বলল, 'শ্রীচরণ তোকে আর ঐ শুয়োরটার কাছে কাজ করতে হবে না। তোকে আমি নিশ্চয়ই জমি দোব। তোর নিজের খাস জমি হবে। আর ঐ কুত্তাকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয় আমি দেখাব।'

শ্রীচরণ মিন্‌মিন্ করে বলল, 'ও নতুন এয়েছে তো বাবু, ও এখনো এদেশের হালচাল জানে না, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মহিম বলল, 'সে তো যাবেই, পিঠে চাবুক পড়লে সব বেটাই জব্দ হয়ে যাবে, বানচোতকে ঠাণ্ডা করতে আমার কদিনই বা লাগবে?' বলে একটু চুপ করে লক্ষ্মীর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমার নাম কি গো মেয়ে?'

লক্ষ্মী বলল, 'লক্ষ্মী।'

'বাঃ নামটি তো বেশ। তা আমার একটা কাজ করবার লোক দরকার, তুমি কাজ করবে আমার বাড়ীতে।'

তার মানেই হলো নায়েবের বাড়ীতে লক্ষ্মীকে কাজ করতেই হবে

লক্ষ্মী বলল, 'আপনার কাছারি অনেক দূর।'

'অনেকদূর আর কোথায়? আর আমার ওখানেই থাকবে। প্রতিদিন তো আর আসতে যেতে হবে না।'

ভয়ে বুক কাঁপতে লাগল লক্ষ্মীর। সে চুপ করে রইল।

নায়েব বলল, 'এখুনি আমার সঙ্গে যাবি? নাকি পরে যাবি?'

শ্রীচরণ বলল, 'আজ দিনটা থাক বাবু। যাবে কাল পরশু।'

'আচ্ছা তাই হোক। আজ আমি উঠলাম বুঝলি। কি যেন নাম হ্যাঁ, লক্ষ্মীকে তাহলে পাঠিয়ে দিবি। আর তুইও যাস আমার কাছে

ভালো জমি দোব তোকে খাজনা করে।'

দাওয়া থেকে নেমে জুতো পরে আর একবার অত্যন্ত অসভ্যের মতো লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে ছোটো মদের বোতল বার করে খানিকটা গলায় ঢেলে বোতলে আবার ছিপিএঁটে পকেটে পুরে চলে গেল নায়েব মহিম ঘোষ।

॥ ৬ ॥

সেদিন শ্রীচরণের বাড়ীতে নায়েবের প্রতি ওদের অমন কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করা, লেজ-নাড়া তোয়াজ করা দেখে ক্রোধে আগুন হয়ে উঠেছিল গণপতি। মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ওর ছিঁড়ে যাচ্ছিল, সে শ্রীচরণ, শ্রীচরণের মা, লক্ষ্মী সবাইকে মনে মনে ঘেন্না করেছিল, মনে মনে কুৎসিত গাল দিয়েছিল ওদের। কিন্তু পরে গণপতি জানতে পারল যে, জমিদার, জোতদার, নায়েবদের অভ্যর্থনা করার এই হচ্ছে রীতি সুন্দরবনে। বাড়ীর মেয়ে বা বৌ পা ধুয়ে দেবে, মাথার চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দেবে। বাড়ীর সবাই হাঁটু গেড়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো জিবে ঠেকাবে। সবচেয়ে সুন্দর আসনে বসতে দেবে। পায়ের কাছে টাকা দিয়ে প্রণামী দেবে। নতুন কিছুই করেনি শ্রীচরণরা। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই গণপতির কাছে অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, ভয়াবহ বলে মনে হলো। এখানকার ভাগচাষীরা আর ক্ষেতমজুররা জমিদার, জোতদার আর তাদের নায়েবদের কেনা-গোলাম নাকি? মানুষ মানুষকে এত ভয় করবে কেন? অসহ্য যন্ত্রণা আর অপমান-বোধ তার ভিতরে আগুনের মতো জ্বলতে শুরু করল। সেদিন থেকে হু হু করে আগুন জ্বলতে লাগল গণপতির মনে। যে লক্ষ্মীকে বিশালাক্ষী সাক্ষী রেখে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছে সেই লক্ষ্মী ঐ খানকির বাচ্ছা নায়েবের পায়ের ধুলো নিল, পা ধুইয়ে দিল, চুল দিয়ে মুছে দিল তার পা! গণপতির ভিতরে দুরন্ত অভিমান, ক্রোধ আর যন্ত্রণার দাপাদাপি শুরু হলো।

দিনকয়েক পরে একদিন সন্ধেবেলা শ্রীচরণ গেল গণপতির রাগ ভাঙাতে। বলল, 'গণপতিদা, তোমার কাছে একটা যুক্তি নিতে এলাম।'

গণপতি রেগে বলল, 'কিসের যুক্তি?'

'তুমি অত রাগ কর কেনে বল দিনি?'

'না রাগব কেনে? তোদের কাণ্ড দেখে খ্যাক খ্যাক করে হাসব।'

'কী কাণ্ড?'

'তোরা মহিম ঘোষের পা ধুইয়ে দিলি। সমর্থ যোবতী মেয়ে মাথার চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দিল। তোরা নায়েবের পায়ে গড় করলি। কেনে রে নায়েব তোদের কে? গুরুঠাকুর নাকি ভগবান?'

শ্রীচরণ বলল, 'এ শুধ্ আমরা করলাম নাকি? জমিদার, জোতদার, নায়েব যে-চাষীর বাড়ীতে যাবে সেই চাষীই অমনি করবে। না করলে উপায় আছে নি কি?

'কি করবে?'

'ধরে নিয়ে গিয়ে কাছারির খুঁটিতে বেঁধে শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক দিয়ে পিঠের ছাল তুলে দেবে।'

গণপতি চুপ করে রইল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এক অসহ্য যন্ত্রণাময় অনুভূতি তাকে পীড়ন করতে লাগল। নায়েবের সেদিনকার ব্যবহার ওর মনে পড়ে গেল আর আবার চড়াৎ করে মাথায় রক্ত উঠে গেল। খানিক পরে নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি যুক্তির কথা বলছিলে?'

খানিকক্ষণ আমতা আমতা করে কোনো কথাই বলতে পারল না শ্রীচরণ। তারপর বলল, 'মহিমবাবু লক্ষ্মীকে বলল ওঁর কাছারি বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করতে।'

'হুঁ, তা ওর কাছারিতে থাকে কে কে?'

'দশটা দারোয়ান, একটা পেয়াদা আর ও নিজে।'

'কোনো মেয়েমানুষ নাই?'

'না।'

'তাহলে ওর বৌ ছেলে মেয়ে সব থাকে কোথা?'

'সে ওর দেশে থাকে।'

'মেয়ে মানুষ নাই, কিছু নাই, লক্ষ্মী সেখানে যোবতী মেয়ে কাজ করতে যাবে কেমন করে?'

'তা জানি না। তবে ও যখন বলেছে লক্ষ্মীকে কাজ করতে যেতে হবে, তখন যেতেই হবে।'

'আর যদি না যায় ?'

'তাহলে কি হবে আমি জানি না। ও আমাকে জমি দোব বলেছে জমির কোনো আশা আর থাকবে নি তাহলে।'

'আমি তোমাকে ভাগে চষতে জমি দোব। কিন্তু সাবধান শ্রীচরণ, লক্ষ্মীকে পাঠাবে না।'

'লক্ষ্মীকে না পাঠালে আমার ঘরে যদি আগুন ধরিয়ে দেয় ? কোনো মিথ্যা হামলা করে আমাকে যদি পুলিশে ধরিয়ে দেয়।'

'পুলিশ কি ওর হাতধরা ?'

'হাতধরা নয় ? কাকদ্বীপ থানার দারোগা প্রায়ই আসে ওর কাছারিতে। দারোগাকে মদ মেয়ে মানুষ মাংস যোগায় নায়েব। একটা মেয়েতে হয় না দারোগার। সে রাত্রে তিনটে চারটে করে মেয়ে মজুত রাখতে হয় কাছারিতে।'

যেন বাজ পড়ল গণপতির শরীরে, এমনি ভাবে ওর সমস্ত মন চমকে উঠল। স্তম্ভিত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল গণপতি, 'অত মেয়ে পায় কোথায় ?'

'আমার মতো ক্ষেত মজুতদের বাড়ীর বৌ ঝিকে নিয়ে যায়।'

'পাঠায় কেন ?'

'পেটের দায়ে, প্রাণের ভয়ে।'

গণপতি খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। নিজেকে ওর সহসা মনে হলো লোহার খাঁচায় পোরা বাঘ। গর্জন, লাফালাফি সার, খাঁচা থেকে বেরোবার শক্তি ওর নেই। সুন্দরবনে যে খাঁচা পাতা আছে ওর চারদিকে, সে খাঁচা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু এই খাঁচার অস্তিত্ব শ্রীচরণেরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করে। শ্রীচরণ বছর পাঁচেক এখানে এসেছে! এসেছিল নিজের বলে কিছু জমি পাবে বলে, সে আশা তার মিথ্যে হয়ে গিয়েছে, এখন ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের কবলে পড়ে মনের জোর গিয়েছে ধ্বংস হয়ে, জমিদার আর নায়েবদের চাবুকের ডগায় দাড়িয়ে কেমন করে গা বাঁচিয়ে টিকে থাকবে তাই ভাবতেই অস্থির।

গণপতি সহসা জিজ্ঞাসা করল, 'লক্ষ্মী কি বলে ?'

'সে কিছুতেই যাবে না।'

গণপতি বলল, 'আচ্ছা ও যদি অন্য কোথাও কাজ নেয় ?'

'কাজ কার কাছে নেবে? জমিদার নায়েব ছাড়া ঝি রাখবার মতো লোক আর কে আছে?'

গণপতি বলল, 'ওকে কাজ করতে হবে না। অনেকদিন তো কষ্ট করলে। আর কটা মাস কষ্ট কর। আসছে বর্ষাতেই তুমি ভাগে চষবার জমি পাবে।'

'তা নয় তো হলো, কিন্তু মহিমবাবু যে ডেকে পাঠিয়েছে আমাকে।'

'যেও না।'

'তারপর কিছু হলে।'

'তখন দেখা যাবে।'

একটুখানি চুপ করে থেকে গণপতি বলল, 'দেখ ছিচরণ, তোমার তো হাবাবার মত কিছু নাই। আছে শুধু জীবনটা। তা অপমান সহ্য করে কুকুরের মতো বাঁচার চে লড়ে মরাই ভালো। কিছু না বলে বলে জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তাদের অমন সাহস বেড়েছে। রুখে দাঁড়ালেই শুয়াররা সোজা হয়ে যাবে।'

শ্রীচরণ বলল, 'কথাটা তো বলেছ ভালো কিন্তু এখনও ঠিক এখানকার ব্যাপার দেখ নাই। আচ্ছা তোমার কথাই মানলাম। তারপর যা থাকে কপালে।'

দুজনে বসে বসে বিড়ি টানতে লাগল। গণপতি গভীর দুশ্চিন্তা ও ক্রোধে আচ্ছন্ন থাকল। আর শ্রীচরণ ভাবতে লাগল না জানি কপালে কি আছে।

॥ ৭ ॥

গভীর আতঙ্ক এবং মানসিক অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটতে লাগল শ্রীচরণের। জমিদারের কোনো পেয়াদা দেখলেই ওর মনে হতে লাগল, নিশ্চয় মহিমবাবু পাঠিয়েছে তাকে ধরে নিয়ে যেতে। রাত্রে হঠাৎ ওর ঘুম ভেঙ্গে যেতে লাগল নির্জন আকাশ-বিস্তৃত রাত্রির কোনো অদ্ভুত শব্দ শুনে। মনে হতে লাগল নায়েবের কোনো লোক এসেছে ওর ঘরে আগুন দিতে। একেবারে অসহ্য হয়ে উঠল ওর বেঁচে থাকা। নিজের জন্যে বা মায়ের

জন্যে অত চিন্তা নেই কিন্তু নারী-লোলুপ নায়েব যদি ওর বোনটাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায় তাহলে ও ঠেকাবে কেমন করে। না হয় লড়ে মরবে কিন্তু তাতেও কি রক্ষা করতে পারবে তাকে। কয়েকদিন পর থেকে ওর মনে হতে লাগল এর চেয়ে একটা কিছু ঘটে গেলেই যেন ভালো হতো। মনের এমনি ধুকপুকুনি নিয়ে আর যেন বাঁচা যায় না।

দিন সাতেক পর একদিন বিকেল বেলায় সত্যি সত্যি মহিম নায়েবের পেয়াদা লক্ষ্মণ এসে হাজির হলো। হাঁকল 'এ ছিচরণ, ঘরে আছিস নাকি?'

শ্রীচরণ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'কি খবর লক্ষ্মণ?'

'চল্ চল্ নায়েববাবু তোকে নিয়ে যেতে বলেছে।'

'আমি যে সবে কাজ থেকে ফিরলাম গো, কাল সকালে দেখা করে আসব বলো গিয়ে।'

'আরে ওসব চালাকি রেখে দে। আমার সঙ্গে চল। না গেলে বেঁধে নিয়ে যেতে বলেছে নায়েববাবু।'

'তাহলে আমি একবার গণদার কাছ থিনে ঘুরে আসি।'

'রেখে দে তোর গণদা, চল্ আমার সঙ্গে।' বলে দাওয়ায় উঠে গিয়ে শ্রীচরণের বাহু ধরে হিড়্ হিড়্ করে উঠোনে টেনে নিয়ে এল পেয়াদা। বলল, 'চল্ দেরি করিস না।'

অগত্যা পেয়াদার সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল শ্রীচরণ। মাইল দুই দূরে হাজরাদের কাছারি। একটা বাঁধের উপর দিয়ে একটা খাল পেরিয়ে যেতে হয়। বাঁধ দিয়ে ঘেরা এই খালটা হাজরাদের মাছের ঘেরি। কাছারিতে পৌছতে বেলা প্রায় পড়ে এল। সূর্য তখন একেবারে পশ্চিম দিক্‌রেখায় নেমে গেছে। হাল্‌কা আলো ছড়িয়ে আছে সুন্দরবনের ফাঁকা প্রান্তরে। শ্রীচরণকে নিয়ে পেয়াদা হাজরাদের কাছারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পেয়াদা ডাকল, 'বাবু ছিরচণ এয়েছে।'

'দাঁড়া যাচ্ছি', বলে মদের গেলাস হাতে নায়েব মহিম ঘোষ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মদে বার দুই চুমুক দিয়ে শ্রীচরণের দিকে রক্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'কিরে শালা, সাতদিনেও যে পাত্তা নেই তোর? কি হয়েছে কি, খুব যে নবাবি দেখছি, জমি চাই না তোর?'

শ্রীচরণ জবাব না দিয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বুক কাঁপছে

তখন ওর।

'মাঝে মাঝে এই সব হারামজাদাদের না চাবকালে সিধে থাকে না এই কুকুরগুলো। দারোয়ান', বলে হাঁক পাড়ল মহিম।

দুজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান এসে দাঁড়াল।

নায়েব বলল, 'হারামজাদাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেল'

হিন্দুস্থানী দুজন সঙ্গে সঙ্গে ওকে গিয়ে ধরল। পেয়াদা ভিতর থেকে একগাছা দড়ি এনে দিল। দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হলো শ্রীচরণকে। তারপর খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল তাকে।

নায়েব বলল, 'লক্ষ্মণ'

লক্ষ্মণ সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'হুজুর'

'চাবুকটা।'

লক্ষ্মণ শঙ্করমাছের লেজের একখানা চাবুক এনে নায়েবের হাতে দিল।

নায়েব আবার লক্ষ্মণকে হুকুম করল, 'যা বোতলটা নিয়ে আয়।'

লক্ষ্মণ বোতল আনলে নায়েব বলল, 'ঢেলে দে গেলাসে।'

এক গ্লাস মদ উপচে উঠল। নায়েব সবটা এক নিঃশ্বাসে পান করে শ্রীচরণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঐ গণপতি না ফণপতি মেদনীপুরের উড়েটা বোধ হয় সাহস দিয়েছে তোকে আর অমনি মাথা বিগড়ে গেছে। তোকে আসতে বললাম তুই এলি না কেন?'

শ্রীচরণ কথা বলতে পারল না।

নায়েব আবার বলল, 'জমি চাস্ না?'

শ্রীচরণ ভীত কম্পিত স্বরে জবাব দিল' 'আজ্ঞে না বাবু।'

'জমি না চাস্ তো না চাস, তা তোর বোনটাকে পাঠালি না যে। বলেছিলাম না, আমার একজন কাজ করার লোক চাই।'

'ও আসতে চায় না।'

'কেন গণপতি ওর নাও হয়ে গিয়েছে বুঝি।'

শ্রীচরণ বলে উঠল, 'খারাপ কথা বলবেন নি বাবু।'

'উঁ এখনও তাহলে রস মরে নি। আচ্ছা রস শুকিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আজকেই তোর বোনটাকে পাঠিয়ে দিবি। এখন থেকে সে আমার কাছে থাকবে।'

শ্রীচরণ প্রতিবাদ করল, 'না'

'না!' বলেই এলোপাতাড়ি চাবুক চালাতে লাগল নায়েব। শঙ্কর মাছের লেজের চাবুক ধারালো, গিঁট গিঁট। কেটে কেটে যেতে লাগল শ্রীচরণের সর্বাঙ্গ। শ্রীচরণ কাত্‌রে কাত্‌রে উঠতে লাগল। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে লাগল। চাবুক মারতে মারতে এক সময় নায়েব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে গেল শ্রীচরণের। মুখের উপর একটা চাবুক পড়েছিল। রক্তাক্ত এক বিদারণ-রেখা কপাল থেকে নাকের উপর দিয়ে চিবুক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আঁকা পড়ে গেল।

নায়েব বলল, 'খুলে দে।'

দারোয়ান বাঁধন খুলতে লাগল।

নায়েব বলল, 'ঘরে যা, গিয়ে তোর সেই বোনটাকে পাঠিয়ে দেগা। ছুঁড়ীটা বেশ হয়ে উঠেছে।'

শ্রীচরণ বাঁধন-মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। নায়েব হঠাৎ শ্রীচরণের মুখের উপর এক লাদা থুথু ছুড়ে দিল। বলল, 'যা বানচোত বাড়ী যা। কপালে জমি নাই তা কি হবে তোর। যাঃ, আমার শালা হবি এবার।' বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

শ্রীচরণ সর্বাঙ্গে রক্তাক্ত ক্ষত নিয়ে দেহমনে আগুনের দাহ নিয়ে বাড়ী যেতে লাগল।

সোজা বাড়ী না ফিরে গেল সে গণপতির কাছে। লম্পর কম্পমান শিখার আলোয় শ্রীচরণের চেহারা দেখে আঁতকে উঠল গণপতি।

শ্রীচরণ গণপতির কাছে বসে গণপতির হাতটা চেপে ধরল। সহসা শ্রীচরণের গাল বেয়ে টস্‌টস্‌ করে জল পড়তে লাগল।

শ্রীচরণের কাছে সব ঘটনা শুনে গণপতি বলল, 'তোমাকে কোর্টে যেতে হবে ছিচরণ?'

'কোর্ট'

'হ্যাঁ কোর্ট।'

'কেন পাগলামি করছ, নায়েব যা বলছে তাই করি। আমি পারব নি ঐ বাঘের সঙ্গে লড়তে।'

'না—, তোমাকে লড়তেই হবে।'

'আমার টাকা কোথায়? কোর্ট সেইতো ডায়মণ্ডহারবারে। সেখানে যাব কেমন করে। সেকি চারটিখানি কথা।'

'তা হোক আমি টাকা দিব। যেতে হবে তোমাকে কোর্টে। আর তোমার ঘরের দাওয়াতে আজ থেকে আমার দুজন মুনিষ শুয়ে থাকবে। কাজকম্ম থাক এখন, চলো কালকে সকালেই ডায়মণ্ডহারবারে যাই।'

গণপতির নির্দেশ মতোই সমস্ত ব্যবস্থা হলো। কিন্তু গণপতি জানত না যে, সুন্দরবনের সমস্ত পারানি-ঘাট বা খেয়াঘাটও জমিদারদের। সকালবেলা হরেনের কাছে টাকা ধার করে গামছায় চাল চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে শ্রীচরণকে নিয়ে গণপতি খেয়াঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। খেয়াঘাটের মাঝি বলল, 'আমি তো তোমাদিকে পার করতে পারব নি বাপু।'

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'কেন পারবে নি?'

'নায়েববাবুর বারণ আছে।'

'তা খেয়াঘাট কি নায়েববাবুর নাকি?'

'হ্যাঁ গো, জানো না তুমি?'

অনেক অনুরোধ উপরোধ করল গণপতি। কোনো কাজ হলো না দেখে খেয়াঘাট থেকে নদীর ধার ধরে ধরে অনেকটা হেঁটে গিয়ে বলল, 'ছিচরণ, চলো সাঁতার কেটে পার হয়ে যাই নদী। বেশি তো চওড়া নয়।'

'নদীতে কুমীর হাঙর আছে যে, এই ক'দিন আগেও যে একটা বাছুরকে নিয়ে গেইছে।'

'তা যাক, চলো নদী সাঁতরে পার হয়ে যাই।'

অগত্যা দুজনে নদী সাঁতরে পার হয়ে নদীর পাড়ের জঙ্গল পেরিয়ে নামখানার দিকে চলতে লাগল। নামখানাতেও বহু কষ্টে গোপনে নদী পার হয়ে কাকদ্বীপে গিয়ে শেয়ারের নৌকায় উঠে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে পাড়ি দিল।

ডায়মণ্ডহারবারের জেটিঘাটে নেমে হোটেলে খেয়ে নিয়ে এক দোকানের দাওয়ায় গামছা পেতে শুয়ে পড়ল দুজনে। ঘুম থেকে উঠে দেখল, বেলা পড়ে গেছে। লোকের কাছে খোঁজখবর নিয়ে গেল এক নাম করা মোক্তারের কাছে।

মোক্তার সব শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকদ্বীপ থানায় গিয়েছিলে?'

গণপতি বলল, 'থানার দারোগাবাবু মহিম নায়েবের বন্ধু।'

'অ, তা মামলা একটা করতে পার, তা তোমরা বাপু জিততে পারবে না। তার চেয়ে মামলা ফামলা না করে নায়েবের সঙ্গে মিটিয়ে নাও গে। জলের মধ্যে বাস করে তো বাপু কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না। কটা মামলা করবে তুমি? উল্টে তোমাদের চোর প্রমাণ করে ওদের জমিদারি থেকে উচ্ছেদ করে দেবে জেলে ঢুকিয়ে।'

গণপতি বলল, 'তাহলে মামলা টিকবে না বলছেন।'

'কি করে টিকবে? সাক্ষী নেই, সাবুদ নেই। আর মামলা হয়তো হাইকোর্ট পর্যন্ত চলবে। নায়েবের সঙ্গে মামলা করে পারবে কেমন করে বলো দেখি।'

গণপতি রেগে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মহিম ঘোষকে আপনি চেনেন নাকি?'

'তা আর চিনি না? তা এখন কি করবে বলো, টাকা খরচ করতে চাও আমি মামলা লাগিয়ে দিচ্ছি।'

হতাশ হয়ে গণগতি মোক্তারের ফি কুড়িটি টাকা গুনে দিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে বেরল। রাত্রে থাকবার মতো জায়গা কোথাও নেই ডায়মণ্ড-হারবারে। হোটেলে জিজ্ঞাসা করে জানল, কালীবাজারে মানে বেশ্যা-পল্লীতে একজায়গায় শোবার জায়গা চাটাই আর মাথায় দেবার বালিশ পাওয়া যায়। নয়তো কোনো বেশ্যার ঘরে গিয়ে থাকতে হবে।

অগত্যা দুজনে সেই বেশ্যাপল্লীর পান্থশালার খোঁজে গেল। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অন্ধকার কাঁচা গলি। দুপাশ থেকে নর্দমার জল উঠে এসে স্থানে স্থানে কাদা হয়ে আছে। খোলার চাল, টিনের চাল, ছিটেবেড়ার বস্তি দুধারে। দুএকখানা অত্যন্ত নিচু ইঁটের ঘরও চোখে পড়ল। দরজায় দরজায় বেশ্যারা কুপির আলোর সামনে কুঁচিয়ে কাপড় পরে চোখে কাজল আর ঠোঁটে রঙ মেখে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কেউ সিগারেট ফুঁকছে। গেঁয়ো দুটো মানুষকে দেখে কেউ কেউ হি হি করে হাসল, হাতছানি দিয়ে ডাকলও কেউ কেউ। খোঁজখবর নিয়ে সেই রাত্রি-নিবাসে গিয়ে উপস্থিত হলো দুজনে। এক চিমড়ে মতো বুড়ী বেরিয়ে এসে বলল, 'কি চাইগো লোকেরা?'

গণপতি বলল, 'একটু শোবার জায়গা চাই।'

বুড়ীটা সামনের একটা নিচু স্যাঁতসেঁতে চালা দেখিয়ে বলল, 'এইতো শোবার জায়গা।'

সেখানে জন পনের লোক শুয়ে বসে আছে। কেউ কেউ বিড়ি ফুঁকছে। কেউ কেউ সটপটাং হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। জন চারেক লোক তাস খেলছে। ওপাশে জনতিনেক মদের বোতল নিয়ে বসেছে। তাদের কাছে বসে একটা ধাড়ী বেশ্যা মদ খাচ্ছে আর হেসে হেসে তিনজনের গায়ের উপর ঢলে ঢলে পড়ছে। নোংরা কথা বলছে। গণপতি আর শ্রীচরণের দিকে তাকিয়ে বার দুই চোখও মারল সে।

বুড়ী বলল, 'জায়গা আর নি গো বাছা, কারো ঘরে টরে যাও।'

গণপতি বলল, 'তুমিই একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

বুড়ী সদাশয়া। ওদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে চঞ্চলা বলে একটা বেশ্যার ঘরে ঢুকিয়ে দিল।

সারারাত্রি ওরা গোঁজ হয়ে শুয়ে রইল। আর চঞ্চলা ভাবল, এ আবার কি বেরসিক গেঁয়ো লোক বাবা। একবার আমার দিকে ফিরেও দেখে না।

সকাল হলে চঞ্চলার টাকা মিটিয়ে দিয়ে জেটিঘাটে গিয়ে কাকদ্বীপের নৌকায় উঠল দুজনে। নদীর হাওয়ায় নদীবক্ষের মুক্তিতে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দুজনে। কাল সারারাত নরকে কাটাতে হয়েছিল যেন। গণপতির মহাভারতের আখ্যান মনে পড়ল। যুধিষ্ঠিরকেও নাকি নরকবাস করতে হয়েছিল। ওরা অবশ্য যুধিষ্ঠির নয় কিন্তু কি পাপে যে একরাত্রি নরকবাস করতে হল', মনে মনে তাই সন্ধান করতে লাগল গণপতি।

দিন পাঁচেক পর লয়ালগঞ্জে দুজনে ফিরে এসে দেখল ওদের দুজনেরই ঘর পুড়ে ছাই হয়ে আছে। শুনল শ্রীচরণের মাকে ঘরের মধ্যে রেখে ঝাঁপের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে রেখে ছিল, সে পুড়ে মারা গেছে। লক্ষ্মীর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। গণপতির ভাইবোন আর মুনিষরা গণপতির পোড়া ঘরই কোনোমতে মেরামত করে তারই মধ্যে কোনো রকমে মাথা গুঁজে আছে।

শ্রীচরণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। হাঁটুতে মাথা গুঁজে সে বসে

পড়ল। গণপতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানল যে, যেদিন গণপতিরা ডায়মণ্ডহারবার কোর্টে মামলা করতে যায় সেইদিনই মাঝরাতে হঠাৎ গণপতির বোন ঘুম ভেঙ্গে দেখে ঘরের চাল জ্বলছে। সে তার দাদাকে ডেকে তোলে, বাইরে মুনিষরা ছিল তাদেরও ডেকে তোলে। তখন ঘর ভালো রকম জ্বলতে আরম্ভ করেছে। এমন সময় ওরা দেখতে পায় শ্রীচরণের ঘরও জ্বলছে। এখানে সবাই খাল থেকে জল তুলে আগুন নেভাবার কাজে লেগে যায়। আর দুজন ছুটে যায় শ্রীচরণের ঘরে। সেখানে গিয়ে দেখে, যে দুজন মুনিষ শ্রীচরণের ঘরের দাওয়ায় শুতো তারা দড়ি-বাঁধা অবস্থায় মাঠে পড়ে আছে। ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ, আগুন প্রায় সব ঘরটাই পুড়িয়ে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে দেখে শ্রীচরণের মা জ্বলে পুড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। লক্ষ্মী নেই। তারপর মুনিষ দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানল গণপতি যে, জন কয়েক হিন্দুস্থানী দারোয়ান এসে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাদের মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তাদের পিছমোড়া করে বেঁধে মাঠে ফেলে দিয়ে আসে। তারপর দারোয়ানগুলো কি করল তা তারা কিছু দেখতে পায় নি কেননা ঘরের পিছন দিকে তাদের ফেলে দিয়ে এসেছিল। তার খানিক পরে ঘরটা জ্বলে উঠেছিল।

গণপতি হঠাৎ বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'আ—আমি যদি বাপের বেটা হই, আমি এর শোধ নবই। আমি যদি বেজন্মা না হই, এর শোধ আমি কড়ায় গণ্ডায় তুলব।'

ওরা ওখানে এসে দাঁড়াতেই চারিদিকে মেয়ে পুরুষের ভিড় জমে গেছে। ওদের দুজনকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে শতখানেক লোক।

গণপতি সিংহের মতো ভীষণ হয়ে উঠেছে। কদিনের অনিয়মে অনিদ্রায় চোখ ওর কুঁচফলের মতো লাল। বড় বড় চুল উড়ছে। আকামানো দাড়ি মুখে খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে। লাল চোখ দুটো জ্বলছে দুখণ্ড অঙ্গারের মতো। গণপতি হঠাৎ চীৎকার করে বলতে লাগল, 'ভাই সব, তোমরা যদি মানুষ হও যদি মানুষের রক্ত মাংস তোমাদের শরীলে থাকে তাহলে এসো আমার সঙ্গে মহিম ঘোষের কাছারিটাও ছাই করে দিয়ে আসি। তাকেও পুড়িয়ে মেরে আসি। তাও যদি না পারি,

চলো আমার সঙ্গে তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে আসি, লক্ষ্মীকে খুঁজে নিয়ে আসি। লক্ষ্মী তোমাদের মেয়ে তার ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সকলের। চলে এসো আমার সঙ্গে, আমরা মুখ বুজে সহ্য করে যাই বলেই ওদের অত সাহস। এসো তোমরা আমার সঙ্গে।'

কিন্তু অধিকাংশ লোক সুট্ সুট্ করে কেটে পড়তে লাগল। সুন্দরবনের মাটিতে বাস করে জমিদারের নায়েবের সঙ্গে বিবাদ করবার মতো বুকের পাটা ওদের ছিল না। গণপতি বলল, 'ঠিক আছে আমি একাই যাব।'

রৌদ্র দগ্ধ মাঠের উপর দিয়ে ছায়া ফেলে হন্ হন্ করে মহিম ঘোষের কাছারির দিকে চলতে লাগল গণপতি। শ্রীচরণ সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দাঁড়াও গণদা, আমিও যাব।'

গণপতি দাঁড়াল না, চলতেই লাগল। আরও জনা সাতেক লোক শ্রীচরনের সঙ্গে চলতে লাগল। ছুটে ছুটে গিয়ে তারা ক্রমশঃ গণপতির সঙ্গ ধরল।

গণপতি মহিম ঘোষের কাছারির সামনে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'মহিমবাবু? এই মহিমবাবু।'

চীৎকার শুনে বেরিয়ে এলো জন দুই দারোয়ান। বোধ হয় সবাই তখন কাছারিতে ছিল না।

দারোয়ান হেঁকে উঠল, 'কেনো, কি দরকার কি? চিল্লানো মৎ কর।'

গণপতি প্রচণ্ড জোরে ধমকে উঠল, 'চুপ কর কুকুররা, তোদের বাবাকে ডেকে দে।'

দারোয়ান দুটো চোখ রাঙিয়ে তড়পাতে লাগল, 'হেই শুয়ারের বাচ্ছা মুখ সামলে কথা বলবি।'

তখনই গণপতির সঙ্গে তাদেব একটা লড়াই বেঁধে যায় আর কি এমনি অবস্থা ঘনিয়ে উঠল। ঠিক এমনি সময়ে বাড়ীর ভিতর থেকে মহিম ঘোষ বেরিয়ে এল। বোধহয় সে এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল। তার চুল উস্কোখুস্কো। চোখে মুখে রাত্রি জাগরণের মালিন্য। বাইরে বেরিয়ে এসে সে দারোয়ানদের বলল, 'সিধা হয়ে দাড়িয়ে থাক তোরা।'

তারপর গণপতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি হয়েছে কি? এই দুপুর

বেলায় এসে চেঁচামিচি জুড়েছ ?'

গণপতি কঠিন কণ্ঠে হিসিয়ে হিসিয়ে উচ্চারণ করল, 'বলো, লক্ষ্মী কোথায় ? বলো, কেনে আমাদের ঘরে আগুন দিয়েছ ?'

যেন আকাশ থেকে পড়ল মহিম, 'লক্ষ্মী ! আগুন ! লক্ষ্মী কে ? আগুন কি ?'

'কেন, কিছুই জানো না তুমি ?'

'আমি কেমন করে জানব হে ? এ্যাঁ ? আর দিক্‌বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে যে একেবারে তুমি টুমি আরম্ভ করেছ ?'

গণপতি চীৎকার করে উঠল, 'ন্যাকামি ছাড়ো। বলো লক্ষ্মী কোথায় ?'

শ্রীচরণকে উদ্দেশ্য করে বলল নায়েব, 'লক্ষ্মী কোথায় আমি জানিনা রে। দেখ আমায় কাছারি বাড়ী খুঁজে দেখ। আমার কথায় বিশ্বাস না হয় খুঁজে দেখ না।'

গণপতি বলল, 'তাহলে লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দেবে না ?'

এবার মহিম ধমকে উঠল, 'এই খানকির বাচ্ছা, মুখ সামলে কথা বল, খেয়াল আছে তোর, কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস, আমি তোর বাবা।'

গণপতি চীৎকার করে ওঠে, 'এই চুপ মারো শুয়োরের বাচ্ছা, আমার জানতে বাকী নেই তুই কি।'

ইতিমধ্যে আরও দুজন দারোয়ান এসে দাঁড়িয়ে গেছে। নায়েব দারোয়ানদের বলল, 'ওদের তাড়িয়ে দে, ওরা কুকুরের দল।'

দারোয়ানগুলো ঐ সাতজন লোকের সামনে এসে দুই হাত দিয়ে ঠেলে দিল ওদের।

গণপতি আবার বলল, 'মহিমবাবু, বলো, লক্ষ্মীকে ফিরে দেবে কিনা ?'

মহিম খেঁকিয়ে উঠল, 'বলছি না লক্ষ্মী এখানে নেই, লক্ষ্মীর খবর আমি জানি না।'

আর কোনো কথা না বাড়িয়ে গণপতি লোকেদের নিয়ে ফিরে যেতে লাগল।

পথের মাঝখানে এসে বলল, 'তোমরা ফিরে যাও, আমি লক্ষ্মীকে খুঁজে দেখতে যাব।'

শ্রীচরণ বলল, 'আমিও যাব।'

লোকগুলিও ফিরে যেতে চাইল না।

তখন গণপতি লক্ষ্মীকে খুঁজতে আরম্ভ করল। প্রত্যেকটি খালের ধার, প্রত্যেকটি জঙ্গলের ভিতর, বিশালাক্ষীর স্থান, চন্দনপিঁড়ি নদীর কূলের জঙ্গল ঝোপঝাড়ে সে পাগলের মতো ফিরতে লাগল। বাড়ী বাড়ী গিয়ে লক্ষ্মীর খবর জিজ্ঞাসা করল। এমনি করে সেই দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত একটা বিরাট অঞ্চল সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো খুঁজে বেড়াল। সন্ধে হয়ে এলে আকাশে চাঁদ উঠল। তখন শ্রান্ত ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে সে এসে দাঁড়াল বিশালাক্ষীর মন্দিরের সামনে। তখন সে সঙ্গীচ্যুত হয়ে গেছে। সে জানে না শ্রীচরণ-ওরা কোনদিকে গেছে। একা সেই চন্দ্রালোকের আলোছায়াখচিত বিশালাক্ষী মন্দিরেব সামনে দাঁড়িয়ে গণপতি কান্নারুদ্ধ গলায় বলতে লাগল, 'আজ জানলাম, ভগমান নাই, আজ জানলাম তুই মিথ্যে মা। তোকে সাক্ষী রেখে আমি লক্ষ্মীকে ধর্মপত্নী করেছিলাম সেই তুই অন্যায়কারীকে ঠেকাতে পারলি নি। লক্ষ্মীর যে সর্বনাশ করল, আমার বুকে যে আগুন জ্বেলে দিল তাকে কিছু করবার ক্ষেমতা তোর নেই। তুই মিথ্যা, তুই মাটির পুতুল, তুই জুজুমানা। তোকে আমি মানি না। তোকেই আমি প্রথম ধ্বংস করব, ভেঙ্গে ফেলব। তোর মাটি আমি জমির মাটিতে মিশিয়ে দোব।' বলে মন্দিরে ঢুকে বিশালাক্ষীর মাটির মূর্তিটা দুই হাতে তুলে মন্দিরের বাইরে নিয়ে এসে বটগাছের তলায় নিষ্ঠুর শক্তিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে টলতে টলতে আড়মাতলার মতো ওর পোড়া ভিটের দিকে ফিরতে লাগল গণপতি। লক্ষ্মীর মূর্তি ওব মনে ভাসতে লাগল, লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর ওর কানে বাজতে লাগল, লক্ষ্মীর স্পর্শের স্মৃতি ওর সারা অঙ্গে শিহরিত হল।

চাঁদের আলো দিগন্তবিস্তৃত হু হু করা প্রান্তরের উপরে কুহকের মতো ছড়িয়ে আছে। দুর্বার বেগে বাতাস বইছে। বাতাসে দক্ষিণ সমুদ্রেব লবণোচ্ছ্বাসের মত্ততা।

গণপতি যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। জনেরা জঙ্গল হাসিলের কাজ ঢিলে তালে চালিয়ে যেতে লাগল। শ্রীচরণ পাগলের মতো চুপচাপ বসে বসে থাকত। আর গণপতি সুন্দরবনময় ইতস্তত খুঁজে বেড়াতে লাগল লক্ষ্মীকে। একা একা সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বনজঙ্গল মাঠে মাঠে ঘুরে

বেড়াতে লাগল সে। গোপনে খোঁজ নেবার চেষ্টা করল হাজরাদের কাছারিতে কিংবা অন্য কোনো কাছারিতে লক্ষ্মীকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা। কিন্তু কোনো জায়গাতেই লক্ষ্মীর কোনো খোঁজ সে যোগাড় করতে পারল না।

রাত্রে ঘুম আসত না গণপতির। বিনিদ্র রাত্রি সে হাতে বল্লম নিয়ে জেগে থাকত। শুনতে পেত, ঘুম থেকে উঠে বসে শ্রীচরণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মাঝে মাঝে শ্রীচরণকে সান্ত্বনা দিত গণপতি, 'কেঁদো না শ্রীচরণ, ভেঙ্গে পড়ো না। মনে রেখো এর শোধ একদিন নিতেই হবে।'

একদিন রাত্রে শ্রীচরণের পাশে বসে গণপতি ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, 'যাও ছিচরণ শুয়ে পড় গে, আমি জেগে আছি, আমার ঘুম আসবে না।'

হু হু করা নির্জন প্রান্তর। দূরে দূরে ছুটন্ত আলেয়ার আলো। আকাশের রাশি রাশি নক্ষত্রের ক্ষীণ দীপ্তি পৃথিবীতে ঝরে পড়ছে। বিচিত্র এবং অদ্ভুত সব শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই দিগন্তব্যাপ্ত অন্ধকার নৈঃশব্দের মধ্যে ক্ষীণতম শব্দও যেন বোমার মতো ফেটে পড়ছে।

শ্রীচরণ চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'তুমি বুঝবে না গণদা, আমার মা আগুনে পুড়ে মলো, আমার বোনকে ওরা চুরি করে নিয়ে গেল। তার কি যে হলো তা কেউ জানতে পারল নি। তোমার তো বোন নয়, তুমি কেমন করে বুঝবে আমার বুকের জ্বালা।'

গণপতি বলল, 'এতদিন তোমাকে বলিনি ছিচরণ। আজ আমি বলছি শোনো। লক্ষ্মীকে আমি বিয়ে করেছিলাম। লক্ষ্মী আমার বৌ।'

শ্রীচরণ চমকে উঠল, 'সে আবার কি কথা। কোথায় বিয়ে করেছিলে? কেমন করে বিয়ে করেছিলে?'

'বিশালাক্ষীর থানে। বিশালাক্ষীর চরণের সিঁদুর নিয়ে আমি লক্ষ্মীর মাথায় লাগিয়ে দিয়েছিলাম। তাহলে বুঝতে পারছ, আমার ভিতরে কী আগুন জ্বলছে। কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে সারাক্ষণ কাঁদছি। দেখছ না, আমি ঘুমোতে পারছি না, খেতে পারছি না, বসতে পারছি না। আমার ভিতরটা হাহাকার করছে।'

শ্রীচরণ বলল, 'আমাকে আগে বল নাই কেনে?'

'বলতাম, সময় হলেই বলতাম। তাই বুক বাঁধো। মনে মনে দিব্যি

কর এর শোধ নিতেই হবে।'

শ্রীচরণ আর কোনো কথা না বলে পাথরের মূর্তির মতো বিশাল অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। গণপতি শ্রীচরণের পাশে নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আগামী দিনের বিচিত্র কাজের পরিকল্পনা মনে মনে স্বপ্ন দেখতে লাগল।

মহাসমুদ্রের প্রবল বাতাস দুর্বার বেগে ছুটে আসছে। গাছে পাতায় বাতাসের লুটোপুটিতে মর্মরিত হাহাকার জেগেছে। জোনাকিরা আগুনের ফুলকির মতো ওড়াউড়ি করছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে শেয়ালের সম্মিলিত হাহাকার। রাত্রিচর পশু ও পাখির বিচিত্র ধ্বনি রাত্রির আকাশে থমথমে পরিবেশ ঘনিয়ে তুলছে। দুই সমব্যথী বন্ধু নিদ্রাহীন মধ্যরাত্রে পাশাপাশি বসে আছে।

দিনকয়েক পর এক দুপুর বেলায় এই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে জনকয়েক যুবক দেখা করতে এল গণপতির সঙ্গে। বুধাখালির সাধুচরণ মাইতি, বিশ্বনাথ মাইতি, দ্বারিকনগরের সাগর জানা, শিবরামপুরের বিহারীলাল ঘড়ুই, চন্দনপিঁড়ির ইন্দ্র মাইতি, রাজনগরের অভিমন্যু সাউ। গণপতির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ওরা ডাকছিল, 'গণপতিবাবু আছেন নাকি ?

ডাক শুনে চকিত সন্ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছিল গণপতি। ছ'জন মানুষকে দেখে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বলেছিল, 'কাকে খুঁজছেন আপনারা ?'

সাগর বলেছিল, 'আমরা গণপতি বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছি।'

গণপতি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?'

সাগরই জবাব দিয়েছিল, 'আমরা বুধাখালি, দ্বারিকনগর, শিবরামপুর, চন্দনপিঁড়ি আর রাজনগর থেকে আসছি।'

গণপতি বলল, 'আমিই গণপতি।'

সাধুচরণ অবাক হয়ে বলে উঠল, 'এই গণপতি !'

গণপতি আবার বলল, 'হ্যাঁ, আমিই গণপতি।'

বিহারী বলল, 'আপনার সব কথা আমরা শুনেছি। তাই আপনার

সঙ্গে কথা বলতে এলাম। ভাবলাম, এমন রোখালো তেজী লোক যখন সুন্দরবনে এসে গেছে তখন আর আমাদের কোনো ভয় নাই।'

সাধুচরণ বলল, 'আমরা একটু আলাদাভাবে কথা বলতে চাই।'

ওরা চন্দনপিঁড়ি নদীর ধারে বনের ভিতরে গিয়ে বসল।

সাধুচরণ আলোচনার সূত্রপাত করে বলল, 'দেখ গণপতি তোমার কথা আশেপাশের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি নাকি তিন জমিদারের বাঘের মতো নায়েবকে অপমান করেছ, দলবল নিয়ে গিয়ে তাকে ধমকে এসেছ। এ চাগলায় এত বড় বুকের পাটা আর কেউ দেখায় নি। তাই আমরা তোমার সঙ্গে একটা আলোচনা করতে এসেছি।'

গণপতি বলল, 'আমি তো শিখতেই চাই, আমি তো শুনতেই চাই। বলুন কি বলবেন।'

বিশ্বনাথ বলল, 'আমরা বলতে এসেছি যে একা একা লড়াই করা মানে হঠকারিতা। আপনার সেদিনকার সঙ্গী সাতজন চাষীকে আর আপনাকে খুন করে ফেলতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না নায়েবকে। কেন না, আপনারা সংখ্যায় কম, তাই শক্তিও কম। কিন্তু যদি আমরা সুন্দরবনের সমস্ত গরীব শোষিত মানুষকে সংগঠিত করে বড় বড় জমিদার আর জোতদারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়লাভ করতে পারি, তবেই হবে খাঁটি জয়। তা নাহলে দুচারজন মিলে কিছুই করতে পারা যাবে না। শুধু শুধু মার খেয়ে মরতে হবে।'

গণপতি বলল, 'সেদিন ডায়মণ্ডহারবার থেকে ফিরে আসতে শতখানেক লোক এসেছিল আমাদের দেখতে। তা আমি বললাম চলো, নায়েব মহিম ঘোষকে গিয়ে আমরা ধরি, কিছু না বলে বলে কেবল সহ্য করে করে আমাদের দশা এমনি হয়েছে; তাতে আস্তে আস্তে প্রায় সবাই পালিয়ে গেল। কিন্তু জনকুড়ি লোক পালাল না। আর তাদের মধ্যে সাত জন একটু ভেবে নিয়ে আমার সঙ্গে এল। তাই আমি বলছি যে, সব গরীবকে তা বোঝানো যাবে না। ওরা ভীতু, ওরা কেবল মার খেতেই জানে। কিন্তু যে কজন আমার সঙ্গে এসেছিল, আমি বলব তারা সাহসী, তাদের নিয়েই কাজ হবে।'

বিহারীলাল বলল, 'সাহসী লোকেরা আগে থাকবে। কিন্তু সবাইকে

দলে না পেলে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব।'

গণপতি জানতে চাইল, 'তাহলে কি করতে হবে আমাদের? সবাইকে বোঝাতে হবে যে ভয় পেয়ো না, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও?'

সাগর বলল, 'হ্যাঁ, এই কথাটি সকলের মনে ঢুকিয়ে দিতে হবে যে ভয় পেয়েছ কি মরেছ। ভয় মানেই হলো মিত্যু। সাহসই হলো শক্তি, সাহস মানেই বেঁচে থাকা।'

সুন্দরবনে নবাগত গণপতির সঙ্গে পরিচয় হলো ওদের। সাধুচরণ মাইতি, বিশ্বনাথ মাইতি, সাগর জানা, বিহারীলাল ঘড়ুই, ইন্দ্র মাইতির সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো গণপতির। গণপতি ওদের কাছ থেকে সুন্দরবনের জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, দারোয়ানদের নানান অত্যাচার অনাচারের কথা শুনল। ওরা বলল, 'এর বিরুদ্ধে একটা কিছু করতেই হবে। মানুষকে সচেতন করতেই হবে।'

চন্দনপিঁড়ির ইন্দ্রমাইতি বলল, 'ওখানকার সেন জমিদারের নায়েব ভবেশ দাস তার কাছারিতে প্রতি রাত্রে মদ আর মেয়ে নিয়ে ফূর্তি করে। আর সে মেয়েদের জোর করে নয়তো টাকা দিয়ে বশ করে বা কিনে নিয়ে আসা হয় গরীব চাষীদের ঘর থেকে। প্রতিদিন নতুন নতুন মেয়ের দরকার হয় ভবেশ দাসের। ভবেশ দাসের দারোয়ানগুলো পর্যন্ত চাষীদের বাড়ী ঢুকে মেয়েদের অপমান করতে চায়। পথে ঘাটে পেলে জড়িয়ে ধরে, দাঁত বার করে খ্যাক খ্যাক করে হাসে।'

বুধাখালির সাধুচরণ মাইতি বর্ণনা করল বুধাখালির নায়েব অবনী ব্যানার্জি কত বড় লম্পট। কোনো গরীব চাষীর মেয়ের বিয়ের আগে নায়েবকে খবর দিতে হবে। বিয়ের আগে মেয়েকে পাঠাতে হবে কাছারিতে। সে মেয়েকে নায়েবের পছন্দ হলে তার আর বিয়ে দেওয়া চলবে না। আর পছন্দ না হলে নায়েব তাকে উচ্ছিষ্ট করে দেবে। সে মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরবে, তবে নায়েব বিয়ের অনুমতি দেবে। অনুমতি পেয়েই নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। চাষী যদি তার ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয় তাহলে কাছারিতে বিয়ের ট্যাক্স দিতে হবে চাষীর ভাগের ধান থেকে।

মানুষ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন জীব। পরাধীনতা সে বেশীদিন সহ্য করতে

পারে না। শৃঙ্খল তার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিকে পীড়ন করে। তাই পরাধীনতার অত্যাচার থেকে সে মুক্তি খুঁজবেই। সুন্দরবনের ভূমিহীন শ্রমজীবী অসহায় কৃষকদের উপরে মুষ্টিমেয় জমিদার, জোতদার, নায়েব আর পুলিশের যে কুৎসিত অত্যাচার ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, শোষণ এবং পীড়নের যে শৃঙ্খলে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে তার থেকে মুক্তির তৃষ্ণা ওদের ভিতরে জেগে উঠেছে। এই ভীষণ কারাগার থেকে তারা মুক্তির তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সচেতনভাবে এই যন্ত্রণা হয়তো এখনও তাদের সকলের প্রাণে জাগেনি। কিন্তু অপমানের জ্বালায়, চাবুকের ঘায়ে, শোষণে নিষ্পেষণে ভিতরে ভিতরে মানুষগুলির সমস্ত প্রাণ ব্যথিয়ে উঠেছে। আর ওরা পারছে না যেন, ধৈর্য যেন ওদের শেষ হয়ে আসছে।

শতশত নিরুপায় মানুষের হৃদয়ের এই যন্ত্রণা কেমন করে যেন দু'একটি মানুষেব মধ্যে আগ্নেয় পাহাড়ের রূপ ধরে। তাদের অন্তঃকরণ সহসা জেগে ওঠে। চুপ করে সহ্য করে, নীরবে যন্ত্রণাকে হজম করে আর যেন তারা বসে থাকতে পারে না। প্রচণ্ড তাগিদ, নিষ্ঠুর যন্ত্রণা তাদের ভয়ঙ্কর ব্যাকুল করে তোলে।

সুন্দরবনের যে কটি মানুষ আজ গণপতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তারা সেই জাতেরই মানুষ। আপাত সহিষ্ণু মানুষের গোপন যন্ত্রণা এদের হৃদয়ে সব থেকে বেশী ক'রে বেজেছে। হয়তো এরা বেশী সংবেদনশীল। হয়তো ওদের জীবনে বিচিত্র ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে আর সকলের চেয়ে কিছু বিভিন্ন ধরণের মানসিকতা গঠিত হয়েছে। তাই চারদিকের এই অপমান, লাঞ্ছনা, অত্যাচার ওদের ভিতরেই আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই যন্ত্রণাই ওদের গৃহজীবনের স্তিমিত সহিষ্ণুতা থেকে ছিঁড়ে এনে রুদ্র-প্রচণ্ডের মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে ছেড়ে দেয়।

আজকে চন্দনপিঁড়ি নদীর অরণ্যসঙ্কুল কূলে বসে এই যে সাতজন মানুষ মিলিত হলো, বসে বসে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের কথা বলাবলি করে করে হৃদয়ে হৃদয়ে একটি যোগাযোগ রচনা করল তা একটি বিস্ময়কর সংঘটন বলে ওরা ভাবতেও পারল না। ওরা ভাবতেও পারল না, আজকে সাতটি হৃদয়ের এই যোগাযোগ ও বন্ধুত্ব ভবিষ্যতে সুন্দরবনের পীড়িত ও স্তিমিত জীবনে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। হয়তো এদের সবাই সে অগ্নিকাণ্ডের শেষ

পর্যন্ত সম্পন্ন করতে থাকবে না, ভয় পেয়ে, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাবে কেউ কেউ। কিন্তু মহাপ্রলয়ের ভূমিকা রচনা করল ওরা নিজেদেরই অজান্তে। এমনি করে আকস্মিক ভাবেই ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাময় ঘটনার সূত্রপাত হয়। এই রকম আপাত সামান্য ব্যাপার ইতিহাসকে পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে।

॥ ৯ ॥

কিছু কিছু চাষের কাজ আরম্ভ করল গণপতি। জঙ্গল হাসিলের কাজও চলতে লাগল। কিন্তু চাষের ধান উঠতেই নিরীহ হরেনের চেহারা পাল্টে গেল। হরেন বলল, 'তোমাকে এতদিন যে টাকা দিয়েছি, সুদে আসলে তা অনেক হয়ে গিয়েছে গণ, এ ধান তো তুমি পাবে না বাপু। আগে আমার ঋণ শোধ করে দাও, তবে তো তুমি ধান নেবে।'

অনেক ঝগড়া ঝাঁটি করে নিজের অর্ধেক ভাগের থেকে কিছু হরেনের ঋণ শোধ করে কিছু পেল গণপতি। যারা ওর কাছে কাজ করে তাদেরও ধান দিল গণপতি।

পাঁচবছর পর দীর্ঘদিনের কঠিন পরিশ্রমের পর, চারটি লোকের মৃত্যুর পর জঙ্গল হাসিল কাজ শেষ হলো, বাঁধ বাঁধা শেষ হলো।

তারপর হরেন সামন্তর কাছে গিয়ে গণপতি বলল, 'আমার পঞ্চাশ বিঘে জমি এবার আমাকে দিয়ে দিন বাবু।'

হরেন বলল, 'দোব দোব, তার জন্যে অত ব্যস্ত হবার কি আছে। চলো না মেপে দিয়ে দিচ্ছি, সে টুকু জমির ধান তোমার নিজেরই থাকবে।'

কার্তিক সামন্ত, ব্রজ সামন্ত, কার্তিক পাত্র, হরিপদ মজুমদারের কাছে গিয়ে গিয়ে বলল গণপতি, 'বাবু এবার তো জমি আবাদযোগ্য করে ফেলেছি, আমার পাঁচ বিঘে করে জমি এবার লিখে দেন।'

তারাও বলল, 'দোব দোব। তার জন্যে অত ভাবনা কিসের। চলো না মেপে দিচ্ছি। পাঁচবিঘে করে জমির ধান তোমার নিজেরই থাকবে।'

গণপতি দিনের পর দিন ওদের কাছে তাগাদা দিতে লাগল, 'আমার

জমি আপনারা মেপে জুপে দিন বাবু'

অবশেষে একদিন পঞ্চ জোতদার এলেন গণপতির কাছে। অনেকবার দেখেছে তবু আবার গণপতির পরিষ্কার করা বিশাল জমি দেখে লোভে চোখ ওদের চকচকিয়ে উঠল। বলল, 'আরে বাপরে কি করেছিস রে গণা ! এ যে দেখি লক্ষ্মীর জোল তৈরী করে ফেলেছিস।'

গণপতি বলল, 'বাবু, তার জন্যে আমাকে আর আমার লোকেদের অনেক মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছে বাবু। আমার চারজন লোক প্রাণ দিয়েছে। তবে এমন জমি দেখছেন।

হরেন বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তার জন্যে দুঃখ করো না গণ ; তোমার প্রাপ্য তুমি ঠিকই পাবে।'

গণপতি বলল, 'তাহলে আমার প্রাপ্য জমিটুকু মেপে দেবার ব্যবস্থা করুন।'

হরেন বলল, 'চলো জমিতে চলো।'

পাঁচ জোতদার আর গণপতি, শ্রীচরণ গেল জমিতে।

হরেন বলল, 'পা দিয়েই মেপে দিচ্ছি। আমার এমন আন্দাজ যে ঠিক পঞ্চাশ বিঘে জমিই হবে।' বলে হেঁটে হেঁটে ঘুরে খানিকটা জায়গা চিহ্নিত করে বলল, 'গণ এই হলো তোমার জমি। এর ধান তুমি নেবে। আর বাকী জমির ধান নিয়ম মতো ভাগাভাগি হবে।'

হরেনের দেখাদেখি বাকী চারজন জোতদারও পায়ে হেঁটে হেঁটে পাঁচ বিঘে করে জমি আন্দাজে মেপে দিল গণপতিকে।

গণপতি বলল, 'বাবুরা এখন তো পায়ে হেঁটে মেপে দিলেন। কিন্তু আসল মাপ, দলিল কবে হবে বাবু ?'

সবাই বলতে লাগলেন, 'সে হবে হবে, তার জন্যে তুমি ভেবো না গণ, তুমি মন দিয়ে চাষবাস কর।'

গণপতি ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হলো। সে বুঝতে পারল, সে বঞ্চিত হবে, জমি ওকে দেবে না জোতদাররা। আজ নয় কাল নয় করে তাকে ঠকিয়ে যাবে। মুখের কথার ভেল্কি ছাড়া কোনো দলিলের প্রমাণ ওর থাকবে না। তবু নিরুপায় হয়েই গণপতি আপাতত নীরব হয়ে রইল।

গণপতি নিজের জন্যে আশি বিঘে জমি ভাগে চষবার জন্যে রাখল।

বাকী জমির মধ্যে একশ বিঘে ওর কয়েকজন মুনিষ ও শ্রীচরণকে ভাগে চষবার জন্যে বেঁটে দিল। ওর নিজস্ব জমি থাকল সত্তর বিঘে। জমির বিলি ব্যবস্থা ঠিক করে গণপতি চাষের কাজ শুরু করল।

জমির উপর ওদের কি নিবিড় মমতা! গণপতি শ্রীচরণ আর গণপতির সেই সহকারী কৃষকরা সারাদিন জমিতে পড়ে থাকে। জমিতে লাঙ্গল দেয়, মাটিকে মাখনের মতো কোমল ও মোলায়েম করে তোলে, জমির জল যাতে না বেরিয়ে যায় সে দিকে লক্ষ্য রেখে আল তৈরি করে। জমি যেন ওদের কাছে প্রেমিকের কাছে প্রিয়ার মতো, শিল্পীর কাছে রঙ তুলি ক্যানভাসের মতো, ভাস্করের কাছে মূল্যবান পাথরের মতো। মাটি মেখে, মাটি ঘেঁটে, মাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে দিন কাটে ওদের। মাটির প্রতি তীব্র নিবিড় প্রেমে যেন ওরা মিশে যেতে চায় মাটির মধ্যে। জমিতে ধানের চারা বুনবার আগেই স্বপ্ন বোনে ওরা মনে মনে। আগামীদিনের শস্যশীর্ষ আনমিত সোনারবর্ণ ভূমি ভেসে ওঠে কল্পনায়। ধান পেলে সারাজীবনের বঞ্চনা আর লাঞ্ছনার দুঃখ চিরদিনের জন্যে ঘুচে যাবে এই আশা নিয়ে কঠিন শ্রমের ঘাম ঢেলে দেয় মাটির বুকে।

আবার বর্ষা এল। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত মাঠে মাটি ঘেঁটে, মাটি মেখে, দিন কাটতে লাগল চাষীদের। আকাশ সব সময়ে মেঘে মলিন। বৃষ্টিতে বিদ্যুতে বজ্রগর্জনে দিক্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন। নাগরিক জীবনে এই ছেদহীন বৃষ্টিপাত বিষাদ নিয়ে আসে। বস্তির জীবন ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু গণপতি শ্রীচরণের মতো যারা কালো মেঘের নীচে সকাল থেকে সন্ধে জলে ভিজে ভিজে বিপুল পরিশ্রম করে তাদের কাছে এই বৃষ্টি অমৃতবিন্দুর মতো। বর্ষণসিক্ত পৃথিবী আর আকাশের নিবিড় আলিঙ্গনে কি গভীর তৃপ্তি ওদের!

বর্ষা শেষ হয়ে এল, ওদের ও মাঠের কাজ শেষ হলো। তারপর ধান চারার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। কিন্তু সে ভারী কাজ নয়। মাঝে মাঝে নিড়িয়ে দেওয়া, পোকা লাগছে কিনা লক্ষ্য করা, একটু নজর রাখা যাতে গোরু ছাগল হঠাৎ কচিধানে মুখ না দিয়ে বসে। তাই মোটামুটি অবসর মেলে শরৎকালে। যদিও জোতদারের কাছে ধান ধার নিতে হয়, সামনের ধান কাটা মরসুমের দিকে তাকিয়েই প্রাণে যা একটু বল থাকে।

কার্তিকের শেষাশেষি গণপতি একদিন বেড়াতে গেল চন্দনপিঁড়ির ইন্দ্র মাইতির বাড়ী। ইন্দ্রের বাড়ীতে এক রাত্রি থাকল গণপতি। খুব সকালে ও আর ইন্দ্র মাঠের পুকুরে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে ফিরছিল হঠাৎ একটা অভাবনীয় ব্যাপার চোখে পড়ল গণপতিদের।

ওরা দেখল, একটি চৌদ্দ পনের বছরের মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে সেনেদের কাছারির দিক থেকে আসছে। একেবারে কাছে আসতে দেখল মেয়েটার মুখে একটু শুকিয়ে যাওয়া ক্ষতচিহ্ন, কালশিঁটের দাগ। ওপরকার ঠোঁটটা একদিকে ফুলে উঠেছে। বাঁ চোখের উপরে ফুলে আছে। আলু থালু চুল। গায়ের ছিটের জামাটা ছেঁড়া। কাপড়ে বাসি রক্তের দাগ। মেয়েটা টলতে টলতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করল, 'বেহুলা, কোথা থেকে আসছিস রে?'

বেহুলা কোনো জবাব দিল না, আরও যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। ছুটে পালিয়ে গেল ওদের সামনে থেকে।

গণপতির চোখ তখন ব্যথায় ম্লান হয়ে গেছে। ও শুকনো পাংশু মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার, ইন্দ্র?'

ইন্দ্র বলল, 'ও সতীশ দাসের মেয়ে, চলো দেখি ওর বাড়ীতে কি ব্যাপার হয়েছে জেনে আসি।'

গণপতিকে সঙ্গে নিয়ে ইন্দ্র গেল সতীশের বাড়ীতে। একটা ছোট্টো কুঁড়ে ঘর। সঙ্গে এক চিলতে দাওয়া। ভাঙ্গা পাঁচিল দিয়ে উঠোনটা ঘেরা। বাড়ীর কাছে যেতেই দুজনে শুনতে পেল দুটি মেয়ে কণ্ঠের আর্ত কান্না।

ইন্দ্র ডাকল, 'সতীশ, সতীশ আছ নাকি?'

সতীশ বেরিয়ে এল। সতীশকে দেখে মনে হলো যেন সে অনেকদিন জ্বরে ভুগে উঠে এল। চোখ বসে গেছে। মুখ কালিমাখা।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে সতীশ? কাঁদছে কে?'

সতীশ কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, 'বেউলা আর ওর মা কাঁদছে।'

'কেনে কাঁদছে কেনে?

সতীশ হঠাৎ হুহু করে কেঁদে ফেলল। তাকে সঙ্গে নিয়ে মাঠের এক গাছতলায় গিয়ে বসল ইন্দ্র আর গণগতি। ইন্দ্র, গণপতি ওকে সান্ত্বনা

দিল। গায়ে ওর হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। তখন সতীশ বলল, 'কাল বিকালে ভবেশ দাসের কাছে গেলাম ধান ধার করতে। ধান দিল আর বললে, শুনলাম নাকি তোর মেয়ের বিয়ে দিবি অঘ্রানে।'

আমি বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা বললে, 'আজ একবার তোর মেয়েকে সান্ধের সময় একঘটি দুধ দিয়ে পাঠিয়ে দিবি তো।'

আমি বললাম, 'দুধ আমার নাই বাবু, গোরু নাই। তা বলল, কোথাও যোগাড় করে পাঠাস। তা আমি জবাব না দিয়ে পালিয়ে আসি। কিন্তু বাড়ী এসে ভয় হলো, আমার সব বাঁধা আছে কাছারির কাছে। কাছারি ধান ধার না দিলে খেতে পাব না। সবশুদ্ধ উপোস দিয়ে মরতে হবে। আর বিয়ের আগে মেয়েছেলেকে একবার কাছারিতে যেতেই হবে। তাই বাড়ী এসে দুধ দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম বেউলাকে। বেউলা যেতে চায় নাই। আমি বললাম, দুধটা দিয়েই চলে আসবি ভয় কিসের।'

গণপতি দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, 'তারপব?'

'তারপর সারারাত্রি ভবেশ দাস মেয়েটাকে মারধোর করে অত্যাচার করেছে।' বলে আবার ফুঁপিরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সতীশ।

গণপতি চুপ করে বসে রইল। কিন্তু ওর মনের ভিতরে মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে। বিরাট অগ্নিকাণ্ড হলে কিংবা অগ্ন্যুৎপাত হলে কিংবা ভীষণ ভূমিকম্প হলে যে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে থাকে তেমনি প্রচণ্ড আলোড়ন উত্তাল হয়ে উঠল গণপতির ভিতরে। লক্ষ্মীকে ওর দিবানিশিই মনে পড়ে। কিন্তু এখন লক্ষ্মীর জন্যে সমস্ত ভিতরটা ওর প্রমত্ত হাহাকারে ফেটে পড়তে লাগল। মনে মনে ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগল, 'শোধ নোব, শোধ এর নোবই আমি।'

মুখ ফুটে ও বলে ফেলল সতীশের বুকে হাত রেখে, 'সতীশ, এই তোমার বুকে হাত রেখে বলছি, এর শোধ নোব, শোধ এর নোবই। তুমি কেঁদো না, তুমি ভয় পেয়ো না, আমি এর শোধ নিয়ে মরব। মৃত্যু দিয়েই আমি বদলা নোব এর।' বলে আবার গুম খেয়ে বসে রইল।

সতীশ ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। ইন্দ্র আর গণপতি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

সহসা ইন্দ্র বলে উঠল, 'গণপতি কেমন করে এসব অত্যাচার শেষ হবে

বলো দেখি? তুমি কি ভাবছ?'

'আমি এখনও কিছু ভেবে ঠিক করতে পারি নি ইন্দ্র। তবে অনেক কিছু কথাই ভাবছি।'

'আমিও ভাবছি গণপতি। গোপনে খুন করে ফেলব নায়েবকে?'

'পারবে?'

'চেষ্টা করতে হবে, দল গড়তে হবে। শুধু পেটের ধান্দাতেই দিন চলে যাচ্ছে। আর লোকগুলো কেমন যেন ভীতু হয়ে গিয়েছে। দেখলে তো সতীশ কেমন করে কাঁদছিল মেয়েমানুষের মতো।'

'তাই তো দেখলাম, সবাই কেমন যেন ভীতু বনে গেছে। কেন বলো দেখি, এত অত্যাচারেও ওদের গা গরম হয় না কেন?'

'আসলে ভরসা পায় না বুঝেছ? যে যার নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে আছে। কেউ কারও জন্যে তো ভাবছে না। আর ভাবলেই বা কি, জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ান, মহাজন, পুলিশ এই এতগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ করবে কেমন করে মানুষ! তাই ভয় পায়।'

'আমরা আশে পাশের গাঁয়ে যে ক'জন ছড়িয়ে আছি, একদিন বসে ভাবতে হবে, আলোচনা করতে হবে কি করা যায়।'

'কি করা যায়?' এই চিন্তাতে মথিত হতে লাগল ওদের হৃদয়। সুন্দরবনের শিশিরসিক্ত কচি ধানের উপর সূর্যের সোনালী রশ্মি ঝিলমিল করছে। নির্মেঘ আকাশের নীলে সোনার রঙ। গাছের উপর পাখ-পাখালির ডাকাডাকির বিরাম নেই। প্রকৃতি এত সুন্দর, আকাশ এত নীল, পাখিরা এত গান গায়; কিন্তু মানুষ মানুষের জীবনকে এমনভাবে কুৎসিত যন্ত্রণায় ভয়াবহ করে তোলে কেন?

॥ ১০

কিছুদিন পর মেদিনীপুর থেকে লোক এল গণপতির কাছে ওর বাড়ীর খবর নিয়ে। ওর মার নাকি কাহিল রোগ। আর ওর এক বোন কিছুদিন আগে কলেরায় মারা গিয়েছে। ওর শ্বশুর মহাদেব মণ্ডল একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন তাতে লিখেছেন যে মোহিনী এতদিনে ডাগর

মেয়ে হয়ে উঠেছে। এবার এসে গণপতি যেন তাকে নিয়ে যায়।

গণপতি সেই লোকের সঙ্গে মেদিনীপুর গেল, সঙ্গে ওর বোনকেও নিয়ে গেল।

সেখানে গিয়ে দেখল, মা মৃত্যু শয্যায়, অভাবে দারিদ্র্যে ছোটো ভাইদের কঙ্কালসার চেহারা। গণপতি মায়ের সেবা করতে লাগল। গ্রামের ডাক্তার ডেকে এনে দেখাল। মোহিনীকে নিয়ে এল ওর বাপের বাড়ী থেকে। মোহিনী আর সেই অবুঝ গেঁয়ো মেয়ে নেই। এতদিন কিশোরী দশা পার হয়ে ও যৌবনে পা দিয়েছে। ওর সারা শরীরে বিস্ময়কর মাধুর্য্য ও কমনীয়তা এসেছে। চোখের পাতায় এসেছে লজ্জা। মোহিনীও শাশুড়ীকে সেবা করতে লাগল। দিনরাত শাশুড়ীর বিছানার ধারে বসে রইল। সংসারের অন্যান্য কাজকর্মও সে নিঃশব্দে শান্তভাবে করত। কিন্তু গণপতির মা বাঁচল না।

শ্রাদ্ধশান্তি সেরে গণপতি ঠিক করল সবাইকে নিয়ে ও সুন্দরবন চলে যাবে। তার আগে বোন দুটোর বিয়ে দিয়ে যাবে। সুন্দরবনে পাত্র পাওয়া কঠিন। আর কুমারী মেয়ে নিয়ে সুন্দরবনে থাকাও যেন বিপদ-জনক। যে বোনটি ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে উপবাসে শুকিয়ে গিয়ে মেদিনীপুরে মায়ের কাছে ছিল, একদিন হঠাৎ তার হু হু করে জ্বর এল। দারুণ জ্বর। ডাক্তার এসে দুএকটা ইনজেকসন দিলেন। ওষুধও দিলেন। কিন্তু কোনো ফলই হলো না। শেষরাত্রে সে মারা গেল। গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল গণপতি। তার মা জীবনে কখনো দুবেলা নিশ্চিন্তে খাবার পায় নি। বোনটা এই যৌবন বয়েস পর্যন্ত রোগে ভুগে, অনাহারে, দারিদ্র্যে এমনি করে মারা গেল। সুন্দরবনের অরণ্যে গিয়ে এত পরিশ্রম করে এত কাণ্ড করেও এদের জন্যে সে কিছুই করতে পারল না। তিন-বোনের মধ্যে একটি বোন বাকী রইল।

গণপতি পাত্র সন্ধান করতে লাগল তার জন্যে। শ্বশুর মহাদেব মণ্ডলই খুঁজে পেতে একটি ছেলের সন্ধান আনল। দু এক বিঘে জমি জায়গা আছে তার। কিছু লেখাপড়াও শিখেছে। গণপতি তার সঙ্গেই বোনের বিয়ে দিলে। বিয়ের পাট চুকে গেল। সুন্দরবনে যাত্রা করল, সঙ্গে গেল মোহিনী আর দুটো ভাই। ওর দুভাই কাজ করে ব্যারাকপুরে।

দুভাই রইল দেশে, আর দুভাইকে নিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে ও সুন্দরবনে ফিরে চলল। হয়তো আর কোনো দিন দেশে ফেরা হবে না। তার জন্মভূমি ছেলে বেলার বন্ধু এই গ্রামকে ছেড়ে যেতে বড় যেন কষ্ট হল। মানুষটির চোখে জল এসে পড়ল।

১১

লক্ষ্মী হারিয়ে গেছে। কিন্তু গণপতির হৃদয়ে রেখে গেছে দগদগে ক্ষত। দিনে রাতে ঘুমে জাগরণে সব সময় লক্ষ্মী ওর মনে জেগে থাকে। আর মন 'যখন সম্পূর্ণ জেগে থাকে না তখনই লক্ষ্মীকে বড্ড বেশি করে মনে পড়ে। সমস্ত অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে গণপতির। মনে হয় সমস্ত পৃথিবী খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। কিংবা ঐ মহিম ঘোষকে নিয়ে এসে গাছের সঙ্গে বেঁধে ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে ওকে বলতে বাধ্য করে কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছে। সাধারণতঃ মন কিছুটা অচেতন থাকে ঠিক ঘুম ভাঙ্গার পর, আর ঘুম আসবার আগে। ঘুমের আগে আর পরে লক্ষ্মীকে মনে পড়বেই ওর। আর যখন ও একা থাকে। ওর সমস্ত অন্তরাত্মা লক্ষ্মী লক্ষ্মী করে হৃদয়-পিঞ্জরে মাথা কুটে কুটে মরে। ওর শরীরের রক্তস্রোতে লক্ষ্মীর স্মৃতি বাজতে থাকে। অসহ্য কষ্টে বেঁচে থাকাই ভীষণ বলে বোধ হয় ওর কাছে।

কিন্তু পনের বছরের বৌ মোহিনী আসার পর থেকে সেই ভীষণ কষ্ট থেকে যেন কিছুটা নিষ্কৃতি পেল গণপতি। মোহিনী সত্যিই যেন মোহিনী হয়ে উঠেছে। সেদিনের সেই গেঁয়ো মেয়েটি যৌবনে মধুমতী হয়ে উঠেছে যেন। কথায় আছে, 'নাক খাঁদা খাঁদা, চোখ ভাসা, সেই মেয়েটি দেখতে খাসা।' মোহিনীর নাক একটু চাপা। কিন্তু মুখের ছাঁদের সঙ্গে কি যে মানিয়েছে! টানা টানা লজ্জানত দুটি দীর্ঘ চোখ। দীর্ঘ দুটি ভুরু কান পর্যন্ত টানা কাশ ফুলের মতো। কপালে ওর কাঁচপোকা টিপ। ছোট্ট কপালটিকে ঘিরে প্রচুর চুল, অযত্নে কিছু বা রুক্ষ। নাকে একটি সোনার হরতন নাকছাবি। আদুরে আদুরে মিষ্টি গড়নের ওষ্ঠাধর। নিটোল সুন্দর চিবুক। হাঁসের মতন কোমল গলা। তিনটি স্নিগ্ধ রেখা টানা তাতে।

আর শরীর খানি দুর্বার আর বন্য ঢেউয়ে ঢেউয়ে উথালি পাথালি। বসন্তের নব মঞ্জরিত কচি পল্লবের মতো গায়ের রঙে ঢল ঢল হাসি হাসি কান্তি। ন বছর আগে যে মেয়েটিকে বিয়ে করেছিল গণপতি, এতদিনে সে এল ওর জীবনে, ওর ঘন আলিঙ্গনে। একেবারে মজে রইল, ডুবে রইল গণপতি মোহিনীকে নিয়ে।

কচি একেবারে ছেলে মানুষ মোহিনী বলে, 'তুমি দিনরাত আমার কাছে পড়ে থাক, তোমার ভাইরা কি ভাববে!'

গণপতি ওকে জড়িয়ে ধরে জবাব দেয়, 'কি আবার ভাববে? তুই আমার বৌ না? দিনরাত তোর কাছেই তো থাকা আমার নিয়ম।'

বেশির ভাগ সময় 'তুই' করেই কথা বলে গণপতি ওর বৌকে। নিশীথ রাতে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধা হয়ে থেকে ওরা দুজনে শোনে বাইরের হা হা করা আকাশ পর্যন্ত মাঠের উপরে শীত রাত্রির উত্তরে হাওয়ার গান। ধান চারার সন্ সন্ দুলে ওঠার শব্দ। রাত্রিচর পাখীর ডানা ঝাপটানোর ধ্বনি, শেয়ালের শীতার্ত কান্না, কুকুরের বীভৎস ডাক আর ক্বচিৎ বাঘের অস্পষ্ট ডাক। হয়তো রিজার্ভ ফরেষ্ট থেকে ভেসে আসে সে ডাক।

এই শূন্য মাঠের ঘর বলে, বন্য জন্তুর ভয়ও থাকে বলে এদিকের ঘরগুলি অনেকটা দুর্গের মতো তৈরি করা হয়। বাঁশ দিয়ে শক্ত দরজা তৈরি করা হয়। বেশ চওড়া করে মাটির এক চতুষ্কোণ বেষ্টনী করা হয়, তার মধ্যে থাকে আসল ঘর। তার মানে ঘরের ভিতরে ঘর। চওড়া মাটির দেওয়াল। উপরে খড়ের চাল। দুটো হয়ত ভিতরে ঢোকার দরজা। দুটোই বাঁশ দিয়ে তৈরী।

এমনি দুর্গের মতো ঘরের ভিতরে দুটি নরনারী। প্রবল দুরন্ত সমুদ্র ঢেউয়ের মতো উন্মাদনায় মত্ত হয়ে জেগে থাকে।

গণপতি বলে, 'মোহিনী, সুন্দরবন সত্যিই বুনো জায়গা আর এখানে বাঘ হচ্ছে জমিদার, জোতদার, নায়েব। ময়াল সাপ হচ্ছে মহাজন। হরিণ হচ্ছে সুন্দরবনের গরীব চাষীদের মেয়ে-বৌরা। আর গরীব চাষী পুরুষরা হচ্ছে শুয়োর মোষ এই সব। মোষ বেশি নাই।'

মোহিনী অবাক হয়ে বলে, 'তার মানে?'

গণপতি বলে, 'তার মানে হচ্ছে, বাঘ আর ময়াল যেমন হরিণ পেলেই

তাকে গিলতে চায়। তেমনি জমিদার, জোতদার, নায়েব আর মহাজনরা চাষীর মেয়ে বৌ পেলেই তাকে ভোগ করতে চায়।'

'তা চাষীরা কিছু বলে না?'

'চাষীদের হাত পা বাঁধা। দেনায় আর অভাবে, কষ্টে উপবাসে তাদের আর কোনো সাহস নাই, শক্তি নাই।'

মোহিনী গণপতির বুকে নিজেকে আরও গভীরভাবে সমর্পণ করে বলে, 'আমার তুমি আছ। আমার কোনো ভয় নাই।

মোহিনীর নরম, উদ্ধত, সুঢৌল স্তনের আঘাতে প্রমত্ত হয়ে উঠে গণপতি বলে, 'তবু আমার ভয় হয়, বাঘকে আর সাপকে কখনো বিশ্বাস নাই। তোমাকে দেখতে পেলে ওদের নোলায় জল ঝরবে।'

মোহিনী বলে, 'থাক থাক, ওসব কথা থাক।'

'না, থাকবে না মোহিনী। তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কি কাজ?'

'তোমাকে বর্শা ছোড়া শিখতে হবে। ছোরা চালানো শিখতে হবে। কিছুটা লাঠি খেলা শিখতে হবে। একটু আধটু মার-প্যাঁচ, কসরত শিখতে হবে। আমি তোমাকে শেখাব। এখন আমার কাজ নাই। আমি তোমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে নোব। যাতে দুচারজন লোক আক্রমণ করলেও লড়াই করে আত্মরক্ষা করতে পার।'

'বেশ তুমি আমাকে শিখিয়ে দিও। দেখো আমি ঠিক শিখতে পারব।'

গণপতি আবার বলে, 'দেখো মোহিনী, আর এই জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ান, মহাজন এদের কোনো কথা বিশ্বাস করবে নি, এদের ছায়া মাড়াবে নি, এদের ত্রিসীমানায় যাবে নি।'

'কি দরকার আছে আমার ওদের ত্রিসীমানায় যাওয়ার।'

'আর একটা কথা, যদি ঘর ছেড়ে কোথাও, কোনো কারণে যেতে হয় কোমরে ছোরা গুঁজে রাখবে।'

'কেন?'

'হঠাৎ কেউ যদি তোমাকে ধরতে আসে, অন্তত রুখবার একটা জিনিস থাকবে কাছে। হাত পা ছুঁড়ে শুধু মরতে হবে না।'

'তাই হবে।'

গণপতি হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। দাঁতে দাঁত চেপে জোরে জোরে নিশ্বাস নেয়।

লক্ষ্মীকে মনে পড়েছে ওর।

মোহিনী জিজ্ঞাসা করে, 'কি হলো তোমার, অমন করছ কেন?

গণপতি কথা না বলে মোহিনীর ফুলের পাপড়ির মতো কোমল মধুর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দেয়। মোহিনীর নবযৌবনতরঙ্গে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে নিমগ্ন হয়। চাষী মেয়ে তার উদ্ধত তরঙ্গসঙ্কুল যৌবন তার হৃদয়-রাজকে নিঃশেষে অঞ্জলি দিয়ে আবেশে উন্মাদনায় আচ্ছন্ন হয়।

বাইরে শীতরাত্রির ঝিঁঝিঁ-ডাকা হুহু বাতাসের শব্দ জাগে। আর এই নির্জন ঘরে গণপতি-মোহিনীর রাত উপচে ওঠে নিবিড় চুমোয়, গাঢ় আলিঙ্গনে।

এ অঞ্চলে গ্রামগুলি ঘন-সন্নিবিষ্ট নয়। বিচ্ছিন্ন এলোমেলো ছড়ানো ছিটোনো। এই এখানে একখানা ঘর চারিদিকে জমি, ঐ ওখানে দুখানা ঘর চারিদিকে জমি। সাধারণতঃ ঘরগুলি দুর্গের মতো। মোটা মোটা দেওয়ালের আবেষ্টনীর ভিতরে দেওয়াল তুলে ঘর। তাই বাংলার পল্লী অঞ্চলে যে ধরণের ঘনসন্নিবিষ্ট অনেকগুলি বাড়ী নিয়ে গ্রাম গড়ে ওঠে, এখানে তা নয়। আসলে দেশান্তরের মানুষ এসে জমিদার জোতদারের কাছে জঙ্গল বিলি নিয়ে ঘর বেঁধেছিল। জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষ করছে। সেই চাষের জমির মাঝখানে তার ঘর। অন্য চাষী আবার তার চাষের জমির মাঝখানে টঙ তুলেছে। তাই এলোমেলো বিচ্ছিন্ন দূরে দূরে অবস্থিত ঘর। কারও সঙ্গে কারো প্রত্যহের প্রতি মুহূর্তের যোগাযোগ তৈরী হয় না। দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকার জন্যে প্রত্যেকে নিজেদের খানিকটা একা আর অসহায়ও ভাবে। কিন্তু মানুষ সবকিছু সয়ে নিতে পারে। তাই এমনি বিচ্ছিন্নভাবে দূরে দূরে থেকে থেকে ওরাও অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিন সকালে উঠে মোহিনী ফেনভাত রান্না করে। সকলের খাওয়া হয়ে গেলে গণপতি নদীর ধারের জঙ্গলের ভিতরে একটা ফাঁকা মতো জায়গায় গিয়ে মোহিনীকে ছোরা চালানো শেখায়, যুযুৎসু শেখায়, বল্লম ছোড়া অভ্যাস করায়। বেলা বারটা পর্য্যন্ত এই সব শিখিয়ে বাড়ী

ফেরে। দুজনে মিলে রান্না করে। তার পর খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে দুজনে জমি তদারক করতে যায়। সন্ধেবেলা কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়ে গণপতি। পাড়ার লোকেরা এসে জমা হয়। মোহিনীও পড়তে জানে। মোহিনীর বাবা মহাদেব মণ্ডল যাত্রাদলের অধিকারী ছিলেন। মোটামুটি বাংলা লেখাপড়া জানতেন। মোহিনীকে বাংলা লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন মহাদেব। কোনোদিন মোহিনী পড়ে মহাভারত কোমল মধুর কণ্ঠের সম্মোহন ছড়িয়ে।

মোহিনী সুন্দরবনের এই নির্জনতাকে সমস্ত অনুভূতি দিয়ে উপভোগ করে। এতদিন মেদিনীপুরের সেই গ্রামে থাকতে নানান খেলাধুলো করে আর খেলুড়িদের সঙ্গে ভাব করে আড়ি করে ছেলেবেলা কেটেছিল, তার-পর কিছুদিন আগে থেকে কেমন যেন তার মন কেমন করত। গণপতিকে দেখতে ইচ্ছে করত। অতবড় গ্রামটাকে ওর নির্জন মনে হত। ভিতরে ভিতরে ভারি একা বোধ হোত নিজেকে। তারপর সুন্দরবনে আসবার সময় ও কেঁদেছিল। বুকের ভিতরে কিসের যেন মহাআতঙ্ক গুরু গুরু করে ডমরু-ধ্বনির মতো বেজেছিল। আর সুন্দরবনে এসে গণপতির কালো পাথরের মতো সুগঠিত শরীরের পেশীতে পেশীতে নিজেকে জড়িয়ে দিয়ে সহসা কি যে ব্যাপার ঘটল ওর মনে ওর দেহে যে, আজ সুন্দরবনকে ওর স্বর্গ বলে মনে হতে লাগল। এখানের নীলাকাশের জোল্লা, বিকেলে আকাশে ওড়া ধবধবে সাদা বকের সারি, চারিদিকের গাছগাছালির ডালে ডালে পাখির ডাক, আকাশ পর্যন্ত সবুজ ধানের ঢেউয়ের খেলা, চন্দনপিঁড়ি নদীর জোয়ারভাঁটা সব কিছুই ওর কাছে মধুর বলে মনে হয়। যেন হাততালি দিয়ে দিয়ে চারদিকের আকাশ বাতাস সবুজ মাটি ওকে ঘিরে ঘিরে নাচে কেবল নাচে। বনবাসিনী সীতার কথা মনে পড়ে মোহিনীর। রাবণের কথা মনে হতে ও-উপমাকে সে পাত্তা দেয় না। গণপতির বিশাল বুকে নিজেকে গুঁজে দিয়ে পরম স্বস্তি লাভ করে।

তথাকথিত সভ্য সমাজের ধনী জীবনের প্রাচুর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে অনিবার্য অভিশাপ থাকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আড়ম্বর যেখানে সেখানেই অতৃপ্তির অভিশাপ থাকতে বাধ্য। তারা প্রকৃত ক্ষুধা কাকে বলে জানে না, অথচ অবিরত ভালোমন্দ খায় আর রোগে ভোগে। তারা শ্রম

কাকে বলে জানে না, তাই বিশ্রামের আনন্দ কী তা কখনো উপলব্ধি করতে পারে না, অথচ অতিরিক্ত বিশ্রামে মেদস্ফীতিকে বাড়িয়ে তোলে। তারা যৌনতৃষ্ণা কাকে বলে জানে না, কেননা অবিরত যৌনচর্চা করে কিন্তু যৌন জীবনের প্রকৃত আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকে।

আর এই সুন্দরবনের পরিশ্রমী চাষীরা কঠিন পরিশ্রমে বিপুল ক্ষুধা সঞ্চয় ক'রে আহারের প্রকৃত আনন্দ লাভ করে, খাদ্যকে ওদের ক্ষুধাতুর জঠর নিঃশেষে পরিপাক ক'রে দেহের শক্তিকে রূপান্তরিত করে।

বিপুল শ্রমের ফলে বিশ্রাম ওদের কাছে অমৃতের মতো। নিদ্রা তাই ওদের জীবনে নিয়ে আসে ছন্দময় শ্বাসপ্রশ্বাসের গভীর প্রশান্তি। যৌন-শক্তির বীভৎস চর্চা আর অপচয় নেই ব'লে প্রকৃত যৌনক্ষুধা গাঢ় মিলনের নিটোল অনুভূতি সঞ্চয় করে ওদের দেহে মনে।

আর নাগরিক জীবনের বীভৎস কোলাহল, সূর্যহীন ছায়ার প্রলেপ আর কৃত্রিমতা নেই বলে অন্তহীন আকাশের নীচে শিশিরভেজা ঘাস ও মাটিতে ওদের দেহমন প্রকৃতির আনন্দের সঙ্গে ছন্দময় ঐকতানে ঝঙ্কৃত হয়।

গণপতি-মোহিনীর প্রণয়লীলা, নর্মলীলা তাই বলীয়ান্ ও প্রকৃত ক্ষুধাতুর দুটি দেহমনের বলিষ্ঠ লীলায় গভীর তৃপ্তি ও আনন্দে অপরূপ হয়ে ওঠে। নির্জন প্রান্তরের হাহাকারকে ওরা থোড়াই পরোয়া করে। চির পুরুষ-প্রকৃতির মিলন নতুনতর প্রেরণাময় আস্বাদ আনে ওদের জীবনে।

॥ ১২ ॥

নতুন ফসল তুলবার সময় হয়ে এল। মাঠে মাঠে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস শব্দে কাস্তে চলতে লাগল। গণপতি আর তার বন্ধুরা কিছু ক্ষেতমজুর যোগাড় করে দারুণ পরিশ্রম করে ধান কাটার কাজ শেষ করল। মালিকদের খামারেই ধান তোলা হলো। মালিকদের খামারেই ধান ঝাড়া হলো।

তারপর গণ্ডগোল দেখা দিল। হরেন সামন্ত, কার্তিক সামন্ত, ব্রজ সামন্ত, কার্তিক পাত্র, হরিপদ মজুমদার ধান ও খড়ের আধাআধি ভাগ প্রথমে চুলচেরা করে মিটিয়ে নিল। আধাআধি ভাগ হওয়াই রীতি ছিল।

কিন্তু এই আধাভাগ পাবার জন্যে ভাগচাষী (বর্গাদার বা আধিয়ার) কে বীজধান, সার এবং চাষের জন্য পরিশ্রম ও খরচ দিতে হোত, ধান কেটে ধান ঝাড়তে হোত।

কিন্তু ধান ভাগাভাগি হবার পরই হরেন, কার্তিক, ব্রজ সামন্তরা প্রচলিত আবওয়াবগুলি দাবি করে বসল।

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'কি কি আবওয়াব দিতে হবে?'

হরিপদ বলল, 'সে তো সবাই জানে, তুমি জান না?'

'না আমি জানি না, আমি তো এবারে প্রথম ধান তুললাম।'

হরিপদ বলে গেল, 'সালা, মাওলা, রক্ষিতা, ছেলের জন্ম, ভাত-খাওয়ানি, বিবাহ, পুনর্বিবাহ, খামারছিলা, খামারঘেরা, দারোয়ানি, স্কুলের চাঁদা, ঈশ্বরবৃত্তি, কয়ালি, হিসাবানা, পার্বণী এই সব আদায় দিতেই হবে। এ হচ্ছে চিরকালের নিয়ম।'

গণপতি বলল, 'বিঘে প্রতি কত করে দিতে হবে?'

'বিঘেপ্রতি একমন ধান আর একটি করে টাকা। নগদ টাকা যদি না দিতে পার ধান দিয়ে দাও।'

গণপতি এবং তার সঙ্গীরা বলল, 'এত রকম দিতে হলে আমাদের ভাগে কী থাকবে?'

হরেন বলল, 'তাই বললে কি হয়? সবাই দিচ্ছে আর তুমি দেবে না? যা নিয়ম তা মেনে চলতে হবে বৈকি।'

অনেক টক্‌ঝক্ তর্কাতর্কির পরও বিঘে প্রতি তুমন করে ধান তাদের ছেড়ে দিতে হয়েছে মালিককে। তারপর হরেন আবার বলেছে, 'গণপতি আমার কাছে যে-টাকা ধার নিয়েছ, সে এই পাঁচবছরে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদে আসলে অনেক হয়েছে। এখন ধান ছাড়া তো তোমার আর কিছু নাই। তাহলে ধান দিয়েই দেনা শোধ কর।'

গণপতি বলল, 'সুদটুদ নিলে হবে না বাবু, আমি শুধু আসল টাকা দোব।'

হরেন মিষ্টি হেসে বলল, 'তাই বললে কি হয়। টাকা নিয়ে সুদ দেবে না, এতো বেআইনী কথা। দাও গণ, সব ঋণ শোধ করে দাও।'

হরেন আর হরেনের বন্ধুদের সাঁড়াশি প্যাঁচে পড়ে হরেনের কাছে

নেওয়া ঋণ চক্রবৃদ্ধিহারে-সুদসহ-আসল ধান দিয়ে খানিক শোধ করল গণপতি। নিজে সে দেড়শ বিঘে জমি চাষ করেছিল তাই অবশিষ্ট থাকল ভালোই। যদিও এত পরিশ্রমের ফসল গায়ের জোরে কেড়ে নিল বলে বিরক্তি এবং আফসোসের সীমা রইল না গণপতির। ও মনে মনে ভাবতে লাগল, আগামী মরসুমে আমি কিছুতেই বাজে আবওয়াব দোব না।

গণপতির মনে পড়ে যায় সেই চারজন মানুষকে যারা জমির লোভে সুন্দরবনে এসেছিল ওর সঙ্গে জঙ্গল হাসিল করতে। কিন্তু সুন্দরবনের মাটিতেই প্রাণ দিল তারা। রক্ত আমাশয়ে ভুগে, কলেরায় আক্রান্ত হয়ে, ম্যালেরিয়ায় জরাজীর্ণ হয়ে। সেই পরলোকগত মানুষগুলিকে মনে মনে স্মরণ করল, ক্ষমা চাইল গণপতি তাদের কাছে। চারটি যুবক মানুষ হরেন আর হরিপদদের টাকা বাড়াবার জন্যে সুন্দরবনে অকাল-মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। গণপতি বুঝতে পারল, আগামী বছরগুলিতে মালিকদের সঙ্গে তিক্ত সংঘাতে নামতে ও বাধ্য হবেই।

গণপতির কাছে খবর আসে চারদিকে ভাগচাষীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গিয়েছে। লাটদার আর চকদারেরা (লাটদাব জমিদার, জমিদারের অধীনস্থ চকদার মানে জোতদার) নিষ্ঠুরভাবে ভাগচাষীব ধানের ভাগ থেকে প্রায় কুড়ি রকমের বাজে আবওয়াব আদায় করে ছাড়ছে। বর্ষার সময় যে সব ভাগচাষী অভাবে পড়ে ধান ধার নিয়েছে, একমনের দেনা দেড়মন দিয়ে শোধ দিতে হচ্ছে। তার ফলে অনেক ছোটো ভাগচাষী জমিদার জোতদারকে ধান দিয়ে নিঃস্ব হাতে ঘরে ফিরে আসছে।

একদিন সকালবেলা দ্বারিকনগর থেকে সাগর জানা এল গণপতির কাছে। সাগর জানাও ভাগচাষী। সাগর জানা বলল, ‘গণপতি, আমি ঠিক করেছি এবারে আমি বাজে আবওয়াব দোব না।

গণপতি উৎসাহিত হয়ে বলল, ‘না দেওয়াই তো উচিত। আমি এবারে দিলাম, নতুন এসেছি বলে ঠিক জোর করতে পারলাম না। আসছে বছর আমি কিছুতেই বাজে আবওয়াব দোব না।’

সাগর বলল, ‘আমিও তাই জানিয়ে দিয়েছি। কোনোরকম বাজে আবওয়াব আমি দোব না।’

গণপতির কাছে প্রেরণা পেয়ে সাগর গণপতিকে বলল, ‘চলো না তুমি

আমার সঙ্গে, দেখবে কি হয়।'

অতএব গণপতি সাগরের সঙ্গে ওর গ্রামে গেল। ধান ভাগের সময় ও দাঁড়িয়ে রইল সাগরের পাশে। সাগরের সাহায্যকারী চাষীরাও এসেছে। যথারীতি আধাআধি করে ধান প্রথমে ভাগ হলো। তারপর নায়েব চেয়ে বসল কুড়ি রকমের আবওয়াব।

সাগর পরিষ্কার বলে দিল, 'আমি আর কোনোরকম আদায় দোব না।'

নায়েব হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'ধান রেখে দিয়ে বাড়ী যাও তাহলে।'

সাগর বলল, 'ধান তো নিয়ে যাবই, হিম্মত থাকে, আমার কাছে থেকে ধান কেড়ে লিয়ে রেখে দিন।'

হিম্মত ছিল না নায়েবের। কেননা মাত্র একজন পাইক আর একজন হিন্দুস্থানী দারোয়ান ছিল তার। অন্যদিকে সাগরকে সমর্থন করবার জন্যে একগাদা লোক গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অত্যন্ত বিপজ্জনক ওদের এই নিরীহ নীরবতা।

'ভবিষ্যৎ ভালো হবে না রে', বলে নায়েব ক্রুদ্ধ থমথমে মুখে সাগরের দিকে তাকিয়ে কাছারির ভিতরে ঢুকে গেল।

ধান বস্তায় ভরে নিয়ে সাগর লোকজন নিয়ে বাড়ী ফিরে গেল।

এই ঘটনাটি বহু ভাগচাষীর প্রাণে চঞ্চলতা নিয়ে এল। কিন্তু সাহস করে কেউ 'বাজে আবওয়াব দোব না' একথা বলতে পারল না। কেবল নিঃস্ব হাতে ঘরে ফিরে কপাল চাপড়াতে লাগল। আগামী বছরের জন্যে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ওদের জীবনে নেমে এল।

চাপা উত্তাপ, ক্রুদ্ধ উক্তি, ঝলসে উঠতে লাগল এখানে সেখানে। ওদের কলুর বলদের মতো মনে হতে লাগল গণপতির।

॥ ১৩ ॥

আজ ছ বছর হল গণপতি সুন্দরবনে এসেছে। এ ছ' বছরে কি দ্রুত পরিবর্তন ঘটে গেল সুন্দরবনের মাটিতে। অনেক বন ধ্বংস করে হলো জমি। নদী খালগুলিকে অজস্র বাঁধ দিয়ে দিয়ে বাঁধা হলো। গণপতি শুনেছে, সিকি লাটের রাজস্ব ইংরেজ সরকার লাটদারদের ছেড়ে দেয়

লাটের বাঁধ পুল মেরামত, পানীয় জল, গোচারণ ভূমি ইত্যাদির ব্যবস্থা করবার জন্যে।

গণপতি দেখেছে সুন্দরবনের রক্ষাকারী ঐ বাঁধগুলো মজবুত নয়। ভাগচাষীদের কাছ থেকে বেগার আদায় করে বিনাপয়সায় বাঁধের মেরামতি কাজ সারে লাটদার জমিদারেরা। গ্রামে গ্রামে যে সাধারণ সম্পত্তি বিশাল গোচারণ ভূমি ছিল, সেগুলিও ধীরে ধীরে জমিদাররা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে ফেলছে। তার ফলে যখন মাঠে ধান থাকে গোরু ছাগল চরাবার জায়গা নেই। সরকারী খালগুলি এতদিন পড়েছিল। তাতে বেকার ক্ষেতমজুর মেয়ে-পুরুষরা মাছ ধরে খেত, বিক্রি করত। চাষীদের ঘরে গোরুও ছিল, কেননা ঘাস দুষ্প্রাপ্য ছিল না। কিন্তু জমিদাররা ক্রমশঃ খালগুলি আত্মসাৎ করে মাছ চাষ করতে লাগল। খাজনা বাকী পড়লে গোরুগুলি কেড়ে নিয়ে যেতে লাগল।

কর্মহীন দরিদ্র ক্ষেত মজুররা বছরে সাড়ে তিনমাস কাজ পায়, ধান পোতার সময় আর ধান কাটার সময়। বাদবাকী সময়টা তারা পেটের ধান্দায় পাগলের মতো ঘোরে। আগে যা হোক সরকারী খালের মাছ ধরে বিক্রি করে খেয়ে কোনো রকমে কিছুদিন চলত, কিন্তু এখন সে সুযোগ থেকেও ওরা বঞ্চিত হয়েছে। খাল গেছে জমিদারের দখলে। সেখানে জমিদারবাবু মাছের চাষ করেন। সেই খালগুলিতে কখনো কেউ লুকিয়ে চুরিয়ে জাল ফেললে জমিদারের নায়েব আর পেয়াদারা তাকে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখে, মারধোর করে। অত্যাচার করে।

পানীয় জলের ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব ছিল লাটদারদের। এক এক প্লটে হাজার হাজার বিঘের লাটদাররা ইংরেজ সরকারের কাছে প্রথমে চল্লিশ বছরের জন্যে তারপর ত্রিশ বছরের জন্যে এমনি করে যে জমি লীজ পেয়েছিল তখনই শর্ত ছিল পানীয় জলেরও ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থা তারা অবশ্য করেছে। কিন্তু সেও তাদের মর্জি মতো। দু তিন মাইল দূরে দূরে এক এক প্লটে এক একটা পানীয় জলের রিজার্ভ পুকুর। প্রতিদিন তিন মাইল তিন মাইল ছ মাইল হেঁটে কাঁকে কলসী নিয়ে হাতে বালতি নিয়ে মেয়েরা জল নিয়ে আসে রিজার্ভ পুকুর থেকে। সে জল চোখের জলের সামিল।

একদিন একটা ঘটনা ঘটে গেল। রাজনগরের চকদার অনন্ত শাসমলের এলাকায় একটা সরকারী খালে একজন চাষী এক খেপলা জাল ফেলেছিল। দেখতে পেয়ে অনন্তের দারোয়ান তাকে কান ধরে টেনে নিয়ে গেল অনন্তের কাছারিতে। অনন্তের হুকুমে তাকে খুঁটিতে বেঁধে আচ্ছা করে পেটা হল। তারপর তাকে দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে সেই সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত দুপুর রৌদ্রে কাছারির উঠোনে ফেলে রাখা হল। আশপাশের গ্রামের লোকেরা এসে দলে দলে দেখে গেল। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করতে পারল না। অনন্ত চীৎকার করে বলতে লাগল, 'দেখে শিখে রাখ ব্যাটারা। জমিদারের খালে বিলে চুরি করে মাছ ধরতে গেলে কেমন করে শাস্তি দেওয়া হবে!'

গণপতি স্থির হয়ে দাড়িয়ে থাকা মানুষগুলির চোখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।' অঙ্গারের জ্বলুনি ফুটে উঠেছে কিনা, ক্রোধ ঘৃণা আর উত্তেজনা মুখগুলিতে ফুটেছে কিনা। বেদনা আর হতাশায় কালো হয়ে যাচ্ছে মুখগুলি, খোঁয়াড়ে বন্দী জানোয়ারের মতো করুণ আর অসহায় বোধ হচ্ছে এদের। এদের রাগ হয় না কেন? খেপে কেন ওঠে না এরা! এত সহিষ্ণুতা কেন এদের? রাগ বলে কি এদের শরীরে কিছু নেই?

যে চাষীকে বেঁধে রেখে দিয়েছে, তার কাছে বসে কাঁদছে তার বৌ। হাত জোড় করে বলছে, 'বাবু এবার ছেড়ে দেন, আর কোনোদিন এমন কাজ হবে নি।'

বাবু বলছে, 'পয়সা খরচ করে মাছ ছেড়েছি, চোরকে খাওয়াবার জন্যে? ছেড়ে তো দোবই। একটু মজা দেখুক। একটু শিক্ষা হোক হারামজাদার।'

জঙ্গল হাসিল করলে জমি দেওয়া হবে এই আশ্বাস দিয়ে মেদিনীপুর সাঁওতালপরগণা থেকে নিঃস্ব চাষীদের সুন্দর বনে নিয়ে এসেছিল লাটদার-চকদাররা। অকথ্য কষ্ট সহ্য করে, আত্মীয় বন্ধুর জীবন বলি দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জঙ্গলও তারা পরিষ্কার করে আবাদযোগ্য জমি তৈরি করেছে, কিন্তু প্রতিশ্রুত জমি তারা অধিকাংশই পায়নি। কাউকে কাউকে লাটদাররা আমলনামা দিয়ে জমি সামান্য কিছু দিয়েছে। যা দেবে বলেছিল তা দেয় নি। আমলনামা হচ্ছে জমিদারের স্বাক্ষর ও

সীলমোহরযুক্ত দলিল। এই আমলনামাই সুন্দরবনে গ্রাহ্য হয়, দলিল সরকারী অফিসে রেজিস্ট্রি না করলেও চলে। গণপতি কোনো আমলনামাও পায় নি। জমিদার জোতদাররা আজ নয়, কাল নয় করে কেবলই তাকে ল্যাজে খেলাচ্ছে।

কি করা যায় পরামর্শ করবার জন্যে গণপতি একদিন গেল বুধাখালিতে সাধুচরণ মাইতির, বিশ্বনাথ মাইতির কাছে।

ওরা বলল, 'করবার কিছু নেই। ধৈর্য্য ধরে শুধু চেয়ে যেতে হবে, তাতে যা হয় হবে।'

সাধুচরণ, বিশ্বনাথ সেদিন কাছারিতে গেল একজন চাষী ও তার ছেলেকে নিয়ে। সঙ্গে গণপতিও গেল। কাছারির নায়েব অবনী বাঁড়ুয্যে কাছারির বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে বসেছিল।

সাধুচরণ বলল, 'নায়েববাবু, সুধীর ওর ছেলেকে নিয়ে এসেছে, একটা আরজি আছে।'

নায়েব গম্ভীরভাবে বলল, 'আরজি কিসের?'

সাধু বলল, 'ওর ছেলেটা এবার ভালোভাবে পাশ করে ফাইভে উঠেছে। তা নতুন বইপত্র কিনতে হবে, নতুন ক্লাসে মাইনে দিতে হবে। এখানে তো স্কুল নাই, কাকদ্বীপে পাঠাতে হবে। তাই সুধীর বলছিল, ওর দেনার দরুন ধানটা এবার যদি না নেন তাহলে বড্ড ভালো হয়।'

অবনী বাঁড়ুয্যের ভুরু বেঁকে উঠল, 'হ্যাঁ বলিস কিরে সুধীর, তোর ছেলে পাশ করে ফাইভে উঠেছে। এযে দেখছি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়েছে রে। তা কি রকম শিখেছে দেখি।' বলে ছেলেটিকে ডাকল, 'এদিকে আয় দেখি ছোঁড়া।'

ছেলেটি ভীত কম্পিত হয়ে জমিদারের দোর্দণ্ড-প্রতাপ নায়েবের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নায়েব বলল, 'এই বল দেখি 'ষাঁড়া' বানান কি?'

স্তম্ভিত হয়ে গেল মানুষগুলি। সাধু, বিশ্বনাথ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সুধীর লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। আর গণপতির রক্ত উঠল জ্বলে ছলাৎ করে মাথায় রক্ত উঠে গেল। হঠাৎ বলে বসল, 'নায়েববাবু, ও চাষার ছেলে 'ষাঁড়া' বানান ও জানবে কেমন করে, আপনার ছেলেমেয়েদের ভালো করে শেখাবেন।'

অবনী গর্জে উঠল, 'তুই কে রে হারামজাদা শুয়োর। যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা। দারোয়ান, নিয়ে আয়তো চাবুকটা।'

গণপতি বলল, 'তাতে বিশেষ সুবিধে হবে নি বাবু। আমরা পাঁচজন এখানে আছি। আর তোমার তো মোটে দুটো দারোয়ান আর দুটো পাইক। আমরা চলে যাচ্ছি।'

নায়েব ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কি করবে যেন ঠিক ভেবে উঠতে পারছে না। সাধু, বিশ্বনাথ, গণপতি, সুধীর আর তার ছেলে কাছারির সীমানা পেরিয়ে বাইরে চলে এল।

গণপতি বলে উঠল, 'সুধীর, তোমরা সহ্য করে করে এদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছ। তোমরা মার খেয়ে খেয়ে ওদের চাবুকের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই আজকে যা খুশি তাই করে, যা খুশি তাই বলে।'

সুধীর বলল, 'কি করব। হাত পা যে বাঁধা।'

'বাঁধা তা কি হয়েছে। তাই বলে শুধুই সহ্য করে যাব, রুখব না? জান দোব তবু মান দোব না—এই যদি ভাবতে পারি তবেই আমরা বাঁচব নাহলে দুদিন পরে গোরুর গাড়ীতে জুতবে আমাদের। এই তোমাদের বলে দিছি আমি।'

আবার ভীষণ অশান্তি আর অপমান জ্বলে উঠল গণপতির মনে। আবার বড় ভীষণভাবে মনে পড়ল লক্ষ্মীর কথা। লক্ষ্মীদের অপমানের শোধ নিতে হবে। আর এমনিভাবে জমি চষা আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকা চলে না। এবার বেরিয়ে পড়া দরকার। মানুষকে জনে জনে ডেকে ডেকে বোঝাতে হবে। জোট বাঁধতে বলতে হবে। মানুষই শক্তি। গণপতির সমস্ত অন্তর সহসা অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠল, যন্ত্রণায় মুচড়ে মুচড়ে উঠতে লাগল।

॥ ১৪ ॥

আবার বর্ষা এল। আবার মাঠে মাঠে লাঙ্গল নামল। তলা রোয়া হতে লাগল জলে কাদায় মাখামাখি মাঠে মাঠে। গণপতির সত্তর বিঘে জমির চাষ। অনেক মজুর লাগাতে হয়েছে ওকে। মজুরদের সঙ্গে

সারাদিন ধরে ও নিজেও মাঠে কাজ করে। চিরদিনের মতো আকাশ ঘনমেঘে কালো হয়ে থাকে। ঝর্ ঝর্ ঝির্ ঝির্ করে কেবলই বৃষ্টি ঝরে। জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে কাজ করে মানুষগুলি।

গণপতি মাঠে কাজ করে আর মোহিনীকে মজুরদের জন্যে রান্না করতে হয়। মোহিনী অতগুলি লোকের ভাত রাঁধে, তরকারি রাঁধে। পুরুষটি মাঠে খাটে, মেয়েটি ঘরে খাটে। উদয়-অস্ত স্বামীস্ত্রীর পরিশ্রমের বিরাম থাকে না। মোহিনী এখন প্রতিদিন ভোরবেলায় ওঠে। দুটো মস্ত মস্ত উনুনে আগুন দেয়। পঞ্চাশ ষাট জন লোকের জন্যে একমন চালের ভাত রান্না করতে হয় ওকে। আর আলু কুমড়ো আর বর্ষার ডাঁটা, মোচাচিংড়ি ভেটকি যা হোক মাছ দিয়ে একটা মোটা তরকারি রাঁধতে হয়। সুন্দরবনের খাল বিলে তখন অনেক মাছ পাওয়া যেত, সেইসব খালবিল তখনও সব জমিদারের কব্জায় যায় নি। সকাল সাতটা আটটার মধ্যেই ভাত তরকারি নামিয়ে ফেলতে হয়। জনেরা খেয়ে নিয়ে আবার মাঠে নেমে পড়ে। আবার তারা খেতে আসে সেই বেলা তিনটে চারটের সময়। তখনও ভাত তরকারি রেঁধে রাখতে হয় মোহিনীকে। সবদিন ঠিক সময়ে সে রেঁধে উঠতে পারে না।

একদিন বিকেলে গণপতি মাঠ থেকে ঘরে এসে দেখে তখনও রান্না শেষ হয়নি। মোহিনী হিমসিম খাচ্ছে। দুরন্ত ক্ষিধেয় পেট জ্বলছিল। সে বুঝতে পারছিল, সেই সকাল থেকে সারাদিন মাঠে খেটে মজুরদেরও পেট ক্ষিদেয় চোঁ চোঁ করছে। এখুনি তারা চান করে খেতে আসবে। এদিকে রান্না এখনও অনেক বাকী। চীৎকার করে উঠল গণপতি, 'কিরে হারামজাদী, এতক্ষণ বোধ হয় গল্প মারছিলি? পঞ্চাশ ষাটটা লোক যে সারাদিন খেটে খেটে খিদেয় কাতর হয়ে খেতে আসবে সেদিকে খেয়াল আছে?'

মোহিনী বলল, 'কি করব বলো, মাঝখানে উনুন নিভে গেল। আর এত লোকের রান্না একা যেন করে উঠতে পারি না।'

'তবে কি পারিস, দিনরাত কেবল সোহাগ গিলতে পারিস খালি। আর মনে থাকে না, অতগুলো লোক রোদে জলে কাদায় মাঠে খাটছে, পেটের জন্যেই তারা খাটতে এসেছে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর তাদের পেটে আগুন জ্বলছে।'

মোহিনী বলে উঠল, 'তা কি করব বলো?'

'কি করব মানে?' বলে একটা থাপ্পড় কাষল মোহিনীকে। মোহিনী 'উঃ মা গো' বলে ফুঁপিয়ে উঠল। কিন্তু গণপতির তখন রোখ চেপে গেছে। একটা লাঠি সংগ্রহ করে মোহিনীকে সে পিটতে শুরু করল। মোহিনী বলতে লাগল, 'আর মেবো না গো, আর মেরো না। আর কোনো দিন দেরি হবে নি।'

কিন্তু গণপতি কিছুতেই নিরস্ত হলো না।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মোহিনী। হাতের পাতা দিয়ে মার ঠেকাতে চেষ্টা কবল। ডানহাতেব তালু কেটে গিয়ে রক্ত ফুটে উঠল। বাঁ হাতের আঙ্গুলেব গাঁটে ভীষণ ভাবে আঘাত লাগল। আর্ত চীৎকাব করে বসে পড়ল মোহিনী। তখন হুঁশ ফিরে এল গণপতির। রোরুদ্যমান মোহিনীর দিকে খানিক ক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'কাঁদা কাটা পরে কবিস বাপু, লোকগুলো এখুনি খেতে আসবে। রাধাবাড়া তাড়াতাড়ি শেষ কর।' বলে লাঠি হাতেই বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখল আকাশে বন কালো মেঘ জমেছে। হু হু করে হাওয়া উঠেছে। গাছ গাছালিব শাখা প্রশাখা দুলে দুলে উঠছে। হঠাৎ খানিকদূরে দৃষ্টি পড়াতে দেখল দেবেন জানা ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর জন কয়েক মজুব মাটি কোপাচ্ছে। ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল গণপতি। দেবেন জানা গণপতিদেব জমিব এলাকার জল কেটে নিজের এলাকায় ঢোকাবার চেষ্টা করছে। দেবেন জানা জোতদার। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখল গণপতি দেবেন জানার অদূরে লাঠি হাতে জন দুয়েক দাবোয়ানও দাঁড়িয়ে আছে।

বৌকে মেরে এমনিতেই গণপতিব মেজাজ খারাপ হয়েছিল। ভিতরে ভিতরে অশান্তিতে মবছিল সে। পেটেব ক্ষিদে হু হু করছিল। আর ওর উঁচু এলাকার জল দেবেন জানা কেটে নেবার চেষ্টা করছে দেখে হঠাৎ যেন আগুন জ্বলে উঠল ওর মাথায়।

চীৎকার করে উঠল গণপতি, 'কোন শুয়োরের বাচ্চা জল কাটছে রে, নিজেরা জল বেঁধে না রেখে অন্যের জমানো জল চুরি করতে এসেছে কোন খানকির ছাওয়াল রে।' বলে লাঠি হাতে নিয়ে ছুটল গণপতি।

কাছে গিয়ে মজুরদের উপর দুচার ঘা লাঠি চালিয়ে বলল, 'ওঠ, উঠে পড় শালারা।'

মজুররা বিনাবাক্য ব্যয়ে কোদাল নিয়ে উঠে গেল।

দেবেনের ইঙ্গিতে দারোয়ান দুটো আগিয়ে এল গণপতির কাছে। কিন্তু গণপতি বিখ্যাত লাঠিয়াল। দুই হিন্দুস্থানী দারোয়ান বেশী ক্ষণ লড়তে পারল না গণপতির সঙ্গে। একজন রণে ভঙ্গ দিল। একজনের হাত থেকে লাঠি খসে পড়ল।

দেবেন ওদিকে গুটি গুটি ওর কাছারির দিকে হাঁটতে লেগেছে। গণপতি দারোয়ানদের তাড়া করে নিয়ে যেতে লাগল। ব্যাপার দেখে দেবেনও ছুটতে লাগল। দেবেন, দারোয়ান, মজুর সবাইকে ওদের কাছারির সীমানা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল গণপতি। তখন তাকে ভীষণ হিংস্র দেখাচ্ছিল। জলে ভিজে মাথার বড় বড় চুল মুখে এসে লেপটে পড়েছে। লাঠি খেলতে গিয়ে দাঁতে বোধ হয় আঘাত লেগেছিল। কষে খানিকটা রক্ত লেগে আছে জলে কাদায় সারা শরীর মাখামাখি আর চোখ দুটো জ্বলছে ধ্বক ধ্বক করে।

চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল গণপতি, 'ফের যদি কোনো দিন আমাদের এলাকার জল চুরি করতে যাস, তবে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না বলে দিছি। সব কটার লাশ মাটিতে ফেলে দোব। আমাদের চাষ উঁচুতে, জল কাটলে চলবে নি।' বলে ফিরতে লাগল গণপতি।

॥ ১৫ ॥

দিন কুড়ি পরে সাগর এসে হাজির হলো গণপতির কাছে। পাগলের মতো দশা হয়েছে সাগরের। গণপতির কাছে এসে হু হু করে কেঁদে ফেলল সে। বলল, 'গণপতি আমার সর্বনাশ হয়েছে।'

'কি হয়েছে, সাগর, খুলে বলো কি হয়েছে?'

সাগর সব কথা জানাল।

গতবারে সে জমিদারকে বাজে আদায় দেয় নি। এবারে জমিদার তাই প্রতিশোধ নিয়েছে। জমিদারের এক ভেড়ি বাঁধের পাশেই ছিল

ওর ত্রিশ বিঘে জমি। সেই ত্রিশ বিঘে সে আগে চাষ করেছিল। ধান রোয়ানো হয়ে গিয়েছিল। লক্ লক্ করছিল চারাগুলি। আজ সকালে সে মাঠে গিয়ে দেখে ভেড়ি বাঁধ কেটে তার সেই ত্রিশ বিঘে জমিতে নোনাজল ঢুকিয়ে দিয়েছে জমিদারের লোক। রাতারাতি ঘেরি দিয়ে তার ত্রিশ বিঘেকে মেছো ভেড়ির ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়েছে জমিদার।

সে কাছারিতে গিয়ে চেঁচামিচি করছিল, গালমন্দ করছিল। নায়েবের হুকুমে দারোয়ানরা এসে তাকে মারধোর করে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে কাছারি থেকে বার করে দিয়েছে।

সাগর হাহাকার করতে লাগল, 'এখন আমি কি করব বলো, বলো গণপতি এখন আমার কি উপায় হবে? আসছে বছরটা আমাকে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। আমি আমার সংসারকে বাঁচাব কেমন করে?'

গণপতি কোনো উত্তর না দিয়ে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। মাঠের উপর দিয়ে হাহাকার করে বাতাস বয়ে যেতে লাগল। সাগর বিলাপ করতে লাগল পাগলের মতো। আর গণপতির মনের ভিতরে জেগে উঠতে লাগল অনেক স্মৃতি, অনেক অপমানের জ্বালা। মনে পড়ল লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী কোথায় আছে? কোথায় নিয়ে গেছে তাকে? তাকে কি মেরে ফেলেছে? কলকাতার মেয়ে ব্যাপারীদের কাছে বিক্রি করেছে কি? বেশ্যাবাড়ীতে বেশ্যার জীবন কাটাচ্ছে নাকি সে? লজ্জায় কি আসতে পারছে না গণপতির কাছে? নাকি গণপতির কথা ভেবে সে কাঁদে, আর মহিম ঘোষের অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হয় সে?

হঠাৎ সাগরের ডাকে সচেতন হয়ে সাড়া দিল গণপতি, 'হ্যাঁ সব শুনলাম সাগর। কিন্তু এর প্রতিকার করতে হলে জোট বাঁধতে হবে। একা একা তুমি আমি কেউ কিছু করতে পারব নি। বরং একা থাকলে এমনি করেই আমাদের মার খেতে হবে।'

'তাহলে কি করতে বলো?'

'চাষটা হয়ে যাক তারপর সবাই মিলে বসে ঠিক করব কি করব আমরা, কেমন করে আমাদের ইজ্জতটা বাঁচবে। আর আসছে বছরে আমার কাছে ধান নিয়ো তুমি। তোমাকে তোমার সংসার চালানোর জন্যে ভাবতে হবে নি। আমি তোমাকে ধান দোব।'

সাগর গণপতির হাত জড়িয়ে ধরল। বিপুল কৃতজ্ঞতায় অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না সাগর। তারপর বলল, 'তুমি আমার বান্ধব, আমার আত্মীয়, আমার দাদার মতো। তুমি যদি লড়াই কর, আমি তোমাকে কখনও ছেড়ে যাব না।'

॥ ১৬ ॥

শ্রাবণ মাসের শেষাশেষি চাষের কাজ শেষ হয়ে গেল। বছরে দুবার পরিশ্রম করতে হয়। ধান লাগাবার সময় আর ধান তোলার সময়। বাদবাকী সময়ে মাঠে আর বিশেষ কাজ থাকে না। খালে নদীতে মাছধরা, বনের শুকনো ডালপালা ভেঙ্গে জ্বালানি যোগাড় করা এই সব কাজ থাকে। চাষ-আবাদ শেষ হলে গণপতি আশেপাশের গ্রামে গ্রামে যেত পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে। প্রতিদিনের সুখদুঃখের খবর আদানপ্রদান করত। দেশের হালচাল নিয়ে আলাপ আলোচনা করত। জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তাদের অত্যাচার, অবিচার, কুকীর্তির নানান কথা শুনত। কোথায় কোন চাষীর মেয়েকে নষ্ট করেছে কোন জোতদার, কোন চাষীর জমি নোনা জলে ডুবিয়ে দিয়েছে, কাকে ধরে নিয়ে গিয়ে খুঁটিতে বেঁধে চাবুক দিয়ে মেরেছে এমনি অজস্র খবর সংগ্রহ করত গণপতি।

একদিন বিকেলবেলা হরিপুরে একজন পরিচিত চাষীর বাড়ীতে বেড়াতে গেল গণপতি। সে বাড়ীর দাওয়ায় বসে গল্প করতে করতে সান্ধে হলো। তখন গণপতি দেখল বাড়ীর সতের আঠারো বছরের যুবতী বৌটি হাতে একটি দুধের ঘটি নিয়ে আসন্ন সন্ধ্যায় মাঠের পথ ধরে কোথায় চলে যেতে লাগল। শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করল গণপতি, 'মেয়েটি কে গো? গেল কোথা?'

শাশুড়ী বলল, 'আমার বৌমা।'

'গেল কই?'

'হাজরাদের কাছারিতে দুধ দিতে গেল।'

'মহিম ঘোষের কাছে।'

'হ্যাঁ।'

আঁতকে উঠল গণপতি, 'কেনে? এই সন্ধ্যেবেলায় একা গেল কেনে?'

শাশুড়ী কেঁদে উঠল, বলল, 'আমাদের ঘরে এক ছটাক চাল নি। উপোসে মরতে হবে।'

'তাতে কি হয়েছে?'

'কাছারিতে ধান ধার চেয়েছিলাম, তা নায়েববাবু বলেছে তোমাদের বৌকে সন্ধেবেলায় এক ঘটি দুধ নিয়ে আসতে ব'লো।'

'তাই কচি বৌটা সেই রাক্ষসটার কাছে গেল দুধ দিতে?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল শাশুড়ী, 'হ্যাঁ।'

'ও আজকে ফিরে আসবে?'

'না, আজকে কাছারিতে থাকবে।'

'তোমার ছেলে জানে?'

'আমার ছেলেকেই তো হুকুম করেছে নায়েববাবু।'

কুৎসিত যন্ত্রণায় বুকের ভিতরে ভয়ানক অনুভূতি সৃষ্টি হ'লো গণপতির। আবার সেই পুরনো স্মৃতি আবার সেই ক্রোধ এবং হাহাকার ওর রক্তের মধ্যে উথলে উথলে উঠতে লাগল। সেই আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে অনেকক্ষণ ও চুপ করে বসে রইল। তারপর মাঠে নেমে বাড়ীর পথ ধরল। কিন্তু পা দুটো যেন তার ভেঙ্গে আসতে চাইল। নিজেকে ওর অপরাধী মনে হতে লাগল। মনে হতে লাগল, ওর উচিত তখুনি ছুটে গিয়ে বধূটিকে ফিরিয়ে আনা, কিংবা বৌটি যদি কাছারিতে পৌঁছে গিয়ে থাকে তাহলে কাছারিতে গিয়ে চালে আগুন জ্বালিয়ে সবাইকে খুন করে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা।

ও অন্ধকারে মাঠের মাঝখানে একাকী দাঁড়িয়ে পড়ল। কিছুই ঠিক করতে পারল না। একা গেলে ও কিছুই করতে পারবে না, কেবলমাত্র মার খেয়ে ফিরতে হবে ওকে। হয়তো তারপর ওকে সুন্দরবন ছাড়তে হবে। আর তাছাড়া বৌটির স্বামী নিবারণ কুঁতিরও সম্মতি আছে এ ব্যাপারে। না থেকে উপায়ও নেই। অনেক বড় সংসার, ঘরে চাল নেই। গণপতি কর্তব্য স্থির করতে না পেরে সেই-খানেই বসে পড়ল। সাপখোপ জন্তুজানোয়ারের ভয়ও তার রইল না।

ভাদ্রের গুমোট গরমে চারিদিক প্যাচ প্যাচ করছে, আকাশে হালকা হালকা মেঘের ফাকে ফাঁকে তারা ঝিক্ ঝিক্ করছে, কোনো দিকেই ওর খেয়াল রইল না। অনেক রাত্রে সে বাড়ী ফিরল। কিন্তু ওকে দেখাতে লাগল শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। মুখে গাঢ় দুশ্চিন্তার কালিমা যেন কে লেপে দিয়েছে।

প্রদীপের আলোয় স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে মোহিনী ভীত হয়ে উঠল। ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোম'কে অমন লাগছে কেনে? কি হয়েছে? আবার কি হয়েছে, আমাকে বলো।'

গণপতি বলল, 'বলব, বলব, তোমাকেই বলব মোহিনী। আমি আর সইতে পারছি না, আমি কি করব আমি বুঝতে পারছি না। আমার বুকের ভিতরে আগুন জ্বলছে। আমি চেঁচিয়ে কাঁদতে পারি না, আমি শোধ নিতে পারি না। গিন্নি আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। আমাকে যেতে দাও তোমরা, আমি দেখব, এ অন্যায়ের শোধ তোলা যায় কিনা। এ অত্যাচার শেষ হবে কিনা।'

মোহিনী শঙ্কিত ব্যাকুলতায় গণপতির উত্তেজিত, ব্যথিত, নিষ্ঠুর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। এখন মোহিনী সন্তান-সম্ভবা। ওর ক্ষীণ কটি পূর্ণ কুম্ভের মতো ভরে উঠেছে। চোখদুটি ছলছলে হয়ে উঠেছে। ওর চলার ছন্দে এসেছে মন্থরতা, হৃদয় ওর সামান্য কারণেই প্রবল ছন্দে স্পন্দিত হয়ে ওঠে। ক্লান্তি আসে কাজে অকাজে। প্রদীপ নামিয়ে মোহিনী গণপতিকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'চলো বসবে চলো, বলো আমাকে বলো কি হয়েছে তোমার।'

গণপতিও মোহিনীর কোমল শরীরখানি অতি সাবধানে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল।

মোহিনীর নির্দেশ মতো বিছানাতে গিয়ে বসল। কিন্তু কোনো কথা বলল না।

মোহিনী বলল, 'বলো আমাকে কি হয়েছে।'

দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে গণপতি বলল, 'আজ নয়, আমাকে আরও দেখতে দাও, ভাবতে দাও, তারপর তোমাদের কাছে সব কথা বলব। তবে আমার আশা ছেড়ে দাও গিন্নি, আমি আর এমন করে বাঁচতে পারব

নি।'

মোহিনী ভয় পেল, চিন্তিত হলো। গণপতিকে ছুঁয়ে বসে রইল সে।

॥ ১৭ ॥

পরের দিন থেকে গণপতি উৎসুক বৈজ্ঞানিকের মতো ঘুরতে লাগল অঞ্চলটা জুড়ে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে লাগল। সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে কারণ এবং প্রতিকার সন্ধান করতে লাগল।

একদিন চন্দনপিঁড়িতে একজনের বাড়ী গেল গণপতি। সন্ধেবেলায় দেখল সে বাড়ীর পুত্রবধূ দুধের ঘটি নিয়ে যাচ্ছে সেনেদের কাছারিতে। জানল, বাড়ীর লোকেরা যুবতী সুন্দরী বৌকে পাঠাচ্ছে কাছারিতে জমিদারের নায়েবের হুকুমে। না পাঠালে সর্বনাশ। পাঠালে ভাগে চষবার জন্যে অনেক জমি দেবে। বৌটির স্বামীর সঙ্গে কথা বলল গণপতি। মানুষটা ঠিক হাত পা বাঁধা মানুষের মতো অসহায় ক্ষোভে তাকিয়ে রইল গণপতির দিকে। কোনো মত প্রকাশ করবার, কোনো প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা আর যেন তার অবশিষ্ট নেই।

C প্লটে গিয়ে রইল সাতদিন গণপতি। সে-জায়গার সব খবর সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করতে লাগল। প্রত্যেকের অবস্থা জানতে চাইল অসীম আগ্রহ নিয়ে। দেখল বাড়ীর যুবতী বৌ যাচ্ছে পড়ুয়াদের কাছারিতে দুধের ঘটি হাতে। সি প্লটেও শাশুড়ীরা যুবতী পুত্রবধূদের পাঠাচ্ছে সন্ধে বেলায় নায়েবের কাছে, অত্যাচারের ভয়ে, ধান পাবার আশায়, জমি পাবার আশায়। বৌকে পাঠাচ্ছে নায়েবের কাছে আর কাঁদছে বাড়ীর লোক, মন গুমরে মরছে, বৌ ফিরে এলে তাকে মারধোর করছে, কুৎসিত ভাষায় গালাগালি করছে। নিরুপায় হয়ে পাগলের মতো আচরণ করছে বৌ ফিরে এলে। শোকাতুরা অপমানিতা বৌ মাথা নিচু করে অপমান সইছে, কাঁদছে, স্বামীতে স্ত্রীতে মনোমালিন্য তৈরি হচ্ছে। সংসার, শান্তি, আনন্দ তছনছ হয়ে যাচ্ছে। দেহে মনে কোথাও সুখ নেই, শান্তি নেই, রাগ নেই, বীরত্ব নেই। পরাজিত মনোভাব, মেরুদণ্ডহীন

কাপুরুষতা।

গণপতি ভাবে, এরা কি মানুষ! মানুষ এরা! এদের রাগ কই, এদের অপমান বোধ কই, এরা কাঁদে না কেন চীৎকার ক'রে। মরে গেছে নাকি! ভিতরে ভিতরে সবাই কি মরে গেছে। দারিদ্র্য কি মানুষকে এমনি করে কেবল নষ্টই করে দেয়, মানুষকে রাগায় না কেন?

মাসদুয়েক ধরে সমস্ত অঞ্চলে দেখে দেখে শুনে শুনে ঘুরে বেড়াল গণপতি। তারপর ক্রোধের এক মূর্তিমান বিগ্রহ হয়ে ফিরে এল ঘরে। শরীর তার শীর্ণ হয়ে গেছে। মাথার চুল রুক্ষ হয়ে আগুনের মতো লেলিহান হয়ে উঠেছে যেন, চোখে হিংস্র প্রখরতা। ওকে দেখে ভয় পেল মোহিনী। গর্ভভার জর্জরিত মোহিনীর সন্তান-প্রসবের সময় ক্রমশ আসন্ন হয়ে উঠছে।

মোহিনীকে কাছে বসিয়ে বলতে লাগল গণপতি, 'মোহিনী আমি আর বাড়ীতে থাকতে পারব নি, এমনি করে আমি বাঁচতে পারব নি। আমার গায়ে রোদ লাগে না। আমি সুখেই আছি। দেড়শ বিঘে জমির চাষ করি। বছরে দুমাস খাটি, কিন্তু লোকে বড় কষ্টে আছে, লোকে বড় অপমানে আছে। পশুর মতো তারা সহ্য করছে। তাদের সাহস হারিয়ে গেছে, তাদের মনের বল নাই। কাণ্ড শোনো মোহিনী।'

মোহিনী বলল, 'ঠাণ্ডা হয়ে আস্তে আস্তে সব ভালো করে বুঝিয়ে বলো বাপু, তোমাকে দেখে আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।'

গণপতি বলল, 'হরিপুরে দেখলাম দুধের ঘটি নিয়ে বাড়ীর যোবতী বউ যাচ্ছে হাজরাদের কাছারিতে রাত কাটাতে। না গেলে নায়েব ধান দেবে না পেটে খেতে, উপোস দিয়ে মিত্যু হবে বাড়ীশুদ্ধু লোকের। তোমার বয়েসী মেয়ে মোহিনী। চন্দনপিঁড়িতে দেখলাম পুত্রবধূ দুধের ঘটি নিয়ে যাচ্ছে সন্ধেবেলা সেনেদের কাছারিতে। C প্লটে দেখলাম সন্ধেবেলায় শাশুড়ীরা বাড়ীর সুন্দরী যোবতী বৌকে পাঠাচ্ছে কাছারিতে। কাছারিতে সারারাত সেই মেয়েকে থাকতে হবে। না হলে জমি পাবে না তার স্বামী বা শ্বশুর চাষ করবার জন্যে। এতদূর কাণ্ড গড়িয়েছে গিন্নী। এর কি কোন প্রতিকার নাই, এই কি সহ্য করতে হবে। চোখ বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে সহ্য করলে একদিন কি আমিই রেহাই পাব? হয়তো তোমাকেই একদিন হারাতে হবে আমাকে।'

মোহিনী বলল, 'তুমি যাদের কথা বললে, ওরা খানকি মাগী।'

'না তা লয় মোহিনী, উপায় নাই বলে পেটের খিদের টানে মানুষ সব করতে পারে। গিন্নী, আমি তোমার ওপর কত অত্যাচার করেছি। আমি মেরে তোমার আঙুল ভেঙ্গে দিয়েছি। কিন্তু তখন আমার চোখ্ অন্ধ ছিল, আমি ভেবে দেখি নাই তুমি কেমন করে প্রতিদিন একমন চাল আর আধমন মাছ রান্না করেছ। আজ আমি মানুষের দুঃখ কষ্ট বুঝতে শিখেছি। ওদের কোন দোষ নাই। পেটের জ্বালায় ওরা ইজ্জত বেচছে, নায়েবের ভয়ে ওরা অমন করছে।'

মোহিনী কোনো কথা না বলে চুপ করে বসে রইল। কিন্তু ভীষণ ভয় করতে লাগল ওর। গণপতি কেন বারবার বলছে, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে সংসারে আটকে রেখো না।' চাষবাস ঘর-গেরস্থালী ছেড়ে দিয়ে সে কী করতে চায়? আর কি অদ্ভুত সব কথা গণপতি বলছে! এমন কথা সে তো কখনো শোনেনি।

মোহিনী হঠাৎ বলে উঠল, 'আমার ভয় করছে, খুব ভয় করছে আমার।'

গণপতি মাথা নেড়ে বলল, 'ভয় তো করবেই, ভয়ের কথাই তো। কিন্তু ভয়কে আমরা ভয় পাব না। আমরা ভয় পাই বলেই আজ জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা আর পাইক দারোয়ানদের অত সাহস হয়েছে। গোরু ভেড়া ভয় পায় বলেই মানুষ তাদের নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারে, বাঘ সিংহকে নিয়ে পারে না, বাঘ-সিংহ ভয় পায় না বলে বরং বাঘ-সিংহকেই মানুষ ভয় পায়।'

তারপর একটুখানি থেমে যেন স্বপ্ন দেখছে এমনি ভাবে বলতে লাগল গণপতি, 'আমি জমিদারি উচ্ছেদ করব, ক্ষেতমজুরদের মজুরী বাড়াব। ব্রিটিশকে তাড়াব। ভাগচাষীদের ধানের ভাগ বাড়াব। তেভাগা চাইব আমি ভাগচাষীদের জন্যে। আমি অনেক ভেবে তাই ঠিক করেছি। চাষীর অপমান ঘোচাব। সমস্ত অত্যাচারের প্রিতিকার করব। সব গরীব চাষীকে আমি একত্র করব।'

মোহিনী বিস্মিত শঙ্কিত হয়ে গণপতির দিকে তাকিয়ে রইল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে গণপতি মনে মনে বিচিত্র পরিকল্পনা রচনা করে চলল।

একদিন সাগরের কাছে গেল গণপতি। সাগর সাদরে গ্রহণ করল গণপতিকে।

গণপতি বলল, 'সাগর এবার একদিন একসঙ্গে বসে আমরা কি করব না করব একটা আলাপ-আলোচনা করে নিই এসো।

সাগর বলল, 'আমিও সে কথা ভেবেছি। এসো একটা দিন ঠিক করে জায়গা আর সময় ঠিক করে সবাইকে খবরাখবর দিই।

ঠিক হলো সাগরের বাড়ীতেই একদিন সবাই মিলিত হবে। দিন এবং সময় ঠিক হলো। আশেপাশের দূর দূর গ্রাম থেকেও অনেকেই আসবে বলে সেইদিনই সবাই ফিরতে পারবে না। তাই সাগরের বাড়ীতে রাত্রে থাকারও ব্যবস্থা করা হবে, ঠিক করে ফেলল ওরা।

তারপর সাগর আর গণপতি দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামের পরিচিত অগ্রণী মানুষগুলিকে খবর দিতে লাগল। নির্দিষ্ট দিনে দুপুর নাগাদ সাগরের বাড়ীতে একে একে অনেকেই এসে উপস্থিত হলো। বুধাখালি থেকে এল সাধুচরণ মাইতি, বিশ্বনাথ মাইতি, শিবরামপুর থেকে এল বিহারীলাল ঘড়ুই, চন্দনপিঁড়ি থেকে এল ইন্দ্র মাইতি, রাজনগর থেকে এল অভিমন্যু সাউ, চন্দ্রনগর থেকে এল বিষ্ণুপদ মণ্ডল, রাধানগর থেকে এল ফরমান শেখ, সাঁওতালদের পক্ষ থেকে এল সুবল হাঁসদা। এছাড়া তার সাহসী সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে এল গণপতি। এই সঙ্গীরাই লক্ষ্মী চুরি যাওয়ার পর গণপতির সঙ্গে মহিম ঘোষের কাছারিতে যাবার সাহস দেখিয়েছিল। আর সত্যিই এই কাছারিতে গিয়ে মহিম ঘোষকে শাসাতে যাওয়ার মধ্যে দুরন্ত সাহসের পরিচয় ছিল। বনে বাস করে বাঘের সঙ্গে বিবাদ সাজে না, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করা চলে না, ওরা সুন্দরবনে বাস করে সুন্দরবনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়েছিল। সুন্দরবনে ব্যাপারটা ছিল অভাবিত ঘটনা। এর জন্যে চওড়া বুকের পাটা, আর শক্ত কবজির দরকার হয়। গণপতির ডাকে তারা সাড়া দিয়েছিল। সেই সাতজনকে সঙ্গে নিয়ে এল গণপতি। সেই সাতজনের বাড়ীই লয়ালগঞ্জ-হরিপুর। তাদের নাম রেণুপদ, অর্জুন

বীরচন্দ্র, নরেন্দ্র, সিন্ধু, অজয়, আর লক্ষ্মীর দাদা শ্রীচরণ।

সাগর জানা বাড়ীর একটা বড়ঘরে কয়েকখানা মাত্বর বিছিয়ে দিল। এই সতেরজন মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে তার উপরে বসল।

গণপতি বলল, এখনতো দুপুরবেলা, অনেক কথা আলোচনা করতে হবে। তাই তাড়াতাড়ি আমাদের কথা শেষ হবে না। দরকার হলে সারারাতও লেগে যেতে পারে। তা আজ রাতে এখানেই খাওয়ার আয়োজন হবে। সাগর তুমি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা কর। আমি তোমাকে দোব এখন আধমন চাল।'

বিহারীলাল বলল, 'আমিও দোব কিছু।'

মোটামুটি আলোচনা করে ঠিক হলো, কাল সকালেই সবাই বাড়ী যাবে। তাড়াহুড়ো না করে গুছিয়ে সব আলাপ-আলোচনা করাই ভালো।

মিটিং আরম্ভ হবার আগে ওরা পরস্পরের অঞ্চলের খবরাখবর নিতে শুরু করল। সব গ্রামেই এক অবস্থা। সেই বাজে আদায়, সেই বেগারখাটানো, সেই ঘরের মেয়ে-বৌ নিয়ে টানাটানি, দারিদ্র্য, হতাশা, ভীরুতা। উনিশ বিশ তফাৎ। নাহলে সব গ্রামের অবস্থাই মোটামুটি একই রকম। নায়েব, গোমস্তা আর পাইক দারোয়ানগুলো সব খানকির বাচ্ছা, যেমন চরিত্রহীন, তেমনি মাতাল আর বদমাশ।

অভিমন্যু বলল, 'তা আমরা কি এসব গোরুছাগলের মতো সইব, আর ভয় পাব, নাকি এর একটা বিহিত করবার চেষ্টা করব।'

অর্জুন বলল, 'আমার মনে হয় মানুষগুলো ভীতু বলেই জোতদার, নায়েবরা অত জো পায়। যদি মানুষগুলোর ভয় একবার কাটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ ক'গাছা জোতদার আর নায়েব গোমস্তা কি করবে। এত মানুষের ভয়ে ওরাই বরং তখন কাঁপতে থাকবে।'

ঘটনাটি একেবারে নতুন। এ অঞ্চলের কয়েকটি গ্রামের কয়েকজন মানুষ আজ একত্র মিলিত হয়েছে নিজেদের অবস্থা আলোচনা করবার জন্যে। এতদিন পরে কথা বলে আর কথা শুনে তারা একের হৃদয়কে অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত করছে, প্রবাহিত করে দিচ্ছে নদীস্রোতের মতো। ওরা পরস্পরের কাছে পরিচিত হচ্ছে আর অনুভব করছে ওরা কেউই একা নয়। একা কেউ একটা নতুন কথা ভাবতে পারে না। একই দুঃখ,

একই অনুভূতি, একই প্রতিকার-চিন্তা অনেকের মনেই জেগে উঠেছে, আর একথা অনুভব করে ওরা মনে মনে শক্তি লাভ করছে। এই সতেরজন মানুষ পরস্পরের নাম জানল, গ্রামের নাম জানল, পরিচয় নিল। আর নানান কথাবার্তা বলাবলি করতে করতে ক্রমে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো।

সাগর বলল, 'তাহলে মুড়ি খেয়েই মিটিং আরম্ভ করলেই ভালো হয়, আপনারা আসবেন বলে আমি চা-ও আনিয়ে রেখেছি' খাওয়াব আপনাদের।'

'চা' শুনে অনেকে তো অবাকই হয়ে গেল। এদের মধ্যে দুচারজন 'চা' জিনিসটা তখনও পর্যন্ত চোখেই দেখে নি। দূর গ্রামাঞ্চলে তখনও চা অপরিচিত ছিল।

চারখানা বিরাট বিরাট পরাতে তেল মাখিয়ে পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে মুড়ি সাজিয়ে দেওয়া হলো। এক একটা থালা থেকে সেই মুড়ির স্তূপ পাঁচ ছ জন মিলে খেতে লাগল। আধ ঘণ্টার মধ্যে মুড়ির ছোটো ছোটো পাহাড়গুলি অদৃশ্য হলো। তারপর মাটির ভাঁড়ে, পেতলের গেলাসে, কাঁসার ঘটিতে করে চা পরিবেশিত হলো। চা যারা নতুন খাচ্ছে তারা তো তাজ্জব বনে গেল। নামটাই এতদিন শোনা ছিল চায়ের, এতদিনে তার স্বাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে হৃষ্ট হয়ে উঠল অনেকে। তাড়াতাড়ি চুমুক দিতে গিয়ে জিবে ছেঁকাও লেগে গেল দু একজনের। চা পান শেষ হলে পকেট থেকে বিড়ি বার করে ধরিয়ে ফেলল সবাই। ধূমপান চলতে লাগল।

তখন সাধুচরণ বলল, 'আর দেরি না করে এবারে মিটিং আরম্ভ করা যাক।'

সবাই সমস্বরে সায় দিল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ এবারে লাগাও, আর দেরি করে দরকার নি।'

বিশ্বনাথ বলল, 'আমি গণপতিকে আজকের সভার সভাপতি হতে বলছি।'

দুতিনজন একসঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, গণপতিই ভালো হবে।'

আসলে সভাপতি করে মিটিং করার রেওয়াজ ওদের নেই। এই ধরনের মিটিংও ওদের অনেকের কাছেই একেবারে নতুন। ওদের গ্রামের পঞ্চায়েত হলে, বিচারসভা বসলে গ্রামের মুরুব্বি লোকটিই স্বাভাবিক ভাবেই

সভাপতি থাকে। আলোচনা হয়, সিদ্ধান্ত হয়, তার জন্যে আগে থেকে কাউকে সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করতে হয় না।

সুবল হাঁসদা জিজ্ঞাসা করেই বসল, 'সোভাপতি কি জিনিস ?'

সাধুচরণ বুঝিয়ে বলল,'মানে ও আমাদের সভার কাজ চালাবে। আমরা একসঙ্গে কথা বললে, গোলমাল করলে মানা করবে, ও যাকে বলতে বলবে সে বলবে। কোন ব্যাপারে তর্ক হলে সভাপতি সকলের মত জানতে চাইবে, বেশী লোক যা বলবে তা-ই ঠিক হবে।'

সুবল বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ বুঝলাম, সভাপতি মানে সর্দার।'

বিশ্বনাথ বলল, 'না না সর্দার নয়, হয়তো পরের সভাতে তুমিই সভাপতি হবে।'

সুবল বলল, 'আজকে ও সর্দার বটে।'

সাধুচরণ বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

সভা সম্পর্কে গণপতির জ্ঞান ছিল। সে শহরে থাকত, কিছু কিছু সভা-সমিতি সে দেখেছে, ম্যানেজিং কমিটির মিটিং দেখেছে, সে-মিটিং সে ঘরের বাইরে বসে বা চা দিতে গিয়ে, ফাইফরমাশ খাটবার জন্যে উপস্থিত থেকে দেখেছে, শুনেছে!

গণপতি বলল, 'ভাইসব, আপনারা আমাকে সভাপতি করে অনেক সম্মান দিলেন। আমি চাষালোক, মুখ্যু মানুষ। আপনাদের এ সম্মানের যোগ্য নই। তবু আমার কোনো লজ্জা নাই। কেননা আমরা যে কাজ কবতে চাই তাতে আমাদের লজ্জা ভয় কাটিয়ে ফেলতে হবে, সাহসী হতে হবে।'

তারপর কি বলবে বুঝতে পারল না সে। গণপতি গত কয়েকদিন ধরে মনে মনে অনেক ভেবে রেখেছে, সে কি বলবে। কিন্তু এখন বলতে গিয়ে কথা ঠিকমতো যোগাচ্ছে না দেখে সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা ভালো দেখায় না। আর তাছাড়া তার অন্তর্নিহিত বক্তব্যের পীড়ন তাকে প্রেরণা দিচ্ছিল, তবু কী বলবে তা আর একবার মনে মনে গুছিয়ে নেবার জন্যে ও বলল, 'আগে আমি সকলের সঙ্গে সকলের বন্ধুত্ব করিয়ে দিই। আগে নিজের পরিচয় দিই।'

বলে একটুখানি থেমে সংক্ষেপে বলল, 'আমার বাড়ী মেদিনীপুর, নিঃস্ব

চাষীর ছেলে আমি। ছেলে বয়েসেই বাবাকে হারিয়েছিলাম। কিছুদিন ব্যারাকপুরে একটা স্কুলে মালী-দারোয়ানের কাজ করতাম। অনেকগুলো ভাইবোন, সংসার চলত না। তাই ভাগে চাষ করবার জন্যে এখানে এলাম। অনেক পরিশ্রম করে জঙ্গল হাসিল করলাম। তা জোতদার আমাকে জমি দেয় নাই, কখনও দেবেও না। আর হাজরা আর তুই দাস জমিদারের নায়েব মহিম ঘোষ আমার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আর চারিদিকের এই মানুষের কষ্ট, অপমান দেখে আমি খেপে উঠেছি, তা একা তো কিছু করতে পারব নি, যাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে তাদের জাগাতে হবে।'

তারপর বলল, 'এবার আপনারা সকলেই আপনাদের কথা বলুন-আমরা শুনি।'

প্রচণ্ড নিঃস্তব্ধতা ঘনিয়ে উঠল। এমনি বসে বসে গল্পগুজব করা যায়, অনেক কথা বলা যায়। কিন্তু এতগুলি লোককে শোনাবার জন্যে কথা বলতে কেউ সাহস করছে না। সবাই চুপ করে বসে আছে।

গণপতি বলল, 'কি হলো? বলুন।'

কিন্তু কেউ টুঁ শব্দ না করে বসে রইল।

তখন গণপতি বলল, 'আমি এক এক করে নাম বলে যাই, আর যার নাম বলব, সে নিজের কথা বলুক।'

গণপতি বলল, 'সাধুচরণ, তুমি বলো।'

সাধুচরণ বলল, 'আমার নাম সাধুচরণ মাইতি, বাড়ী বুধাখালি গ্রাম। আমার সামান্য কিছু জমি আছে। আমাদের ওখানকার নায়েব অবনী বাঁড়ুয্যে খুব অত্যাচারী। সব নায়েব যা করে সেও তাই করে। মদ খায়, চাষীর ঘরের মেয়েদের জোর করে দারোয়ান দিয়ে ধরে নিয়ে যায়, যখন তখন চাষীদের ধরে মারে, নানান রকম ফন্দিফিকির করে চাষীদের ভাগের ধান কেড়ে নেয়। আর আমি কমিউনিষ্ট।'

গণপতি অবাক হয়ে বলল, 'কমিউনিষ্ট কি?'

'মানে কমিউনিষ্ট পার্টির লোক।'

'পার্টি মানে?'

'পার্টি মানে দল।'

'কমিউনিষ্টরা কি বলে ?'

'কমিউনিষ্ট পার্টি হচ্ছে গরীবের পার্টি, তারা গরীবের রাজত্ব কায়েম করতে চায়, বড়লোকদের মানে ধনীদের ধ্বংস চায়।'

গণপতি বিস্ময়ে শিহরিত হয়ে উঠে বলল, 'আচ্ছা! আপনি আপনাদের দলের কথা আর একটু বলুন।'

সাধুচরণ বলল, 'কমিউনিষ্ট পার্টি বলে, গরীবদের জোট বাঁধতে হবে, তাহলেই তারা বলবান হবে। আমরা পরে কলকাতা থেকে নেতাদের নিয়ে আসব, তাঁরাই আমাদের বলে দেবেন কেমন করে এই সব অত্যাচারের মোকাবিলা করতে হবে।'

সাধুচরণ চুপ করল। গণপতি সাধুচরণের কথাগুলি মনে মনে উপলব্ধি করবার জন্যে কিছুক্ষণ নীরব করে বসে রইল। তারপর বিশ্বনাথকে বলল, 'বিশ্বনাথবাবু, এবার আপনি বলুন।'

বিশ্বনাথ বলল, 'আমিও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বার। আমার কাজই হলো রাজনীতি করা। রাজনীতিই আমার পেশা। এদিকের চাষীদের অবস্থা দেখে আমিও বহুদিন থেকে ভাবছি, একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।'

তারপর সাগর জানাকে কিছু বলতে বলল গণপতি।

সাগর জানা বলল, 'আমার নিজের বিঘে তিনেক জমি আছে। আর চল্লিশ বিঘে জমি ভাগে চষি। তার মধ্যে ত্রিশ বিঘে জমি এবার জোতদার মাছের ভেড়ি করে নিয়েছে।'

বীরচন্দ্র বলল, 'আমরা দুভাই মিলে পাঁচবিঘে জমির মালিক, যা হোক করে চলে যায়।'

বাদবাকী সবাই জানাল যে তারা নিঃস্ব কৃষক। জমিদারের কাছে চেয়ে চিন্তে সামান্য বাস্তুভিটেটুকু করেছে, কারও কারও নিজস্ব বাস্তুভিটেও নেই, জমিদারের জমিতে অস্থায়ী চালা তুলে বাস করে।

ওদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়েস রেণুপদর। রেণুপদ বলল, 'আমাদের নিজেদের জমিজমা কিছু নাই। বিঘে পাঁচেক জমি ভাগে চষি। আমার বিধবা বুড়ি মা আছে আর একটা ছোটো ভাই আছে।"

সকলের পরিচয় আদান প্রদান শেষ হলে গণপতি বলল, 'বন্ধুগণ, আমরা আজ থেকে সবাই বন্ধু হয়ে গেলাম। এবার থেকে আমরা একসঙ্গে যুক্তিপরামর্শ করতে পারব। বিপদে পড়লে বুঝব আমরা কেউ একা নই। আমরা যদি এক হয়ে থাকতে পারি তাহলে আমাদের শক্তি হাজারগুণ বেড়ে যাবে। একটা কাঠি ভাঙ্গা সহজ। কিন্তু আজকে একসঙ্গে সতেরটা কাঠি বাঁধা হলো, এ কাঠি ভাঙ্গা অত সহজ নয়। আমরা একদিন এই সুন্দরবনে এসেছিলাম জমি পাব বলে। জমির খিদে আমাদের চিরদিনের। আমরা চাষীর ছেলে, জমিকে আমরা ভালোবাসি পরিবারের চাইতে বেশি। মেদিনীপুর থেকে, সাঁওতালপরগণা থেকে কত চাষী এসেছিল এখানে, ভেবেছিল একশ বিঘে জঙ্গল হাসিল করতে পারলে, অন্তত পাঁচটা বিঘে জমিও সে পাবে। কিন্তু জোতদার-জমিদাররা জমি তো দেয় নাই উল্টে বিশ রকমের বাজে আবাব আদায় করছে, আমাদের উপরে চাবুক চালাচ্ছে। আমাদের ঘরের বৌঝিদের নিয়ে গিয়ে ইজ্জত নিচ্ছে।'

হঠাৎ গণপতির কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়ে পড়ল। লক্ষ্মীর কথা মনে পড়ে গেল ওর। চোখ ফেটে জল এল। একটুখানি থেমে নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, 'কিন্তু আমরা মানুষ, এসব শোষণ, এসব অত্যাচার অপমান আমরা সহ্য করব নি। একটা ব্যবস্থা কিছু করতে হবে, আমার ইচ্ছা করে, ঐ খানকির বাচ্ছা জমিদার আর নায়েবগুলোকে ধরে ধরে গাছে ফাঁসি দিয়ে ঝুলিয়ে দিই। ওদের একেবারে নিকেশ করে দিই। এখন আপনারা ঠিক করুন, আমাদের কী করতে হবে, কিভাবে কাজে লাগতে হবে, কোন উপায়ে আমরা সুন্দরবনে ওদের অত্যাচারকে চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিতে পারব, সুন্দরবনের চাষীদের দুঃখ অপমান কেমন করে ঘুচবে।'

বিশ্বনাথ মাইতি বলল, 'সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই।'

গণপতি বলল, 'বলুন।'

বিশ্বনাথ বলতে লাগল, 'আমাদের প্রথমে একটা কৃষকসমিতি করতে হবে।' .

সাগর বলে উঠল, 'আরে কৃষক সমিতি করবে করো। কিন্তু তাতে

তো নায়েব-জোতদারদের শায়েস্তা করা যাবে না। আমার মত হলো, আমরা সতের জনা আছি, এক একখানা অস্ত্র হাতে রাতের বেলা গিয়ে ওদের খুন করে আসি।'

বিশ্বনাথ বলল, 'না, না, তাতে আমরা সতের জন ধরা পড়ব। আবার নতুন নায়েব আসবে, পুলিশ আসবে। আর গরীব চাষীর দুঃখ থেকেই যাবে। আমি বলি, কৃষকসমিতি গড়ে এ চাকলার সমস্ত কৃষককে তার সভ্য করতে হবে। আর সবাইকে বলে বেড়াতে হবে জোট বাঁধো। কৃষকসমিতিকে শক্ত কর। একা হলেই দুর্বল, সবাই মিললে হাতির বল।'

অভিমন্যু বলল, 'বিশ্বনাথবাবু কথাটা ভালোই বলেছেন, তাহলে আগে কৃষকসমিতিই করা হোক।'

গণপতি বলল, 'সাগরের কথাই আমার বেশ ভালো লাগছে। আমারও ইচ্ছা আজ রাতে গিয়েই ওদের নিকেশ করে দিয়ে আসি। কিন্তু বিশ্বনাথবাবুর কথাটা ভাববার মতো। আমরা একসঙ্গে না মিলতে পারলে শেষ পর্যন্ত মার খেয়ে যাব। এমন কাণ্ড করতে হবে, যাতে সুন্দরবনের সমস্ত চাষীই ওদের শত্রু হয়। তবে ওরা সমঝে চলবে, যা খুশি তাই করবার সাহস পাবে নি।'

সাধুচরণ বলল, 'তাহলে এই সতের জনকে নিয়েই কৃষকসমিতির পত্তন হোক। আমাদের মধ্যে থেকেই প্রেসিডেণ্ট সেক্রেটারী ঠিক করা হোক। আর কৃষকসমিতির সভ্যদের বছরে চাঁদা হবে চার পয়সা করে। এই পয়সায় কৃষকসমিতির কাজকর্ম চলবে।'

নানানরকম আলোচনা করে ঠিক হলো, সাধুচরণ মাইতি হোক কৃষক-সমিতির প্রেসিডেণ্ট আর গণপতি হোক সেক্রেটারী।

তাই ঠিক হয়ে গেল। এবং সভাতে এই প্রস্তাব নেওয়া হলো যে, এবার থেকে এই সতের জন সভ্য এই অঞ্চলের প্রত্যেক চাষীকে কৃষক-সমিতির সভ্য করবাব চেষ্টা করবে। চাষীদের একতাবদ্ধ হতে বলবে। আরও ঠিক হলো যে, বাজে আদায় বন্ধ করতে হবে। কোনো চাষী বিপদে পড়লে কৃষকসমিতি তাকে সাহায্য করতে আগিয়ে যাবে। কোনো চাষীর উপর অত্যাচার হলে যে নায়েব অত্যাচার করবে তাকেও শায়েস্তা করতে হবে। ভবিষ্যতে কি কর্মপদ্ধতি নেওয়া হবে, কি কি দাবী থাকবে

কৃষকসমিতির, কেমন করে চাষীদের জোট বাঁধতে হবে এই সব নিয়ে অনেক আলোচনা হতে লাগল।

অনেকক্ষণ সন্ধে হয়ে গেছে। কেউ আর কারও মুখ দেখতে পাচ্ছে না। অনেকে ঘন ঘন বিড়ি ধরাচ্ছে। অন্ধকারের মধ্যে বিড়ির আগুন-গুলি জোনাকির মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে। সাগর উঠে গিয়ে একটি রেড়ির তেলের প্রদীপ আর একটা কাঠের পিলসুজ নিয়ে এল। পিলসুজের উপর প্রদীপটি বসিয়ে দিল। মৃদু কম্পমান দীর্ঘ শিখা নিয়ে প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের শিখার কাঁপনের সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালে দেওয়ালে মানুষগুলির বিচিত্র ছায়াছবি কাঁপছে। এই প্রজ্বলিত প্রদীপের আলো ও প্রচুর ছায়ায় যেন এক গুহার ভিতরকার প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম ট্রাইবাল সমাজের কোনো সভার দৃশ্য জেগে উঠল। ওরা ওদের জীবনের ওদের গ্রামাঞ্চলের অসহনীয় দারিদ্র্য আর দুঃখের কথা একে একে বর্ণনা করতে লাগল। কোন কোন মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করেছে নায়েবরা তার কথা বলতে লাগল। কেউ কেউ ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। কেউ গোঁজ হয়ে বসে রইল। তারপর আগামী দিনের সংগ্রামের বিচিত্র সম্ভব অসম্ভব পরিকল্পনা রচনা করতে লাগল ওরা মুখে মুখে মনে মনে। জমির মালিক হতেই হবে চাষীকে। জমিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসবে, জমিতে শরীরের রক্ত-জলকরা ঘাম ঢালবে অথচ সে জমি থাকবে অন্যের কবলে, এ ব্যবস্থা কোনো রকমেই চলতে পারে না—এই বক্তব্য নানান কথার মন্থনে বারংবার জেগে উঠতে লাগল। এমনি করে সভা চলল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত।

॥ ১৯ ॥

খারাপ লোকেরা তাড়াতাড়ি মিলতে পারে, খারাপ উদ্দেশ্যে দ্রুত দল গড়তে পারে। কিন্তু ভালো লোকেদের ভালো উদ্দেশ্যে মিলতে সময় লাগে, নানান ঝামেলা, মতামতের নানান দ্বন্দ্ব এসে জোটে; ভালো লোকদের মধ্যে খারাপ লোক ঢুকে গিয়ে ভালো লোকদের সংগঠনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

সেই মিটিংয়ের পর গণপতির মনে আবার অনেক প্রশ্ন জেগেছে। সেই সব মীমাংসার জন্যে সে সভাপতি সাধুচরণকে সভা ডাকতে বলেছে। কিন্তু সাধুচরণ তেমন গা করে নি। হচ্ছে হবে করে অযথা সময় নষ্ট করছে। অথচ গণপতি লয়ালগঞ্জ থেকে অনেক পথ হেঁটে হেঁটে বারংবার বুধাখালি গেছে সাধুচরণের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেই মিটিংয়ে যে রকম আশা এবং আশ্বাস জেগেছিল, মাসদুয়েক যেতে না যেতে কৃষক সমিতির সদস্যদের মধ্যে সে উৎসাহ আর দেখতে পায়নি গণপতি। গণপতি সাগরের কাছে শুনেছে, সাধুচরণ বিশ্বনাথ এরা গণপতিকে বাদ দিয়ে সংগঠন করতে চায়। সাগর কৃষকসমিতির অন্য দুএকজন সদস্যের কাছে এ-খবর পেয়েছে। ওরা বলেছে, গণপতি সাগর এরা নাকি মাথাগরম লোক। এরা হুটকোমি করতে গিয়ে কৃষকদের চরম ক্ষতি করে ছাড়বে।

একদিন শিবরামপুর থেকে বিহারীলাল এসে গণপতিকে বলল, 'সাধুচরণ আমার কাছে এসেছিল।

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলল সে তোমাকে ?'

সে বলল, 'কৃষকসমিতি করব আমরা কৃষকদের দাবিদাওয়া নিয়ে লড়বার জন্যে। জোতদার, জমিদার, নায়েবদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা করবার দরকার নেই।'

গণপতি বলল, 'দাবিদাওয়া নিয়ে লড়লেই তো জোতদার নায়েবদেব শত্রু করতে হবে। দাবিদাওয়া নিয়ে লড়ব অথচ শত্রুতা হবে নি জোতদারদের সঙ্গে এটা আবার কি ব্যাপার আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না। ওরা অবশ্য কমিউনিষ্ট পার্টির লোক। ওরা বোঝে ভালো।'

বিহারীলাল বলল, 'ওরা তোমাকে আর সাগরকে বাদ দিতে চায়, তোমরা দুজন নাকি খুন-খারাপি করতে চাও।'

গণপতি বলল, 'বিহারী দলাদলি করে তো কোনো লাভ নাই। আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে গরীব চাষীদের দুঃখ দূর করা, নায়েব জোতদারদের ধ্বংস করে দেওয়া, তা যারা করতে চায় আমি তাদের সঙ্গে থাকবই, আমাকে কেউ তাড়াতে পারবে নি। আর এছাড়া অন্য কোনো-রকম মতলব থাকলে আমি তাদের মধ্যে নাই। তখন আমি আলাদাভাবে কাজ করব।'

একটু চুপ করে থেকে গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'বিহারী, তুমি চাষীদের বোঝাচ্ছ তো? কৃষকসমিতির মেম্বার হতে বলছ তো।'

'এখনও ঠিক মতো কাজে নামি নাই, তবে চেষ্টায় আছি।'

আরও কিছু কথাবার্তার পর বিহারী বিদায় নিয়ে চলে গেল। কিন্তু গভীর হতাশায় সহসা আচ্ছন্ন হয়ে গেল গণপতি। নিজেকে তার একা এবং অসহায় মনে হতে লাগল। লক্ষ্মীর মুখখানি মনে পড়ল ওর। লক্ষ্মীর এখনও কোনো সন্ধান পাওয়া যায় নি। একটা মানুষকে আগুন লাগিয়ে হত্যা করে, একটি মেয়েকে জোর করে চুরি করে নষ্ট করে গুম করে দিয়েও মহিম ঘোষ বহাল তবিয়তে টিকে আছে। আর সে সাধুচরণের কথায় হতাশ হয়ে পড়বে? চাষীদের দুঃখ অপমান দূর হবে না সাধুচরণ না থাকলে? সে একাই কাজ করবে। সে সমস্ত গরীব চাষীকে ক্ষেতমজুরকে একতাবদ্ধ করবে। অসুরের মতো খাটবে সে। পশুর মতো চাবুক খেয়ে বাঁচার থেকে না বাঁচাই তো ভালো। অন্যের কষ্টের দিকে না তাকিয়ে নিজের সুখ নিয়ে থাকতে সে পারবে নি। তাকে দেখতে হবে কতদূর সে কি করতে পারে।

॥ ২০ ॥

ধান কাটবার সময় এসে গেল। আবার ক্ষেতমজুরদের নিয়ে মাঠে নেমে পড়তে হলো গণপতিকে। মোহিনী আবার প্রতিদিন রান্নাঘরে ব্যস্ত রইল। সোনার বরণ শিষ মাথায় নিয়ে মাঠে মাঠে সোনালী ধান মাথা ঢুলিয়ে পড়ে আছে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ফসল রচনা করে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত হয়েছে ওষধি গাছগুলি। ধান কাটা হলো। নিয়মমতো ধান তোলা হলো জোতদারের খামারেই।

ধান ঝাড়া হয়ে গেলে প্রথমে আধাআধি ভাগ হলো ধান। তারপর জোতদাররা জুলুম করতে লাগল কুড়ি রকমের বাজে আবওয়াবের দাবি নিয়ে।

গণপতি বলল, 'ওসব বাজে আবওয়াব আমি দোব না মশায়।'

গণপতির পরামর্শ মতো গণপতির অনুগত ক'জন চাষীও সেই কথা বলল।

জোতদার হরিপদ মজুমদার, ব্রজ সামন্ত, কার্তিক সামন্ত, কার্তিক পাত্র বলল, 'তাহলে ধান আমাদের খামার থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। আর ধান পাওয়ার রসিদও দোব না।'

গণপতির অনুগত চাষীরা জোতদারদের জবরদস্তির কাছে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে সব রকম আদায় মিটিয়ে দিয়ে সামান্য ধান নিয়ে ঘরে ফিরল।

গণপতি ওর প্রধান জোতদার হরেনকে বলল, 'আমি কিন্তু বাজে (আবওয়াব) আবাব কিছুতেই দোব নি হরেনবাবু।'

'তাহলে তো আমি রসিদও দোব না গণপতি।'

গণপতি বলল, 'রসিদ না দিলে আপনাকে ধানও আমি দোব না।'

হরেন বলল, 'কোর্টে গিয়ে কথাটা তাহলে বলো।'

'তাই বলব।'

কিন্তু হরেন শেষ পর্যন্ত অর্ধেক ভাগের ধান নিল। রসিদ পরে দেবে বলল।

তারপর ফের বলল, 'তাহলে তোমার নামে আমার কাছারির খাতায় ধার লিখে রাখলাম গণপতি।'

হরেনের আগেকার ঋণই কিছুতেই শোধ হচ্ছে না। আবার ঋণ লিখে রাখলে কি ভীষণ পরিণতি হবে বুঝতে পেরেও গণপতি তার জেদ ছাড়ল না। গণপতি বাজে আবওয়াব দিল না। এমনি করে হরেনের সঙ্গে গণপতির বিরোধ তৈরি হলো। হরিপদ, ব্রজ, কার্তিকরাও রেগে উঠল গণপতির উপর। একদিন হরিপদ গণপতির বাড়ী এসে গণপতিকে শাসিয়ে গেল।

মোহিনী বলল, 'ওগো, কেন তুমি গণ্ডগোল লাগালে। তোমার তো অনেক ধান। আবাব (আবওয়াব) দিলেও তো তোমার অভাব হবে নি।'

গণপতি বলল, 'মোহিনী সবাই ভীতু হয়ে গেছে। একজন কেউ সাহস করে ওদের বিরুদ্ধে না দাঁড়াতে পারলে চাষীরা সাহস পেছে না। শুধু মুখে মুখে লম্বা চওড়া বুলি বললেই তো হবে না। কাজ করেও দেখাতে হবে।'

মোহিনী বলল, 'তুমি একা। সুন্দরবন কী ভীষণ জায়গা জানো তো। আমার ভয় করছে।'

গণপতি বলল, 'মোহিনী আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি আর বেশী দিন সংসারে থাকব নি। তোমাকেই সব কিছু দেখাশোনা করতে হবে।'

ইতিমধ্যে মোহিনীর একটি খোকা হয়েছে। মোহিনী এখন মা। সন্তানকে নিয়ে সে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। গণপতিকে সে জড়িয়ে ধরে। বলে, 'না তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে পারবে নি।'

মাঝে আসব বৈকি। তবে আমি আর শুধু তোমাদের দায় দায়িত্ব নিয়ে থাকতে পারব নি। আমার বুকের ভিতরে আগুন জ্বলছে মোহিনী। আমাকে বেরুতেই হবে। সমস্ত লোককে খেপিয়ে তুলব আমি। তখন সুন্দরবনে ভয়ে ভয়ে থাকবে ঐ জমিদার জোতদার নায়েবরা। চাষীর গায়ে হাত দেবার ক্ষেমতা আর থাকবে নি তাদের।

ধান ওঠার পর শূন্যমাঠ খাঁ খাঁ করে। নানান পাখ-পাখালি শস্যের দানা খোঁজে মাঠে মাঠে। বাতাস হু হু করে বয়ে যায়। চোখ গিয়ে ঠেকে সেই আকাশে মাঠ যেখানে গিয়ে ঠেকেছে। অদূরে বড় নদীর বুক ভরে ওঠে অজস্র পালতোলা নৌকায়। গঙ্গাসাগর মেলা এসে গিয়েছে। তীর্থযাত্রীরা নৌকায় করে চলেছে গঙ্গাসাগরে চান করতে, তীর্থ করতে।

ছেলেকে নিয়ে আর একদিকে গণপতিকে নিয়ে মোহিনী নানান চিন্তায় ডুবে যায়। গণপতি কঠিন আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে মোহিনীকে।

মোহিনী বলে, 'তুমি সংসার ত্যাগ করবে বলছ তাহলে আর আমি ছেলেমানুষ করতে পারব নি।'

গণপতি বলে, 'কিন্তু তাই বলে কি সাধু হয়ে যেছি। তোকে নাহলে

আমার রক্ত না মেশালে মনের বল পাব কোথা থিনে।'

মোহিমী আত্মসমর্পণ করে গভীর সোহাগে। গণপতি মোহিনীকে প্রগাঢ় আদরে ডুবিয়ে দেয়।

॥ ২১ ॥

কিছুদিন থেকে গণপতি প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে। সারাদিন তার অশান্তিতে কাটে, রাতের বেলা ঘুম আসে না। মোহিনী আর শিশুটি ঘুমায়, তাদের কোমল নিঃশ্বাসের শব্দ শোনে গণপতি। পাশে দরদালানের মতো ঘরে শুয়ে থাকে গণপতির দুই ভাই। তাদের গাঢ় শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শোনে গণপতি। বাইরের পৌষের ঠাণ্ডা রাত্রির কত যে শব্দ কানে আসে! রাত্রিচর পাখির ডানা ঝাপটানি, গাছের পাতার মর্মরধ্বনি, বাতাসের সন্‌সন্‌ ডাক, পেঁচার ঠোঁটে আহত পাখির তীক্ষ্ণ আর্ত চীৎকার গণপতির অনুভূতিকে অদ্ভুত প্রখর করে তোলে। ঘন অন্ধকারে চোখ মেলে গণপতি শুয়ে থাকে। গণপতি কিছুতেই বুঝতে পারে না, এত লোক এত অত্যাচার, অভাব, যন্ত্রণা সহ্য করে কেমন শান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে জীবন কাটাচ্ছে, তার মনের ভিতরে কেন এত অশান্তি! অনেকের স্ত্রী নায়েবের কামের ইন্ধন যুগিয়েছে, অনেকের ঘরে উপবাস চলে দিনের পর দিন, সারা বছর কঠিন পরিশ্রম করেও পরিশ্রমের ফসল পায় না, তবু কেন ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে জীবন কাটাতে পারে? কিসের মমতা, কিসের ভয়ে এত মানুষ এমনি ভাবে সহ্য করতে শিখেছে, এই সহ্যশক্তি ওদের মানুষের পরিচয়কে নষ্ট করে দিয়েছে, তবু ওরা কেন রেগে উঠবে না? গণপতি মনে করে, শুকনো খড় আপনি জ্বলতে পারে না আগুন ধরিয়ে দিতে হয়, এদের মনের ভিতরটা আর জীবন্ত নেই, শুকিয়ে উঠেছে আগুনের ছোঁয়ার অপেক্ষায় আছে। আগুন ধরিয়ে দিলে একটা অগ্নিকাণ্ড করে মনের এই শুকনো জঞ্জাল পুড়ে যাবে। মানুষগুলো নতুন করে বাঁচবার প্রাণশক্তি পাবে।

কয়েকদিন বিশ্রী মানসিক যন্ত্রণায় ভুগে গণপতি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, সে একাই ঘুরবে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় বাড়ীতে বাড়ীতে খামারে দোকানে, সন্ধের আড্ডায়; সে তার বুকের আগুন জ্বালা অনুভূতি সকল মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে। সে জানে লক্ষ্মীর জন্যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা সে পেয়েছে, মহিম ঘোষের উপর কি দারুণ ঘৃণা আর আক্রোশ ওর আছে। সেই সব লোকের কাছে সে আগে যাবে যাদের ঘরের মেয়ে বৌকে

জমিদারের নায়েব আর গোমস্তারা ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। সেখানে যে বারুদ জমেছে আগুন দিতে পারলে তাতে ভীষণ কাণ্ড হয়ে যাবে।

একদিন সকালবেলা বিছানা থেকে উঠে কাউকে কিছু না বলে গণপতি বেরিয়ে পড়ল। শূন্য রৌদ্রালোকিত মাঠের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে উপস্থিত হলো হরিপুরে নিবারণ কুঁতির বাড়ীর দরজায়। বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'নিবারণ, নিবারণ আছ নাকি ?'

নিবারণ বাড়ীতেই ছিল ডাকশুনে বেরিয়ে এল। গণপতিকে দেখে বলল, 'কি ব্যাপার গণদা, হঠাৎ এত সকালে।'

'তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে নিবারণ। চল গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠে গিয়ে বসি।'

'আমার একটু কাজ ছিল।'

'আজকে কাজ থাক। আজকে তোমাকে আমার সঙ্গেই আসতে হবে, তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলব বলে আমি এতদূর এলাম।'

নিবারণ একটু ইতস্তত করে বলল, 'চলো।'

নিবারণকে সঙ্গে নিয়ে গণপতি মাঠের এক গাছতলায় গিয়ে বসল। নিবারণ উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় বসে রইল গণপতির কথা শুনবার জন্যে। গণপতি কথা বলতে এসে হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে ফেলে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ভাবতে লাগল, কি ভাবে আরম্ভ করা যায়। নিবারণের বৌ স্বামীর সংসার চালাবার জন্যে সন্ধেবেলায় কাছারিতে যায় নায়েবের কাছে শুতে সে কথা বললে নিবারণ নিশ্চয় খেপে যাবে গণপতির উপর। হয়তো গালাগালি দিয়ে ওকে তাড়িয়েই দেবে। নানানরকম ভেবে চিন্তে গণপতি বলল, 'নিবারণ, তুমি ক'বিঘে জমি চাষ কর ?'

'এখনও জমি পাই নাই, নায়েব মশাই দোব বলেছে।'

'কি ভাগে চষতে দেবে, না, তোমাকে প্রজা করে জমি দান করবে।'

'তা জানি না, বিঘে কয়েক জমি দোব বলেছে।

'তুমি কি এখনও নায়েবকে বিশ্বাস কর ?'

'না বিশ্বাস করি না, কিন্তু কোনো উপায় তো নাই।'

'বিশ্বাস যদি না কর, আর অন্য কোনো উপায়ও যখন নাই, তখন পড়ে পড়ে মার না খেয়ে মার দেবার চেষ্টা করবে না? জানো তো, ঐ নায়েব লক্ষ্মীকে চুরি করে কোথায় নিয়ে চলে গেল। আমি আজ পর্যন্ত লক্ষ্মীকে উদ্ধার করতে পারলাম না। শুনি এদিকের অনেকের বৌকে নায়েব কাছারিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে, জমি দোব বলে নিয়ে যায়, কিন্তু জমি দেয় না।'

গণপতি চুপ করে গিয়ে নিবারণের মুখের দিকে তাকাল। প্রথমে নিবারণের মুখটা ছাইয়ের মত ভয়ে এবং লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর সহসা ক্রোধ ফুটে উঠতে লাগল মুখের রঙে ও রেখায়। চোখ দুটির মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা আর কঠিন আক্রোশ জ্বলে উঠতে লাগল।

গণপতি বলে চলল, 'আমার মতো কত গরীব মানুষ মেদিনীপুর, সাঁওতালপরগণা থেকে এসেছিল এই সুন্দরবনে জমির খিদে নিয়ে। ভেবেছিল একশ বিঘে জঙ্গল হাসিল করতে পারলে অন্তত বিঘে কয়েক জমি সে নিজের বলে পাবে, তা নিবারণ অনেক মানুষ মরেছে জঙ্গল সাফ করতে গিয়ে, অনেক কষ্ট সহ্য করে জঙ্গল তো পষ্কার করেছি আমরা। কিন্তু কোনো জমিদার, কোনো জোতদার, কোনো নায়েব কি কাউকে জমি দিয়েছে? বলো, কেউ কি জমি পেয়েছে?'

'না।'

'তা হলে তুমি কি করে আশা কর, নায়েব তোমাকে জমি দেবে? তবে ভাগে চষবার জন্যে জমি বিঘে কয়েক তোমাকে দিতে পারে নায়েব, কিন্তু কুড়ি রকমের বাজে আবাব (আবওয়াব) দিতে হবে তোমাকে। সেই সব আদায় দিয়ে, মহাজনের ঋণ শোধ করে হয়তো খালি হাতে তুমি ঘরে ফিরবে। দেখবে সারাবছর খাটুনি খেটে হাতে তোমার কলাটা সম্বল হয়েছে।'

গণপতি চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। গভীর মনোযোগ দিয়ে নিবারণের মুখের দিকে চাইল। তারপর বলল, 'আর দেখ চাষীর ঘরের বৌ-ঝিদের নিয়ে কেমন বদমায়েশি লাগিয়েছে নায়েবরা। যেন চাষীর ঘরের বৌ-ঝিরা বেশ্যা মাগী, ডাকলেই কাছারিতে গিয়ে রাত কাটিয়ে আসবে। নিবারণ, যারা বাধ্য হয়ে উপোসের জ্বালায় বৌকে, মেয়েকে, বুনকে কাছারিতে পাঠায় তাদের প্রাণের জ্বালা তুমি কি বুঝতে পারো? তারা এর

প্রতিশোধ কি নেবে না? তারা কি মানুষ নয়?'

নিবারণ গোঙানির স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, তাদের কষ্ট আমি জানি, কিন্তু কেমন করে তারা শোধ নেবে, তাদের কী আছে?'

গণপতি বলতে লাগল, 'আমরা কৃষক সমিতি তৈরী করব। সব চাষীকে আমরা এই কথা বোঝাব যে আমাদের দাবি হলো, আমাদের বাঁচতে দিতে হবে, আমাদের উপরে কোনো অত্যাচার করা চলবে নি, আর যারা অত্যাচার করেছে তাদের উপর কড়ায় গণ্ডায় তার শোধ দিতে হবে। কিন্তু একা তো পারব নি। একা মানেই দুর্বল, একা মানেই বোকা। তাই আমাদেব দল বাঁধতে হবে, জোট বাঁধতে হবে। তখন দেখবে কি না-করতে পারি আমরা।'

নিবারণ সন্দেহ প্রকাশ করল, 'কিন্তু কেউ কি রাজী হবে জমিদার নায়েবের শত্রুতা করতে?'

গণপতি পাগলের মতো বলে ওঠে, 'আমি বলছি নিবারণ রাজী হবেই, সবাই ভেতরে ভেতরে আগুন হয়ে আছে, শুধু এক জায়গায় মিলতে পারলে ভীষণ কাণ্ড হয়ে যাবে। নিবারণ, সহ্য করো না, সহ্য করলেই তুমি শেষ হয়ে গেলে। মানুষের মতো বাঁচবার জন্যে প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়েও আমাদের লড়তে হবে।'

গণপতি চুপ করে গেল। নিবারণও অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। হঠাৎ নিবারণ বলে উঠল, 'আমাকে কি করতে হবে বলো।'

'তুমি কৃষক সমিতির লোক হও, তুমি মানুষকে বোঝাও।'

'কি বোঝাবো?'

'বলো আর আমরা অন্যায় অত্যাচার সহ্য করব নি। আমরা পরিশ্রমের ফসল কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নোব। অত্যাচারের শোধ নোব। তার জন্যে আমাদের দল বাঁধতে হবে। আমরা এক জোট হলেই আমরা শক্তিশালী হব। আমরা আলাদা আলাদা থাকি আর ভয় পাই বলেই জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ান, পাইক, পুলিশ আমাদের ওপর অযথা অত্যাচার করে, আমাদের খিদের ধান কেড়ে নেয়, আমাদের বৌ-ঝিয়ের সতীত্ব নষ্ট করে, আমাদের পিঠে যখন তখন চাবুক মারে, আমাদের মা-বাপ তুলে নোংরা গালাগালি দেয়।'

নিবারণ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, বলল, 'আমি কৃষক সমিতির লোক হলাম। আর তুমি যে-কাজ করতে বলবে আমি তাই করব।'

গণপতি আনন্দে জড়িয়ে ধরল নিবারণকে।

নিবারণ বলল, 'গণদা তুমি দুটো মুড়ি খেয়ে যাও।'

গণপতি বলল, 'মুড়ি আছে তোর ঘরে?'

'তা আছে।'

'তবে দে দুটো আমার গামছার খুঁটে, আমি বাড়ী যাব নি, আমি এখন প্রত্যেক লোকের কাছে যাব, একথা বোঝাব। আর খুব অভাবে পড়লে আমার কাছে যেও নিবারণ।'

নিবারণ গণপতিকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে গণপতির গামছার আঁচলে মুড়ি দিল, কাঁচা লঙ্কা দিল। বসতে অনুরোধ করল। গণপতি আর না বসে নিবারণের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। নিবারণ অনেক দূর চলল গণপতির সঙ্গে সঙ্গে। তারপর নিবারণকে বাড়ী ফিরতে বলে গণপতি চন্দনপিঁড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

খেয়া নৌকায় চন্দনপিঁড়ির নদী পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছল সতীশের বাড়ী। সতীশ তার মেয়েকে সন্ধের সময় নায়েব ভবেশ দাসের কাছারিতে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল। যদিও সে জানত ক্ষুধার্ত নেকড়ের মুখে কচি ছাগল ছানার মতো মেয়েকে তার ছুড়ে দিচ্ছে সে, তবু পরিত্রাণ বা নিষ্কৃতির কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে সে তাই করেছিল। গণপতির মনে পড়ে গেল, ঘুলি ঘুলি ভোর বেলায় নায়েবের কাছারি থেকে ফিরছে সেই মেয়ে। কিশোরী কাঁচা সেই মেয়ে কাল সাপের ছোবলের বিষে নীল হয়ে ঢলে-পড়া মূর্তির মতো নায়েবের বিষাক্ত কাম-লালসার শিকার হয়ে টলতে টলতে ফিরছে। মেয়েটির প্রতি করুণ মমতায় গণপতির সারা প্রাণ হাহাকার করে উঠেছিল। চোখ দিয়ে সহসা ওর জল ঝরে পড়ল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই নায়েব ভবেশ দাসের চেহারাটা ওর স্মৃতিতে জেগে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে গণপতি মনে মনে বলতে লাগল, 'ভবেশ দাসকে যদি এর শোধ দিতে না পারি, আমি মানুষের বাচ্চা নই, বাবা আমাকে জন্ম দেয় নাই, এর উচিত শাস্তি যদি আমি দিতে না পারি আমার যেন মরণ হয়।'

অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণায় ক্রোধে উন্মাদ হয়ে সে পথ চলতে লাগল।

এবং কখন যে সে সতীশের বাড়ীর কাছে চলে এসেছে তা খেয়ালও ছিল না। হঠাৎ সামনেই সতীশকে দেখে সে সচেতন হলো। সতীশ অবাক হয়ে গণপতির রুদ্র ভয়ঙ্কর মুখ দেখছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'গণদা চলেছ কোথা?'

'আমি তোমার কাছেই এসেছি সতীশ, চলো একটু নিরিবিলিতে মাঠের দিকে যাই, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

গণপতিকে অনুসরণ করে সতীশ মাঠের এক বাগান-ঘেরা পুকুরের পাড়ে এসে উপস্থিত হলো।

সতীশ বলল, 'এইখানেই বসা যাক।'

'ঠিক আছে এইখানেই বসব।'

ওরা দুজনেই বসে পড়ল। সতীশের চোখের দিকে প্রজ্বলিত চোখে তাকিয়ে গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'সতীশ তুমি মানুষ তো?'

সতীশ অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ মানুষ বৈকি?'

তাহলে তোমার মেয়ের সর্বনাশ যে করেছে, তোমার সর্বনাশ যে করছে তার উপরে শোধ নেবে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি হাত পা বাঁধা।'

'ও সব নাকী কান্না আমি শুনতে আসি নাই। আমি যা বলছি তার জবাব দাও।'

'কি বলো?'

'আমরা চাই এই সুন্দরবনের মাটিতে জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ানের কবর তৈরি করব। আমাদের পরিশ্রমের ন্যায্য দাম চাই। যে-ফসল আমরা ফলাব সে-ফসল অন্য কেউ জুলুম করে কেড়ে নেবে তা আমরা সহ্য করব নি, আমাদের বৌ-ঝিদের ইজ্জত নিয়ে যারা ফুর্তি করে তাদের মুণ্ডু ছিঁড়ে নোব। তুমি রাজী আছ? তোমার মেয়ের সেই কান্না মনে আছে তোমার? আমি বাজে কথা শুনতে চাই না, পষ্কার জবাব দাও আমাকে।'

সতীশ বলল, 'আমি রাজী আছি।'

'তাহলে বলি শোনো সতীশ, এ জমি ভগবান রেজিস্ট্রি করে জমিদারদের দেয় নাই, আমরা খাটি আমাদেরও বাঁচবার অধিকাব আছে। এই সব জমি

চাষীর হবে, যে চাষী জমিকে মাগ-ছেলের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। আর তার জন্যে চাই গায়ের জোর, শক্তি, জোর, তাগদ। নায়েবের পা ধরে কেঁদে ভিক্ষা চাইলে কিছুই হবে নি। তাতে জুটবে শুধু লাথি, বুঝেছ?'

'কি করতে চাও তুমি?'

'আমরা চাই সমস্ত গরীব চাষীকে একতাবদ্ধ করতে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে, ন্যায্য পরিশ্রমের ফসল কারুর জুলুমের ভয়ে ছেড়ে দোব না, প্রতিজ্ঞা করতে হবে অপমানের প্রতিশোধ নোবই, জীবন দিয়েও প্রতিশোধ চাই।'

'তুমি বলো আমাকে কি করতে হবে?'

'তুমি তোমার গাঁয়ের লোকজনদের ডেকে একদিন সন্ধেবেলা গোপনে কোনো বাড়ীতে বসাও। আমি এসে আলোচনা করব। আমি ইন্দ্রকেও বলে যাব। তাকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ করবে। লোককে বোঝাও, সাহস দাও, দেখ সুন্দরবনে আগুন জ্বলে উঠবে। পাঁঠাকাটার মতো বলি দোব ঐ সব পাঁঠা জমিদার, জোতদার, নায়েবদের। কারও নিষ্কৃতি নাই। কাউকে ছাড়া হবে নি।'

উঠে দাঁড়াল গণপতি। বলল, 'আমার কথা মনে রেখে কাজ করবে। আমি এখন ইন্দ্রের বাড়ী হয়ে বাড়ী যাব।'

'আজকে থেকে যাও।'

'না, না, আমার সময় নাই, আমার বুকে আগুন জ্বলছে। আমি চুপ করে বসে থাকতে পারব নি। আমাকে গাঁয়ে গাঁয়ে যেতে হবে।'

সূর্য তখন মাথার উপরে উঠেছে। আলের উপর দিয়ে গণপতি ইন্দ্রের বাড়ীর দিকে হেঁটে চলল। সতীশ ওর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।

ইন্দ্রকে বলল গণপতি, 'ইন্দ্র, তুমি সতীশকে নিয়ে গাঁয়ের লোকদের ডেকে একটা গোপন মিটিংয়ের ব্যবস্থা কর। আমি আসব। আমার অনেক কথা বলবার আছে। তোমরাও বলবে। ইন্দ্র, দেরি করো না ভাই।'

ইন্দ্র অনেক অনুরোধ করল গণপতিকে তার বাড়ীতে খেয়ে যাবার জন্যে।

গণপতি বলল, 'কাঁচা পোয়াতি বৌ বসে আছে না খেয়ে, আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

ইন্দ্র আর সতীশের কাছে বিদায় নিয়ে শূন্য খাঁ খাঁ করা মাঠের উপর দিয়ে গণপতি দ্রুত বেগে চলতে লাগল।

ইন্দ্র সেইদিকে তাকিয়ে সতীশকে বলল, 'মানুষটা একেবারে খেপে উঠেছে, দেখবে ও আগুন জ্বালিয়ে তবে ছাড়বে। আমাদের একজন ঐ রকম মানুষের দরকার ছিল।'

বাড়ীর কাছে পৌঁছতেই শীতের বেলা ম্লান হয়ে এল। দূর থেকে দেখতে পেল মোহিনী ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। গণপতি বুঝতে পারল মোহিনী তারই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাছে যেতে মোহিনী যেন আত্মস্থ হলো। মোহিনীর মুখখানি শুকিয়ে উঠেছে।

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'এখনও তুমি উপোস করে আছ বোধ হয়।'

'তুমি সেই সকালে বেরিয়ে গেলে, আমি খাব কেমন করে?'

'তাই বলে তুমি কাঁচা পোয়াতি না খেয়ে বসে থাকবে? এখন মাঠে আর কাজে নাই, আমি কখন ফিরব, কি করব ঠিক নাই। আর তুমি আমার জন্যে বসে থাকবে নি।'

তাড়াতাড়ি চান-খাওয়া সেরে নিয়ে গণপতি গুম হয়ে বসে বসে বিড়ি টানতে লাগল।

মোহিনী খাওয়া সেরে গণপতির কাছে এসে বসল। মোহিনী এতদিনে মানুষটাকে চিনে গেছে। সে বুঝতে পেরেছে গণপতি তাকে এখন কিছু বলতে চায়। তাছাড়া গণপতির কাছে বসে থাকতে ভালো লাগে মোহিনীর।

হঠাৎ ঘুমন্ত ছেলেটা কেঁদে উঠল। মোহিনী উঠে গিয়ে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে এসে গণপতির সামনেই কাপড় সরিয়ে দুগ্ধভারাবনত কৃষ্ণচূড় স্তন খুলে ছেলের মুখে গুঁজে দিয়ে বলল, 'বলো কি বলবে।'

গণপতি বলল, 'মোহিনী, আমার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আমি লেখাপড়া সামান্য জানি। বইপত্র কিছুই পড়ি নাই। আমি সব কথা গুছিয়ে বলতে পারছি না। বলতে পারছি না বলে আমার কষ্ট হচ্ছে।'

গণপতি থামল। মোহিনী নীরবে আরও শুনবার জন্যে অপেক্ষা করে রইল।

গণপতি আবার বলল, 'আর পাঁচজনের বৌয়ের মতো তুমি থাকতে পারবে নি। তোমাকে অন্য রকম হতে হবে। নিজেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে। তোমাকে আমি ছোরা চালানো, বর্শা চালানো শিখিয়েছি। রাত বিরেতে কেউ বাড়ীতে না থাকলে কেউ যদি এসে পড়ে লড়ে মরবে, কিন্তু ধরা দেবে না। যদি ধরা দাও, যুদ্ধ করতে ভয় পাও, আমি তোমাকে খুন করে ফেলব।'

'কেন তুমি ত থাকবে রাত বিরেতে। আমাকে লড়তে হবে কেন?'

'বোধ হয় আমি আর ঘরে থাকতে পারব নি। আমাকে ঘুরতে হবে গাঁয়ে গাঁয়ে, মানুষকে আমি আমার কথা বলব। বৌ-ঝিয়ের ইজ্জত যারা লুটে নেয় সেই সব পাঁঠাদের বলি দিতেই হবে, চাষীদের মেহনতের ধান যারা কেড়ে নেয় তাদের উচিত শিক্ষা দিতেই হবে। চাষী জুতো পরে কাছারির সামনে দিয়ে গেলে নায়েবরা খুঁটিতে বেঁধে চাবুক মারে, এসব বন্ধ করতেই হবে। না হলে আমাকে এখান থেকে পালাতে হবে। তা শেয়ালের মতো পালাব, না, লড়ে মরব? তুমি বলে দাও। আমার যদি একখানা বন্দুক থাকত! আমি, আমি যে কি করব!'

মোহিনী বলল, 'তুমি অমন করছ কেন বলো দিনি! চেষ্টা কর, ধীরে সুস্থে সব হবে।'

গণপতি আত্মসংবরণ করে বলল, 'ঠিক আছে। আমি যা বলছিলাম, এবার থেকে আমার জন্যে না খেয়ে বসে থাকবে নি। রাত বিরেতে না ফিরলে ভাববে নি, ভয় পাবে নি, মাথার কাছে বর্শা নিয়ে শোবে। তেমন কিছু হলে লড়বে। যুদ্ধ করে যদি ধরা পড়তে বাধ্য হও তার জন্যে তোমার কোনো দোষ নাই।'

মোহিনী বলল, 'বেশ গো বেশ, আমার কথা তোমাকে ভবাতে হবে নি। তুমি যা করতে চাইছ তাই কর গে।'

পর পর কয়েকটা বিড়ি টেনে গণপতি উঠে পড়ল, বেরবার উদ্যোগ করে বলল, 'ফিরতে আমার বেশি রাত হলে খেয়ে শুয়ে পড়বে।'

মোহিনী বলল, 'রাত হলে অন্ধকারে ফিরবে কেমন করে? হারিকেনটা নিয়ে যাও।'

'হারিকেন নিয়ে গেলে তোমার চলবে কেমন করে?'

'আমি পিদিম জ্বালিয়ে কাজ করব।'

'অন্ধকারকে ভয় করলে আমার চলবে নি।'

আর কোনো কথা না বলে গণপতি মাঠের পথ ধরল। সে জানে হরি মুদির দোকানে আর রতনদের ঘরের দাওয়ায় সন্ধের সময় দুটো আড্ডা বসে। কিছু মানুষজন এসে বসে গল্পগুজব করে। সে রতনদের বাড়ীর আড্ডার দিকে চলতে লাগল।

সূর্য তখন অস্তাচলে। লালচে আলোয় আকাশ মাঠ বন রাঙা হয়ে উঠেছে। যে পাখিরা ধান-তোলা মাঠে নীবারকণা খুঁটছিল তারা দল বেঁধে ঘরে ফিরছে। উত্তুরে হাওয়া ক্রমশ রুক্ষ হয়ে উঠছে। সুতীর চাদরটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে গণপতি চলতে লাগল।

রতনদের ঘরের দাওয়ার সামনে গিয়ে উপস্থিত হতেই কলকণ্ঠে ডেকে উঠল কয়েকজন 'আরে গণদা এসেছে, এসো এসো গণদা, ওপরে উঠে এসো' বলে তারা অভ্যর্থনা জানালো।

গণপতি অল্প হেসে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে বসে একটু গল্পগুজব করতে ইচ্ছে করল। তাই চলে এলাম।'

'ভালোই করেছ তো, যা শীত পড়েছে! ঘর থেকে বেরনোই দায়।'

গণপতি আর কথা না বলে পাতা চটের উপর একপাশে বসে পড়ল। একটা বিড়ি ধরিয়ে চুপ করে বসেই রইল।

লোকগুলি নানান রকম আলোচনা আরম্ভ করেছে। সাপের মন্ত্র এবং ওঝা নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা চলল। মেয়েমানুষ নিয়ে জমাটি কথা হলো খানিকক্ষণ। তারপরেই কেমন করে যেন অভাব অভিযোগের কথা উঠে পড়ল।

হরেরাম বলল, 'সারাবছর খেটে যা ধান তুললাম জোতদারদের ঘরে সব তুলে দিয়ে দুমুঠো নিয়ে ঘরে এলাম। এখন সারাবছর কেমন করে যে চলবে!'

কেষ্ট বলল, 'গেল বর্ষায় মন দশেক ধান ধার নিয়েছিলাম। ধান উঠতেই সত্যি সত্যি বিশ মন ধান আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে। কাঁদাকাটা করলাম তা কানে তুলল না।'

সুধীর বলল, 'আরে ধানের সুদ নিক ভাও দিতে পারা যায়, কিন্তু ঐ যে সব, কি সব আদায় করে, খামারছিলা, কয়ালি, ভাত-খাওয়ানি, ছেলের জন্ম, মেয়ের বিয়ে, ঐগুলো দিতে বড্ড গা কচ্ কচ্ করে মাইরি। জমিদারের ছেলের বিয়ে, ভাতখাওয়ানি তা আমরা কি করব বল দিনি। এই সব দিয়ে খালি হাতে ঘরে ফিরতে হয়।'

গণপতি এতক্ষণে কথা বলল, 'দাও কেন?'

সুধীর বলল, 'গণপতি তোমার মতো সাহস আমাদের নাই মাইরি। আর না দিয়েই বা কি করব বলো, অভাবে পড়লে সেই জোতদারই ধান ধার দেয়। না দিলে জমি কেড়ে নেবে তখন যাবো কোথা।'

গণপতি আর কোনো জবাব না দিয়ে আবার একটা বিড়ি ধরিয়ে টানতে লাগল।

শম্ভু বলল, 'আমার মেয়েটা গতবারে বর্ষার সময় মরে গেল। চিকিস্যে হলো না টাকার অভাবে। বাবুকে বললাম, বাবু কটা টাকা ধার দেন—তা দিল না। মেয়েটা আমার মরে গেল। কিন্তু আমার সারাবছরের খাটুনির ধান আমি বাবুর গোলায় তুলে দিয়ে এসেছিলাম।'

তারপর একে একে অসংখ্য অভিযোগ যন্ত্রণা হা-হুতাশ উতরোল হয়ে উঠল। কাউকে জমিদারের নায়েব লাথি মেরেছে, কারও বৌকে নষ্ট করেছে, কারও ঘরে এক মুষ্টি ধান ওঠে নি। বিলাপ করে আর্তনাদ করে ওর নিজেদের হালকা করতে চাইছে। প্রতিকারের কথা কেন ওরা ভাবছে না। ওরা রাগছে না কেন, নিজেকে জিজ্ঞাসা করে গণপতি।

হঠাৎ গণপতির গম্ভীর কণ্ঠ দৈববাণীর মতো বেজে উঠল, 'আমি কিছু বলতে চাই।'

গণপতির কথার ধরণে সবাই চুপ করে গেল। গণপতি কি বলে শুনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

প্রথমে ওর কথা একটু বেধে বেধে গেল। কিন্তু বারংবার বলে বলে এবং চিন্তা করে করে ওর বক্তব্য ক্রমশঃ ওর কাছে স্পষ্ট এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল, তাই ও গুছিয়ে বলতে পারল। গণপতি বলতে লাগল, 'সুন্দরবনের চাষীদের উপরে অনেক অত্যাচার চলছে। কুড়ি রকম বাজে আদায় করে ভাগচাষীদের কাছ থেকে জমির মালিকরা। জুলুম করে ভয়

দেখিয়ে আদায় করে। আমরা চাষীরা তা মেনে নিয়ে খালি হাতে ঘরে ফিরি। যে সব চাষী জঙ্গল হাসিল করল তাদের কিছু কিছু জমি দোব বলেও জমিদাররা কিছুই দিল না। আমাদের ঘরের মা বোন বৌদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে নায়েব জমিদাররা তাদের সতীত্ব নষ্ট করে। আমাদের ঘরের মেয়েরা যেন তাদের বেশ্যা। চাষীরা কেউ জুতো পরে কাছারির সামনে দিয়ে গেলে মালিকরা তাকে ধরে জুতো-পেটা করে। সামান্য কারণে ধরে নিয়ে গিয়ে খুঁটিতে বেঁধে চাবুক চালায়। চাষীর পরিশ্রমের ধান লুটে নিয়ে তারা সুখে থাকে, শহরে থেকে ফুর্তি করে। পুলিশ তাদের লোক। পুলিশকে তারা ঘুষ দেয়, বিলাতি মদ দেয়, আমাদের ঘরের মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে দারোগার সঙ্গে জোর করে শুতে পাঠায়। আর চাষীর ঘরে হাহাকার। চাষী রোগে ওষুধ পায় না, লেখাপড়া শিখতে পারে না, তার পেটে ভাত নাই, পরনে কাপড় নাই। আমরা আর মানুষ নই, পশুর অধম হয়ে গিয়েছি। আমরা মার খাই, লাথি খাই, চাবুক খাই আর সহ্য করি, নায়েবের পায়ে তেল মেরে ভাবি বাঁচতে পারব। কিন্তু আমি বলতে পারি ভিক্ষা করে কেউ কখনো মানুষের মতো বাঁচতে পারে না। গায়ের জোরই হলো আসল জিনিস। আমরা যদি ভয় না করি সবাই মিলে এই জমিদার, জোতদার, নায়েবের বিরুদ্ধে একজোটে দাঁড়াতে পারি তাহলে ওদের জব্দ করা যায়। দরকার হলে খুন করেও ফেলতে হবে। দেখবে তখন সব ব্যাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি কতমাস ধরে ভেবে দেখেছি যদি সুন্দরবনের সব চাষী, সব ক্ষেতমজুর একজোট হয়ে অস্তর ধরতে পারে তাহলে সুন্দরবনের সব জমি, সব বন, সব সম্পত্তি চাষীদের হয়ে যাবে। কোনো শালার ক্ষেমতা নাই যে চাষীদের হাত থেকে সুন্দরবন কেড়ে নিতে পারে। তাই আমি বলি আমাদের উচিত দলবাঁধা, সহ্য না করে রুখে দাঁড়ানো।'

গণপতি চুপ করল। কিন্তু অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। মাঠে মাঠে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। ঝিঁঝির কান্না ভেসে আসছে উত্তুরে হাওয়ায়। অদূরে চন্দনপিঁড়ির নদীর কূলের জঙ্গলে বাতাস সন্ সন্ ডাক ছেড়েছে।

নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রতুল বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে আছি। তুমি যা

করতে বলবে আমি তা করব।'

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'সুধীর, কেষ্ট, শম্ভু, হরেরাম, রতন তোমরা বল কি বলতে চাও।'

রতন বলল, 'কথা তো ঠিকই বলেছ গো। কিন্তু মানুষ কেমন যেন দমে গিয়েছে, অতটা সাহস কি ওদের হবে।'

গণপতি অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, 'কিন্তু এ ছাড়া তো অন্য কোনো পথ নাই, হয় লাথি, কানমলা, চাবুক খেয়ে বৌ-ঝিয়ের ইজ্জত বেচে, না খেয়ে মর, আর না হলে সব ভয় ভুলে গিয়ে রুখে দাঁড়াও। একা দাঁড়ালে মার খেয়ে মরবে, তাই জোট বাঁধো, দলবদ্ধ হও। তুমি যদি অন্য কোনো পথ দেখাতে পার, তাহলে বলো—'

রতন চুপ করে গেল।

সুধীর বলল, 'তোমার কথাই ঠিক গণদা, কেমন করে কি করতে হবে বলো দেখি।'

তখন গণপতি দ্বারিক নগরের মিটিংয়ের কথা বলে বলল, 'কৃষক-সমিতি তৈরি হয়েছে। সমস্ত কৃষককে তার মেম্বার হতে হবে। তারপর কৃষকরা একত্র বসে মিটিং করে ঠিক করবে কেমন করে, কি ভাবে আমরা কাজ আরম্ভ করব। সেই রকম কাজ হবে।'

শম্ভু বলল, 'তাহলে আর একদিন সবাইকে ডেকে বসা হোক। গণদা, তুমি তাদের সব কথা বলো। একসঙ্গে সবাই কৃষক-সমিতির মেম্বার হয়ে যাব।'

গণপতি বলল, 'ভালো কথা। একটা দিন ঠিক করে যত জনাকে পার ডেকে বসাও।'

একটু থেমে গণপতি ফের বলল, 'কিন্তু আসল কথা হচ্ছে শক্তি। গায়ের জোরের কাছে সবাই মাথা নোয়াবে। কাকুতি-মিনতি করলে কোনো লাভ হবে না।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর গণপতি ওদের কাছে বিদায় নিয়ে অন্ধকারে নেমে পড়ল। ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌, উত্তুরে হাওয়া অবাধে ছুটে আসছে। যেন থাবা মারছে মুখে বুকে পিঠে। পায়ের পাতাটা যেন ঠাণ্ডায় জমে গেছে বলে মনে হচ্ছে। এই শীতের সন্ধেয় কেমন যেন ভুতুড়ে

পরিবেশ ঘনিয়ে উঠেছে। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে বন, তারপর ধানের ক্ষেত, তারপর আবার বন। বনের গাছগাছালি উত্তুরে হাওয়ায় যেন হাহাকার করছে।

গণপতি মুদির দোকানের দিকে দ্রুত পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল। তাড়াতাড়ি যেতে পারলে সেখানেও কিছু লোককে পাওয়া যাবে। মুদির দোকানে গিয়ে দেখল সেখানে যে কজন লোক আশা করেছিল তাব চেয়ে বেশী লোক জমে আছে। উত্তেজিত কথাবার্তা চলছে। একটা কিছু ঘটেছে নিশ্চয়। গণপতি যেতে সবাই যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

কলকল করে একসঙ্গে সবাই ব্যাপারটা বলতে চাইল। গণপতি কারও কথাই ঠিক মতো বুঝতে পারল না। দেখল কে একজন হাঁটুতে মাথা গুঁজে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে।

মুদির দোকানে টিনে, বস্তাতে, হাঁড়িতে অল্প-স্বল্প মাল সাজানো। মাঝখানে একখানা জলচৌকির উপর মুদি বসে আছে। চাল থেকে ঝোলানো একটা লম্বা দড়িতে একটা হারিকেন ঝুলছে।

মুদিকে উদ্দেশ্য করে গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে কি? ও বসে আছে কে?'

মুদি বলল, 'ও যোগেশ, ধানের ভাগ নিয়ে নায়েবের সঙ্গে কি টকঝক হওয়াতে নায়েব ওকে গোঁজে বেঁধে চাবুক দিয়ে মেরেছে।'

গণপতি যোগেশের কাছে গিয়ে পাশে বসে যোগেশকে জড়িয়ে ধরল, বলল, 'কি হয়েছে যোগেশ। আমাকে বলো কি হয়েছে।'

গণপতির সাহসিকতার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সেই গণপতি যে মহিম ঘোষের মুখের উপর অপমান করে আসতে পারে, যে জোতদারকে বাজে আবওয়াব দেয় নি, যে নায়েবের বিরুদ্ধে মামলা করবার জন্যে শহরে যেতে পারে। গণপতির সাহসিকতা সম্পর্কে কিছু কিছু গল্পও মুখে মুখে অতিরঞ্জিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই ওকে অনেকেই সমীহ করে। গণপতি কাছে এলে মানুষগুলি ভয়ও যেমন পায় তেমনি পরম আরামও বোধ করে। গণপতি ওদের গোপন-মনের অস্ফুট বিদ্রোহের যেন এক মূর্তিমান রূপ।

গণপতির সহানুভূতিতে যোগেশ সহসা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। গণপতি ওকে কিছুটা কেঁদে নেবার সময় দিল। তারপর বলল, 'আমাকে বলো কি ব্যাপার হয়েছে।'

যোগেশ বলতে লাগল, 'আমি গেল বার বর্ষার সময় কিছু ধান ধার নিয়েছিলাম। নায়েববাবু বললে, সব ধার শোধ করে দিতে হবে। সব ধার, আবাব (আবওয়াব) দিলে আমার আর কিছুই থাকত না, তাই আমি বললাম, বাবু আমার ছেলেমেয়েরা কি খাবে বাবু, এবার ধারটা আর নেবেন না বাবু।' একটু থেমে বলল, 'তা বাবু বললে কি, তোর বৌকে সন্ধে বেলা আমার কাছারি পাঠিয়ে দিস, তাহলে ধান পাবি। আমি নিজেকে সামলাতে পারলাম না, বললাম বাজে কথা বলবে নি বাবু। তাতেই আমাকে দারোয়ান দিয়ে খুঁটিতে বেঁধে পিটলে। বললে, যত বড় মুখ লয় তত বড় কথা, চাবকে তোর মুখ আমি ছিঁড়ে দোব। বললে, শালা তোর বৌকে যদি আজ ধরে আনি তোর কোন বাবা আটকাবে শালা।'

গণপতি বলল, 'তাই তুমি কাঁদছ যোগেশ। কিন্তু শুধু কেঁদেই তো কিছু হবে না। দুঃখ পেয়েছ কাঁদবে বৈকি। কিন্তু এই অপমান সহ্য করবে, নাকি এর বদলা নেবে।'

যোগেশ চুপ করে রইল।

গণপতি বলল, 'যদি আমরা চাষীরা সবাই দল বেঁধে এক হতে পারতাম, যদি যোগেশের এই অপমানে আমরা সবাই গিয়ে নায়েব হারামজাদাকে ধরে পেটে আচ্ছা করে লাথি ঝাড়তে পারতাম তাহলে এর জবাব হোত। শোনো ভাই সব, আরও যদি সহ্য কর, তোমরা আর মানুষ থাকবে না, ভেড়া হয়ে যাবে তোমরা। মার খেয়ে যদি মার দিতেও পার তবেই বাঁচবে। তা নাহলে বাঁচবার আর কোনো পথ নাই, খেটে মরবে আর উপোস করে ধুঁকবে। আর কথায় কথায় জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ান, পাইক, পুলিশ তোমাদের লাথি মারবে, খুন করবে, তোমাদের মা বোন স্ত্রীর ইজ্জত কাড়বে।'

একটু থেমে গণপতি ক্রোধে উন্মাদ হয়ে চেঁচাতে লাগল, 'জোট বাঁধতে হবে। কারণ একা কেউ লড়তে পারবে না। মার দিতে হবে, নিজেদের

দাবি কেড়ে নিতে হবে। বজ্জাত নায়েব আর গোমস্তাদের মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে, ওসব রামপাঁঠা, ওদের পাঁঠার মতো বলি দিতে হবে বিশালাক্ষীর থানে।'

গণপতি চুপ করে প্রজ্বলিত চোখে তাকিয়ে রইল মানুষগুলির ছায়া-ছায়া মুখের দিকে।

শিবনাথ হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আমরা কেমন করে জোট বাঁধব?'

গণপতি বলল, 'আমরা কৃষক-সমিতি করছি। এ অঞ্চলের সব চাষীকে সেই কৃষক-সমিতির মেম্বার হতে হবে। আলোচনা করে ঠিক করতে হবে আমরা কি কি করব। তবে আমি অনেক ভেবেছি। আমি দেখেছি, আমাদের দাবি হবে আমরা বাজে আবাব (আবওয়াব) দোব না। জমির মালিক জমিদার জোতদাররা জমিতে কোনো কাজ করে না, আমরা মাথার ঘাম জমিতে ফেলে ফসল ফলাই। তাই ফসলের ভাগ ভাগচাষীকে বেশি দিতে হবে। এক মন ধানে আধ মন সুদ নিলে চলবে নি। আর আমাদের কোনো চাষীকে কোনো জমিদার বা জোতদার বা নায়েব বা দারোয়ান অপমান করলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। আর যে আমাদের মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করবে তাকে খুন করতেই হবে। গায়ের জোরে অস্ত্রের জোরে জমিদারদের শেষ করে দোব আমরা। এ সুন্দরবনে চাষীর রাজত্ব কায়েম করব আমরা।'

অনেক আলোচনা হলো। যোগেশ তার দুঃখ ভুলে উত্তেজিত হয়ে উঠল। একদিন সবাই বসে আলোচনা করা হবে ঠিক করে গণপতি বাড়ীর উদ্দেশে পথে নেমে পড়ল।

তখন ক্ষীণ চাঁদ উঠেছে আকাশে। হু হু করছে ফাঁকা মাঠ। হিম হাওয়া যেন এক পাল নেকড়ের মতো তীক্ষ্ণ নখর উদ্যত করে তাড়া করে আসছে। দূরে অদূরে ছড়ানো-ছিটোনো বাড়ীগুলির কোনো কোনোটাতে ক্ষীণ আলোর শিখা চোখে পড়ছে। বনের শাখায় পাতায় বাতাস সাঁ সাঁ করছে, শুকনো পাতার খসখসানি শোনা যাচ্ছে, কোনো রাত্রিচর প্রাণী বোধহয় হেঁটে যাচ্ছে শুকনো পাতার উপর দিয়ে। আকাশে চোখ মেলল গণপতি, আকাশ নীল, গভীর কোমল নীল। সেই নীলিমায় বাঁকা চাঁদ মধুর হাসি ছড়াচ্ছে। চাঁদের আলো-মাখানো নরম নীলাকাশের গায়ে

নারকেল গাছগুলির সবুজ পাতাগুলি ঝিল্‌মিল্‌ করছে।

সহসা মোহিনীর জন্যে গণপতির প্রাণের ভিতরটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। মোহিনীর জন্যে যেন করুণ বিরহ-বেদনা অনুভব করতে লাগল গণপতি। মোহিনীকে হঠাৎ তার বড় দুঃখিনী বলে মনে হলো। কিন্তু কি লজ্জা গো, কি জ্বালা, এই নির্জন রাতে বিশাল মাঠের সরু আলপথ ধরে একা একা হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর যেন সে শুনতে পেল বাতাসের হাহাকারে। ঝন্‌ ঝন্‌ করে উঠল বুকের ভিতরটা। গণপতির মনে হলো আর এক মুহূর্ত সে একা থাকতে পারবে না। মোহিনীকে এক্ষুনি কাছে না পেলে বড় অসহায় বোধ হতে লাগল তার নিজেকে।

'নির্জন মাঠের বুকে এই আলোছায়াময় রাতের বেলা গণপতি হাঁটছে, বুকের ভিতর অপরিমিত বেদনা ও যন্ত্রণার, দুঃখ ও বিদ্রোহের গুরুভার বয়ে। সে যেন এই সুন্দরবনের এক অভিশপ্ত আত্মা যে জেগে আছে কত যুগ ধরে, যার দীর্ঘশ্বাস ঝরছে সুন্দরবনের এই আদিগন্ত মাঠ ও অন্তহীন আকাশের বুকে।

বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে গণপতি ভাইদের নাম ধরে ডাকল। এক ভাই দরজা খুলে দিল। ভিতরের ঘরের দরজার সামনে গিয়ে বড় যেন তৃষিত কণ্ঠে ডাকল গণপতি, 'মোহিনী, মোহিনী।'

মোহিনী উঠে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল বাইরে থেকেই ওর ডাক শুনে। দরজা খুলে দিল। গণপতি ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে মোহিনীকে কঠিন আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলল। মোহিনী মুখ লুকোলো গণপতির বুকে। গণপতির ঠাণ্ডা হিম হাত দুখানা মোহিনীব উষ্ণ পিঠে ছ্যাঁক করে লাগল যেন। ঘরের কোণে ছোটো কুলুঙ্গিতে জ্বলছিল রেড়ির তেলের মিটমিটে প্রদীপ। এদিকে কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য বলে হারিকেন বা ল্যাম্প ওরা প্রায়ই জ্বালে না, প্রদীপ জ্বালায়। ঘরের একদিকে হাঁড়ি কলসী বাসনপত্র সাজানো। অন্যদিকে দেওয়াল ঘেঁসে মোটা করে খড় বিছিয়ে তার উপরে বিছানা করা আছে। সে বিছানায় গণপতির নতুন শিশু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমের ঘোরে ঠোঁট চুষছে। স্বপ্নেও স্তন পিপাসার স্বাদ নিচ্ছে বুঝি।

গণপতিকে ভাত-তরকারি বেড়ে দিল মোহিনী। ভাত খেয়ে হাত ধুয়ে

খড়ের গরম বিছানায় মোহিনীকে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল গণপতি। মিটমিট করে ক্ষীণ প্রদীপটি জ্বলতেই লাগল, মোহিনীর কপালের কাঁচ-পোকা টিপটি সেই আলোটুকুতে মাঝে মাঝে ঝিলকে উঠতে লাগল। তারপর রক্তে রক্ত যোগ করে বেঁচে থাকাটা অনুভব করতে লাগল দুজনে।

বাইরে শীতার্ত মধ্যরাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করছে। স্তব্ধ রাত্রির বিচিত্র শব্দ ক্ষীণ ভাবে ভেসে আসছে মাঝে মাঝে।

॥ ২২ ॥

সংসারের দিকে গণপতির আর কোনো নজরই রইল না। সংসারের সব ব্যবস্থা মোহিনীই করত। গণপতি পাগলের মতো সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরে বেড়াত। এই অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে রুখে দাঁড়ানো দরকার, সহ্য করা মেনে নেওয়া মানেই যে মরে থাকা, রুখে শক্তভাবে দাঁড়ানোই যে বাঁচা এই কথাটাই সকলের ভিতরে ঢুকিয়ে দেবার জন্যে গণপতি প্রাণপাত পরিশ্রম করতে লাগল। সে বলতে লাগল আমাদের দাবি হবে সাতটি :

১। বাজে আবওয়াব, দেড়া বার বন্ধ করতে হবে।

২। ক্ষেতমজুরদের মজুরী বাড়াতে হবে।

৩। ফসলের তিনভাগের দুভাগ ভাগচাষীকে দিতে হবে।

৪। ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করা চলবে না।

৫। ভাগচাষীর খামারে ধান উঠবে।

৬। খালবিল গোচারণ ভূমিতে সকলের অধিকার থাকবে।

৭। চাষীদের উপরে কোনোরকম অত্যাচার করা চলবে না।

গণপতি সবাইকে বলতে লাগল, 'এগুলি আমাদের ন্যায্য দাবি, কিন্তু এ দাবি আদায় করতে হলে চাষীদের জোট বাঁধতে হবে, কাকুতি-মিনতি করে জমিদার নায়েবের পায়ে পড়ে কাঁদলে কোনো ফলই হবে না, গায়ের জোরে লড়ে আদায় করতে হবে সমস্ত দাবি।'

বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে গণপতি এই সব কথা বলতে লাগল। এবং আশ্চর্য হলো এই দেখে যে, চাষী পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা এ ব্যাপারে বেশী

উৎসাহী। মেয়েরা গণপতির কথা শুনে যেন নতুন শক্তি আর উৎসাহ লাভ করে, বলে, 'এ না করলে চলবে নি। যেমন করেই হোক আমাদের এসব আদায় করতেই হবে।' মেয়েরা কেন এত মরিয়া হয়ে উঠছে? কারণ খুঁজতে গিয়ে গণপতির মনে হয়েছে, মেয়েরাই সব থেকে বেশী নিপীড়িত। সংসারে দারিদ্র্য থাকলে ঘরে চাল না থাকলে পুরুষের দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। কিন্তু মেয়েদের দুর্ভাবনা অনেক বেশি। কেননা ভাত রেঁধে তারাই ভাতের থালা নামিয়ে দেয় পুরুষের কোলের কাছে। সন্তানকে দুধ দিয়ে যত্ন দিয়ে লালন পালন করতে হয় মেয়েদেরই, হিংস্র কামুক নায়েব জমিদার পুলিশের শিকার হতে হয় মেয়েদেরই। আহা কি যে লজ্জা, কি যে অপমান, কত যে দুঃখ নিয়ে মাতাল হারামজাদাদের কাছে সতীত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে আসে ওরা তার দুঃখ পুরুষ কেমন করে বুঝবে। নিশ্চিত উপবাসের কবল থেকে পুরুষকে বাঁচাতে নিজেদেব তারা বলি দেয় পশুর কাম-লালসার কাছে। অভাবের জ্বালায় খিট-খিটে পুরুষের ঠেঙানি খায় সেই মেয়েরাই, পুরুষ জাতির বাঁদী তারা, কিন্তু ভিতরে ভিতরে স্বাধীনতা হাহাকার করে মরে। তাই মেয়েরা এত উৎসাহী হয়ে ওঠে, গণপতির পরিকল্পনা শুনে ওরা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ওরা উৎসাহ উদ্দীপনা যোগায় গণপতিকে।

গণপতি যোগাযোগ করে অন্যান্য গ্রামের নেতাদেব সঙ্গে। কৃষক-সমিতির আদি সভ্যদের সঙ্গে সে মাঝে মাঝেই দেখাসাক্ষাৎ করে, কাজকর্ম কতদূর আগাচ্ছে তার খোঁজখবর নেয়। নিজের ক্রমবিকশিত চিন্তা এবং পরিকল্পনার কথাগুলি তাদের কাছে বলে, তাদের সঙ্গে তর্ক করে, আলোচনা করে, নিজের চিন্তা এবং সিদ্ধান্তগুলিকে আরও স্পষ্ট এবং নিখুঁত করে তুলবার উদগ্র আগ্রহ ওকে কষ্ট দেয়।

কিন্তু সহজে কিছুই হতে চায় না। একমাস চেষ্টা করে অনেক কথা বলে অনেক তর্ক বিতর্ক আলোচনা করে হয়তো সে একটা কৃষক-সমিতি গড়ে তুলল। মানুষগুলির মধ্যে সাহস এবং চেতনা আনতে চেষ্টা করল। বেশ গড়ে উঠল সমিতি, কিন্তু হঠাৎ কি অদ্ভুত ভাবে আবার সব সংগঠন এলিয়ে পড়ল, ভেঙ্গে গেল, তছনছ হয়ে গেল। এমনি ভাবে অবিরত ভাঙ্গাগড়া চলতে লাগল। কৃষকসমিতির অন্যান্য কর্মীরা এমনি ভাবে একই অভিজ্ঞতা

সঞ্চয় করতে লাগল। অনেকে তো হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল, বলল, 'এরা মানুষ নয়, মানুষের চামড়া এদের গায়ে নাই।' সাধুচরণ তো কৃষক-সমিতির কাজকর্ম করা ছেড়েই দিল, কিন্তু তিন চারজন লোক কিছুতেই হাল ছাড়ল না। গণপতি দিনের পর দিন চালিয়ে যেতে লাগল তার গোপন বৈঠক, তার আলোচনা, তার কথা। সাগর জানাও তার কাজে গাফিলতি করল না। আর চন্দনপিঁড়ির ইন্দ্র আর সতীশ দিনরাত চেষ্টা করতে লাগল কেমন করে মানুষগুলিকে একতাবদ্ধ করা যায়, জাগানো যায়।

চারদিকেই যখন হতাশা আর দুর্বলতা, চারদিকেই যখন কাপুরুষতা আর নির্জীবতা তখন দিনের পর দিন এই ভাবে মানুষগুলির সঙ্গে লেগে থাকা কি যে কঠিন কাজ তা কল্পনা করাও যায় না। কত নিষ্ঠুর তাগিদ থাকলে, মনের ভিতরে কত তীব্র জ্বালা থাকলে একাজ এমনি ভাবে চালানো যায় তা তারাই জানে যারা শুধু বাক্যবাগীশ নয়, যারা কাজ করেছে, প্রতিমুহূর্তে জীবনের সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, লড়েছে।

এমনিভাবে ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে, এমনিভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে গণপতি লয়ালগঞ্জে জনাকুড়ি মানুষকে তৈরি করতে পারল। তাদের মধ্যে সাতজন ইস্পাতের মতো কঠিন, প্রচণ্ড সাহসী আর জমিদার জোতদার নায়েবদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধ অনির্বাণ হয়ে আছে তাদের বুকে। এই জনাকুড়ি সঙ্গী নিয়ে প্রতিদিন সন্ধেয় এক একটা অঞ্চলে গিয়ে গণপতি গোপনে বৈঠকী মিটিং করতে লাগল। একই কথা হাজারবার লক্ষবার বলতে লাগল। প্রতিটি মানুষের কানে তাদের কথা পৌঁছে দিতে লাগল।

এবং গণপতিরা অনুভব করতে লাগল মানুষের চোখমুখের চেহারার মধ্যে একটা পরিবর্তন ধীরে ধীরে কেমন করে যেন এসে গিয়েছে। এখনও তারা দ্বিধায় দ্বন্দ্বে আশঙ্কায় দুলছে বটে, কিন্তু গণপতিদের কথা ওদের মনের ভিতরে বীজের মতো কাজ করতে শুরু করেছে। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে সে বীজ বিকশিত হয়ে উঠছে। কয়েকবছর পরে ওদের মনের এই ভীরুতা কেটে যাবেই। এখনও অনেকে স্বার্থপরের মতো ভাবছে, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' নিজের অবস্থা গুছিয়ে নেবার কথা ভাবছে অনেকে। ভাবছে, জমিদার নায়েবকে সন্তুষ্ট রেখে নিজে সে ঠিক টিকে যাবে। কিন্তু গণপতি

জানে, এই অন্ধ বিশ্বাস ওদের ঘুচে যাবে। কঠিন সঙ্কটের মুখে পড়লে গণপতিদের কথা এই সব স্বার্থপর চাষীরাও মনে প্রাণে মেনে নিতে বাধ্য হবে।

এমনি করে সংগঠন ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে আগিয়ে চলল। অনেকে গোয়েন্দাগিরি করতে লাগল। গণপতির দলের লোকেরা কোথাও কোথাও কিছু কিছু লাঞ্ছনাও ভোগ করল। কাকদ্বীপ থানার দারোগা দুএকবার ঘুরে গেল, দেখতে অঞ্চলটার অবস্থা কি রকম। কিন্তু তেমন কিছু বিপদের গন্ধ কি জমিদার কি পুলিশ কেউই টের পেল না।

॥ ২৩ ॥

চৈত্রের এক গভীর রাতে হঠাৎ গণপতির ঘুম ভেঙ্গে গেল। কান সজাগ করে গণপতি শুনতে পেল কে যেন ডাকছে, 'গণদা, ও গণদা, গণদা।'

গণপতি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। দেখল, সাগর দাঁড়িয়ে আছে। চৈত্রের দুর্বার দক্ষিণ হাওয়া প্রবলবেগে বইছে। সে হাওয়ায় ধুলো উড়ে আসছে। পাগল হাওয়ার দৌরাত্মে কত বিচিত্র শব্দ জেগেছে আকাশ মাটি জুড়ে।

সাগরকে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত মনে হচ্ছে। গণপতি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার সাগর, এত রাত্তে? এসো ভিতরে এসে বসবে এসো।'

সাগরকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসল গণপতি। ভিতরের ঘরে ঢুকে মোহিনীকে জাগিয়ে প্রদীপ জ্বেলে নিয়ে এসে সামনে রাখল। প্রদীপের আলোতে দেখল সাগরের কপালে গলায় ঘাম চিক্‌চিক্ করছে। সাগরের কাছে বসে গণপতি বলল, 'কি ব্যাপার সাগর?'

সাগর বলল, 'গণদা পুলিশ আমাকে ধরতে বাড়ীতে এসেছিল।'

'কি ব্যাপার কি বলো দেখি।'

'গতবারে জমিদার তো আমার ত্রিশবিঘে জমির ধানে নোনাজল ঢুকিয়ে দিয়ে মাছের ভেড়ি করে নিয়েছিল।'

'হ্যাঁ তা তো জানি।'

'এবারেও বাকী দশবিঘে জমির ধানের অংশ থেকে আমি বাজে আদায়

দিই নাই। ধান নিজের খামারে তুলে ধান ঝেড়ে বলেছিলাম, ধান পাওয়ার রসিদ পাঠিয়ে দেবেন, আমিও ধান পাঠিয়ে দোব।'

'সে তো শুনেছি। খুব ভালো কাজ করেছিলে, খুব সাহসের কাজ করেছিলে।'

'তা জমিদার পুলিশের সঙ্গে ষড়্ করে আমার নামে ডাকাতির অভিযোগ করেছিল। পুলিশ আমার নামে ওয়ারেন্ট বার করে ধরতে এসেছিল।'

'তারপর ?'

'তারপর পুলিশ আমাদের বাড়ী ঢুকলে আমি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে অন্য বাড়ীতে লুকিয়েছিলাম। তখন দুপুরবেলা। বিকেলে আমি বাঁধের উপর দিয়ে অন্য গাঁয়ে যেছিলাম হঠাৎ দারোগার মুখোমুখি পড়ে গেলাম। তা দারোগা আমাকে ধরতে এলে আমি টেনে এক চড় কষালাম দারোগাকে। দারোগা গড়াতে গড়াতে বাঁধের নীচে কাদায় পড়ে গেল। আমি আর এক মিনিট দেরি না করে ছুটতে লাগলাম।'

'তারপর ?'

'তারপর এখানে সেখানে খানিক লুকিয়ে রইলাম। পুলিশ গাঁ তোলপাড় করতে লাগল। উপায় না দেখে আমি তোমার কাছে চলে এলাম।'

'ভালো করেছ, পুলিশ চলে যাক, তারপরে গাঁয়ে ফিরে যাবে।'

'না, না, পুলিশ এখানেও আসতে পারে, আমাদের কত গুপ্তশত্রু আছে জানো ?'

'তা বটে, তাহলে কি করা যায় বলো দেখি।'

'আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।'

গণপতি খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ভাবতে লাগল। তারপর বলল, 'ভোর হোক, একটা নৌকো ভাড়া করে তোমাকে মেদনীপুর পাঠিয়ে দোব। সেখানে আমার ভাইরা আছে। তাদের কাছে গিয়ে দিনকতক কাটিয়ে এসো।'

সাগর বলল, 'কিন্তু ভোর বেলাতেই পুলিশ চলে আসতে পারে।'

'তাও তো বটে। তাহলে চলো এখুনি বেরিয়ে দেখি নৌকো ঠিক করতে

পারি কিনা।'

ভাইদের ডেকে তুলল গণপতি। বলল, 'দরজা বন্ধ করে দাও। আর, কেউ আমার খোঁজ করতে এলে বলবে বান্ধব-বাড়ী গেছে। আর যদি বলে, সাগর এসেছিল কিনা, বলবে কেউ আসে নাই।'

সাগরকে নিয়ে গণপতি সেই নির্জন রাতে বেরিয়ে পড়ল। পথে যেতে যেতে অনেক কথা হলো ওদের মধ্যে। সাগব বলল, 'এখনও কাজের তো সবে আরম্ভ। এব মধ্যেই আমাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক তৈরি হয়েছে। অনেক চাষী জমিদারদেব গুপ্তচবের কাজ করছে।'

গণপতি বলল, 'সে তো থাকবেই, সব লোক তো আর ভালো হতে পারে নারে বাপু। ভালো থাকলেই মন্দ থাকবে। আমাদের কাজ হবে বেছে বেছে ভালো লোকগুলোকে একজায়গায় করা। তবে কাউকে আমরা বাদ দোব না। সবাইকেই চাই আমাদেব। কৃষকসমিতির লোক হবে সকলেই।'

একটু থেমে হিসিয়ে উঠল গণপতি, 'আর বিশ্বাসঘাতকদের কি ভাবে ঠাণ্ডা করতে হয় দেখবে তখন।'

সাগর বলল, 'শুনলাম, তুমি রাতবিরেতে একা একা এই মাঠের পথ দিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘোরো। শত্রু তোমার কম নাই।'

গণপতি তার কোমর থেকে একটা খাপ-শুদ্ধ ভোজালি বার করল। খাপমুক্ত করতেই ভোজালিটা ঝিলকে উঠল। গণপতি বলল, 'এ জিনিস সব সময়েই আমার কাছে থাকে। তোমাদের কাছেও অস্ত্র রাখবে সাগর। অস্ত্রই হচ্ছে আসল জিনিস। যাদের কাছে যত দামী অস্ত্র থাকে তারা ততো বলবান। তবে অস্ত্র চালাবার কায়দা জানতে হবে। তবে—'

সাগর জিজ্ঞাসা করল, 'তবে কি?'

'তবে অস্ত্রের চেয়েও শক্তিমান হচ্ছে মানুষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ যদি জোট বাঁধে তাহলে সব অস্ত্রই তাদের সামনে দুর্বল হয়ে যায়। মানুষই অস্ত্র চালায় কিনা তাই অস্ত্রের চেয়ে মানুষের শক্তি অনেক বেশি।'

তারপর অনেকক্ষণ ওরা নীরবে হাঁটতে লাগল। গভীর রাত্রির বিস্ময়কর শব্দ চারদিকে বাজতে লাগল। গাছের পাতায় বাতাসের সন্‌সনানি ধ্বনিত হচ্ছে। রাতের কোন পাখি ডেকে ডেকে সারা হলো।

আর এই নির্জন বিশাল মাঠের কি যে এক বিচিত্র একটানা ধ্বনি আছে যা মনকে আবিষ্ট করে ফেলে, নেশা লাগে যেন।

গণপতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'সাগর কতজন চাষীকে কৃষক-সমিতির সভ্য করতে পারলে?'

সাগর বলল, 'জন কুড়ি নতুন সদস্য হয়েছে। কিন্তু কেউই তেমন কাজের নয়। এখনও অনেকদিন লেগে যাবে মানুষকে ঠিকমতো বোঝাতে।'

'সময় তো লাগবেই। এ তো একদিনের ব্যাপার নয় সাগর। ধৈর্য চাই, কতদিন ধরে মানুষগুলো ঝিমোচ্ছে তার ঠিক আছে। ঝিমুনি কাটাতে কিছুদিন সময় লাগবে বৈকি।'

সে রাত্রে নৌকা ভাড়া করে সাগরকে মেদিনীপুরে পাঠিয়ে দিয়ে ভোরবেলা ঘরে ফিরে দেখল গণপতি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে তার বাড়ীর খোলা উঠোনে। গণপতিকে আসতে দেখে পুলিশ কজন ওকে ঘিরে ধরল। দলপতি মতো পুলিশটা চোখ পাকিয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'সাগরকে কোথা রেখে এলে বলো।'

গণপতি আশ্চর্য হয়ে গেল, 'সাগর! তাকে আমি কোথা পাব?'

'চালাকি করো না, তুমি গিয়েছিলে কোথা এই ভোররাত্রে?'

'কেনে আমার ভাইরা কিছু বলে নাই?'

'ডেকে কারও সাড়া না পেয়ে ভাবছিলাম দরজা ভেঙ্গে ফেলব।'

'অ, তা আমি বাবু বাহ্যে করতে ফাঁকে গিয়েছিলাম। সাগর ফাগরের খবর আমি জানি না।'

বাধ্য হয়ে পুলিশ ফিরে গেল। আর গণপতি মনে মনে গালাগালি দিল, 'দেখব শালারা, ঐ জমিদার, জোতদার, আর নায়েব গোমস্তাদের তোরা কেমন করে বাঁচাস। সে দিন আর আসতে দেরি নাই, আমি বুঝতে পারছি।'

॥ ২৪ ॥

এমনি ভাবেই কাজ চলছিল। চাষীদের মধ্যে খুব যে একটা জাগরণ বা সাহস এসেছিল তা নয়। কিন্তু সমস্ত অঞ্চল জুড়ে নানান ধরনের ঘটনা

ঘটছিল। জমিদারের দারোয়ান বা পাইক কোনোরকম বাঁদরামি করবার চেষ্টা করলে চাষীরা প্রতিরোধ করত। একেবারে মরে-থাকা ভাবটা অনেকটা ঘুচে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে একটা প্রতিরোধ যেন আপনিই তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। বাইরে থেকে ব্যাপারটা ঠিক অনুভব করা যাচ্ছিল না। কিন্তু চাষীরা যে একটু উদ্ধত হয়ে পড়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না।

("১৯৪২ সালের ৭ই এবং ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ের বৈঠকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করে—সেটি পরে 'ভারত ছাড় প্রস্তাব' নামে অভিহিত হয়।"

প্রস্তাবে কি ছিল সে নিয়ে আলোচনা এখন থাক।

কিন্তু "৮ই আগস্ট রাত্রে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে, ৯ই আগস্টের প্রত্যূষে বোম্বাই এবং সারা ভারতে ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হল।"

"তখন সকলের মনে একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষাই তীব্র হয়ে উঠেছিল—যে কোনো উপায়ে, যে কোনো মূল্যদানে এই শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতেই হবে; একটি মাত্র চেতনাই উদ্দীপ্ত ছিল—ফলাফল যাই হোক, এই অসহ্য অবস্থা আর বরদাস্ত করা যায় না।"

"১৯৪২ সালে ৯ই আগস্টের প্রত্যূষে সারাভারতে বহু সংখ্যক লোক গ্রেপ্তার হলো।" "বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলকেই হঠাৎ গ্রেপ্তার করা হয় এবং অতঃপর কি করা উচিত তা কেউ জানত না। প্রতিবাদ হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং সর্বত্র বিক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তিও হয়েছিল।" মেদিনীপুরে এই বিক্ষোভ প্রচণ্ডরূপ নিয়েছিল। "সমস্ত প্রতিবাদ-সভাগুলিকে লাঠি, গুলি ও কাঁদুনে গ্যাস দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হল এবং জনসাধারণের প্রতিবাদ ঘোষণার সাধারণ পথগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু দমন ও নির্যাতনের ফলে গণবিক্ষোভ নতুন করে ফেটে পড়ল। শহরে ও গ্রামে লোকের ভিড় জমতে লাগল এবং পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে জনতার সঙ্ঘর্ষ বাধতে লাগল। জনসাধারণের মনে যেগুলি ব্রিটিশ শক্তি ও শাসনের উদ্ধত প্রতীক রূপে গাঁথা ছিল, গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে জমায়েত হয়ে জনসাধারণ সেগুলিকেই আক্রমণ করতে শুরু করল। পুলিশথানা, ডাকঘর, রেলপথ—এগুলিই ছিল তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। ব্যাপকভাবে তারা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কেটে দিতে লাগল। নেতৃত্বহীন নিরস্ত্র জনগণ বহুবার

পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিল এবং সরকারী বিবৃতি অনুযায়ীই কমপক্ষে তাদের উপর ৫৩৮ বার গুলি চালানো (সারাভারতে) হয়েছিল। নিচু-দিয়ে-ওড়া বিমান থেকে তাদের উপর মেসিনগানের গুলি-বর্ষণও করা হয়েছিল। মাসখানেক অথবা মাসত্বয়েক কি আরও কিছু বেশি সময় দেশের সর্বত্র এই ধরনের বিক্ষোভ চলতে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে এটা প্রশমিত হয়ে যায়। যদিচ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এখানে সেখানে ত্ব'একটা ঘটনা ঘটতে থাকে। হাউস্-অফ্ কমন্সে মিস্টার চার্চিল ঘোষণা করলেন—'সর্বশক্তি প্রয়োগ করে গভর্ণমেণ্ট এই বিক্ষোভ দমন করতে সক্ষম হয়েছে।' এই সঙ্গে 'সাহসী ভারতীয় পুলিশবাহিনীর বিশ্বস্ততা ও দৃঢ়তা ভারতের উর্ধ্বতন রাজকর্মচারীদের মতিগতি ও কর্মদক্ষতার' তিনি উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন যে 'বহু নতুন সৈন্যসামন্ত ভারতে পাঠানো হয়েছে, এবং সমগ্র ব্রিটিশ আমলের ইতিহাসে এত বেশি সংখ্যক শ্বেত-সৈন্য এর আগে কখনো ভারতে ছিল না।' এই সব বিদেশী সৈন্যদল এবং ভারতীয় পুলিশ-বাহিনী ভারতের নিরস্ত্র কৃষকের সঙ্গে বহু যুদ্ধেই জয়ী হল; এবং যে আমলাতন্ত্র ভারতে 'ব্রিটিশরাজের' দ্বিতীয় স্তম্ভস্বরূপ তারা এই দমননীতির সাফল্যের জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, তা সক্রিয়ভাবেই হোক বা নিষ্ক্রিয় ভাবেই হোক।

গ্রামাঞ্চলে ও শহরে, দেশের সর্বত্র, এর প্রতিক্রিয়া তীব্র ও ব্যাপকরূপ ধারণ করেছিল। প্রদেশে প্রদেশে এবং বহু দেশীয় রাজ্যে সরকারী বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও অসংখ্য সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ চলতে লাগল। একদিন, ত্বদিন থেকে শুরু করে একমাস দেড়মাস পর্যন্ত অনেক জায়গায় দোকান বাজার ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করে হরতাল পালন করা হয়েছিল।"

অসংখ্যবার গুলি চালিয়েছিল সেনাবাহিনী। "চল্তি লরি থেকে জনতার উপর ইতস্তত গুলি বর্ষণ তো ছিলই।"

"শহর এবং গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকায় যেভাবে ব্রিটিশশক্তির কর্তৃত্ব লোপ পেয়েছিল তাতে বিস্মিত হতে হয়। এই সমস্ত এলাকাকে 'পুনরাধিকার' করতে সরকারের অনেকদিন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েক সপ্তাহই লেগেছিল।"

"ঘটনার রূপ এমন তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে সেটা সাধারণ পুলিশ বাহিনীর আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। সজাগ কর্তৃপক্ষ তাই ১৯৪২ সালের প্রথম দিকেই স্পেশাল আর্মড্ কনষ্ট্যাবুলারী (এস. এ. সি.)

নামে একটি নূতন পুলিশ বাহিনী সংগঠিত করেছিল। গণ-আন্দোলন ও বিক্ষোভ দমনের জন্য এদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। আয়র্ল্যাণ্ডের ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান-এর মতই ছিল নিষ্ঠুর ও নৃশংস এদের কার্যকলাপ এবং ১৯৪২ সালের গণ-আন্দোলন ধ্বংস ও দমনে এদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে মনোনীত শুধুমাত্র কয়েকটি শ্রেণী ও গোষ্ঠী ছাড়া সাধারণভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে এ বিক্ষোভ দমনে কাজে লাগানো হয় নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ ও গুর্খা সেনাবাহিনীকেই নিযুক্ত করা হত। কখনও কখনও ভারতীয় সেনাবাহিনী ও স্পেশ্যাল পুলিশবাহিনীকে সুদূর কোনো অঞ্চলে পাঠানো হত। সে সব জায়গার ভাষা না জানায় তারা সেখানকার জনতার মধ্যে অপরিচিত আগন্তুক হিসাবেই দায়িত্ব পালন করে যেত।”

“ভারতের বিত্তশালী ও ধনিকশ্রেণীর মধ্যেও মৃদু জাতীয়তাবোধ ছিল, মাঝে মাঝে সরকারী নীতির সমালোচনাও তারা করত। কিন্তু ভারতব্যাপী এই গণবিক্ষোভে তারাও ভীতিগ্রস্থ হয়ে উঠেছিল; কারণ তারা জানত যে এই গণ-আন্দোলন কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, এর লক্ষ্য শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তনই নয়, সামাজিক কাঠামোকেও ওলটপালট করা এর উদ্দেশ্য। সুতরাং যেমন যেমন এই গণ-বিক্ষোভকে সরকার দমন করতে সফল হল, সেই অনুপাতে এই সমস্ত দ্বিধাগ্রস্থ সুবিধাবাদীর দলও সরকারের পিছনে এসে দাঁড়াল; এবং যারা সরকারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল, সেই জনতাকে এরা যেন এখন তারস্বরে নিন্দাবাদ করতে লাগল।”

“ব্রিটিশের সৃষ্টি এবং তার প্রভুত্বের প্রতীক ফেডারেল কোর্ট এবং হাইকোর্টের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রকাশ্যভাবে আমলাতন্ত্র লঙ্ঘন ও অবজ্ঞা করতে লাগল; অথবা নূতন অর্ডিনান্স জারী করে এইগুলিকে অকার্যকরী করে দেওয়া হল। এই সময়ে যে সমস্ত বিশেষ বিচারের ট্রাইবিউনাল খাড়া করা হয়েছিল (এবং যে গুলি পরবর্তীকালে বিভিন্ন কোর্টের রায় অনুসারে বেআইনী বলে প্রমাণিত হয়েছিল) সেগুলি আইনকানুনের সাধারণ রীতিনীতি লঙ্ঘন করেই হাজার হাজার লোককে দীর্ঘমেয়াদী বন্দীজীবন এমনকি ফাঁকির হুকুম পর্যন্ত দিয়েছিল। পুলিশ (বিশেষত স্পেশ্যাল আর্মড্ কনস্ট্যাবুলারী) ও গোয়েন্দাবিভাগ সর্বেসর্বা হয়ে উঠল

এবং রাষ্ট্রশক্তির প্রধান স্তম্ভ হিসাবে দেখা দিল। বিচার সমালোচনার বাইরে এরা অবাধে এদের বেআইনী ও নৃশংস কার্যকলাপ চালাতে লাগল। দুর্নীতি ও ব্যভিচারে দেশ ছেয়ে গেল। স্কুল কলেজে অসংখ্য ছাত্রকে নানাভাবে পীড়ন ও শাস্তি দেওয়া হল। এবং হাজার হাজার তরুণের উপর চাবুক চালানো হল। সরকারের স্বপক্ষে ছাড়া সমস্ত রকম আন্দোলন বেআইনী করে দেওয়া হল।

সরকারের এই নির্মম দমননীতির সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হয়েছিল গ্রামাঞ্চলের সরলহৃদয় দারিদ্র্যপীড়িত নরনারী। যুগ যুগ ধরে দুঃখ, দারিদ্র্য, নির্যাতন, নিপীড়নই ছিল এদের জীবনের ভূষণ। তারাও ক্ষণেকের জন্যে মাথা তুলবার সাহস করেছিল, তাদের মনে জেগেছিল সুদিনের আশা ও স্বপ্ন। এমন কি জড়তা ত্যাগ করে তারা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।"

"তারা পরাজিত হয়েছে এবং সেই পরাজয়ের বোঝা গিয়ে চেপেছে তাদের নুয়ে পড়া কাঁধে আর ভগ্ন দেহে।" "একটা গোটা গ্রামের সমস্ত অধিবাসীকেই শাস্তি দেওয়া হয়েছে—সে শাস্তির হার বেত্রাঘাত থেকে শুরু করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। বাঙলা সরকারের পক্ষ থেকেই বলা হয়েছিল যে, '১৯৪২ সালের সাইক্লোনের পূর্বে ও পরে তমলুক ও কাঁথি মহকুমার সরকারী ফৌজ প্রায় ১৯৩টি কংগ্রেস ক্যাম্প ও বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেয়।' সাইক্লোনের ধ্বংসলীলায় এই সমস্ত অঞ্চল একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সরকারী দমননীতির নির্মম পথে সেটা কোনো প্রতিবন্ধকই সৃষ্টি করে নি।"

"বিভিন্ন গ্রামে সমস্ত গ্রামের উপর শাস্তিমূলক জরিমানা (পিউনিটিভ ফাইন) হিসাবে প্রচুর টাকা ধার্য হয়েছিল।"

('ভারত সন্ধানে নেহরু' থেকে)

মেদিনীপুরের বিপ্লবী আগস্ট আন্দোলন সুন্দরবনের মানুষের মধ্যেও সাহস এবং আশা সঞ্চার করেছিল। সুন্দরবনের চাষীদের অনেকেরই আত্মীয় ছিল মেদিনীপুরে, বিচিত্র খবর নিয়ে আসত তারা। সেই সব খবর শুনে উদ্দীপ্ত ও হতচকিত হয়ে উঠত সুন্দরবনের মানুষেরা। তারিফ করত তারা মেদিনীপুরের লোকেদের। আর সরকারী অত্যাচারের রোমহর্ষক কাহিনী শুনে ভয় পেত তারা, কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে

নিষ্ঠুর ঘৃণা ও ক্রোধ তাদের হৃদয়কে পুড়িয়ে দিত। তারা মনে করত ব্রিটিশ সরকার মানেই জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ান, পাইক, পুলিশ, মিলিটারী। একই কালে প্রচণ্ড বিক্ষোভ আর দারুণ ভয়ে ভুলত তারা। আর ভিতরে ভিতরে হৃদয়দ্বন্দ্বে একেবারে দারুণভাবে পীড়িত হতো।

এমন সময় পুজো এসে গেল। বাংলা ১৩৪৯ সালের (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ) পুজো। এ অঞ্চলে দুটি মাত্র দুর্গা পুজো হতো। হাজরাদের কাছারিতে আর বিশালাক্ষীর থানে। বিশালাক্ষীর থানে সার্বজনীন পুজো হতো কয়েকটি গ্রামের চাষী, ভাগচাষী ও ক্ষেতমজুরদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ ক'রে। এই প্রায় নির্জন জনভূমিতেও পুজোর আনন্দের কমতি ছিল না। শরতের গেরুয়া আলোর ঝলকে আকাশ মাঠ গাছগাছালি ঝলমলিয়ে উঠেছিল। নদীর ধারে শূন্যমাঠে হাজার হাজার কাশফুলের উজ্জ্বল শুভ্রতা দুলে দুলে উঠছিল। ঢোল আর কাঁইনানার বাজনায় সারা অঞ্চল জুড়ে নতুন অনুভূতি জেগে উঠেছিল। শরতে সোনার আলো মুঠো মুঠো ছড়িয়ে পড়ছিল, কাশবনের মতো সাদা মেঘের ঘোরাফেরা চলছিল বর্ষাধোয়া ঝকঝকে নীলাকাশের বুকে। ঈষৎ শীতের আমেজ আগামী শীতঋতুর আভাস দিচ্ছিল। সপ্তমী পুজোর দিন সহসা আকাশের প্রসন্ন মুখ ভাব হয়ে উঠল। ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘের টুকরোগুলো সহসা কালচে হয়ে উঠতে লাগল। পুবে হাওয়া উঠল। সোনালি কমলা রৌদ্রকে ম্লান করে বিবর্ণ মলিন হয়ে গেল চারদিক। আকাশ ক্রমশ থমথমে বিমর্ষ হয়ে উঠতে লাগল। পুব হাওয়া আস্তে আস্তে ভীষণ হয়ে উঠতে লাগল। বিকেল থেকে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি হতে শুরু করল। টিপ্ টিপ্ থেকে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হলো। সন্ধে নামতে না নামতে চারিদিক ঘনকালো পর্দার মতো ঢেকে গেল। দারুণ বৃষ্টি চলতে লাগল। আর পুব দিকে ভয়াবহ বেগবান ঝড়ো হাওয়া লুঠেরা সৈন্যবাহিনীর মতো ছুটে আসতে লাগল। সন্ সনিয়ে প্রচণ্ড ঝড় চলতেই লাগল আর ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিরও বিরাম রইল না। মনে হতে লাগল যেন আবার মহাপ্রলয় এসে গেছে। সপ্তমী পুজোর সমস্ত আনন্দকে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে আশ্বিনের অকালবর্ষা এল আকাশ মাটি জুড়ে। প্রবল পুব হাওয়ার ঝাপটায় হুগলী

নদীর মোহনা, বটতলা, সপ্তমুখী নদীগুলি উত্তাল উন্মাদ হয়ে উঠল। সহসা বন্যা এল কানায় কানায় ভরা এই নদীগুলিতে। নদী ছাপিয়ে বিপুল জলরাশি গাদা গাদা ফেনা মাথায় নিয়ে কখনো বা সর্পিল গতিতে কখনো বা বুনো ঘোড়ার পালের মতো ফেনার কেশরগুচ্ছ দুলিয়ে দুলিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে টগবগিয়ে ছুটে চলতে লাগল নদীর দুইতীরের জনবসতির দিকে। উঃ সে কি ভীষণ ঝড়, কি দুর্যোগ, কি বুভুক্ষু বন্যা। দক্ষিণ বাংলার মাটি ও অরণ্য, জনপদ ও জমি বন্যার কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। সুন্দরবন, সাগর ও মেদিনীপুরের নদীতীরবর্তী অঞ্চল জলের তোড়ে প্লাবিত হলো। সপ্তমী পূজোর দিন বিকেলের দিকে আকাশে মেঘ উঠেছিল, পূবে হাওয়া উঠেছিল আর ঝড়ের আগের থমথমে অস্বস্তিকর ভাব জেগে উঠেছিল আকাশে মাটিতে। ভীত পাখিরা যেন কোন আসন্ন দুর্যোগের আভাস পেয়ে দুরন্ত বেগে ডানা ঝাপটিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটছিল। যত বেলা পড়তে লাগল তত ঝড় বাড়তে লাগল। ভীষণ ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুতে পৃথিবী উথলিপাথালি। ঘরের ভিতরে সবাই বন্দী। সহসা সেই নিকষ-কালো মধ্যরাত্রির অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টি বিদ্যুতের শব্দকে ছাপিয়ে আরও এক ভীষণ শব্দ জেগে উঠল। যেন কারা বিরাট দল বেঁধে চীৎকার করে ছুটে আসছে, যেন কোনো নদীর প্রপাত এদিকের গ্রাম ও জনপদগুলির মাথার উপরে লুটিয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু খানিক-পরেই বোঝা গেল বান আসছে। ফেনাচূড়ো ঢেউগুলি তর্‌তর্‌ করে মাঠ, ক্ষেত, গাছপালা ডুবিয়ে ভাসিয়ে ছুটে আসছে। যেন ফেনাভাঙ্গা একটা দীর্ঘ লক্‌লকে জিব লুপ্‌লুপ্‌ করে সব কিছু গিলতে গিলতে আগিয়ে আসছে। পলকে পলকে জল বেড়ে চলেছে। আকাশ মাটি গভীর কালো অন্ধকারে ডুবে আছে। ভীষণ বেগে বৃষ্টি ঝরছে, আকাশকে বিদ্যুতের চাবুক ফালা ফালা করে ফেলছে। গম্ভীর ভয়ঙ্কর মেঘগর্জনে দূরদিগন্ত পর্যন্ত যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর পূব থেকে ধাক্কা দিচ্ছে ঝড়। কি তীব্র ভীষণ তার শক্তি আর গর্জন, একটানা সোঁ সোঁ হু হু গর্জন যেন মহাসমুদ্রের ক্রুদ্ধ কল্লোল। ঘরের চাল উড়ে চলে যেতে লাগল। গাছপালা ভেঙ্গে চুরমার হলো। ঘরবাড়ী ভেঙ্গে পড়তে লাগল। কত লোক চাপা পড়ল। যারা বুঝতে

পারল বান আসছে তারা স্ত্রীপুত্রকন্যাশিশুদের নিয়ে প্রাণ বাঁচাবার তাগিদেই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সেই দুর্যোগের মধ্যে নেমে পড়ে পশ্চিমদিকে ছুটতে লাগল। কয়েকজন হয়তো বাঁচল, হঠাৎ জলস্রোতের ঝাপটা এসে পড়ায় কয়েকজন অন্ধকারে গেল কোথায় হারিয়ে। কালকেউটে সাপের রঙের অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে যেতে লাগল মানুষ। বিরাট উঁচু জলস্রোতের পাল্লায় পড়ে মানুষ, পশু, গোরু, ছাগল প্রাণ হারাতে লাগল, ভেসে গেল। মারণ যজ্ঞ সমাধা হয়ে গেল সেই রাত্রেই। কিন্তু বৃষ্টি বিদ্যুৎ মেঘগর্জন ঝড় বন্যা তারপরের দিনও কমলো না। অষ্টমীর দিনে যেন আরও ভয়ঙ্করী হয়ে উঠল প্রকৃতি। প্রবল জলকল্লোলে মৃতদেহ, গরু, বাছুর ভেসে চলেছে, ভেসে যাচ্ছে ঘরের চাল, বাক্স-পেটরা, নানান তৈজসপত্র। ওখানে একটা খেজুর গাছে উলঙ্গ ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় শাড়ি-জড়ানো কাঁপছে একটি যুবতী। তার পায়ের কাছে জল তাকে গিলবার জন্যেই বোধ হয় তীব্র স্রোতে খলখল ছলছল করে ঘূর্ণি দিয়ে ছুটে চলেছে। একটি খাট ভেসে যাচ্ছে, তার উপর একটি সদ্যোজাত শিশু হাত পা ছুঁড়ে প্রাণপণে চীৎকার করছে। শুধু জল ছাড়া আর কিছু নেই। উঁচু ঘরবাড়ীর মাথাটুকু মাত্র জেগে আছে। সেই উঁচু চালে অথবা ছাদে অথবা উঁচু গাছের উপর নগ্ন, অস্নাত, ক্ষুধার্ত ক্লান্ত নরনারী বসে আছে। বৃষ্টিতে ভিজে থর্ থর্ করে কাঁপছে ওরা, কাঁদছে। বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত নিদ্রাতুর হয়ে ঝপ করে জলে পড়ে যাচ্ছে কেউ কেউ। সাপেরাও সেই গাছগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে। প্রাণপণে শাখা আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে মৃতের মতো পড়ে আছে ওরা। গঙ্গার মোহনা, বটতলা, সপ্তমুখীর পূর্বতীরগুলিতে এমনি অবস্থা হলো। পশ্চিম তীরগুলিতে জল উঠল, কিন্তু এত ভয়াবহ কাণ্ড হলো না। কেননা ঝড়টা আসছিল পূর্বদিক থেকে। সেই ঘণ্টায় একশ মাইলেরও বেশি বেগে প্রবাহিত ঝড়ের ঝাপটে মেদিনীপুরের নদীতীরবর্তী অঞ্চল, সাগরদ্বীপের পূর্বদিক ধ্বংস হয়ে গেল। আর কাকদ্বীপ সুন্দরবনের অসংখ্য ছোটোবড়ো নদীর নিকটবর্তী জায়গাগুলিও বন্যার শিকার হলো। এখানে বসতি ছাড়া ছাড়া ; তাই লোক, গোরু-বাছুর কম মরল। তবে বানের জল উঠে হাজার হাজার বিঘে জমির ধান নষ্ট করে দিল। বটতলা, সপ্তমুখী

নদীর জলোচ্ছ্বাসের ঝাপটায় সুন্দরবনের অনেক ঘরবাড়ীও ধ্বংস হয়ে গেল। নবমীর দিনে ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুতের আস্ফালন কিছুটা মন্দীভূত হলো। কিন্তু একেবারে থামল না। দশমীর দিন বিকেলের দিকে আকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে গেল। আর রাত্রে সেই আদিগন্ত জলরাশির উপরে ক্ষীণ চাঁদ ও লক্ষকোটি নক্ষত্রের আলোর দীপ্তি কম্পমান রেখায় খেলা করতে লাগল। যেখানে গ্রাম ছিল, মানুষ ছিল, পূজোর আনন্দ ছিল, গাছপালা, ঘরবাড়ী ছিল সেখানে শুধু জল আর স্রোত, দিক্‌-রেখা পর্যন্ত সহসা যেন আর কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু মাঝে মাঝে উঁচু বাড়ীর চাল আর গাছ পালার মাথাগুলি এখানে ওখানে জেগে আছে। কিন্তু তেমন বাড়ী বা গাছের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না।

একাদশীর দিন সকালবেলায় পরিষ্কার ঘননীল আকাশে ঝক্‌ঝকে সূর্য উঠল, বাতাসের বেগ নেই, এ আকাশে কোনোদিন যে মেঘ-বিদ্যুৎ-বজ্র ভয়ঙ্কর হানাহানি করেছিল তা বিশ্বাসই হয় না। প্রকৃতি আবার নিরীহ শান্ত সুন্দর মূর্তি ধরল আকাশে, কিন্তু দক্ষিণ বাংলার মাটিতে তখনও অবর্ণনীয় বীভৎসতা জমে রইল।

সপ্তাহখানেক ধরে ধীরে ধীরে বানের জল নেমে গেল। থক্‌থকে কাদা পড়ে রইল। পড়ে থাকল গলিত শব, পচা গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি, গাছ পাতা। কুৎসিত দুর্গন্ধে আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। গাদা গাদা শকুনি এসে মাঠে ঘাটে গোল হয়ে মৃত জীবজন্তু মানুষকে নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করতে লাগল। কাক এবং কুকুররা শকুনিদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করে তাদের ব্যূহ ভেদ করে গলিত মাংসের ভাগ আদায় করতে লাগল। যে সব জায়গায় বানের জল ওঠেনি সেখানে বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা আর ডালে একহাত দেড়হাত পুরু আস্তরণ বিছোনো ছিল। মাঠে ঘাটে পড়ে ছিল অসংখ্য মৃত পাখি।

মেদিনীপুরে গণপতির ভাইরা থাকে। বোনেদেরও শ্বশুরবাড়ী সেখানে। গণপতির নিজের শ্বশুরবাড়ীও মেদিনীপুরে। মোহিনী ওর মা বাবা ভাইবোনেদের জন্যে কাঁদতে লাগল। ছমাসের ছেলে কোলে নিয়ে বসে বসে সে কাঁদে। সকলের খোঁজ খবর নেবার জন্যে গণপতি ব্যস্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি বান এসে পড়াতে মাঝিসমেত বহুনৌকা জলমগ্ন

হয়েছে। চারিদিকেই কান্নাকাটি হাহাকার, চারিদিকেই কলেরা পেটের অসুখ জ্বরজ্বালা আরম্ভ হয়েছে। শোনা গেল, সাগরদ্বীপে গেলে নৌকা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু মেদিনীপুর যাবার জন্যে নৌকা পেতে হলে যেতে হবে সাগরদ্বীপের মন্দিরতলা। গণপতি ঠিক করে ফেলল মন্দিরতলা গিয়ে নৌকা ভাড়া করে যাবে মেদিনীপুর। সাগরদ্বীপ যাবার নৌকা পাওয়া যাবে কাকদ্বীপ থেকে। গণপতি মেদিনীপুর যাবে শুনে অনেকেই দেখা করতে এল। অনেকেরই আত্মীয় স্বজন মেদিনীপুরে থাকে। অনেকেই তাদের আত্মীয়স্বজনকে দেবার জন্যে টাকা দিল গণপতির কাছে। এমনি করে নিজের টাকা আর অন্যান্যদের টাকা নিয়ে হাজার খানেক টাকা রইল গণপতির কাছে। তাছাড়াও পথের খরচ হিসেবে নিল বস্তা করে একমন চাল, পাঁচসের নুন। কোমরে গুঁজে নিল খাপশুদ্ধ ভোজালি। দড়ি বেঁধে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল একটা বড়ো টর্চ। আর একটা লম্বা লাঠি নিল কাদা জলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা হাঁটতে সুবিধে হবে বলে।

কাকদ্বীপের দিকে যেতে যেতে ভয়ানক সব ব্যাপার চোখে পড়ল গণপতির। ধানের জমি জলে ডুবে ডুবে পচে উঠেছে। যে সব ধান ডোবেনি তার অবস্থাও কাহিল, ফুলের রেণু ঝরে গিয়েছে, হুমড়ি খেয়ে মাটিতে সব মুখ থুবড়ে পড়ে আছে যেন। চারিদিকেই ঘর বাড়ী ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গেছে। গরীবলোকেরা ভিক্ষা করতে চলে যাচ্ছে শহরে, কলকাতায়। চারিদিকে রোগ আরম্ভ হয়েছে, মানুষ মরছে নানান রোগে ভুগে। সরকারের কোনোরকম সাহায্য তখনও এসে পৌঁছোয় নি, আসবে কিনা তারও কোনো ঠিক নেই। কাকদ্বীপ গিয়ে একখানা ডিঙ্গি ভাড়া করল গণপতি। সেখানকার থানার দারোগা খবর পেয়ে এসে হাজির হলো গণপতির কাছে। গণপতির সব খোঁজ খবর নিয়ে বলল, 'আমাকেও সাগর যেতে হবে। চলো তোমার বোটেই যাই।'

অতএব দারোগার সঙ্গে ডিঙ্গিতে চেপে সাগরদ্বীপের কচুবেড়ে গিয়ে উপস্থিত হলো গণপতি। দারোগা চলে গেল তার কাজে। নৌকা ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে গণপতি একটা জায়গায় বসল। এক বুড়ো এসে উপস্থিত হলো। গণপতিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথাকার লোক তুমি বাবা, যাবে কোথায়?'

গণপতি বলল, 'যাব মেদনীপুর, আত্মীয়স্বজন আছে। তাদের খোঁজখবর নিতে যাব।'

'তা কি করে যাবে?'

'কেন এখানে নৌকা টৌকা পাব নি?'

'নৌকা পেতে হলে বাবু, তোমাকে মন্দিরতলা যেতে হবে। সেখানে গেলে বোট পাবে।'

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'মন্দিরতলা যাবার রাস্তা ঠিক আছে?'

বুড়ো বলল, 'তা আছে একরকম। কিন্তু সেদিকে তো তুমি যেতে পারবে নি বাবু।'

'কেনে?

'সাগরের (দ্বীপ) পূবদিক তো তছনছ হয়ে গেছে। ঘরবাড়ী সব ভেঙ্গে মাটিতে মিশেছে। জল নেমে গেছে কিন্তু মানুষের ঘরে খাদ্য নাই। সব গাছের উপর মাচান বেঁধে বাস করছে। তোমার সঙ্গে চাল আছে। তারা কেড়ে নেবে। টাকাপয়সা থাকলে তাও কেড়ে নেবে। পেটের জ্বালায় কত লোক ও পথে ডাকাতি করছে। দিনদুপুরে মানুষ খুন করছে। আর এখন প্রায় বিকেল হয়ে এল, তুমি যেতে যেতে তো রাত হয়ে যাবে, ও পথে গেলে তুমি প্রাণে বাঁচবে নি বাবু।'

'তাহলে কি করব বলুন দেখি?'

'এক কাজ করো, নদীর ধারে ধারে চলে যাও। এখনও সেখানে মানুষ গরু মরে পড়ে আছে, মহাশ্মশান হয়ে আছে। তবু ঐ নদীর ধার ধরেই যাও। নদীর শব্দ কানে শুনে নদীকে একমাইল দূরে দূরে রেখে যাবে।'

কচুবেড়েতে একটা গাছের নীচে বসে ইঁট পেতে উনুন করে ভাত রান্না করে খেতে বসল গণপতি। তার খাবার সময় একপাল ভিখিরী গোল হয়ে তাকে ঘিরে ফেলল। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, 'আমাদের দুটি খেতে দাও বাবা, আমরা উপোসে আছি। কতদিন আমাদের পেটে দানাপানি পড়ে নি।'

কোনোরকমে দুটি খেয়ে নিয়ে ভিখারীদের কিছু কিছু চাল আর পয়সা দিয়ে বিদায় করে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সে-স্থান ত্যাগ

করল গণপতি। তখন সূর্য ডুবে গেছে। পথ অন্ধকার। জল শুকিয়ে এলেও তখনও মাটিতে রস আছে। স্থানে স্থানে কাদা হয়ে আছে, জল জমে আছে। নদীর ধার ধরে অগ্রসর হতেই কালো ছাই ছাই মাটিতে এসে পড়ল গণপতি। টর্চ জ্বেলে দেখল, সমস্ত জায়গায় কাদা কাদা কালি কালি ছাই। গণপতি বুঝতে পারল, জায়গাটা শ্মশান। বানের জলে ধুয়ে গিয়েছিল, কিন্তু চারিদিকেই মড়ক শুরু হয়ে গেছে বলে নতুন চিতার ছাই ও পোড়াকাঠ এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। এ পাশে ওপাশে দুচারটি গলিত মৃত দেহ পড়ে আছে। কুৎসিত দুর্গন্ধ উঠছে। ওরা বানের জলে ডুবে গিয়ে মরেছে। কেউ ওদের সদ্গতি করে নি। গণপতি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত একটা বিশ্রী অনুভূতি তুহিন স্রোতের মতো বয়ে গেল ওর শরীরের মধ্যে। ও বুঝল, ও ভয় পেয়ে গেছে। এবং এই ভয় জয় করতে না পারলে এই নির্জন ভীষণ রাত্রে এই নদীর ধার ধরে ধরে ও মন্দিরতলা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারবে না। ভয়কে জয় করতেই হবে। টর্চের আলো চারিদিকে ফেলে ফেলে শ্মশানটা সে দেখে নিল। দেখল ইতস্তত অনেকগুলি মৃতদেহ পড়ে আছে। গোটা দুই গোরুও পড়ে আছে। শকুনির ঠোঁটে প্রায় সাফ হয়ে এসেছে মৃতদেহগুলি।

খানিকক্ষণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে গণপতি নিজের ভিতরকার ভয় দমন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করল। তারপর একটা মৃতদেহের কাছে গিয়ে লাঠি নামিয়ে চালের বস্তা নামিয়ে মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। একটু ইতস্তত করে মৃতদেহের গলিত দুর্গন্ধ শরীরে হাত দিল। দুহাত দিয়ে মরা চটকে নিজের অস্তিত্বকে মিশিয়ে দিতে চাইল এই মৃতদেহের সঙ্গে। গণপতি কেমন করে যেন অনুভব করেছে কোনো বিষয়ের সঙ্গে দূরত্ব থাকলে সেই বিষয়টি বিচিত্র অনুভূতি আনতে পারে মানুষের মনে। কিন্তু যদি সেই বিষয়টির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেওয়া যায় তাহলে আর কোনোরকম বিকার মনে জাগবে না। কোনো ভয় কি বিস্ময় মনকে পীড়া দেবে না। তাই এই মৃতদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে গণপতি মৃতদেহটি চটকাতে লাগল, মৃতদেহের গায়ে দুইহাত বুলিয়ে দিল। এমনি করে একে একে সব মৃতদেহগুলির কাছে গিয়ে গিয়ে তাদের শরীরে হাত বোলালো। তাদের

হাত দুই হাতের মুঠিতে ধরে মর্দন করল। তারপর হাতটা মাটিতে মুছে নিয়ে আবার বস্তা মাথায় তুলে, লাঠি ধরে পথ চলতে লাগল।

পথ চলতে চলতে এই ধরনের অজস্র দৃশ্য দেখতে হলো গণপতিকে। স্যাঁতসেঁতে পথ। মাঝে মাঝে দুর্গম কাদা, কোথাও হাঁটুভোর জল। শেয়াল কুকুর ঘোরাঘুরি করছে। মাথার উপরে বড়ো বড়ো গাছের ডালে শকুনি বসে আছে। শকুনের বিশ্রী কাঁদুনে ডাক শোনা যাচ্ছে থেকে থেকে। শেয়াল ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে। কুকুররা মরার ভাগ নিয়ে ঝগড়া করছে। গাছের পাতা বেয়ে বেয়ে টুপটাপ করে শিশির ঝরছে। অদূরে প্রবাহিত নদীর একটানা ধ্বনি ভেসে আসছে। আশে পাশে জোনাকি উড়ছে আগুনের ফুলকির মতো। গাছে গাছে জোনাকি ছড়ানো আছে। গণপতি মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালছে। সামনেটা দেখে নিচ্ছে। চলতে চলতে কখনো কখনো উৎকট গন্ধ এসে লাগছে নাকে। পা দেবে যাচ্ছে পচা মৃতদেহের মধ্যে। পায়ের নীচে মড়মড়িয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে মৃতের বুকের পাঁজর। মড়া, মড়া আর মড়া। চারিদিকে এলোমেলো ভাবে ছড়ানো আছে মড়া। নারীদেহ নগ্নভাবে গলিত বিকৃত হয়ে লুটোচ্ছে। পুরুষরা পড়ে আছে শকুনির চঞ্চুক্ষত হয়ে, শিশুরা লুটোচ্ছে। কারও হাত ছেড়ে গেছে, কারও পা কুকুরে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, কারও মুণ্ডু ভেঙ্গে গেছে। গোরু পড়ে আছে, কঙ্কাল স্থানে স্থানে বেরিয়ে পড়েছে শেয়াল কুকুরের দাঁতে, শকুনের ঠোঁটে। উৎকট বীভৎস গন্ধ ছড়াচ্ছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে গণপতির। এমনি করে চলতে চলতে একটা জায়গায় এসে গণপতি নদীর স্রোতধারার শব্দ অনেক স্পষ্ট করে শুনতে পেল। বুঝতে পারল ও নদীর কাছে এসে গেছে। হঠাৎ একটা মৃত দেহের উপর পা পড়ল ওর। তাড়াতাড়ি সরে যেতে গিয়ে আবার একটা মড়ার উপর পা পড়ল ওর। তাড়াতাড়ি সরে যেতে গিয়ে একটা শিশু-শরীরের কোমল স্পর্শ অনুভব করল গণপতি। ও এতক্ষণ টর্চ জ্বালতে চাইছিল না। কেননা টর্চ জ্বাললে এই সব বীভৎস দৃশ্য চোখে দেখে ও কেমন যেন অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। ও দেখতে চাইছিল না এই সব ভয়ানক দৃশ্য, মানুষের এই দারুণ, বীভৎস অপমান ওকে কাতর করছিল, ও জীবনের প্রতি বৈরাগ্য অনুভব করছিল, বমি আসছিল ওর। কিন্তু পর পর

তিনটি পদক্ষেপে তিনটি মৃতদেহে পা লাগাতে ও পড়ে যেতে যেতে কোন রকমে বেঁচে গিয়ে টর্চ জ্বাললো। এঃ একি দৃশ্য, এযে সহ্য করতে পারছে না গণপতি। ও নিজেকে যেন কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছে না। ও কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে? আকণ্ঠ পিপাসায় ও কাতর হয়ে পড়ল। ওর মুখ শুকিয়ে গেছে। গলা যেন তেষ্টায় কাঠ হয়ে গেছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। নদী কতদূর, কতদূর এখান থেকে? টর্চ ফেলে ও দেখতে চাইল নদী কাছে কিনা। না, না কাছে নয়। হয়তো নদী এখানে বাঁকের মুখে তাই শব্দ এত প্রবল মনে হচ্ছে। কিন্তু আর যেন ও চলতে পারবে না। লাঠি ফেলে দিয়ে বস্তা নামিয়ে রেখে বসে পড়ল গণপতি। টর্চের আলো ফেলে ফেলে দেখতে লাগল, অন্তত পঞ্চাশটি নারী পুরুষ শিশুর মৃতদেহ পড়ে আছে, কি বিশ্রী ভাবে পড়ে আছে ওরা! কেউ কুঁকড়ে ভেঙ্গে, কেউ মুখ থুবড়ে, কেউ চিত হয়ে। কারও হাত বেঁকে গেছে, কারও পা ভেঙ্গে গেছে। ওরা অধিকাংশই উলঙ্গ। বানে ওদের কাপড় ভেসে গেছে। নদীর মোহানার বানের প্রচণ্ড ঝাপটা এসেছিল গভীর রাত্রে। ওরা হয়তো দরজা বন্ধ করে ঘরে শুয়ে ছিল, বসেছিল, ঘুমোচ্ছিল, হঠাৎ বান এসে ওদের ভাসিয়ে দিয়েছে, ওরা এখন মরে পড়ে আছে। কিন্তু গণপতি যেন নিশ্বাস নিতে পারছে না, তেষ্টায় ওর বুক যেন ফেটে যাচ্ছে, ঘেমে উঠেছে ও। 'জল, একটু জল না হলে আমি এখুনি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।' গণপতি পাগলের মতো সিদ্ধান্ত নিল, 'আমি পেচ্ছাব করেই খাব। একটু জল আমার ঠোঁটে গলায় নিতেই হবে।' পেচ্ছাব করে দুই হাতের অঞ্জলিতে সেই পেচ্ছাব নিয়ে দু অঞ্জলি পেচ্ছাব পান করল গণপতি। সবটা ও গিলতে পারল না। কিন্তু বিশ্রী দুর্গন্ধ আর ঝাঁঝালো নোনতা কটু স্বাদ ওর জিবকে যেন পুড়িয়ে দিল। তবু গলাটা যেন ভিজল। মুখের শুকনো ভাবটা যেন খানিক কাটলো। ও আবার সেই মৃতদেহগুলির দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ওদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে টর্চ ফেলে দেখতে লাগল। সহসা একটা অশরীরী অনুভূতি যেন ভর করল গণপতির মধ্যে। জায়গাটা আলকাতরার মতো কালো অন্ধকার। মাথার উপরে দশ বারোটা বড়ো বড়ো শিরীষ, বট, তেঁতুল গাছে জট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাস হাহাকার করছে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে গাছগুলির ঘন পাতায় পাতায়

গণপতির মনে হলো, যেন এরা এই মৃতদেহগুলি ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথা বলছে। গণপতি উৎকর্ণ হয়ে শুনতে চেষ্টা করল সত্যি ওরা কিছু বলছে কিনা। গণপতি কি কাণ্ডজ্ঞান, বাস্তববোধ হারিয়ে ফেলল! সে কি এখন আর প্রকৃতিস্থ নেই? গণপতির অনুভূতি এমন এক অদ্ভুত বিস্ময়কর পর্যায়ে উঠে গেল যে বাস্তব অবাস্তব জ্ঞান তার লুপ্ত হয়ে গেল। মৃতদের কথা শুনবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। সে উৎকর্ণ হয়ে বাতাসের ফিসফিসানির মধ্যে কণ্ঠস্বর শুনবার চেষ্টা করতে লাগল। গণপতির মনে হলো, ওরা যেন বলছে, 'গণপতি তুমি, একমাত্র তুমিই আমাদের কাছে এসে পড়েছ, তুমিই কেবল আমাদের দেখতে এসেছ। দ্যাখো, দ্যাখো, গণপতি, আমরা কেমনভাবে পড়ে আছি। গোরু, ছাগল, কুকুর, বিড়ালের মতো, গোরু ভেড়া কুকুর ছাগলের মধ্যে। গণপতি আমরা কি মানুষ নই? গণপতি পৃথিবীতে কি জীবন্ত মানুষ নেই? তারা কি আমাদের কথা ভাববে না, মানুষের মৃতদেহ যতটুকু সম্মান পায় সেটুকুও আমরা পাব না? গণপতি, আমরা কী অপরাধ করেছি যে আমরা সে-সম্মান পাব না?'

গণপতিকে তখন দেখাচ্ছিল উন্মাদের মতো। গণপতি চোখে বড়ো বড়ো করে আরও উৎকণ্ঠিত হয়ে বাতাসের কণ্ঠস্বর শুনতে লাগল, নিজের মনের কল্পনা দিয়ে বাতাসের মর্মর ধ্বনিতে কথা সঞ্চার করে শুনতে লাগল, মৃতদেহরা যেন একযোগে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কত হাহাকার করছে, 'গণপতি, আমরা কেন এমন করে অপঘাতে মলাম। আমরা কী দোষ করেছি গণপতি? বেঁচে থাকতে আমরা কোনোদিন অন্যায় করিনি, কিন্তু অন্যায় না করেও কোনোদিন সুখ পাইনি। জমিদার জোতদার আমাদের মেরেছে, আমাদের পরিশ্রমের ফসল কেড়ে নিয়েছে, তারা পুরুষদের ল্যাংটো করে চাবুক মেরেছে, মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করেছে। আমরা নিষ্পাপ, আমরা নিরীহ, আমরা গরীব, কিন্তু কেন আমরা এমনি করে বানে ভেসে গিয়ে ডুবে গিয়ে মরে গিয়ে এই নদীর চড়ায় পড়ে আছি। কেন শকুনি আর শেয়াল কুকুরের খাদ্য হয়েছি আমরা?'

গণপতি ভাবতে লাগল, তার মানে কি? সত্যিই তো কেন বান এলো? বাঁধ! নদীর ধারে বাঁধ দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। প্রবল ঢেউয়ের

ঝাপটায় বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছিল আর তাই মাঝ রাত্রে বন্যা এসে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মানুষকে, ধ্বংস করে দিয়েছিল গ্রাম, লোকবসতি। আর এই বাঁধ বাঁধবার দায়িত্ব থাকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আর জমিদারদের। নদীর ধারের বড়ো বড়ো প্রধান বাঁধগুলির দেখাশুনো করে ব্রিটিশ সরকার আর জমিদারী এলাকার মধ্যেকার ভেড়ি বাঁধগুলি বাঁধবার, দেখাশুনো করবার দায়িত্ব থাকে জমিদারদের। এবং জনসাধারণের খাজনা থেকে তার খরচও প্রতিবৎসর আদায় করা হয়। নদী নালার দেশ বাংলার এই দক্ষিণ অঞ্চল। বাঁধ বেঁধে বেঁধে দুরন্ত নদীগুলিকে এদেশে বশে না রাখলে প্রলয়ঙ্করী হয়ে ওঠে নদীগুলি। এই বাঁধগুলিই দক্ষিণ বাংলার মানুষের জীবনের নিরাপত্তা। তবু বাঁধগুলি সম্পর্কে সরকার এবং জমিদার উদাসীন থাকে, অবহেলা দেখায়। বাঁধ বাঁধবার টাকা মেরে দেয় কনট্রাকটার, টাকা খরচের ভয়ে জমিদার বাঁধের দিকে নজর দেয় না। আর সেই জন্যেই নোনা জল ঢুকে হাজার হাজার বিঘে জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়, আর নদী খেপে উঠলে এমনি করে মানুষকে মরতে হয়, এমনি করে মহাশ্মশান হয়ে যায় সুন্দরবন, সাগর, মেদিনীপুর। গণপতি জানে, সুন্দরবনের অনেক মানুষও হঠাৎ বন্যায় প্রাণ হারিয়ে পূবের ঢেউয়ের ঝাপটায় এই সাগরদ্বীপের কূলে এসে পড়ে আছে।

গণপতি বাতাসের সেই রহস্যময় কথকতার মধ্যে যেন শুনতে পেল, তার চারিদিকে মৃতরা বলছে, 'আমাদের জীবনের কোনো দাম নেই গণপতি, আমাদের সবাই শোষণ করে। ব্রিটিশ শোষণ করে, জমিদার শোষণ করে, মহাজন শোষণ করে। কিন্তু আমাদের জীবনের নিরাপত্তা যে বাঁধ, সেই বাঁধের দিকে ওরা তাকায় না। বাঁধ দুর্বল ছিল। বানের ধাক্কা সামলাতে না পেরে ভেঙ্গে পড়ল বাঁধ আর আমাদের এমনি করে মরে এই অন্ধকারে পশুর মতো পড়ে থাকতে হলো, গণপতি! গণপতি, এমনি করে গরীব চাষীরা কি চিরকাল শুধু মার খাবে আর মরবে? মানুষের অধিকার কি তারা পাবে না? তোমরা যারা বেঁচে আছ, তারা কি আমাদের কথা ভাববে না? আমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে না? মানুষের জীবন কি এত সস্তা গণপতি? মানুষ মারলে তার জন্যে কি কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না? খুন করেও কোন শাস্তি

পাবে না বিদেশী ব্রিটিশ আর দেশী জমিদার ?'

গণপতি কি এক রকম বিচিত্র ভাবাবেগে হু হু করে কেঁদে ফেলল। ও উদ্‌ভ্রান্তের মতো বিচরণ করতে লাগল। ওর মনে হলো, 'সত্যিই তো বাঁধ যদি শক্ত থাকত তাহলে তো এত মানুষ এমনি করে মুখ থুবড়ে নদীর ধারে পড়ে থাকত না, এমনি করে শেয়াল কুকুর শুকনি তাদের নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করত না ?' এলোমেলো পায়চারি করতে গিয়ে একটি মড়ার গায়ে পা লেগে গিয়ে আছাড় খেলো গণপতি। মুখ থুবড়ে পড়ল একটা মৃতদেহের উপরে। ভক্ করে মানুষ-পচা গন্ধ লাগল নাকে। মনে হলো যেন রাত্রেও মাছি ভন্ ভন্ করছে। গণপতি উঠে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, 'আমি তিনটে অঞ্চল দেখে এলাম ; ঘরবাড়ী, গ্রাম, স্কুল, হাঁসপাতাল, মানুষ-জন সব ভেসে গেছে। অথচ এর কোনো প্রতিকার নেই ! জোয়ারে বাঁধ ভাঙ্গলে খাজনা দোব না, এই নিয়ম করতে হবে। জলের কল নাই, তাই চাষীরা বন্যার পর কালেবায় ভুগছে, জলের কল না দিলে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে। চাষী মজুরকে জাগাতেই হবে, তেভাগা আদায় করতেই হবে। সুন্দরবনে জমিদার মণীন্দ্র নন্দী মধ্যস্বত্বভোগী চকদারদের কাছ থেকে বিঘে প্রতি খাজনা নেন তিন পাই করে। আর চকদাররা সেন-নন্দগুষ্টিরা চাষীদের কাছ থেকে আদায় করে বিঘে প্রতি তিনটাকা করে খাজনা।'

হঠাৎ গণপতি চীৎকার করে বলতে লাগল, 'আমার মৃত বন্ধুরা শোনো, আমি গণপতি বলছি, আমি তোমাদের কথা শুনতে পেয়েছি। আমি তোমাদের মিত্যুর শোধ নোব। আমি কৃষক-সমিতি করব। সমস্ত গরীব চাষীকে আমি এক করব। আর যে ব্রিটিশ আর জমিদাররা তোমাদের মরণের জন্যে দায়ী তাদের আমি নিশ্চিহ্ন করে দোব সুন্দরবনের মাটি থেকে। আমি ব্রিটিশ আর জমিদারদের শ্মশান করব সুন্দরবনে। আমার মৃত ভাইবোনরা শোনো, আমি তোমাদের কথা জীবন থাকতে ভুলব না, আমি তোমাদের কথা শুনতে পেয়েছি, আমি বলছি, আমি শোধ নোব ! যত অত্যাচার করেছে জমিদার, লাটদার, চকদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ান, পাইক আর দালালরা সব অত্যাচারের সুদ সমেত শোধ নোব। বন্ধুরা শোনো, তোমরা কেঁদো না, তোমরা একটুখানি চুপ

করে শোনো আমি বলছি, এই কাজ করবার জন্যে যদি আমাকে সব স্বার্থ ত্যাগ করতে হয় আমি তাই করব। দরকার হলে আমি ঘর বৌ ছেলে সব ছেড়ে চলে যাব। আমি কথা দিলাম, তোমাদের কথা আমি কখনও ভুলব না।'

গণপতি নীরব হলো। রাত্রির অদ্ভুত নির্জন নীরবতায় গণপতির চীৎকার যেন বজ্রগর্জনের মতো বেজে উঠেছিল। গণপতি নীরব হতেই সেই নৈঃশব্দ যেন আরও প্রগাঢ় বলে মনে হলো। গণপতি কান সজাগ করে শুনতে চেষ্টা করল মৃতদের কণ্ঠস্বর। কিন্তু আর কোনো কথা শুনতে পেল না। কানে বাজতে লাগল ঝিঁঝিঁ পোকার কান্না, বাতাসের ফিসফিসানি, গাছের পাতার ঝির্ ঝির্ সন্ সন্ শব্দ, মশার ভ্যানভ্যানানি আর শেয়াল কুকুরের গরগরানি কিংবা ফ্যাসফ্যাসানি। গণপতি কল্পনা করল, তাহলে মৃতেরা তার কথা শুনেছে, সান্ত্বনা লাভ করেছে। গণপতির এতক্ষণ হুঁশ ছিল না যে সে অনেকক্ষণ এখানে আছে। রাত্রি যে কত হয়েছে তাও সে আন্দাজ করতে পারল না। গণপতি বলতে লাগল ধীরে ধীরে, 'হে আমার মৃত বন্ধুরা, তাহলে এবার আমি তোমাদের কাছে বিদায় নোব। আমাকে কাল সকালে মেদনীপুর যেতে হবে। তোমরা আমাকে যাবার অনুমতি দাও।'

একটু থেমে বলল, 'কি বলছ, আর একটু থাকব তোমাদের কাছে! বেশ তা থাকতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু অন্তত ভোরবেলা মন্দিরতলা পৌঁছতে না পারলে অনেক অসুবিধা হবে। তা হোক আমি আরও কিছুক্ষণ বসছি তোমাদের কাছে।'

বলে সেই মড়ার স্তূপের মধ্যে উৎকট দুর্গন্ধের মধ্যে, মশার ভ্যান্-ভ্যানানির মধ্যে ঘন জমাট অন্ধকারে মাটির উপর বসে পড়ল গণপতি। অচেতন মানুষের মতো স্থির হয়ে রাজাসনে বসে রইল সে। কি যে সে ভাবছিল তা সে নিজেই জানে না। নেশাগ্রস্তের মতো মনে হচ্ছিল তাকে। অর্ধচেতন অবস্থায় স্থির হয়ে বসেই রইল গণপতি।

মশারা হুল ফোটাতে লাগল তার শরীরে, দুর্গন্ধ সম্পর্কে বোধও যেন তার তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভয় অভয়ের ঊর্ধ্বে তখন সে উঠে গেছে। এমনি করে যে কতক্ষণ বসেছিল তা গণপতির খেয়াল ছিল না। সে বুঝতেও

পারে নি যে মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। বাতাস অনেক বেশী ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। গণপতির শীত করতে লাগল। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্থাণুর মতো বসে রইল। একসময়ে ওর মনে হলো রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। ঘন কালো অন্ধকার যেন একটু তরল হয়ে নীলাভ হয়ে উঠেছে। সমস্ত জায়গাটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। গণপতি উঠে দাঁড়াল। বস্তাটা মাথায় তুলে নিল। ডান হাতে লাঠিটা ধরল। তারপর চারিদিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'তাহলে ভাইসব আমি চললাল। আমি কথা দিলাম, আমি তোমাদের কথা ভুলব না। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, তোমাদের এই অপমিত্যুর শোধ আমি নোব।' বলে হাঁটতে আরম্ভ করল। অত্যন্ত ক্লান্ত আর অসুস্থবোধ হচ্ছিল ওর নিজেকে। অত্যন্ত আস্তে আস্তে মন্থর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন সে মন্দিরতলা পেঁছিল তখন ভোর হয়ে গেছে। আকাশে তখন ঘুলি ঘুলি অন্ধকার দলা দলা হয়ে জমে আছে যেন। নগ্ন হয়ে নদীর মাটি মেখে নদীর জলে চান করল গণপতি। কাপড় কাচল। বস্তা থেকে কাচা কাপড় বার করে পরে নৌকার খোঁজ করতে গেল।

মেদিনীপুরের একখানা নৌকা পাওয়া গেল। সেই নৌকায় একজন ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তার যাচ্ছিলেন মেদিনীপুরের বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে ওষুধপত্র দিতে, চিকিৎসা করতে। সরকারী ডাক্তার। সরকারী ডিউটিতে যাচ্ছিলেন।

গণপতি ডাক্তারকে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আমিও মেদনীপুরে যাব। আপনার নৌকাতে যাই?'

গণপতিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার। নাম, ধাম, পিতৃপরিচয়, বংশপরিচয় সব জানতে চাইলেন। গণপতিও জবাব দিল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ওকে নৌকায় উঠতে দিলেন; গণপতি অসুস্থ শুনে ওষুধপত্রও খেতে দিলেন।

নৌকাতে মেদিনীপুরেরও কিছু লোক ছিল। তাদের কাছে বন্যার বিবরণ শুনল গণপতি। বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েই এই ধ্বংসকাণ্ড ঘটে গিয়েছে। প্রায় সত্তর আশি মাইল এলাকা ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই সত্তর আশি মাইল এলাকায় ঘরবাড়ী মানুষজন জীবজন্তু সব শেষ হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ জল জমে ছিল। আর দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো, মানুষের মৃতদেহ,

মরা জীবজন্তু এই সব ভেসেছে সেই জলের উপরে।

গণগতি জিজ্ঞাসা করল, 'যারা বেঁচে আছে তাদের কি অবস্থা বলো।'

তারাও মরছে পাইকারী হারে। অধিকাংশই রোগে মরছে। চারিদিকে কলেরা, আমাশয়, পেটের অসুখ জ্বর জ্বালা আরম্ভ হয়েছে। খাদ্যের দারুণ অভাব। ঘরে যা ছিল ভেসে গিয়েছে। উপবাসে অনাহারে দিন কাটছে মানুষের। কত মেয়ে বিধবা হয়ে গেছে। কত মায়ের বুক থেকে ছেলে মেয়ে ভেসে চলে গেছে। কত লোক সব কিছু হারিয়ে, বৌ ছেলে মেয়ে হারিয়ে একা বেঁচে আছে। তারা কেবল কাঁদছে আর বুক চাপড়াচ্ছে।

খেজুরী থানার জয়নাবাদে গণপতির বাড়ী। গাঁয়ে পোঁছে দেখল জল অনেক নেমে গেছে। কিন্তু তখনও মাটি শুকোয়নি। খাল্য জায়গাতে জল জমে আছে। গণপতির ভাইরা সবাই বেঁচে আছে। যদিও বানের ধকলে কাহিল অবস্থা হয়েছে তাদের। গাঁয়ের পশ্চিমে একটা উঁচু ডাঙ্গায় আরও অনেক লোকের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছে। বোনেদের শ্বশুরবাড়ীতে বান পৌছয় নি। তারা মোটামুটি ভালোই আছে। গণপতি ওর শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে দেখল তারা উঁচু মাচা বেঁধে টঙ তৈরি করে তার উপরে সপরিবারে বসে আছে। জল এখনও সম্পূর্ণ নামে নি। দুঃখকষ্টে দিন কাটছে তাদের। গণপতি টাকাকড়ি যা এনেছিল সবারই খোঁজ খবর করে টাকাগুলি দিয়ে দিল। শ্বশুরবাড়ী আর ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দিল চালের বস্তা। দেখল ইতিমধ্যে কিছু কিছু সরকারী সাহায্যও এসে পৌচেছে। কাপড়, চাল, কিছু কিছু নগদ টাকা সরকার দিচ্ছে বন্যাপীড়িতদের।

আর একটা অদ্ভুত ঘটনা শুনল গণপতি। প্রায় দু'শ আড়াইশ' মিলিটারী সৈন্য বন্যাতে ভেসে গেছে, মারা গেছে। বিধ্বস্ত সৈন্যদের সাহায্য করবার জন্যে জাহাজ এসেছে সৈন্যভর্তি। প্লেন এসে খাবার ফেলে যাচ্ছে। গণপতি জানতে চাইল সৈন্য আবার কোথা থেকে এল, কেমন করে এল।

তখন মেদিনীপুরে ও '৪২ সালের বিখ্যাত আগস্ট আন্দোলন চলছিল। সেই আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে পুলিশ এসেছিল। পুলিশের

সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল বারংবার। পুলিশ বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। তাই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট পাঠিয়েছিল মিলিটারী। তাদের সদম্ভ মার্চের শব্দে আকাশ মুখরিত হচ্ছিল; অত্যাচার আর উৎপীড়নের ভয়াবহ নরক সৃষ্টি করেছিল পুলিশ আর মিলিটারীরা। বন্যা এসে পড়লে সৈন্যরা মেদিনীপুরের অফিসে এবং ধনী জমিদারদের কাছে লোক পাঠিয়েছিল কলকাতায় ফোন করবার জন্যে। কিন্তু গণপতির শালার এক বন্ধু নেতৃত্ব দিয়ে গ্রামাঞ্চলের বহুলোক জড়ো করে মিলিটারীদের ঘিরে ফেলে। তাদের পোষাক, পরিচ্ছদ, বন্দুক কেড়ে নেয়। ক্যাপটেনকে ধরে ফেলেছিল তারা। তার পোষাক পরিচ্ছদ অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে স্বদেশী খদ্দরের কাপড় পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। গাঁয়ের লোকেরা ঠিক করেছিল ক্যাপটেনকে কাকদ্বীপে ছেড়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু বন্যা হঠাৎ বেড়ে গেল সব ভাসিয়ে ভেঙ্গে চুরে। কে কোথায় ছিটকে গেল, হারিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ক্যাম্পট্যাম্প সরাতে পারল না ব্রিটিশ সৈন্যরা। তাদের ক্যাম্প তাঁবু ভেসে গেল। দুশ আড়াইশ সৈন্য ভেসে গেল। চরম দুর্গতি ভোগ করল ওরা। যে মানুষদের উপর অত্যাচার করবার জন্যে ওরা এসেছিল, প্লাবন এসে অত্যাচারী আর অত্যাচারিতের অবস্থা সমান করে দিয়ে গেল।

নিজের আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের আত্মীয়স্বজনদের টাকাকড়ি দিয়ে তাদের খোঁজখবর নিয়ে গণপতি আবার ফিরে এল সুন্দরবনে। কিন্তু চুপ করে ঘরে বসে থাকতে পারল না গণপতি। নদীতীরবর্তী সুন্দরবন-এলাকার হাল কি হয়েছে নিজের চোখে দেখতে যাবার জন্যে নয়ালগঞ্জের তেরজন যুবককে নিয়ে একটা দল তৈরি করল। শ্রীচরণ, যোগেশ, রেণুপদ অর্জুন, বীরচন্দ্র, নরেন্দ্র, সিন্ধু, অজয়, শিবনাথ, কেষ্ট, সুধীর, শম্ভু, হরেরাম এই তেরজন আর সে নিজে বস্তাকয়েক চাল, কিছু আলু আর নুন বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে গেল নদীর কাছাকাছি গ্রামগুলি ভেসে গেছে। হাজার হাজার বিঘে জমি নোনাজলে ডুবে গেছে। যে সব জমি ডোবে নি, আশ্বিনে সবে ধানের থোড় আসছিল ঝড়ে নষ্ট হয়ে গেছে, রেণু ঝরে গেছে। ধান এবার আর হবে না। হবে শুধু আগরা। গৃহহারা ক্ষেত-

মজুররা হা-অন্ন হা-অন্ন করে জোতদার, নায়েবদের দরজায় দরজায় ঘুরছে। দশপনের টাকায় গরীব চাষীদের কাছ থেকে গোরু বাছুর কিনে নায়েব জোতদাররা নিজেদের গোয়াল ভর্তি করতে লেগেছে। দুচার বিঘে সামান্য জমি যে সব ছোটো চাষীদের আছে, ঘরবাড়ী ভেসে যাওয়াতে তারাও পথে বসেছে। পাঁচ-সাতশ' টাকা বিঘে জমি মওকা পেয়ে পঞ্চাশ ষাট টাকায় কিনে নিচ্ছে নায়েব, জমিদার, জোতদার, মহাজনরা। মহাজন, নায়েব, জোতদাররা চাষীদের ধান ধার দিচ্ছে। দ্বিগুণ কিংবা তারও বেশি সুদে। মানে কখনো চাষী চাষ করে ধান তুলতে পারলে, বছরে দ্বিগুণ তিনগুণ সুদে ধান ফেরত দেবে মহাজনকে। বেশি বছর হয়ে গেলে চক্রবৃদ্ধি হারে আদায় হবে সুদ।

খাবার জলের পুকুরগুলো বন্যায় ভেসে গেছে। কোথাও মিঠে জল নেই। পানীয় জলের অভাবে লোকে নানান রোগে ভুগছে। গোমড়ক লেগেছে হঠাৎ। পাইকেরী হারে গোরু-বাছুর মরছে। মেয়েদের সতীত্ব কিনছে নায়েব, গোমস্তা, জমিদার, জোতদার, মহাজন, দারোয়ান, পাইকরা পর্যন্ত জলের দামে। একমুঠো ক্ষুধার অন্নের জন্যে সতীত্ব লুণ্ঠিত হচ্ছে যত্র তত্র। দুএক বস্তা ধান দিয়ে চাষীব সামান্যসম্বল জমি জলেব দরে লিখিয়ে নিচ্ছে জোতদার, নায়েব, মহাজনরা।'

গণপতি ভাবে, দেখুক ওর সঙ্গীরা ওদের দেশের হাল, পড়ে পড়ে সব সহ্য করে, রাগুক ওরা, ওদের মধ্যে বিকার আসুক। এই জমিদার, জোতদার, মহাজন, দারোয়ান, গেঁয়ো ভদ্দরলোকদের ওপর ওদের দারুণ ঘেন্না আসুক। তবে ওদের জড়তা ঘুচবে। ক্রমেই গণপতি গম্ভীর আর বাকহীন হয়ে পড়ছে। গণপতি ভাবতে থাকে, ও দেখল শুধু সুন্দরবন আর সাগরদ্বীপের জীবনকে। কে জানে এই ভারতবর্ষে এমন কত জায়গা আছে যেখানে পানীর জল নেই, নদীতে বাঁধ নেই, নদী পারাপারের জন্যে সেতু নেই, যেখানে হাজার হাজার মানুষ কয়েকজন ধনীলোকের হাতের মুঠোয় থাকে, যেখানে মেয়েদের মাংসের দরে কেনাবেচা করা হয়, যেখানে মানুষ সারাদিন খাটে আর দুশ্চিন্তায় মাথা তুলতে পারে না, বিষ-খাওয়া মানুষের মতো ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে অপমান অত্যাচার সহ্য করে করে মনুষ্যত্বকে অপমানিত করে, যারা জীবনকে

ভালোবাসতে জানে না, নিজের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকে?

ধানের দাম হঠাৎ বেড়ে উঠেছে। বাড়িয়ে দিয়েছে ধানের মালিকরা। চাষী আজ গৃহহারা সর্বহারা। সেই সুযোগ নিয়ে আগুনদামে ধান চাল বিক্রি করে টাকা লুটতে লাগল বড় বড় ব্যবসায়ীরা, জোতদার-মহাজনরা।

গণপতি বলে, 'কি হরেরাম, কি বুঝছ, বাপু সন্ধেবেলায় রতনের দাওয়ায় বসে আড্ডা না দিয়ে এবার থেকে লোকের কাছে বলে বেড়াবে, কি দেখে গেলে।' খানিক গুম হয়ে থেকে আবার বলে, 'যোগেশ, শুধু মার খেয়ে যারা মার হজম করে, মার দেবার চেষ্টা করে না, তারা মানুষ নয়, তারা জানোয়ার, গোরুমোষের সঙ্গে তাহলে মানুষের তফাতটা যে থাকে না বাপু।'

তারপর সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, অশ্রুরুদ্ধ ভাঙ্গা গলায় চীৎকার করে ওঠে গণপতি, 'তোমরা যদি মানুষ হও, মানুষের রক্ত যদি তোমাদের শরীরে থাকে তাহলে প্রতিজ্ঞে কর, আজ থেকে তোমরা ঐ জমিদারী ব্যবস্থা নিপাত করবার চেষ্টা করবে, সুন্দরবনের চাষীদের অপমান ঘোচাবে, যত অত্যাচার করেছে জমিদার, জোতদার, চকদার, নায়েব, গোমস্তা, মহাজন, সুদখোর, দালাল, দারোয়ান, পাইক, ব্যবসাদার তাদের ওপর শোধ নেবে কড়ায়গণ্ডায়, কারুকে নিষ্কৃতি দিলে চলবে নি। কাউকে আমরা ছেড়ে দোব নি। গুনে গুনে সুদে আসলে প্রতিশোধ নোব।'

ওরা একে একে বলে, 'আমরা তোমার সঙ্গে আছি গণপতি, আমরা কথা দিচ্ছি, জমিদারির উচ্ছেদ করবার জন্যে জীবনভোর খাটব আমরা, সুন্দরবনের চাষীর দুঃখ আমরা ঘোচাব।'

ঘুরতে ঘুরতে মথুরাপুরে উপস্থিত হলো ওরা। দেখল একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে দু তিনশ লোক আশ্রয় নিয়েছে। তাদের ঘর ভেসে গেছে, অন্ন নেই ঘরে। গণপতিরা কিছু চাল দিয়ে ওদের সাহায্য করল। শুনল বাগে পেয়ে জলের দরে জমি কিনছে জোতদার, নায়েব, মহাজনরা। পাঁচ ছ শ' টাকা বিঘে জমি এখানে পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা বিঘে দরে বেচতে বাধ্য করছে বিপদগ্রস্ত চাষীকে।

দেখল মহকুমা-শহর থেকে অফিসাররা লঞ্চে করে এসেছে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করতে।

মথুরাপুরের জমিদারকে ডেকে এনে অফিসাররা বলল, 'প্রজাদের এই বিপদে না খাওয়ালে গভর্ণমেণ্ট আপনার সম্পত্তি আর আয়ের হিসেব নেবে।'

জমিদার মিথ্যে করে বলল, 'আয় হয় সামান্য। আমার হাজার বিঘে জমি হলে কি হবে বিঘে প্রতি দুমন আড়াই মনের বেশি ধান হয় না।'

অফিসাররা জিজ্ঞাসা করল, 'ক্ষেতমজুরদের দিনে কত করে মজুরী দেন আপনি?'

জমিদার মিথ্যে বলল, 'আমি ক্ষেতমজুর খাটাই না। আমি উড়িষ্যা থেকে মজুর নিয়ে আসি। তাদের মজুরী দিই দিনে দুটাকা।'

গণপতি ক্রোধে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। এ জমিদার তার এলাকার ক্ষেতমজুতদের দিয়ে চাষ করায়, আর দিনে মাত্র দুআনা করে মজুরী দেয়। অথচ সে কেমন সহজে মিথ্যে কথাগুলি বলে যাচ্ছে সরকারী লোকেদের কাছে।

গণপতি বলে ফেলল, 'না হুজুর, ক্ষেতমজুরদের এখানে দিনে দুআনা করে মজুরী দেওয়া হয়। সারাটা বছর তাদের পেরায় উপোস দিয়েই কাটে।'

অফিসাররা গণপতির কথা বিশেষ গ্রাহ্য করল না। জমিদারের সঙ্গেই কথা বলতে লাগল।

মথুরাপুর থেকে সঙ্গীদের বিদায় দিয়ে গণপতি এবার একা একা ঘুরতে মনস্থ করল। কেননা সঙ্গীরা বাড়ী ফিরবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকের বাড়ীতেই কাজ আছে। এমন বিপদের দিনে বাড়ীতে মেয়েরা হয়তো ভয় পাচ্ছে। ঘুরতে ঘুরতে গণপতি গেল নামখানা। একদিন থাকল পরিচিত গৌর মণ্ডলের বাড়ীতে। সেখান থেকে সকাল বেলা বিদায় নিয়ে আবার বিধ্বস্ত মাঠের উপর দিয়ে চলতে চলতে উপস্থিত হলো অগস্তী জমিদারদের কাছারির কাছে। সেখানে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখল গণপতি। অনেকটা দূর থেকে দেখতে পেল একটা মেয়ে কচি ছেলে কোলে নিয়ে নদীর জলে নেমে যাচ্ছে। ব্যাপারটা প্রথমে বুঝতে পারেনি গণপতি। তারপর মনে হলো মেয়েটা বোধ হয় আত্মহত্যা করতে নামছে। কিন্তু অনেকটা দূরে আছে সে। একবার চীৎকার করল, 'হোই তুমি কি করতেছ।' কিন্তু মেয়েটা ফিরেও তাকাল

না। হয়তো সে শুনতে পায় নি। গণপতি শিউরে উঠে তাকিয়ে দেখল মেয়েটা ছেলেটাকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে নদীর পাড়ে লুটিয়ে পড়ে চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাটিতে মাথা কুটতে লাগল। ছুটতে ছুটতে মেয়েটার কাছে এসে যখন পৌঁছল তখন মেয়েটা শূন্যদৃষ্টিতে পাগলের মতো নদীর দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

গণপতি চীৎকার করে উঠল, 'এই মেয়ে তুমি ছেলেটাকে জলে ফেলে দিলে কেনে?'

মেয়েটা ফিরেও তাকাল না।

গণপতি ফের চীৎকার করে বলল, 'ও মেয়ে শুনতে পেছ না?'

মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে তাকাল গণপতির দিকে। তার দুচোখ জলে ভাসছে। মুখের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, চোখ বসে গিয়েছে, পরণে ছেঁড়া ময়ল. শাড়ী।

গণপতি শুধোল, 'কি হয়েছে কি?'

মেয়েটা আবার একবার কেঁদে উঠল। গণপতি চুপ করে অপেক্ষা করে রইল'

মেয়েটা একটু শান্ত হলে গণপতি বলল, 'কি হয়েছে, বলতো এবার।'

মেয়েটা ভেঙ্গে ভেঙ্গে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমার স্বামী হঠাৎ কলেরা হয়ে মরে গেল। ঘরে এক মুঠো খাবার নি, কচি বাচ্ছাটাকে আজ দুদিন কিছু খেতে দিতে পারি নাই। আমার বুকে এক ফোঁটা দুধ নি। খিদেয় আমি অন্ধকার দেখছি। আমি ওর কান্না আর দেখতে পারছিলাম না তাই ওকে নিয়ে ডুবে মরব ভাবছিলাম। তা ও হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গেল, আমি ডুবতে পারলাম না। আমি সাঁতার জানি আমি ডুবব না' বলে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

গণপতি খানিকক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে কয়েকটা টাকা বার করে মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এই টাকা নাও, কিছু কিনে এখুনি খাও গা। তারপর যা হয় করো। কি বলব বলো। আমার নাম গণপতি। থাকি নয়ালগঞ্জে। টাকা ফুরলে, কোনো কিছু উপায় না হলে আমার কাছে যেও।'

মেয়েটা হঠাৎ গণপতির পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বলল,

'বাবু, তুমি আমার বাবা, আমার ইজ্জত নিয়ে একমুঠো চাল দিয়েছিল এক জোতদার চাষী। তারপর আমাকে তেইড়ে দিলে। তুমিও তো চাষী, কিন্তু—' বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল মেয়েটা। কতই বা ওর বয়েস। মোহিনীর সমবয়সী হবে হয়তো। কিন্তু না খেতে পেয়ে শুকিয়ে উঠেছে, ধুঁকছে, যেন এখুনি প্রাণটা ওর বেরিয়ে যাবে।

গণপতি পাটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'যাও তাড়াতাড়ি কিছু খাও গা কেনে? তেমন বিপদ হলে আমার কাছে যেও।'

বলে চলতে লাগল। সহসা মোহিনীর কথা বড্ড ব্যাকুল ভাবে মনে পড়ে গেল ওর। আর বাইরে নয়। এবার ঘরে ফিরতে হবে তাকে। অনেক দেখল, অনেক শুনল, অনেক বুঝল। কিন্তু আর যেন ওর শরীর বইছে না। বাড়ী ফিরে মোহিনীর কাছেই এখন কিছুদিন বিশ্রাম নিতে হবে। আবার একবার অগ্র পশ্চাৎ সব ভেবে দেখতে হবে। চিন্তার গুরুভারে মাথাটা ভারী হয়ে উঠেছে যেন। মোহিনীর স্নিগ্ধ ঢলঢলে মুখখানি মনে পড়ে পিপাসিত হয়ে উঠল সমস্ত প্রাণ, বাড়ীর পথে চলতে লাগল গণপতি।

॥ ২৫ ॥

যখন বাড়ী এসে পৌছল তখন সূর্য ঢলে পড়েছে। মোহিনী গণপতিকে দেখে মনে মনে চমকে উঠল। কি চেহারা হয়েছে গণপতির! গোঁফ দাড়িতে সমস্ত মুখ ঢেকে গিয়েছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। ঘরছাড়া খেপা শিবের মতো লাগছে ওকে। মলিন মুখের মধ্যে চোখদুটো জ্বলছে ধ্বক ধ্বক করে।

তারপর নাপিত বাড়ীতে গিয়ে ক্ষৌর সেরে চান করে ঘরে ফিরে খাওয়া দাওয়া করল ও। অনেকটা স্নিগ্ধ ও সুস্থ বলে মনে হতে লাগল ওকে। খাওয়া দাওয়া সেরে খেজুরের চাটাই পেতে দেওয়ালে হেলান দিয়ে শান্ত ভাবে বসল গণপতি। মোহিনী তামাক সেজে এনে হুঁকো দিল গণপতির হাতে। গণপতি পরম আরামে হুঁকো টানতে লাগল। মোহিনী এসে বসল গণপতির পাশে। বলল, 'কি দেখে এলে আমাকে বলো।'

গণপতি অনেকক্ষণ কথা না বলে ধূমপান করল। তারপর বলল, 'হ্যাঁ মোহিনী, আমি তোমার কাছে সব রিপোর্ট করব। আমি তোমার কাছে থাকব দুদিন, দুসপ্তাহ কিংবা দুমাস। এই এতদিন ধরে তোমাকে আমি সব কথা বলব। তারপরে আমাকে বিদায় দিতে হবে। এমনি করে ঘরের মধ্যে আর আমি বসে থাকতে পারব নি মোহিনী। আমার সুখের সংসারে ঘরছাড়া মানুষের ডাক এসেছে। আমি মানুষের কষ্ট দেখেছি।'

মোহিনী গণপতির দিকে তাকিয়ে ভয় পায়। লোকটা দিনে দিনে যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। কথা বলতে বলতে ওর মুখচোখের এমন অবস্থা হয়, যেন মনে হয় ও স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্নের মধ্যে ভুল বকছে। গণপতির উত্তেজনা এবং উদ্দীপনা মোহিনীর মনেও যেন সংক্রমিত হয়। মোহিনী নীরবে শুনে যায় গণপতির কথা।

গণপতি বলতে লাগল, 'মোহিনী আমি সমস্ত সুন্দরবন, সাগরদ্বীপ দেখে এসেছি। আমি কতদিন ধরে দেখছি, এই সুন্দরবনকে, এই সুন্দরবনের মানুষকে। অনেকেই অবশ্য চুপচাপ আছে। কিন্তু গরীব চাষীদের এই বিড়ম্বনা, এই কষ্ট আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না, আমার মনে কোনো শান্তি নাই। কি দেখলাম, কি জানলাম তোমাকে আমি সব বলি শোনো। পেরথমে দেখলাম গরীবচাষী ক্ষেতমজুররা উপোসের ভয়ে বাড়ীর যোবতী বৌকে, কুমারী মেয়েকে সন্ধে বেলায় কাছারিতে নায়েবের কাছে পাঠিয়ে দিছে। এমনি দেখলাম সমস্ত সুন্দরবনে, হরিপুরে, চন্দনপিঁড়িতে, সি-প্লটে। নায়েবরা চাষীর ঘরের বৌঝিদের ইজ্জত নেয়, কিন্তু চাষীর কথা পরে আর মনে রাখে না।'

মোহিনী বলে উঠল, 'ওরা নষ্ট মেয়ে, ওরা ছেনাল মাগী, ওদের কথা ছেড়ে দাও।'

গভীর আবেগে বলে উঠল গণপতি, 'নাঃ না মোহিনী তা লয়, স্বামীপুত্তুর যখন উপোসে থাকে তখন মেয়েমানুষের বড় জ্বালা হয়। আর ওই সব মেয়েরা তো নিজের ইচ্ছায় নায়েবদের কাছে রাত কাটাতে যায় না। মোহিনী, মেয়েমানুষ তার কাছেই নষ্ট হতে পারে যাকে সে ভালোবাসে, পীরিতের লোকের কাছে মেয়েমানুষ তার সতীত্ব জলাঞ্জলি দিতে পারে।

কিন্তু নায়ের গোমস্তার কাছে শুতে যেতে তার যে কি কষ্ট, কি দুঃখু, কি লজ্জা মেয়ে হয়েও তা কি তুমি বুঝতে পারছ না ?'

মোহিনী চুপ করে থাকে। গণপতি খানিকক্ষণ কথা না বলে গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। তারপর হৃদয়-মথিত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, 'বৌ, আমার দেশের মাবোনের ইজ্জত না থাকলে তোমার ইজ্জতও থাকবে না।'

'কি যাথা বলছ তুমি !'

'ঠিক কথা বলছি। আজ আমাব ঘরে দুমুঠো ধান চাল আছে। কাল যে থাকবে তার কোনো মানে নাই। কাল জোতদার আমার কাছ থেকে জমি কেড়ে নিতে পারে, আমার ঘর জ্বালিয়ে দিতে পারে, তোমাকে ডাকাতি করে নিয়ে যেতে পারে। বৌ, তোমার মতো চাষীদের বৌঝি মাবোনের ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব আমারও। আমার খোকার মতো সব খোকাকে খাওয়ানোর ভার আমারও।'

একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আজকে একটা চাষীমেয়ে তার কচি ছেলেকে খেতে দিতে পারে নাই বলে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিল। ত্যাখন আমার তোমার মুখটি মনে পড়ল। মনে হলো, তুমিই যেন আমার খোকা কাতিককে কোলে নিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিতে গিয়েছ। সে মেয়ের বয়েস ঠিক তোমার মতো। উপোসে থেকে থেকে কঙ্কালসার হয়েছে। জোতদাররা তাকে নষ্ট করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার স্বামী কলেরাতে মরেছে। এই জোতদাররা পশুর অধম, তাদের শাস্তি না দিলে আমিও মানুষ লয়।'

মোহিনী ভিতরে ভিতরে আতঙ্কে শিউরে উঠল। সহসা নিজেকে ওর অত্যন্ত অসহায় মনে হলো। মনে হলো, এই সুন্দরবনের হতভাগিনী মেয়েদের থেকে সে আলাদা কিছু নয়। গণপতির যন্ত্রণাময় কথা শুনে এই সব হতভাগিনী মেয়েদের দুঃখ যন্ত্রণা কষ্ট সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে লাগল। তাদের দুঃখে যেন সহসা একাত্ম হয়ে উঠল।

গণপতি বলে যেতে লাগল, 'মোহিনী, আমি মরালোকেদের কাছে শপথ নিয়েছি। কচুবেড়ে থেকে মন্দিরতলা যাবার পথে সেই দারুণ রাতে আমি মরালোকেদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে গিয়েছি, তাদের কথা আমি শুনতে পেয়েছি। সাগরের মানুষরা মরে পড়েছিল, সুন্দরবনের মানুষও স্রোতের

ঝাপটায় সাগরের মরা মানুষদের মধ্যে পড়ে ছিল। তারা আমাকে বলেছে, শোধ নিও গণপতি, আমাদের এই মিত্যুর শোধ নিও। জানো কেন এতবড় ভীষণ বন্যা হলো। বাঁধ বাঁধে না ইংরেজ সরকার আর জমিদাররা। দুব্বল বাঁধ স্রোতের ধাক্কায় ভেঙ্গে গেল। গরীব চাষী গরীব মানুষের জীবনের দাম তো বড়লোকদের কাছে কিছুই নাই মোহিনী। মরালোকের কাছে যে শপথ আমি করেছি তা আমি ভাঙ্গতে পারব না মোহিনী।'

গণপতি হঠাৎ থেমে গিয়ে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে একদিকে তাকিয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে রইল। সেদিনের রাত্রির ভীষণ অনুভূতি বোধহয় তার স্মরণে জেগে উঠল। মানুষের এতবড় অপমান ওর কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। মানুষ, গোরু ছাগল কুকুরের মৃতদেহের মধ্যে পড়ে পড়ে পচছে, শকুনি কাক শিয়াল কুকুরের ঠোঁট দাঁতে সাফ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ! মানুস ওরা! গণপতির কেবলই মনে হয়, সেও তো বানের তোড়ে মরতে পারত। তাকে ভাসিয়ে নিয়ে পশ্চিমগামী মহাস্রোতের বেগ তাকেও তো সাগরদ্বীপের কূলে নিয়ে ফেলতে পারত। তাহলে ওর অবস্থাও তো ঐ মরালোকদের মতো হতো। অমনি করেই শকুনি আর কাক এসে ওর চোখ খুবলে খেত। অমনি করেই উলঙ্গ হয়ে দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকত ও, পচে ফুলে ঢোল হয়ে উঠত। আর ওর শরীরের গলিত মাংস নিয়ে শেয়াল কুকুর কাক শকুনিতে চলত ছেঁড়াছেঁড়ি, লড়ালড়ি। তার ঘরে বান আসেনি। তাই বলে কি সে ঐ মৃত অপমানিত মানুষগুলির সঙ্গে নিজেকে আলাদা ভাবতে পারে? কেমন করে ভাবা যায়, কেমন করে ভাববে তা কিছুতেই মাথায় আসে না গণপতির। সে কল্পনা করে, অমনি করেই দুমড়ে মুচড়ে পচে গলে শকুনি আর কুকুরের ছেঁড়াছেঁড়িতে বীভৎস ক্ষত বিক্ষত হয়ে অনাদরে অবহেলায় পড়ে আছে সে সাগরের কূলে।

সহসা আবার বলে উঠল গণপতি, 'আমি অনেক কিছুই দেখলাম বৌ, জমিদার, জোতদার, লাটদার, চকদার, নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ান, পাইক, মহাজন, ব্যবসাদার আর পুলিস সবাই অত্যাচার করছে গরীব চাষীদের ওপর। চাষীরা লেখাপড়া জানে না। সহজ সরল মানুষ! সারা বছর পরিশ্রম অথচ খেতে পায় না। কি কল যে বানিয়েছে বড়লোকেরা। খেটে মর

কিন্তু খেতে চেয়ো না। কোনো রকম আপত্তি করলে, ধরে নিয়ে গিয়ে গরুর খুটোতে বেঁধে চাষীকে চাবুক মারে, অনেক সময় ল্যাংটো করে বেঁধেও মারে, জুতো পরে কাছারির সামনে দিয়ে যাবার উপায় নাই চাষীদের। আর চাষীর ঘরের বৌ-ঝিদের তো বেশ্যা মনে করে জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা, মহাজনরা। যে লোক দারোয়ান আর পাইকের চাকরি করে সেও চাষীদের কাছ থেকে গুছিয়ে নিয়ে জমি করছে, চাষীর ঘরের মেয়ে নিয়ে টানাটানি করছে। আর মানুষগুলো কেমন যেন নিরুপায় হয়ে সহ্য করছে। কি করবে ভেবে পেছে না। ওদের শিরদাঁড়া যেন ভেঙ্গে গেছে। ওদের পেটে অন্ন নাই, মনে সুখ নাই। ওরা আর মানুষ নাই, বৌ। ভাগচাষী ধানের খড়ের আধাআধি ভাগ পায় সারা বছর পরিশ্রম করে আর জমির মালিক সেই অর্ধেক ভাগ থেকে কুড়িরকম বাজে আদায় নিয়ে চাষীকে শূন্যহাতে ফিরিয়ে দেয়; বিপদে ধান ধার দেয় দেড়া দ্বিগুণ সুদে। সবাই যদি সহ্য করে, কেউ যদি রুখে না দাঁড়ায়, এই অন্যায় অত্যাচার যদি মেনে নেয়, তাহলে কেমন করে চলে। আমার মনে হয়েছে মোহিনী, সমস্ত মানুষের প্রাণ শুকনো খড়ের মতো হয়ে আছে, একটু শুধু আশায় আগুন জ্বালাতে পারলে লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাবে। সবংশে নিধন হবে জমিদারের গুষ্টি। মেরে তাড়াতে হবে শালাদের। পাঁঠাকাটা করে কাটতে হবে ওদের।'

হাঁপাতে লাগল গণপতি। ওর চোখ রাঙা হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত পিষছে ও। উত্তেজনায় থম্ থম্ করছে ওর মুখচোখ। সন্ধে হয়ে এসেছিল। ঘরের ভিতরে অন্ধকার হয়ে আসছে। মোহিনী উঠে গিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে এনে একপাশে বসিয়ে দিল। হঠাৎ ঘুমন্ত ছেলে কেঁদে ওঠাতে কাছে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে এসে আদর করতে লাগল। ছেলেকে কোলে নিয়ে আবার সে বসল গণপতির কাছে।

মোহিনী বলল, 'কিন্তু তুমি একা কি করবে। সবাই তো দেখি চুপ করে সব সহ্য করছে। তোমার কথা কি ওরা শুনবে?'

গণপতি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, 'তুমি কী বলছ মোহিনী? জানো কত লোক আমার মত ভাবছে, কত লোক মানুষকে জাগাবার চেষ্টা করছে। আমার প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেককে পাব আমি। মানুষের মধ্যে

ভালো মানুষ আছে, খারাপও আছে ঠিকই। আমি ভালোটুকু নোব, খারাপ অংশটুকু বাদ দোব।'

'তোমাকে জমিদারের লোকেরা কি ছেড়ে দেবে? পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। তুমি জমিদার জোতদারের বিরুদ্ধে কথা বললেই তোমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে। তখন কি হবে।' হঠাৎ চোখ ভরে জল এল মোহিনীর। মোহিনী কম্পিত ওষ্ঠে বলল, 'আমার ভয় করছে, আমার ভারী ভয় করছে।'

'ভয়ের কি আছে মোহিনী। আমি তোমাকে অস্ত্র চালাতে শেখালাম কি জন্যে? কেউ পিছিয়ে থাকলে আমরা জিততে পারব না। মা ভগিনীরাও যুদ্ধ করবে। ভয়ই আমাদের জানোয়ারের অধম করে রেখেছে, ভয় পাই বলেই আমাদের এই দশা। আর আমাদের ভয়টাকে ভাঙিয়ে ওরা আমাদের উপর চাবুক চালায়, ওরা জানে ভয়ে আমরা কিছু বলতে পারব না, কিছু করতে পারব না। আমাদের প্রথম কাজই তো হবে মানুষের ভয় ভাঙানো।

মোহিনী ম্লান মুখে বসে রইল। কোনো উত্তর দিল না।

গণপতি বলে যেতে লাগল, 'কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। লাখো লাখো মাষ্টার আমার। সব চাষীদের কাছে আমি শিখব। তাদের মনের কথা জানব, তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানব তারপর ঠিক করব কেমন করে কি কাজ করব। সকলের কাছে শিখব আমি। তাহলেই সবাই আমার কথা শুনবে।

মোহিনী জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি করবে আমাকে বলো।'

'সমস্ত আন্দোলনের ছক আমি ভেবে রেখেছি। তবে সকলের পরামর্শ নিয়ে পরে সব ঠিক করতে হবে। আমরা তেভাগা চাইব। আমরা ক্ষেত মজুরদের দু আনার পরিবর্তে দু টাকা মজুরী দাবি করব, আমরা বাজে আবওয়াব দোব না, আমাদের উপর কোনো রকম অত্যাচার আমরা বরদাস্ত করব না, আর যারা এতদিন আমাদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের খুন করব।'

গণপতির জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল মোহিনী। বলল, 'খুন করবে?'

'হ্যাঁ খুন করব, ওসব খানকির ছাওয়ালদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নাই, ওরা বেঁচে থাকলেই মানুষের ক্ষেতি করবে। কাল সাপকে যেমন করে মেরে ফেলতে হয় ওদের তেমনি যেমন করেই হোক মেরে ফেলতেই হবে।'

মোহিনী বলল, 'পুলিশ এলে, মিলিটারী এলে তখন কি করবে, যেমন মেদিনীপুরে এসেছিল।'

'মেদিনীপুরে আর সুন্দরবনে অনেক তফাত আছে। এখানে তো শহরও নাই, জমাটবাঁধা গ্রামও নাই। এখানে ছাড়া ছাড়া ঘর আর নোনাজল আর ফাঁকা মাঠ। পুলিশ এলে পুলিশের খাবার জল আমরা বন্ধ করে দোব। ওদের খাবার জলের পুকুরে বিষ মিশিয়ে দোব। জলের কল করলে কল ভেঙ্গে দিয়ে আসব। আমরা সব চাষী সব গরীব মানুষ এক জোট হব। আমাদের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করলেই ষ্ট্রাইক করে দোব।'

মোহিনী বলল, 'তার জন্যে তোমাকে বাড়ী ছাড়তে হবে কেনে?'

'কারণ পুলিশ, জমিদারের লোক আমাকে খুঁজতে আসবে। তাছাড়া ঘরের কাজে, ঘরের মায়া-মোহ-মমতার বাঁধনে আটকে থাকলে আমি কাজ করতে পারব না। এক আধ দিনের এক আধ ঘণ্টার কাজ নয়। বড্ড কঠিন কাজ। সারাক্ষণ এই নিয়ে আমাকে থাকতে হবে। কোনো রকম পেছুটান থাকলে আমি পারব না।'

মোহিনী বলল, 'হঠাৎ তোমার এমন কেনে হলো!'

গণপতি বলল, 'মোহিনী আমি তো আগে মানুষ ছিলাম না। আমি জোতদারের দালালি করে জমির মালিক হতে চেয়েছিলাম। আমি বড়লোক হতে চেয়েছিলাম। গরীবের দুঃখের দিকে আমি তাকাতে চাই নি।'

হঠাৎ মোহিনীর একখানা হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গণপতি প্রবল আবেগে একটুখানি কেঁদে ফেলল, দুফোঁটা জল ওর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। গণপতি বলতে লাগল, 'গিন্নি, আমি তোমাকে কত মেরেছি কারণে অকারণে, আমি মেরে তোমার আঙ্গুল ভেঙ্গে দিয়েছি। আমি তখন অমানুষ ছিলাম। আমি পশু ছিলাম।'

মোহিনী গণপতিকে আদর করে বলল, 'অমন করে বোলো না, লোকেরা সারাদিন কাজ করে ঠিক সময়ে খেতে পাবে না বলে তুমি আমাকে মেরেছিলে।'

'কিন্তু তুমি কতটুকু মেয়ে ছিলে, তুমি কেমন করে অত রাঁধবে তাতো ভাবি নাই। কিন্তু আজ আমি বুঝেছি মোহিনী আমাকে কিছু করতেই হবে। হয় চাষীদের জাগিয়ে দল বেঁধে লড়তে হবে, নয়তো সুন্দরবন থেকে পালাতে হবে। আমি এখানে থেকে এসব সহ্য করতে পারব নি।'

মোহিনী বলল, 'সব জায়গাতেই সমান। এখানে একটু বেশি অত্যাচার, কিন্তু চাষীদের অবস্থা সব জায়গাতেই এমনি।'

'ঠিক বলেছ তুমি, তাহলে মনকে শক্ত কর বৌ, ভয়কে তাড়াও। আমাকে সংসার থেকে মুক্তি দাও, আমি এমন করে থাকতে পারব না। এমনি আরামে থাকলে আমার মনের জোর নষ্ট হয়ে যাবে।'

রাত্রি বাড়ছিল। ছেলেটা কেঁদে উঠল। মোহিনী তাকে দুধ খাওয়াবার জন্যে উঠে গেল। গণপতি ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। ঈষৎ শীতার্ত বাতাস বইছে। পরিষ্কার আকাশে কত তারা ফুটে উঠেছে। আকাশ যেখানে মাটিতে মিশেছে গাছের জটলাপাকানো ছবি যেখানে তুলির পোঁচের মত দেখায় সেখান থেকে অন্ধকার গুটি গুটি নেমে আসছে। অন্ধকার নামছে, কিন্তু আজ কত লোকের ঘর নাই, মাথা গুঁজবার জায়গা নাই, পেটে অন্ন নাই। এ হাহাকার কবে শেষ হবে, এ দুঃখের অবসান হবে কবে? গণপতি ভাবে, ভগবান নাকি করুণাময়, মঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান, তাহলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্ষিদেতে কষ্টে অপমানে রেখে জনাকয়েক বজ্জাত শয়তান মানুষকে সুখে আরামে রেখেছে কেন? ভগবানকে কে দেখেছে, তার কথা কে প্রচার করেছে। কেউ কি তাঁকে দেখেছে। গণপতির হঠাৎ মনে হলো, তাহলে কি ধনীরাই ভগবানের আবিষ্কর্তা, ভগবানের নাম আর গুণগান কি তারাই প্রচার করেছে ক্ষুধিত মানুষদের মধ্যে তাদের ধোঁকা দেবার জন্যে? ব্যাপারটা জানতে ইচ্ছে করে গণপতির। কিন্তু সে মূর্খ, তার তেমন লেখাপড়া নেই, সে কেমন করে অত সব মহাবজ্জাতির অন্ধিসন্ধির খোঁজ নেবে!

॥ ২৬ ॥

১৯৪২ সাল বাংলা ১৩৪৯ সালের বন্যার জের চলতে লাগল। রোগ-ভোগ লেগে রইল অবিরত। বাংলার মৃত্যুদণ্ড ম্যালেরিয়ার হিংস্র প্রকোপ দেখা দিল সুন্দরবনে। বন্যার জমে থাকা জলে মশারা বংশবৃদ্ধি করে চলল আর ম্যালেরিয়ায় রুগ্ন, দুর্বল, রক্তশূন্য হয়ে উঠতে লাগল মানুষ।

বহু জমির ধান নোনাজলের বন্যায় ডুবে গিয়েছিল। যখন বান হয় তখন আশ্বিনমাস। ধানের তখন সবে থোড় উঠছিল, প্রচণ্ড সাইক্লোনে আর বৃষ্টিতে ধানের রেণু ঝরে গিয়ে, ধানগাছ ভেঙ্গেচুরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই ফলন যা হলো তা অতি সামান্য। অধিকাংশ ধানই হয়ে গেল আগড়া। ধান উঠল সামান্য। তারপর ভাগচাষীব কাছে একে একে এসে উপস্থিত হলো জোতদার, মহাজন, ব্যবসাদার। এই দুর্বৎসরে ভাগচাষী ধানের ভাগ পেল সামান্য। কিন্তু জোতদার নিক্তি-ওজনে তার দেনা শোধ করে নিল এবং কুড়ি রকম বাজে আবওয়াবও ছাড়ল না। ভাগচাষী প্রায় শূন্যহাতে ঘরে ফিরল। সামান্য যা ধান নিয়ে ঘরে ফিরল তাও সঞ্চয় করে রাখতে পারল না। ধানই তার একমাত্র সম্বল, তাই ধান বেচে বেচে সংসার চালাতে হলো, ধান বেচে বেচে বছরকার ঋণ শুধতে হলো। এবং প্রতি বছরের মতো ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ধানের দাম কমে যায় বলে চাষী দামও পেল খুব কম। দাম কেন কমে? সব চাষী দায়ে পড়ে একসঙ্গে ধান বিক্রি কবতে চায় বলে?

ছোটো চাষী আর ভাগচাষীর ধান ফুরাতেই ধান-চালের দাম বাড়তে শুরু হলো। অল্পদামে কিনে নিয়ে ব্যবসাদাররা প্রচুর খাদ্য মজুত করে ফেলল। এবং ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি মানে গ্রীষ্মকালেই চালের দাম বার তের টাকা থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে বাড়তে শুরু করল। ব্যবসাদার, মজুতদার, জোতদাররা মওকা পেয়ে ধানচালের দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে যেতে লাগল।

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেই মহাযুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। ভারত-উপনিবেশের জনসাধারণের অবস্থার দিকে তাকাবার অবসর নেই তার। মুনাফাখোর মজুতদারদের অপরিমিত লালসার শিকার

হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ যে অনাহার এবং দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ছে সে নিয়ে মাথা ঘামানোর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন কিংবা ইচ্ছা ছিল না ইংরেজ-শাসকের। গ্রীষ্ম গিয়ে বর্ষা এল। চালের দাম হু হু করে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকায় উঠে গেল। গ্রামীণ জনসাধারণের কোন সঞ্চয় নেই, কোনো উপার্জন নেই, বংশানুক্রমিক অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যের ফলে দুর্বল শরীর, তাদের উপর বন্যার মতই নিশ্চিত উপবাস নেমে এল। এ নিয়ে সরকার মাথা ঘামালো না। গত বছর ধান ভালো হয় নি। চাষী শূন্যহাতে ঝাঁটা-কুলো সম্বল করে ঘরে ফিরেছিল, জাপানী আক্রমণে ব্রহ্মদেশের পতনের ফলে বর্মার চালের আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, খাদ্য ও যানবাহনের উপর ছিল সামরিক চাপ। "১৯৪৩ সালে কনট্রোল তুলে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট ও বাঙলা গভর্নমেণ্ট সমান ভাবেই দায়ী। কনট্রোলের অভাবে এই আবহাওয়ায় দ্রুত মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য।" আর গভর্ণমেণ্ট দেশের এই ভয়ঙ্কর অবস্থার অস্তিত্ব একেবারেই অস্বীকার করল। কড়া সেন্সর দিয়ে খবরের কাগজে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পর্যন্ত বন্ধ রাখল। বাংলা দেশকে দুর্ভিক্ষের কবলে ছুড়ে দিয়ে দুর্জয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে হত্যা করবার জন্যেই বৃটিশ শাসকের এই ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য ও অবহেলা। এই ঔদাসীন্য, এই অবহেলা, গোপন ও নিষ্ঠুর ষড়্‌যন্ত্রেরই ফল, বীভৎস পরিকল্পনার বাস্তব চেহারা বাংলার এই বিভীষিকাময় দুর্ভিক্ষ।

গণপতির ঘরে ধান ছিল। অনেক জমি সে ভাগে চষত। বাজে আদায় দিয়েও সে যা ভাগে পেয়েছিল তাতে দুই ভাই আর ওদের স্বামী স্ত্রীর হয়েও উদ্বৃত্ত খাদ্য সে পেয়েছিল। কিন্তু নিরুপায় হতাশায় সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, সুন্দরবনে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী নেমে আসছে। তাকে ঠেকাবার, তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার কোনো উপায় নেই। চাষীরা ভীত, সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত। ক্ষুধায় রোগে তারা মনোবল একেবারে হারিয়ে বসেছে। জোতদার, জমিদার, নায়েব, মহাজন, ব্যবসাদারদের কাছে ধন্না দিচ্ছে দলে দলে। ঋণ চাইছে, খাদ্য চাইছে, আর প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে ফিরে আসছে। দেখতে দেখতে সুন্দরবন ক্ষুধার রাজ্য হয়ে উঠল। মানুষগুলি কঙ্কালসার হয়ে উঠতে লাগল। মাথার চুলে তেল নেই, গায়ে খড়ি উঠছে। মুখের হাড় ঠেলে উঠেছে, পাঁজর গোনা যাচ্ছে। আর চোখগুলি

জ্বলছে ধ্বক ধ্বক করে। গাছের পাতা, লতাগুল্মের শিকড়, সাপ ব্যাঙ খেতে আরম্ভ করল মানুষ। ঘুনো কচুর পাতা শেষ হয়ে গেল। গাছের পাতা ফুরিয়ে যেতে লাগল, কাঁচা খেজুর, গাছের ছাল তাও খেতে লাগল মানুষ।

যার দু এক বিঘে জমি ছিল জলের দামে গ্রাস করল জোতদার মহাজনরা। চাষীর গোয়ালের গোরু, হাল লাঙ্গল, ভিটেমাটি সব বড়োলোকদের কুক্ষিগত হলো। চাষী মেয়েদের যৌবন কিনতে লাগল চরিত্রহীন ধনী মানুষরা। আত্মসম্মান, ইজ্জত, জমি, গোরু জলের দামে বিকোতে লাগল।

একদল লোক এসে জুটল সুন্দরবনে। সস্তায় যুবতী, কিশোরী মেয়েদের বাগিয়ে ফেলে শহরে, কলকাতায় চালান দিতে লাগল তারা। শহরের বেশ্যাখানা গুলোতে নতুন নতুন গেঁয়ো মেয়ে প্রচুর পরিমাণে আমদানি হতে লাগল।

দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের সংকটও এসে গিয়েছিল। কিন্তু যাদের খাদ্যই জোটে না, তাদের কাছে বস্ত্রের সমস্যাটা বিলাসিতা। নগ্ন কঙ্কালসার মানুষ স্রোতের মতো জ্বলন্ত চোখে যা হোক কিছু গিলবার যোগ্য জিনিস খুঁজে বেড়াতে লাগল।

তারপর এল মৃত্যুর হিড়িক। মৃত্যু তখন সমস্ত পৃথিবীতেই সস্তা হয়ে গেছে। ইউরোপের রণাঙ্গনে, প্রাচ্যের রণাঙ্গনে প্রতিদিন হাজারে হাজারে মানুষ মরছে। ধ্বংসের মহাতাণ্ডব চলছে পৃথিবী জুড়ে। অধিক সংখ্যক মানুষকে একসঙ্গে হত্যা করবার জন্যে বিচিত্র সব মারণাস্ত্র প্রতিদিন আবিষ্কৃত হচ্ছে। মানুষের রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছে যুদ্ধ-এলাকায়। আর বাংলাদেশে মানুষ মরছে না খেয়ে, মানুষ মারার দুটি কৌশলই একই সঙ্গে চলছে তখন।

একদিকে অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। আর একদিকে না খেতে দিয়ে মারা হচ্ছে। বহুলোক আত্মহত্যা করতে লাগল সুন্দরবনে। খিদের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বিষ খেয়ে মরতে লাগল, গলায় দড়ি দিতে লাগল, গলায় মাটির কলসী বেঁধে জলে ডুবে মরতে লাগল। কলেরা আর ম্যালেরিয়ায় মরতে লাগল মানুষ। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে ফুলে উঠতে লাগল।

ফুলে মরে গেল অনেকে।

তারপর সুন্দরবন ছেড়ে পালাতে লাগল মানুষ শহরের দিকে, কলকাতায়। কলকাতা যেতে পারলে হয়তো বেঁচে যেতেও পারে, সেখানে অনেক বড়োলোক আছে, সেখানে গেলে ভিক্ষা মিলবে, সেখানে গেলে বাঁচা যাবে, এই আশায় স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে মানুষ কলকাতা যেতে লাগল। যারা ইতিমধ্যেই আত্মীয় স্বজনদের হারিয়েছে তারা নিজেকে বাঁচাবার জন্যে কলকাতার দিকে চলতে লাগল। অনেকে এখানে ওখানে রাস্তায়, মাঠে মরে পড়ে রইল। অনেকে কলকাতা গিয়ে উপস্থিত হলো।

গণপতি খেপার মতো দিনেরাতে ঘুরে বেড়াতে লাগল সুন্দরবনের মাঠে মাঠে, গ্রামে গ্রামে, বাড়ীতে বাড়ীতে। কঙ্কালসার মানুষ এসে দরজায় দাঁড়ালে তাকে চাল দিতে লাগল। গণপতির ভাইরা, মোহিনী ভীত হয়ে উঠল, তারা চাল লুকিয়ে ফেলল, গণপতির সঙ্গে সেই নিয়ে তীব্র মতান্তর শুরু হলো পরিবারের সঙ্গে। গণপতি নিজেও যে ব্যাপারটা বোঝে না তা নয়, তবু নিজেকে সে স্থির রাখতে পারে না। খেতে বসে ভাত তার মুখে রোচে না। খাওয়া শেষ করতে পারে না সে। হঠাৎ খেতে খেতে উঠে পড়ে। মোহিনীর অনুরোধ উপরোধ গ্রাহ্যও করে না। হয় সে স্থির হয়ে গভীর চিন্তাগ্রস্ত হয়ে চুপচাপ বসে থাকে, হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, নয়তো কাউকে না জানিয়ে বেরিয়ে পড়ে, ঘুরে বেড়ায়।

একদিন ভর দুপুরে গণপতি ফিরছিল গ্রামান্তর থেকে। হঠাৎ একটা ঝোপের আড়ালে সে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। দেখল গাছ থেকে খসে পড়া একটা পাকা তাল নিয়ে একটি যুবতী মেয়ে কি যে করবে ঠিক করতে পারছে না। তালটা বুকে ধরে খানিকটা নিয়ে যায়, আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। গণপতি শুনতে পেল মেয়েটা বলছে, 'বাড়ী নিয়ে গেলেই তো ছেলেগুলো সব খেয়ে নেবে, আমি একটুও খেতে পাব না, তার চেয়ে একটু খেয়ে নিয়ে যাব?'

গণপতি দেখল, মেয়েটি তালটা ভেঙ্গে উন্মাদের মতো খেতে লাগল। ছেঁড়া ময়লা এক চিলতে কাপড় ওর পরনে, মাথায় চুলের জটা, শরীর কঙ্কালসার, তারই মধ্যে শুকনো দুটো স্তন, দুধ নেই, পুষ্টি নেই, তালটা সে খাচ্ছে চুষে চুষে, কিন্তু কি ব্যস্ততায়! কি রাক্ষুসে খাওয়ার ভঙ্গি!

গণপতির মনে হলো, মানুষের একি অবস্থা! কেন? কেন? কি অপরাধ করেছে মানুষ। যে মানুষ আজন্ম পরিশ্রম করেছে, কখনো কোনো অন্যায় করে নি, তার এমম দশা কেন? ভগবান সর্বশক্তিমান, করুণাময়, তিনি কোথায়? কোথায় হে ভগবান, দেখা দাও, শক্তি দেখাও, করুণা দেখাও! নাকি যারা চাল বেচে মুনাফা লুটছে, খিদে নিয়ে শয়তানি করছে, মেয়ে মানুষকে ভোগ করছে, ফুর্তি করছে, তাদের প্রতি করুণায় তুমি ঢলে পড়ছ? তাদের কাছে তোমার করুণাময় শক্তি দেখাচ্ছ, বলিহারি রে! আমার ভগমান, বড়োলোকের দালাল। এই দুঃখের, এই অনাহারের শোধ নিতে কিছু মানুষ বেঁচে থাকবেই। তারা এদিনের কথা ভুলবে না, যারা এর জন্যে দায়ী সেই জোতদার, মহাজন, ব্যবসায়ী, নায়েব, গোমস্তা, মজুতদার, মুনাফাখোর আর বৃটিশ এদের কাউকে মানুষ ক্ষমা করবে না। এর শোধ তারা নেবে। আর ধনীর তৈরী ধনীর ভগবানের নাম পর্যন্ত মুছে দেবে সংসার থেকে; মানুষকে ধোঁকা দেবার ও কল আর বেশিদিন চলবে না।

মেয়েটা একসময় অবশিষ্ট ভাতটা নিয়ে চলে গেলে গণপতি ঝোপ থেকে বেরিয়ে বাড়ীর পথ ধরল। বাড়ী গিয়ে মোহিনীকে শোনাল সব কথা। মোহিনীকে প্রতিদিন তার অভিজ্ঞতার আর দেখার বিবরণ শোনায় গণপতি। মোহিনী শোনে, আর গণপতির অনুভূতিময় দৃষ্টি দিয়ে দেখে সমস্ত ঘটনা আর এই মৃত্যুর কারণ বুঝতে চেষ্টা করে মোহিনী।

একদিন একটা বাড়ীর পাশ দিয়ে আসতে আসতে ভক্ করে একটা পচা গন্ধ লাগল গণপতির নাকে। কুকুর টুকুর পচেছে বোধহয়। হঠাৎ গণপতি দাঁড়িয়ে পড়ল। কুকুর পচেছে না মানুষ? একটু ইতস্তত করে বাড়ীর ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। দরজা ঠেলে ভিতরে গিয়ে দাঁড়াল। উৎকট দুর্গন্ধ নাকে এসে গা ঘুলিয়ে তুলল। ঘরের অন্ধকার চোখে সয়ে এলে গণপতি দেখল সে যা ভেবেছিল ঠিক তাই। ঘরের মধ্যে একটা ছেঁড়া ময়লা কাঁথার উপরে একটা মেয়ে মরে পড়ে আছে। স্বামী বোধহয় তার কাজের সন্ধানে শহরে গিয়েছে। এখনও ফেরে নি। হয়তো শহরের রাজপথে তার মরা দেহ ধুলোয় লুটোচ্ছে আর এখানে তার যুবতী

কঙ্কালসার বৌ মরে পচে ঢোল হয়ে পড়ে আছে। পচা রস গড়াচ্ছে। মাছি ভন্ ভন্ করছে। দরজাটা বন্ধ ছিল বলে শেয়াল কুকুর ঢুকতে পারে নি। গণপতি বাইরে এসে দরজাটা বন্ধ করে আবার হাঁটতে লাগল।

তারপর গণপতি দেখল মড়া, মড়া আর মড়া, রাত্রির অন্ধকারে বীভৎস 'বলোহবি হরিবোল' ধ্বনি সুন্দরবনের কান্নার মতো জেগে ওঠে। নদীর ধাবে শ্মশানে চিতা আর নেভে না। মানুষ পোড়াবার মতো কাঠ মেলে না, কাঠ কিনবাব টাকাই বা কোথায়! যারা মরা নিয়ে যায় চ্যাংদোলা করে নদীর জলে দেয় ছুঁড়ে। ভাসতে ভাসতে যায়, শকুনি এসে ভাসন্ত মড়ার উপরে বসে মহানন্দে ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভোজ সমাধা করতে করতে ভেসে যায়।

গণপতির মনে হয় পৃথিবীতে মৃত্যুই বিজয়ী হয়ে গেছে। জীবনকে গ্রাস করবার জন্যে মৃত্যু যেন তার লক্ষ থাবা বাড়িয়ে ছুটে আসছে। মৃত্যু সস্তা, মৃত্যু সুলভ। বেঁচে থাকাটাই আশ্চর্য এবং লজ্জাকর হয়ে উঠেছে এখন। কঙ্কালসার মানুষের মধ্যে মৃত্যুর চিহ্ন, তারা মৃত্যুর ভোগ। মানুষ উপবাসে মরছে, কলেরা আমাশয়ে ভুগে মরছে ময়লা মেখে, ম্যালেরিয়ায় মরছে, হঠাৎ ফুলে উঠে মরছে, আত্মহত্যা করে মরছে। দুর্ভিক্ষের দিন যত যেতে লাগল চালের দাম তত বাড়তে লাগল, বেশ্যা আব ভিক্ষারীর সংখ্যা তত বাড়তে লাগল, তত বাড়তে লাগল মৃত্যুর সংখ্যা। এখন গণপতি যেখানে সেখানে মৃতদেহ পড়ে থাকলে দেখে। বাঁধের ধারে। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে, বনের মধ্যে, নদীর ধারে, জলার ধারে মৃতদেহ দেখে। দেখে শেয়ালে কুকুরে শুকুনিতে ছেঁড়াছিঁড়ি করছে। আগেই শকুনিরা চোখ দুটো খুবলে তুলে নেয়, খেতে ভালো লাগে বলে? নাকি মানুষটার চোখ দুটো আগে তুলে নেয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে, বুঝতে পারে না গণপতি। শকুনির চঞ্চুক্ষত চক্ষুহীন মৃতদেহগুলিকে দেখলে মানুষ বলে নিজেকে ভাবতে ঘেন্না লাগে গণপতির। মাথাটা তার একটু যেন খারাপই হয়ে গেছে। আজকাল ভারী অদ্ভুত আর জটিল চিন্তার উদ্ভব হয় গণপতির মনে। কিছুই বুঝতে পারে না গণপতি কিছুই ভাবতে পারে না। কেবল নিঃঝুম নিঃশব্দে বসে বসে ভাবে, ভেবেই চলে।

ভাবে গণপতি, কংগ্রেসীরা কোথায়? রাজনৈতিক দলগুলো কোথায় গেল? তারা কেন মানুষকে দলবদ্ধ করে কেড়ে খেতে বলে না? চালের গুদামে চাল কেন জমা হয়ে থাকে? দোকানে খাবার কেন থাকে? আর মানুষ কেন মরে উপবাসে মহামারীতে?

গণপতি দেখে, সকাল থেকে কঙ্কালসার মেয়ে পুরুষের দল অবস্থাপন্ন লোকেদের বাড়ীর দরজায় দরজায় ভিড় করে বসে থাকে। কঙ্কালগুলির কোমরে এক চিলতে ময়লা ছেঁড়া কানি জড়ানো। মেয়েগুলির মাথায় শনন্নুড়ির মত রুক্ষ চুল। কেউ কেউ আপনমনেই মাথা হাঁটকে উকুন বাচছে। ককিয়ে ককিয়ে উঠছে সব, একটু ফেন দিন গো বাবু, দুটি খেতে দেন মা, নাকী নাকী স্বরে কথা বেরয়, অস্পষ্ট, ক্লান্ত। জ্বরগ্রস্ত প্রেতদের দল যেন। মমতায় যন্ত্রণায় বুকের ভিতরটা হাহাকার করে ওঠে গণপতিব। গণপতি ভাবে, ওরা কেবল ভিক্ষা চায়, কাকুতি-মিনতি করে, ওরা তো মরণের দরজায় বসে আছে, ওদের আর কিসের ভয়, মরনের বড়োতো ভয় কিছু নেই, তাহলে কেন ওরা ছিনিয়ে নিতে চায় না? কেন ওরা দল বেঁধে আক্রমণ করে না, লড়াই দিতে চায় না? ক্লান্তি, ক্ষুধা, হতাশার শেকলে ওদের মন কি বাঁধা পড়েছে? পেটে খিদে, প্রাণে বল নেই, দুর্বল হৃৎপিণ্ড, চিন্তা করবার ক্ষমতাও বোধ হয় লোপ পেয়েছে, অমন মানুষ কি যুদ্ধ করতে পারে? লড়তে পারে? ওরা ঝিমিয়ে পড়েছে, ওরা এখন কোনো কথাই বুঝতে পারবে না, সংগ্রামের জন্যে উঠে দাঁড়াবার সাধ্য ওদের নেই, তাই ওরা কেবল নাকী দুর্বল স্বরে কাঁদে, ওদের কান্নায় সুন্দরবনের আকাশ ভরে উঠেছে, পরাজিত মানুষের মৃতদেহের দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে। এখন মৃত্যুর জয়ের দিন চলছে, জীবন কেবলই হার মানছে মৃত্যুর কাছে। জীবনমৃত্যুর এই লড়াই তাকিয়ে তাকিয়ে বেদনাময় দৃষ্টিতে দেখে গণপতি তার মনের ভিতরে বীভৎস অনুভূতি মাতামাতি করে, গণপতির নিদ্রা নেই, আহার ঘুচে গেছে, মনের আগুনই কেবল সার হয়েছে ওর।

গণপতি দেখে, সুন্দরবনের গরীব চাষীরা এমনি করে মরছে কিন্তু স্বচ্ছল অবস্থার লোকেদের তাই বলে কোনো বিকার নেই। তারা প্রাত্যহিক নিয়মমাফিক খাচ্ছে দাচ্ছে, কাজ করছে, ফুর্তি করছে; মেয়েদের নিয়ে নোংরামি করছে, যেন হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরছে না, যেন পথে

ঘাটে মানুষের মৃতদেহ চোখে পড়ছে না, কঙ্কালের মিছিল যেন দেখতে পাচ্ছে না, এমনি সহজ ভাবেই জীবন কাটিয়ে যাচ্ছে ওরা। আস্তে আস্তে সুন্দরবন প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। অনেক মানুষ মরল, অনেকে শহরাঞ্চলে কলকাতায় পালিয়ে গেল। একদিন গণপতির ইচ্ছা হলো কলকাতা যাবার। কলকাতা গিয়ে ও দেখতে চায় এখানকার মানুষেরা কলকাতা গিয়ে বাঁচবার উপায় করতে পারছে কিনা। মোহিনী আপত্তি করল কিন্তু গণপতি শুনল না। বাংলার রাজধানী কলকাতা সুন্দরবনের মানুষদের বাঁচবার কিছু উপায় করেছে কিনা নিজের চোখে না দেখে আসতে পারলে কিছুতেই ও স্বস্তি পাবে না, এমনি মনে হলো ওর।

সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করে কলকাতার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল গণপতি। ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে কলকাতায় ট্রেনে উঠল সে। অফিসের ট্রেন। অফিসের বাবুরা দিব্যি ধোপ-দুরস্ত জামা কাপড় পরে অফিসে চলেছেন। আর কামরাগুলির মেঝেতে বসে আছে শুয়ে আছে বিনাটিকিটের গেঁয়ো মেয়ে পুরুষ শিশু। ওরা দক্ষিণের দূর গ্রাম থেকে এসেছে, চলেছে কলকাতা। কঙ্কালসার চেহারা, ময়লা ছেঁড়া কাপড়, রুক্ষ খড়ের মতো চুল, ক্ষুধিত অঙ্গারের মতো দৃষ্টি। আহা, ওদের ছেলে মেয়েগুলোর দিকে তাকানো যায় না! ছোটো ছোটো ছেলেগুলির মাজা ভেঙ্গে পড়েছে। ওরা আর উঠে দাঁড়াতে পারে না। কোলের কচি বাচ্ছারা অনেকদিন আগেই মরেছে। গণপতি দেখল দু'একটি কঙ্কালসার মায়ের কোলে কচি বাচ্ছাও আছে। দেখাচ্ছে নেংটি ইঁদুরের ছানার মতো। ওরা আর শব্দ করে কাঁদতে পারে না। দেখ দেখ, ওদের ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু শব্দ বেরুচ্ছে না। ট্রেনের ভিতরে কতকগুলি বাদামের খোলা পড়েছিল। কে বাদাম খেয়ে ছাড়ানো খোলাগুলি ফেলে গেছে। একটা বাচ্ছা ছেলে হামাগুড়ি দিয়ে লোকের পায়ের তলা দিয়ে সেই বাদামের খোলাগুলির কাছে চলে গেল। ব্যাকুল হয়ে সরু সরু শুকিয়ে যাওয়া আঙুল দিয়ে খুঁজতে লাগল একটা বাদামের দানা পাওয়া যায় কিনা। গণপতির চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। আহা বাছারে, ওর চোখে কি হতাশা, কি ভীষণ আকুলতা! পরের স্টেশনে ট্রেন থামতে

একটা বাদামওয়ালার কাছে দু'আনার বাদাম কিনল গণপতি। ছেলেটার হাতে বাদামের ঠোঙাটা তুলে দিল। ছেলেটির চোখে সহসা যেন জ্যোতি ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর অবস্থা জেগে উঠল। যে কঙ্কালগুলি মেঝেতে শুয়ে বসে ছিল সহসা তাদের মৃত্যু-ভীষণ চোখ গণপতির উপরে গিয়ে পড়ল। নাকী নাকী ক্ষীণ কণ্ঠে তারা প্রেতের হাহাকার সৃষ্টি করল, 'আমাকে মশায়, আমাকে মশায়, আমাকে দুটো বাদাম দেন মশায়।'

গণপতি তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, 'আব তো বাদাম নাই আমার কাছে, পরের স্টেশনে পেলে কিনে দোব।'

একজন রাশভারি ভদ্রলোক উপদেশ দিল গণপতিকে, 'এদের কিছু দিয়ে কি তুমি ঠাণ্ডা করতে পারবে হে, কত আছে তোমার তাই এখানে ঝামেলা লাগিয়েছ।'

গণপতি বলল, 'ভদ্দরলোকরা সবাই যদি কিছু কিছু স্বার্থ ছাড়ত মশাই তাহলে এত লোক না খেয়ে মরত না।'

পাশ থেকে আর একজন ভদ্রলোক বিষাক্তকণ্ঠে মন্তব্য করল, 'দয়ার সাগর যে।'

গণপতি আর কথা বলল না। সে জানে কথায় এদের বোঝানো যাবে না, তর্ক করলে অকারণ ঝামেলা সৃষ্টি হবে। কিন্তু পরের স্টেশনে বাদাম পাওয়া গেল না। গণপতি দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকগুলিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'বাদাম পেলাম না বাছারা। কি করব বলো।'

আবার নেতিয়ে পড়ল লোকগুলি। আবার অনেকে শুয়ে পড়ল গুটিশুটি হয়ে। অনেকের দীর্ঘশ্বাস শ্রবণেন্দ্রিয় পুড়িয়ে দিল গণপতির। গণপতি ভারী বিষণ্ণতার বোঝা হৃদয়ে বহন কবে নীরবে বসে রইল। বুকের ভিতরে হু হু করে কি যে আগুন জ্বলতে লাগল ওর!

গণপতি ভাবতে লাগল, 'ওরা এত সহজে হাল ছেড়ে দিল কেন? ওরা এত তাড়াতাড়ি নেতিয়ে পড়ল কেন? কেন ওরা ওর কাছ থেকে বাদাম আদায় না করে ছাড়ল না? কেন ওরা এত সহিষ্ণু! এত নম্র!'

মনে মনে ওদের উদ্দেশ্যে গণপতি বলতে লাগল, 'তোমরা এত সহিষ্ণু কেন? তোমাদের রাগ নেই কেন? প্রতিহিংসা কেন নেই? কেন তোমরা ডাকাতি করছ না, ছিনিয়ে নিতে চাইছ না? এত সহ্যশক্তি কেমন করে

তোমরা পেলে ? এই সহ্যশক্তি যে তোমাদের অমানুষ করে দিয়েছে।'

'আবার ভাবে গণপতি, 'ওদের শরীরে মৃত্যুর ছায়া পড়েছে, সাপের বিষ-ক্রিয়ার মতো মৃত্যুর ছায়া পড়েছে ওদের সর্বাঙ্গে। তাই ওরা এমন করে নেতিয়ে পড়ছে, ক্ষুধায় জীবনীশক্তি শেষ হয়ে গেছে ওদের।'

গণপতি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মানুষগুলিকে দেখতে লাগল। প্রায় সকলেরই গায়ে চুলকানি পাঁচড়া হয়েছে, অনেকেরই ঠোঁটের কশে সাদা ফ্যাকফেকে সালুক হয়েছে। ওরা কেউই ঠিক সুস্থ নয়। হয়তো অনেকেই অল্প অল্প জ্বরে ভুগছে। আর ঠিক বুকের পাঁজরের নীচে পেটের বসে-যাওয়া চামড়া থর থর করে কাঁপছে, দুর্বল হৃৎপিণ্ডের কাঁপুনি বোধ হয়।

শিয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এসেই গণপতি দেখল, সেখানেই কত মানুষ পড়ে আছে, কাতরাচ্ছে, ভিক্ষা চাইছে। তারপর সারাদিন ধরে কলকাতার বিখ্যাত মসৃণ সুন্দর রাজপথগুলিতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বিচরণ করে ফিরতে লাগল গণপতি। দেখল, কলকাতা বড়োলোকদের মতোই তার বিরাট বিরাট বাড়ী, আলো, দামী দামী জিনিসে ঠাসা দোকান আর গাড়ী ঘোড়া নিয়ে দিব্যি সেজে গুজে উদাসীন হয়ে আছে। আর কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় কঙ্কালেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফুটপাথের উপরে উপবাসী মানুষ মরে মরে পড়ে আছে কত জায়গায়। কঙ্কালের দল ভিক্ষা চেয়ে চেয়ে ঘুরছে। বাংলা দেশের কত জায়গা থেকে কত লোক যে এসেছে কলকাতাতে! কলকাতার পথে পথে কত যে লোককে মরে পড়ে থাকতে দেখল গণপতি! উলঙ্গপ্রায় মানুষ কালো ধুলোয় মলিন হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, সর্বাঙ্গে ভ্যানভেনিয়ে মাছি উড়ছে। এই সব মৃতদেহগুলিকে ঘিরে মানুষের ভিড় নেই, এ সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। এত সস্তা হয়ে গেছে এমনি মৃত্যু যে কলকাতাও সে নিয়ে মাথা ঘামাতে আর রাজী নয়। কোনো জায়গায় এমনি পড়ে থাকা মৃতদেহ দেখলেই গণপতি দাঁড়িয়ে যায়, মৃতের প্রতি মনে মনে ওর শ্রদ্ধা জানায়। মনে মনে বলে, 'তুমি কে ? আমি জানি না, তোমার বাড়ী কোথায় ? তোমার কে আছে ? কোথায় আছে ? তুমি আজ মরে পড়ে আছ কলকাতার রাজপথে, কিন্তু দেখ, তোমার দিকে তাকাবার কেউ নেই, অথচ দেশটা তোমারও, তোমারও বাঁচবার অধিকার ছিল।'

দেখেছে গণপতি, শুকনো কাঠ হয়ে মৃতদেহ পড়ে আছে আর শকুনি নেমে এসে কলকাতার রাস্তার উপরে সেই মড়া নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করছে। গণপতি হাঁটতে হাঁটতে কতদিন দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেখেছে, ডাস্টবিনের ফেলে দেওয়া বাসী ময়লা খাবার নিয়ে মানুষে কুকুরে, মানুষে মানুষে লড়াই লেগেছে। দেখেছে, নর্দমার ভাত খাচ্ছে কঙ্কালসার মানুষ। দেখেছে, রাস্তার ইলেকট্রিক থামে হেলান দিয়ে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে কঙ্কালসার মানুষ, কখন যে সে মরেছে কেউ জানতেও পারে নি।

সন্ধের পর কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে দেখেছে গণপতি, দামী দামী মোটর গাড়ীতে সুন্দর সুন্দর মেয়ে পুরুষ সুখে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। রেস্তরাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনেছে বাজনার শব্দ। সুসজ্জিত লোকেরা মেয়েরা সেখানে ঢোকে। দেখেছে, রেসের মাঠে ঘোড়দৌড়ের দিনে কত যে লোকের ভিড়! কলকাতার ভদ্দরলোকদের বড়োলোকদের তো কোনো কষ্ট নেই! কলকাতার চারিদিকে এত যে মানুষ মরে পড়ে আছে তাতে কলকাতার ওপর তলার লোকদের তো কোনো ক্ষতি হয়নি!

একদিন এক ভদ্রলোককে এক পার্কের বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখে গণপতি তাঁর পাশে একটু দূরত্ব রেখে বসে পড়ল। ভদ্রলোককে দেখে, মুখ চোখ পরখ করে তাঁকে গণপতির ভালোলোক বলে মনে হলো।

গণপতি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, 'বাবু, দুটো কথা জিজ্ঞেস করব?'

ভদ্রলোক ভ্রূ কুঁচকে গণপতির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কি বলো?'

'আমার বাড়ী বাবু সুন্দরবনে। আমি চাষী মানুষ! আমাদের ওখানে দুর্ভিক্ষ লেগেছে। অনেক মানুষ উপোস দিয়ে মরল, রোগে মরল, উপোসের ভয়ে অনেকে কলকাতা পলায়ে এল। তা আমি ভাবলাম কলকাতা গিয়ে মানুষগুলো বাঁচতে পারছে কিনা দেখে আসি। তাই এয়েছিলাম। তা বাবু দেখলাম কলকাতা তাদের বাঁচাতে পারে নি। এখানে পথে পথে গাদা গাদা মানুষ মুখ থুবড়ে মরে পড়ে আছে। তা বাবু কলকাতার লোকেরা তো দেখছি দিব্যি আছে। বড়োলোকরা তো গাড়ী হাঁকিয়ে ফুর্তি করছে, ঘুরছে। বাবু আমার মাথা ঘুরতে লেগেছে। মুখ্যু

মানুষ কিছু বুঝতে পারছি না। তা এত যে লোক মরছে, তাতে কলকাতার লোকেরা কি একটুও মাথা ঘামাবে নি?'

ভদ্রলোক বললেন,' এ কথা যখন তুললে তখন তোমাকে বলি তুমি তো গ্রামের চাষী, কলকাতার কতটুকু আর দেখতে পারছ তুমি। মানুষ যখন উপবাসে মরছে কলকাতার রাস্তায়, কলকাতার উঁচু সমাজের লোকদের প্রতিদিনের জীবনের কোনো পরিবর্তন হয় নি। তারা বিলাসে আছে, প্রাচুর্যে আছে, হোটেলে হোটেলে নাচগানের কামাই নেই, খাওয়া দাওয়ার ফূর্তিতে এতটুকু ভাটা পড়ে নি। বরং আরও জমে উঠেছে সব কিছু। বেশ্যা এখন সস্তা হয়ে গেছে। বেশ্যাবাড়ীতে হুল্লোড় দেখ গে, ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে দেখগে দেশী আর ইংরেজ লোকরা কেমন ফূর্তি করে টাকা উড়িয়ে মজা করছে। খাদ্য বইবার যানবাহন পাওয়া যায় না কিন্তু ঘোড়-দৌড়ের ঘোড়া চলাচলের জন্যে বিশেষ ধরণের রেলের ওয়াগানের অভাব হয় না। বড়োলোকদের ফূর্তি আরও বেড়ে গেছে। কেন জানো? চাল। যে চালের জন্যে, খাদ্যের জন্যে মানুষ হাহাকার করছে, মরছে, সেই চাল নিয়ে ব্যবসা করে হঠাৎ বড়োলোকদের পকেট বড্ড ভারী হয়ে গেছে, লাল হয়ে গেছে সব, আর হঠাৎ টাকা বেশি হয়ে গেলে একটু ফূর্তি না ক'রে কেমন করে থাকে বলো! আর ফূর্তি করবার জন্যে, মদ মেয়েমানুষ, ভালো ভালো খাবার, ভালো ভালো জামা কাপড়, গাড়ী বাড়ী না হলে চলে কেমন করে! কি দিয়ে টাকা খরচ করবে, মদ মেয়েমানুষ না হলে?'

গণপতি বলে উঠল, 'বাবু, মানুষ যখন না খেয়ে মরছে, তখন ওদের এসব করতে লজ্জা লাগে না?'

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'লজ্জা? লজ্জা কবে ছিল মানুষের? মানুষ নির্লজ্জ, বুঝলে ভাই, যাদের টাকা থাকে তাদের নির্লজ্জ না হলে চলে না।'

'বাবু, যারা মরছে তারা তো এই দেশেরই মানুষ। তাদের জন্যে কেউ কিছু করবে না?'

'সবাই তো খারাপ মানুষ নয়। বড়োলোকরা অধিকাংশই বজ্জাত, তবে মধ্যবিত্ত মানুষদের মধ্যে অনেক ভালো লোক আছে। সেই ভালো মানুষগুলো ঠিক বসে নেই। তারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে, দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়বার চেষ্টা করছে তারা। ওরা আছে বলেই বাঙালী বলে এখনও

পরিচয় দেওয়া যায়, নাহলে মনে হতো বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় জানোয়ার, জানোয়ারের দেশে বাস করছি আমরা।'

গণপতি হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করল, 'কোনো কোনো লোক বাবু খুব তাড়াতাড়ি মারা পড়ছে। কেন বাবু এত শীঘ্রি কেন মরে যাচ্ছে, একটুও মরণকে রুখতে পারছে না কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'তাহলে বলি শোনো, ভারতের মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেকটর জেনারেল স্যার জন ম্যাগঅ ১৯৩৩ সালে একটা রিপোর্টে লিখেছিলেন, ভারতের জন সংখ্যার শতকরা ৩৯ জন মোটামুটি ভালোভাবে পুষ্ট, ৪১ জন স্বল্পপুষ্ট, আর ২০ জন নিতান্তই মন্দপুষ্ট। আর বাংলাদেশের অবস্থা সবচেয়ে কাহিল। বাংলার শতকরা ২২ জন ভালোভাবে পুষ্ট আর শতকরা ৩১ জন নিতান্তই মন্দ পুষ্ট।

একটু থেমে বললেন, 'এই শতকরা ৩১ জন হলো গরীব মানুষ। তাই দুর্ভিক্ষের ধকল ওরা একদম সহ্য করতে পারছে না, এত তাড়াতাড়ি মারা পড়ছে।'

এমনি নানান কথা আলোচনা করল গণপতি ভদ্রলোকের সঙ্গে। জানলো, ভদ্রলোকের নাম আনন্দ রায়। তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির লোক। ভদ্রলোক গণপতির নাম আর ঠিকানা জেনে নিলেন। গণপতি অভিভূত হয়ে বসে রইল। ঘুরতে ঘুরতে এমন একটি মানুষের সংস্পর্শে সহসা সে এসে পড়েছে যিনি গণপতির হৃদয়ের এক অপরিচিত অনুভূতিকে আলোড়িত করেছেন।

গণপতি বলল, 'বাবু এত মিত্যু, এত কষ্টের প্রতিকার কি? কেমন করে বাঁচবে গাঁয়ের গরীব চাষীরা?'

অনেকক্ষণ চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বসে রইলেন আনন্দ রায়। তারপর বললেন, 'মানুষকে জোট বাঁধতে হবে। একসঙ্গে বড়োলোকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে জমির উপর মালিকানা কায়েম করতে হবে।'

'কেমন করে তা হবে বাবু?'

'হবে, ধীরে ধীরে হবে। আমি তোমার সঙ্গে ভবিষ্যতে দেখা করব গণপতি। আর তুমি আমাকে 'বাবু বাবু' বলছ কেন?'

গণপতি বলল, 'তাহলে কী বলব?'

'যা খুশি বলে ডেকো, বাবু বলে নয়, আচ্ছা আমি এখন উঠব।' বলে

বিদায় নিয়ে তিনি গণপতির মনে একটা প্রগাঢ় ছাপ রেখে দিয়ে চলে গেলেন।

গণপতি সেখানে অনেকক্ষণ বসে রইল। তারপর শিয়ালদা স্টেশনের উদ্দেশ্যে হাঁটতে লাগল। কলকাতা দেখা তার সাঙ্গ হয়েছে। সে বুঝেছে কলকাতা রাক্ষসী, কলকাতা বিলাসিনী বেশ্যার মতো। যার টাকা আছে, ক্ষমতা আছে কলকাতা তাকেই খাতির করে। গাঁয়ের উপবাসী চাষীকে খাওয়াবার জন্যে কলকাতার দায় কেঁদেছে। কলকাতার সঙ্গে গাঁয়ের বাংলার কোনো মিল নেই। কলকাতা বাংলাদেশে বিদেশ। কলকাতার বাতাসে গণপতি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এই স্বার্থ-দেবতার পাষাণকারা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সমস্ত প্রাণ তার উন্মুখ হয়ে উঠল। সুন্দরবনের চাষী, গেঁয়ো চাষী ফাঁকা মাঠের মুক্ত বাতাস আর অসীম উদারতার মধ্যে ফিরে যাবার জন্যে অকুলি-বিকুলি কষ্ট অনুভব করতে লাগল।

॥ ২৭ ॥

১৯৪৪ সালের অগ্রানের দিকে দুর্ভিক্ষ যখন চূড়ান্ত অবস্থায় গিয়ে পৌঁচেছে তখন এল সরকারী সাহায্য। লঙ্গরখানা খোলা হলো। বিকেলের দিকে জলের মতো খিচুড়ি দেওয়া হতো উপবাসী মানুষদের যারা টিনের মগ কিংবা অ্যালুমিনিয়মের থালা অথবা মাটির সরা নিয়ে এসে লাইন দিয়ে বসত। লঙ্গরখানার পরিচালকরা কি ধোয়া তুলসীপাতা ছিল? চারদিকেই যখন খাদ্য নিয়ে ব্যবসা করে মুনাফাখোর আর মজুতদাররা মানুষকে শুকিয়ে মারছে তখন লঙ্গরখানার পরিচালকরা হঠাৎ গরীবের দুঃখে বিগলিত-হৃদয় হতে যাবে কেন? তারাও গোপনে রাত্রির অন্ধকারে চাল পাচার করত বাজারে আর জলের মতো খিচুড়ি দিত উপোসী মানুষগুলোকে। নিজেদের বোধহয় তারা এই ভেবে সান্ত্বনা দিত যে, বেশী ঘন খিচুড়ি খালি পেটে খেলে বেচারারা সহ্য করতে পারবে না, বরং পাতলা খিচুড়ি খাওয়াই ওদের পক্ষে মঙ্গল। তার ফলে সুবিধা হলো এই যে, পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে যারা করিতকর্মা তারা দুপয়সা গুছিয়ে নিল।

ধীরে ধীরে চালের দাম আবার নামতে লাগল, দুর্ভিক্ষের হঠাৎ

আক্রমণের ধাক্কা সামলে নিয়ে দুর্ভিক্ষকে প্রতিরোধ করবার জন্যে আবার মানুষ তৈরি হতে লাগল। যদিও ঐ দুর্ভিক্ষ মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে গেল, যদিও এই দুর্ভিক্ষ বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেল, দুর্ভিক্ষে উত্তীর্ণ গোটা বাঙালীজাতিকে রেখে গেল দুর্বল ও ক্ষীণজীবী ক'রে, তথাপি জীবনের স্বাভাবিক ধর্মেই আবা'র মানুষ উঠে দাঁড়াবার মরণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

একদিন দুপুরবেলা গণপতি ফিরছিল গ্রামান্তর থেকে। একটি গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল সে। গ্রাম এমনিতেই শান্ত নির্জন মনে হয়। দুর্ভিক্ষের পর মনে হচ্ছে সমস্ত অঞ্চলটাই যেন শ্মশানের এক্তিয়ারে। পথে যেতে যেতে হঠাৎ গণপতি শুনতে পেল মেয়ে কণ্ঠের কথা, 'কে গো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, আমার এক পয়সার নুন এনে দেবে দোকান থেকে?'

কথা শুনে গণপতি একটা ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, বলল, 'বাইরে এসে পয়সা দাও মা।'

মেয়েকণ্ঠ শোনা গেল, 'তুমি আমাকে মা বলেছ বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো, কিন্তু আমি তো বাইরে যেতে পারব নি, আমার কাপড় নি।'

মনে হলো কথাটা বলে মেয়েটি বোধ হয় লজ্জায় সিঁটিয়ে উঠে চুপ করে গেল। কিন্তু একটু পরেই ভুল ভাঙ্গল ওর। শুনতে পেল মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

গণপতি অবাক হয়ে ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁদছ? কেন কাঁদছ মা?'

'বাবা ভগবান মুখপোড়া, না হলে এমনি করে আমাকে রাখে। পরনে কাপড় নি, দিনের বেলা বাইরে বেরতে পারি না, খেতে না পেয়ে ও বছর আমার কোলের বাছা, মারা গেল।'

গণপতি দাঁড়িয়ে রইল। দেখল দরজার নীচে দিয়ে দুটি পয়সা বেরিয়ে এল। পয়সাটা নিয়ে দোকানের দিকে যেতে যেতে গণপতি অনেক কথা ভাবতে লাগল। এতদিন শুকনো পেটে ঘাসপাতা খেয়ে মানুষ লড়েছে খিদের সঙ্গে। আজ কাপড় নেই। আবার বোধহয় কাপড় নিয়ে বজ্জাতি আরম্ভ করেছে ব্যবসাদাররা। মোহিনীর কাছে জেনেছে গণপতি ঘরে ঘরে মেয়েমানুষ ল্যাংটো হয়ে ঘুরছে আর বন্দিনী হয়ে কাঁদছে। অনেকে এসে

গণপতির কাছে বলেগেছে যে কাপড়ের ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। গণপতি বুঝতে পারে নি, কি করবে, না করবে। দোকানে নাকি কাপড় নেই। তবে শীঘ্রিই নাকি কণ্ট্রোল চালু হবে, সেখানেই চাল চিনি কাপড় দেওয়া হবে। ওদের অঞ্চলে কণ্ট্রোলের যে ডিলার তার কাছে গিয়েছিল গণপতি। সে বলেছে, শীঘ্রিই নাকি কাপড় এসে যাবে। এদিকে মেয়েরা ঘরে ঘরে উলঙ্গ অবস্থায় মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। যদিও হরেনের রাঁড়ের পরনে দামী কাপড়ের অভাব হয়নি। গণপতি ভাবল, শীঘ্রিই কাপড়ের একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

নুন কিনে নিয়ে এসে সেই ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গণপতি বলল, 'আমি এসেছি মা, নুন রইল তোমার দরজার সামনে।'

'তোমার ভাল হোক বাবা!'

'আমার নাম গণপতি।'

'গণপতি!'

'হ্যাঁ বাড়ী গিয়ে দেখি, যদি আমার বৌয়ের বাড়তি কাপড় থাকে বা নতুন গামছাও যদি থাকে বৌকে দিয়েই তোমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দোব।'

মেয়েটির গলা কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল 'তোমাকে কি বলব বাবা, বেশি বয়েস হলেও কথা ছিল, আমার বয়সে বাইরে বেরনো যায় না, ওকে তাই তুবেলা গাল দিচ্ছি, তা গাল দিয়ে কি করব, ওর দোষ কি। পুরুষ মানুষ কি সাধ করে বউকে এমনি করে রাখে।'

'ঠিক আছে আমি চললাম মা।' বলে গণপতি সেখান থেকে দ্রুত চলে এল। ওর মনে হলো, রেণুপদ, অর্জুন, বীরচন্দ্র, নরেন, সিন্ধু, অজয়, কেষ্ট, সুবীর, শম্ভু, যোগেশ, শিবনাথ এদের বাড়ীর খবর অনেকদিন নেওয়া হয় নি। সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। তুর্ভিক্ষের চোয়ালে পড়ে সবাই ক্লান্ত হতাশ। মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে মিলবার চেষ্টা করেছে গণপতি কিন্তু কেউই তেমন আমল দেয় নি। কদিন আগে অর্জুনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে বলছিল, 'এবার আবার কাজে লাগতে হবে।' মানুষ একটু নাকি সামলে উঠেছে। বাড়ী ফিরবার পথেই পড়ে রেণুপদর বাড়ী। বাড়ীর বাইরে থেকে রেণুপদর নাম ধরে ডাকল গণপতি। রেণুপদ বাড়ীতে ছিল না। ঘরের ভিতর থেকে জবাব এল, 'সন্ধ্যের পর আসবে, তখন বাড়ী

আসবে।'

সন্ধের পর রেণুপদর বাড়ীর সামনে গিয়ে রেণুপদ বলে ডাক দিতেই দরজা খুলে রেণুপদ বেরিয়ে এল। তারপর গণপতিকে দেখে গভীর তৃপ্তিতে গণপতির হাত ধরে বাড়ীর ভিতরে ঢুকতেই গণপতি আবছা অন্ধকারে দেখল দুজন মেয়ে যেন হুড়মুড় করে ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকল।

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার রেণুপদ?'

রেণুপদ লজ্জা পেয়ে বলল, 'আমার ঠিক খেয়াল ছিল না, আমি বাইরে যেতে আমার মেয়ে বৌ ঘরের বাইরে এসেছিল। কিন্তু হঠাৎ ঢুকব তা বোধ হয় বুঝতে পারে নাই।'

গণপতি আঁতকে উঠল, 'ওদের কাপড় নাই?'

'না, দেখছ না আমিও একটা গামছা পরে আছি।'

'তোমার ঘরে ছেঁড়া কানিটানি নাই? আমাকে দাও আমি আমার পরনের কাপড়টা দিয়ে যাই।'

রেণুপদ আপত্তি করতে লাগল, কিন্তু গণপতি শুনল না। অগত্যা রেণুপদ চেঁচিয়ে বলল, 'ছেঁড়া কানিটানি থাকে তো বাইরে ছুঁড়ে দাও।'

ঘরের মেয়েরা সব কথাই শুনেছিল। কিছুক্ষণ পরে লম্বা একটা ছেঁড়া কাপড়ের ফালি গবাক্ষ দিয়ে বাইরে এসে পড়ল। গণপতি সেইটাই লেঙটের মতো পরে কাপড় খুলে দিয়ে বলল, 'কাপড় ভিতরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এসো রেণু।'

রেণুপদ কাপড়টা হাত বাড়িয়ে দিয়ে এল।

গণপতি বলল, 'চল একটু বাইরে গিয়ে বসি। তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলি।'

রেণুপদ বলল, 'আমরা বাইরে যেছি, বেরিয়ে এসে খিলটা দিয়ে দিয়ো।'

ওরা দুজনে বাইরে এসে দরজা ভেজিয়ে দিল, তারপর ভিতর থেকে খিল দেবার শব্দ শোনা গেল।

অন্ধকার মাঠের ধারে পাশাপাশি বসল ওরা দুজন।

গণপতি বলল, 'রেণু, অনেক দুঃখকষ্ট অনেক ঝড় তো গেল, এবার গরীব চাষীরা জীবন দিয়ে বুঝল যে, এমন করে বাঁচা যাবে না। জোট বাঁধতে হবে, এসো আবার আমরা কাজ আরম্ভ করি।'

রেণুপদ বলল, 'সব মন ভেঙ্গে গেছে, কোনো কিছু ভাববার ক্ষমতা কি আর আছে কারও?'

'ভাঙ্গা মনকে আবার গড়তে হবে রেণুপদ, মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে, লড়তে না পারলে বাঁচা যাবে না। গতবছর সব ধান জোতদার কেড়ে নিয়েছিল, তাই না-খেয়ে মরল গরীব চাষী। এবার আমাদের কথা ওরা বুঝবে, আর ওরা পিছিয়ে থাকবে না।'

রেণুপদ বলল, 'আরও কিছুদিন যাক, মানুষ একটু সামলে নিক। এখন কাপড় চোপড় যোগাড় করবার ব্যবস্থা করো দিকিনি।'

'হঁ্যা, সে ব্যবস্থা তো আগে করতেই হবে। আমি ডিলারের কাছে গিয়েছিলাম, সে বলেছে কাপড শীঘ্রি আসবে।'

'সে তো অনেক দিন থেকেই আসছে। জোতদাররা বড়োলোকরা চিনি পাচ্ছে, কাপড় পাচ্ছে, আর আমাদের বেলায় কেবলই ফুরিয়ে যায়, আর কাপড় শুধু আসছে।'

একটু থেমে রেণুপদ বলল, 'অথচ ডায়মণ্ডহারবারে কনট্রোলে কাপড় দিচ্ছে শুনলাম।'

গণপতি বলল, 'আমি একটা মিটিং ডাকছি। এ নিয়ে কি করা যায় দেখা যাক। কাপড আদায় করতেই হবে। মা বোনেরা উলঙ্গ হয়ে আছে, এ সহ্য করা হবে না।'

রাত বাড়ছিল। গণপতি রেণুপদর কাছে বিদায় নিয়ে শূন্যমাঠের উপর দিয়ে একা ফিরছিল। মাঘমাসের শেষাশেষি। শীত ফুরিয়ে গিয়ে দক্ষিণের হাওয়া মারতে শুরু করেছে। পাতা ঝরার সরসরানি শব্দ উঠছে। একটা বন মতো জায়গার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ গণপতি অদ্ভুত কথা শুনতে পেল।

নারীকণ্ঠ, 'বাবু, আজ ছেড়ে দাও, আমার ভয় করছে!'

পুরুষ কণ্ঠ, 'ভয় করছে? দে আমার কাপড় খুলে দে, ল্যাংটো হয়ে থাকগে যা।'

নারীকণ্ঠ, 'না, বাবু, কাপড় ফিরে চেয়ো নি।'

পুরুষকণ্ঠ, 'তাহলে চল শুবি আমার কাছে, আমি কাপড় পাঠিয়েছিলাম কিজন্যে, বলিনি, আমার সঙ্গে রাত কাটাতে হবে?'

তারপরই একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনে গণপতি হাঁক দিয়ে উঠল, 'কে রে?'

একটা লোক হঠাৎ বন থেকে বেরিয়ে ছুটে চলে গেল।

গণপতি বলল, 'কে গো তুমি মেয়া?' বলে বনের ভিতরে একটু ঢুকতে একটা নারীমূর্তির মুখোমুখি পড়ে গেল।

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা কে?'

'হেমন্তবাবুর ছেলে।'

'সে তো কলকাতার কলেজে পড়ে, সে কাপড় দিয়েছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'অ।' বলে গণপতি বনের বাইরে চলে এল। কাণ্ডটা ভাবতে লাগল। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল এসব ব্যাপার তাকে আর তেমন করে নাড়া দেয় না, বোধহয় মনে ওর ঘাঁটা পড়ে গেছে। এ তো প্রতিদিনের ঘটনা, কত যে এমন দেখেছে, এমন শুনেছে গণপতি তার কি ইয়ত্ত আছে! এখন ওর মনে যে অনির্বাণ আগুন জ্বলছে একমাত্র লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে সে হলো কেমন করে এর উচ্ছেদ করা যায়। সহসা আনন্দ রায়ের কথা মনে পড়ল ওর। মানুষটার সঙ্গে আর একবার দেখা করবার বড় ইচ্ছে হয়।

গণপতি নিজের বাড়ীতেই মিটিং করবে বলে ঠিক করল। ওর নিজের গাঁয়ের বন্ধুদের সাহায্যে আশেপাশের গাঁয়ের বন্ধুদের খবর দিল। অনেকের সঙ্গেই অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না, মাঝে মাঝে কারও কারও সঙ্গে দেখা হয়েছে, দুর্ভিক্ষ এবং সে সময়ের অবস্থা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনাও হয়েছে গণপতির। কিন্তু দেশের অবস্থা এমনি ভীষণ হয়ে উঠেছিল যে সকলেই কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত ভীত হয়ে ছিল। কোনো আলোচনা থেকেই কোনো কর্তব্য বা সিদ্ধান্ত তারা ঠিক করতে পারে নি।

দিন পনের পরে একদিন দুপুরবেলা গণপতির ঘরে মিটিং বসল। আগের মিটিংয়ে যারা ছিল তারা প্রায় সবাইই এল। দেশের অবস্থা নিয়ে ওদের মধ্যে অনেক আলোচনা হলো।

গণপতি বলল, 'আর মানুষ দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারছে না। তারা সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁচেছে। দুর্ভিক্ষে সুন্দরবনের বহুলোক মারা

পড়ল। এভাবে মানুষকে মরতে দিলে চলবে না। এবার আমাদের কাজ করতেই হবে।'

তারপর কাপড়-সমস্যার কথা উঠল।

একে একে অনেকেই বলল, 'বাড়ীর বৌ ঝিয়েরা উলঙ্গ হ'য়ে আছে, আর ডিলার দুলালবাবু কেবলই বলছে কাপড় আসে নাই। কিন্তু বড়োলোকদের মেয়েদের কাপড়ের কোনো অভাব নাই, তারা দিনকে দিন ঠিক নতুন কাপড় পেয়ে যাচ্ছে।'

একজন বলল, 'বড়োলোকদের কাপড় যোগাচ্ছে কিন্তু ঐ দুলালই।'

নানান আলোচনার পর ঠিক হলো, তারা সকলে মিলে একসঙ্গে দুলালের কাছে গিয়ে কাপড় দাবি করবে।

সেই সিদ্ধান্ত মতোই বিকাল বেলা সবাই দল বেঁধে একসঙ্গে দুলালের কাছে গেল।

নেতা হিসেবে গণপতি দুলালকে বলল, 'দেখ দুলালবাবু, আমরা সুন্দরবনের মানুষদের হয়ে তোমার কাছে এসেছি কাপড়ের লেগে। এক্ষুনি আমাদের কাপড় দিতে হবে।'

দুলাল বলল, 'কাপড় এলে তবে তো দোব, অত তাড়াহুড়ো করলে কি চলে?'

গণপতি বলল, 'কি? বড়োলোকদের বাড়ীতে তো ঠিক কাপড় চালান দিচ্ছ।'

দুলাল খেঁকিয়ে উঠল, 'কে বলেছে? কোন শালা বলেছে, আমি কাপড় দিয়েছি বড়োলোকদের? একথা কে তোকে বলেছে একবার বল তুই আমাকে, তারপরে আমি দেখে নোব সে কত বড়ো বাপের বেটা হয়েছে।'

গণপতি বলল, 'ওসব প্যাঁচের কথা জানিনা দুলাল, আসছে হপ্তার মধ্যে কাপড় না পেলে ভালো হবে নি। যদি আমাদের ঘরের কেনো মা বোন তখনও কাপড় না পরতে পায় তাহলে তোমার ভালো হবে না দুলাল।'

দুলাল চীৎকার করে উঠল, 'শালা, আমাকে তুই চোখ রাঙাতে এসেছিস? কাপড় তোর বাপের মিলে তৈরি হচ্ছে শালা, যা, যেয়ে নিয়ে আয় গা।'

গণপতি বলল, 'গালমন্দ করো নি বাবু, সাফ কথা বলে দিয়ে গেলাম,

মনে থাকে যেন।' বলে সঙ্গীদের নিয়ে গণপতি ফিরে গেল।

কিন্তু দিন তিনেক পরেই তুলালের মুখ থেকে শোনা গেল, এক নৌকা বোঝাই কাপড় আসছিল এখানে। হঠাৎ নৌকাটা নাকি নদীর কিনারে জলে ডুবে গেছে।

ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে গণপতিরা নানান ভাবে খোঁজখবর নিতে লাগল। যখম সুন্দরবনের ঘরে ঘরে মেয়েরা দিনের আলোয় বেরতে পারছে না তখন এক নৌকা কাপড় জলে ডুবে গেল, ব্যাপারটা ভারী রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল সকলের কাছে। নানানভাবে অনুসন্ধান করতে করতে জানা গেল নৌকা একটা ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেটা আসল নৌকা নয় এবং সুন্দরবনের বরাদ্দ সব কাপড় ডায়মণ্ড-হারবারেই থেকে গিয়েছে, সেখানেই তা বিক্রি হবে এবং তুলাল পকেট ভারী করবে। তখন সরু কালো পাড় শাড়ি আর থান ধুতির কণ্ট্রোলে দাম ছিল আড়াই টাকা করে আর ব্ল্যাকে বিক্রি হতো দশটাকা বারটাকা করে। এই নৌকার কাপড় ছাড়াও আগেও কিছু কিছু কাপড় এসেছে, কিন্তু তুলালবাবু সে সব কাপড় তার জানাশোনা লোককে আর ধনীলোকদের দিয়েছেন। চাষী মেয়েরা যে উলঙ্গ হয়ে আছে সে নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার বোধ করে নি তুলাল। তুলালের কাছে চিনি আনতে গেলে চাষীমানুষ ধমক খেয়ে পেট ভরায়, ফুড্ কমিটির মেম্বার বাবুদের ডাকলে সাড়া মেলেনা।

গণপতি আবার তার বাড়ীতে মিটিং ডাকল। এবার ইচ্ছা করেই সে নরমপন্থীদের বাদ দিল। মিটিংয়ে ঠিক হলো, তুলালকে শায়েস্তা করতে হবে, মেয়েমানুষ উলঙ্গ আছে জেনেও যে কাপড় নিয়ে কালোবাজারি করে টাকা লুটছে তাকে ছেড়ে দিলে হবে না।

সন্ধে উত্তীর্ণ হলে গণপতিরা তুলালের বাড়ী গিয়ে হাজির হলো। সন্ধের পরই গ্রাম নির্জন থমথমে হয়ে যায়। তুলালের নাম ধরে না ডেকে দরজা ভেঙ্গে ওরা ভিতরে ঢুকে গেল। দেখল চারিদিকে চিনি গম আর চালের বস্তার মধ্যে একটা খাটে তুলাল শুয়ে আছে। দেখ, ওদিকে ওর মাথার কাছে নতুন কণ্ট্রোলের কাপড়ও কাঁড়ি করা আছে ?

সাগর তুলালবাবুকে টেনে তুলল। তুলাল এই সন্ধে রাতেই নাক

াকাতে শুরু করেছিল। আচমকা ঘুম থেকে উঠে সে গেল হকচকিয়ে।

রেণুপদ বলল, 'দুলালবাবু তোমার ঘরে এত কাপড় জমিয়ে রেখেছ আর চাষীর মেয়েরা ঘরে ঘরে ল্যাংটো আছে, সেকথা মনে পড়ে না তোমার?'

দুলাল ওর ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে তোষামুদে হাসি হাসতে হাসতে বলল, 'এ কাপড় তো আজ এসেছে, কাল তো আমি এ কাপড় চাষীদের দোব।'

'মাইরি!' বলে উঠল বিহারীলাল।

গণপতি বলল, 'দেরি কোরো না ভাই সব, আমাদের কাজ শেষ করে ফেলি এসো।'

কয়েকজন মিলে দুলালকে শক্ত করে ধরল। তারপর একজন একখানা নতুন কাপড় এনে ভাঁজ খুলে দুলালের মুখে গুঁজতে গুঁজতে বলল, 'এই নে, কাপড় খা।' তারপর ওরা সবাই মিলে চিনি এনে, চাল এনে, আটা এনে দুলালের নাকে, মুখে, কানে গুহ্য দেশে গুঁজে দিতে লাগল। আর বলতে লাগল, 'শালা, চাষীদের বঞ্চিত করে নিজেই সব খেতে চেয়েছিস, তা নে খা এবার। আমরাই তোকে খাইয়ে দিয়ে যাব।' 'নে কাপড় খা, চিনি খা, আটা খা, চাল খা।' বলে দুলালের নাকে মুখে, কানে গুঁজতেই লাগল। কিছুক্ষণ পরে দুলাল মরে নেতিয়ে পড়লে কাপড়ের গাঁটরিগুলি আর চাল আর আটার বস্তা মাথায় করে ওরা চলে গেল। সেই রাত্রেই চাল, আটা, কাপড় ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল ওরা।

পরের দিন কাকদ্বীপ থানা থেকে পুলিশবাহিনী এল। সুন্দরবনের চাষীদের ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাবার অছিলায় বাঁদরামি করতে লাগল পুলিশের লোক। ঘরে ঘরে উলঙ্গ মেয়েরা বন্দিনী হয়ে বসে আছে অন্ধকারে, পুলিশ কোনো কথা গ্রাহ্য না করে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়তে লাগল, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা উলঙ্গ যুবতীদের চোখ দিয়ে চেটে চেটে ভ্যা ভ্যা করে হাসতে লাগল।

গণপতিরা পুলিশকে বারবার নিষেধ করতে লাগল। কিন্তু দারোগা গণপতিদের ধমকে উঠল। দারোগা লোকটা ছিল রসিক, যুবতী মেয়েদের সম্পর্কে নানান রকম মন্তব্য করতে লাগল সে, কোনো বাড়ীতে ঢুকে বলল,

'বাঃ একখানা মাল যে বেশ খুবসুরত দেখছি, ডব্‌কা জিনিসটি কে ভোগ করে বাওবা!'

গণপতির দল দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল, দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত মানুষগুলি ভিতরে ভিতরে আগুন হয়ে উঠল। দারোগা দেখল পুলিশদের ঘিরে ক্রমশই গাদা গাদা লোক জমে উঠছে। যদিও সঙ্গে রাইফেল আছে তবুও ভয় পেল দারোগা। তদন্ত কাজ বন্ধ করে তারা পালাল।

কিন্তু দুলাল হত্যার ঘটনা সুন্দরবনের মানুষদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাহস এবং উৎসাহ নিয়ে এল। আর সুন্দরবনের জোতদার নায়েবরা একটু ভীত হলো। কিন্তু দুলালের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যে ভিতরে ভিতরে ঘোঁট পাকাতে লাগল ওরা। শোষক ও শোষিতের সংগ্রাম সহসা একটা তীক্ষ্ণ দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

॥ ২৮ ॥

তারপর এল ১৯৪৬ সাল। ১৯৪৬ ভারতের দিকে দিকে বিদ্রোহ আর বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল। মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষ; অনাহার, দারিদ্র্য হুড়মুড় করে এসে পড়েছে ভারতের জনগণের উপরে। সহিষ্ণু ভারতবাসী ধৈর্য এবং সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। ওদিকে কংগ্রেস, মুসলিমলীগ জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করবার কুৎসিত লড়াইয়ে মেতেছে। কমিউনিস্ট পার্টি দুর্বল, অক্ষম, ভীরু এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে আছে। সে পার্টি তখনও সাবালকত্ব অর্জন করতে পারে নি। ভারতবর্ষের প্রধান এই তিন পার্টির যোগ্যতার এবং স্বদেশপ্রীতির ভয়ঙ্কর পরীক্ষা হয়েছিল ১৯৪৬ য়ে। এবং সেই পরীক্ষায় ওরা কেউই উত্তীর্ণ হতে পারে নি। কঠিন সংকটকালেই সকলের পরীক্ষা হয়। সংকট না এলে মানুষের, পার্টির পরিচয় প্রকাশ পায় না।

১। ১৯৪৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি বম্বে বিমান বাহিনীতে অনশন ধর্মঘট হয়েছিল।

২। ১৯শে ফেব্রুয়ারি নাবিকবাহিনী বিদ্রোহ করেছিল।

৩। ১৮ই মার্চ দেরাদুনে গোর্খা সৈনিকরা বিদ্রোহ করেছিল।

৪। নাবিক-সৈন্যদের বিদ্রোহের সমর্থনে বোম্বাই, কলকাতা, ত্রিচিনো-পল্লীতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করেছিল।

৫। সায়ন ও আমিপেট-এ রয়াল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের সৈনিকদের ধর্মঘট সংঘটিত হয়েছিল।

৬। ২৯শে জুলাই সর্বাত্মক ধর্মঘট পালিত হয়েছিল।

৭। মহাযুদ্ধকালীন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদহিন্দ্ ফৌজের মুক্তি আন্দোলনের সংবাদ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

বাংলার একেবারে দক্ষিণের এই সুন্দরবন এলাকায় এসব খবর নিখুঁত ভাবে পৌছয় নি। কিন্তু দেশব্যাপী এই সশস্ত্র অভ্যুত্থান, এই বিপ্লবী মুক্তি-সংগ্রামের বিবরণ কিছু কিছু শুনতে পেয়েছিল গণপতি এবং তার বন্ধুরা। এইসব আবছা খবরকে কল্পনায় রঞ্জিত করে ওরা মানুষকে শুনিয়েছিল। কলকাতা যারা যেত তারাও ভাসা ভাসা কিছু কিছু খবর নিয়ে আসত। এবং সৈন্যবাহিনীর এই বিদ্রোহের খবর, শহরের শ্রমিকদের বিপুল ধর্মঘটের খবর, শ্বেতসৈন্যদের অত্যাচাব, গুলি চালানো এবং ভারতীয় শ্রমিকদের সাহসী প্রতিরোধের খবর সুন্দরবনের কৃষকদের মনেও আশা এবং শিহরণ জাগাত। গণপতি, সাগর, ইন্দ্র, বিহারীদের কাছে লোকে নানান কথা জিজ্ঞাসা করত। ওরা খবর ভালো করে প্রায় কিছুই জানত না। কিন্তু সামান্য সামান্য লোকমুখে-বয়ে-আসা সংবাদেই উদ্দীপ্ত হয়ে থাকত বলে বিদ্রোহী ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রের চিন্তা ওদের মনে জাগত। এবং জন-সাধারণের মধ্যে সে উদ্দীপনা স্বাভাবিকভাবেই ওরা সঞ্চার করে দিত।

১৯৪৬ য়ে আগস্টে কলকাতায় এবং পূর্ববঙ্গের বহু জায়গায় হিন্দু মুসল-মানে খুনোখুনি করেছিল। প্রকাশ্য দিনের বেলায় কলকাতা এবং পূর্ববঙ্গের শহরগুলিতে যে সব বীভৎস ও নৃশংস ঘটনা হামেশাই ঘটত তা মানুষের ইতিহাসে দুরপনেয় কালিমা লেপে দিয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনের এক নারকীয় তাণ্ডব শুরু হয়েছিল। বিপ্লব ব্যর্থ হলে এমনি বিকৃতিই বোধহয় আসে। তিন পার্টির যে বিশ্বাসঘাতকতা সৈন্যবাহিনী এবং শ্রমিক জনতার জাগ্রত বিদ্রোহও সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে ধ্বংস করেছিল সেই বিশ্বাস-ঘাতকতাই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে হত্যা, ধর্ষণ এবং লুণ্ঠনের অবাধ নারকীয়তা সৃষ্টিকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। কিন্তু সুন্দরবনে এই খুনো-

খুনি, এই কাটাকাটি, নারী ধর্ষণ আর লুণ্ঠনের কোনো নরক তৈরি হয় নি। এখানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় নি। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত, শোষিত হিন্দু মুসলমান নিজেদের মধ্যে কৃত্রিম বিরোধ তৈরি করে নি। অবাক হয়ে কলকাতা আর নোয়াখালির বিবরণ তারা শুনেছিল মাত্র।

॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ মাইতি, সাধুচরণ মাইতি, বিহারীলাল ঘড়ুই, সাগর জানা প্রভৃতি রাজনগর, শিবরামপুর, চন্দ্রনগর, রাধানগর, বুধাখালি প্রভৃতি অঞ্চলে ছোটো ছোটো বৈঠকী মিটিং করতে লাগল। আর গণপতি, ইন্দ্র মাইতি, শ্রীচরণ, রেণুপদ, অর্জুন, যোগেশ, কেষ্ট, সতীশ প্রভৃতি লয়ালগঞ্জ, হরিপুর, মহারাজগঞ্জ, চন্দনপিঁড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে বৈঠকী মিটিং করতে আরম্ভ করল। দুলালের মৃত্যুর পর জোতদার নায়েবদের চোখ পড়েছিল গণপতিদের উপরে। এবং গণপতিকে পালের গোদা বলে চিহ্নিত করেছিল তারা।

একদিন দারোগা এল গণপতির কাছে। এসেছিল সে হাজরাদের কাছারিতে মহিম ঘোষের আতিথ্য নিতে নিমন্ত্রিত হয়ে। মহিম ঘোষের উসকানিতে গণপতিকে ধমকাতে এল দারোগা। গণপতি ঘরে ছিল। অপরিচিত গলার ডাক শুনে বাইরে এসে দেখল জনদুই পুলিশ নিয়ে দারোগা দাঁড়িয়ে আছে। দারোগা খানিকক্ষণ কটমটিয়ে গণপতির চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর বলল, 'একটু সমঝে চলো হে মস্তান।'

গণপতি মিষ্টি হেসে বলল, 'এঁজ্ঞে, তাই চলব। তা মহিমবাবু বোধহয় পেইঠেছে আপনারে?'

'সে খোঁজে তোমার কি কাজ? বেশি চালাকি করলে খারাপ হয়ে যাবে, এই কথা বলে যাচ্ছি।'

'তা যান ক্যানে, আপনাকে যেতে কে বারণ করেছে, তা অকারণে যে মানুষের বাড়ী এসে ধমকে গেলেন, আপনি কি মহিম ঘোষের প্রজা, না কি বৃটিশের প্রজা?'

'দেখা যাবে কে কার প্রজা, কিন্তু বেশি বেড়ো না হে, বড্ড বিপদ হবে।

ছেলে বৌ নিয়ে ঘর কর, মরবে শেষটায়।'

গণপতি কথা না বলে চুপ করে রইল। দারোগা পুলিশ তুটিকে 'এ্যাই চলো।' বলে দর্পিত ভঙ্গীতে চলতে লাগল।

এই ঘটনাতে গণপতি চিন্তিত হলো। সে এমনিতেই সংসারী মানুষ হয়ে সংসারের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থেকে তার আসল কাজে সময় পাচ্ছিল কম। আজ সে বুঝল, জোতদার, নায়েব এবং পুলিশেরও চোখ পড়েছে ওর দিকে। কয়েকদিন তলিয়ে ভাবল গণপতি। ঘরের সুখসুবিধা ভোগ করে মানুষের কাজ করা ঠিক যায় না বোধহয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে অষ্টপ্রহর মিশে না থাকলে লোকগুলির মন ঠিকমতো যেন পড়তে পারছে না। ও ঠিক করে ফেলল, এবার ও সংসারের দায়-দায়িত্ব থেকে রেহাই নেবে। ওর তু ভাই আছে, তাদেরও বিয়ে থা দিয়েছে গণপতি, তারাই এখন চাষবাসের কাজকর্ম করবে। এমনি করে ঘরের সুখে বন্দী থাকলে সমস্ত প্রাণ ঢেলে কাজ করতে সে পারবে না।

চাষ আবাদের কাজ তখন হয়ে গেছে। এমনি সময় একদিন সন্ধে বেলা সে বাড়ীর সবাইকে ওর কাছে এসে বসতে বলল। সবাই মানে গণপতির তুই ভাই, তুই ভ্রাতৃবধূ, নিজের বৌ মোহিনী। গণপতি ঘরের ভিতরে বসেছিল। কাছেই একটা কুলুঙ্গিতে সরষের তেলের মাটির প্রদীপ জ্বলছিল। একে একে তুই ভাই এসে বসল, তুই ভ্রাতৃবধূ বসল একটু আড়ালে। মোহিনী এল তার চার বছরের ছেলে কার্তিককে নিয়ে। সবাই চুপ করে বসলে গণপতি বলল, 'এবার আমাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

একভাই সীতাপতি বলল, 'ছেড়ে দিতে মানে।'

গণপতি বলল, 'মানে আমি আর সংসারের দায়দায়িত্বে থাকতে পারব নি। বাইরে আমার অনেক কাজ, সে সকল কাজ আমি মনের মতো করে করতে পারছি না। মানুষ সহ্যের শেষ সীমায় এসেছে। আর আমার দেরি করা চলবে নি।'

আর একভাই নরপতি বলল, 'তা তুমি তোমার মতো কাজ কর গা, তোমাকে মানা করেছে কে?'

'আমি বাড়ীতেও থাকতে পারব নি।'

সীতাপতি বলল, 'বাড়ীতে থাকবে নি তো চাষবাস কে দেখবে,

জমিজিরেত কে দেখবে ?'

'সে সব তোমাদের দেখতে হবে।'

নরপতি বলে উঠল, 'তা বাড়ীতে থাকতে তোমার আপত্তির কি আছে ?'

'বাড়ীতে থাকলে পুলিশ আর জোতদাররা হামলা করবে। আর বাড়ীতে থাকলে বাড়ীর নিয়মও মেনে চলা দরকার। আমি বাইরে থাকব, আমি চাষীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরব। আমার জন্যে তোমরা ভেবো নি।'

একটু থেমে বলল, 'আর মাঝে মাঝে বাড়ীতেও আসব বৈকি। যখন আমার সংগ্রামের সাথীরা জোর করে আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে যাবে।'

সীতাপতি বলল, 'তুমি না থাকলে আমরা কি করব দাদা ? আমাদের মাথার উপরে কে আছে তুমি ছাড়া ?'

'তোমরা এখন বড় হয়েছ, আর আমার উপর নির্ভর করে থাকলে তো তোমাদের চলবে নি সীতো।'

মোহিনী এতক্ষণে কথা বলল, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব।'

গণপতি বলল, 'তা তো হয় না গিন্নী। তুমি মেয়েমানুষ, আমি কোথায় থাকব, কি করব তার ঠিক নাই, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে কেমন করে ?'

মোহিনী বলল, 'তুমি তো বলেছিলে মেয়েরাও যুদ্ধ করবে। মেয়েরাও সাহায্য করবে।'

'সে কাজ অন্য ধরণের। আর সময় যখন হবে তখন আমিই তোমাকে ডেকে নোব।'

'আমি তোমাব সঙ্গেই থাকব।'

'তা কি করে হয় মোহিনী, তোমার ছেলে এখনও ছোটো, আবার তোমাব সন্তান হবে।'

মোহিনী বলল, 'সীতা শ্রীরামের সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন।'

গণপতি বলল, 'রামচন্দ্র তো যুদ্ধ করতে যান নি, গিয়েছিলেন বনবাসে। যুদ্ধ করবার জন্যে গেলে নিশ্চয়ই সীতাকে সঙ্গে নিতেন না।'

মোহিনী অভিমান ভরা গলায় বলে উঠল, 'আমি ওসব জানি না, আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব নি।'

'কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতেই হবে গিন্নী। এমনিভাবে সংসার নিয়ে

জড়িয়ে থাকলে আমার মনে কোনো সুখ থাকবে নি। আমি তোমাদের উপর রাগ নিয়ে থাকব। তোমাদের কখনও ক্ষমাও করতে পারব নি।'

মোহিনী বলে উঠল, 'কেন বাড়ীতে থেকে কাজ হয় না?

'হয়, কিন্তু তোমাকে ভালবাসি বলে মাঝে মাঝে পিছু টান লাগে, তাছাড়া পুলিশ এসে আমার সঙ্গে তোমাদেরও বিরক্ত করবে। অবিশ্যি আমি না থাকলেও বিরক্ত করবে। তবে আমি থাকলে তাদের অত্যাচার অনেক বেশি হবে। তাছাড়া সংসারে থাকলে নানান দায় দায়িত্ব অভাব অভিযোগকে এড়িয়ে যাওয়া তো যায় না।'

একটু থেমে সীতাপতি নরপতির দিকে তাকিয়ে গণপতি বলল, 'তোরা কি বলিস সীতো, নরো?'

সীতাপতি বলল, 'আমরা কি বলব? তুমি বড়ো, তুমি বুঝমান মানুষ। তুমি যা ভালো বোঝ কর।'

গণপতি বলল, 'আমি আজ তিন বছর ধরে ভেবেই তবে একথা বলতে পারছি রে। আমি তো দেখছি, আমি ঠিক মতো কাজ করতে পারছিনা। নিজের সুখ, ঘর আর বৌ ছেলে নিয়ে থাকলে আমি দিনরাত সারাক্ষণ মানুষের মধ্যে থাকতে পারব কেমন করে?

মোহিনী আর কোনো কথা না বলে উঠে গেল। ভাইরাও উঠে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে গণপতিও বেরিয়ে গেল সে রাত্রের বৈঠকী মিটিংগুলো সারতে।

কৃষক-সমিতির সভ্য করতে লাগল ওরা চাষীদের। চাষীদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল। কিন্তু খুব বেশি লোককে কৃষক-সমিতির সভ্য করতে পারল না ওরা। কৃষক-সমিতির আদি সভ্যরা একদিন বসে ঠিক করল কৃষক-সমিতির সমস্ত সভ্য এবং জনতা নিয়ে একদিন একটা বড়ো সড়ো মিটিং করা হোক।

লয়ালগঞ্জেই সভা ডাকা হলো। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন।

গণপতি ঠিক করল ঐ কোজাগরী পূর্ণিমার তিন দিন আগে সে গৃহত্যাগ করবে। তার সিদ্ধান্তের কথা শুনে মোহিনী বিছানা নিল। খাওয়া চান-করা সব ছেড়ে বিছানাতে পড়ে রইল।

গণপতি বলল, 'তুমি যদি উপোস করে থাকো, তাহলে আমিও উপোসী

থাকলাম।'

মোহিনীর তিনদিন উপবাসে কাটল। কার্তিকেরও কষ্ট হতে লাগল। গণপতি ওকে অনেক বোঝালো। বলল, 'মোহিনী, আমি তো চিরদিনের জন্যে যাইছি না। মাঝে মাঝেই তো আমাদের দেখা হবে। তারপর তুমি যোবতী মেয়ে। আমার কমরেডরা আমাদের দুজনকে ঘরে ঢুকিয়ে দিলে তখন আমাদের দেখা হবে।'

গণপতির ভাইয়ের বৌরা মোহিনীকে কত বোঝাতে লাগল। বলল, 'দিদি, তোমার ছেলেটার দিকে তাকাবে নি? কি পাথর পেরান তোমার। তোমাব পেটে যেটা আছে সেটা যে মরে যাবে। আর ভাসুর তো চিরদিনের জন্যে যাইছে না। বাড়ীতে সে বাঁধা থাকবে না, তাই বলে কি আমাদের ছেড়ে যাইছে নাকি?'

অনেক বোঝানোর পর তিনদিনের দিন উঠল মোহিনী। গণপতিও স্নান করে নি, খায়নি। এ তিনদিন সে মোহিনীর কাছেই বসেছিল। মোহিনী গণপতিকে তেল দিয়ে বলল, 'যাও চান কবে এসো।'

গণপতি বলল, 'তুমি চান কর।'

'হ্যাঁ, আমিও যাব।'

গণপতি তেল মেখে চান করতে গেল। মোহিনী চান করে এসে গণপতির জন্যে রাঁধতে বসল। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে সেই দিনই গণপতির গৃহ ত্যাগের দিন।

মোহিনী রান্না শেষ করে গণপতিকে বসে খাওয়াল। গণপতির খাওয়া হয়ে গেলে সেই পাতে নিজেও খেল। তারপর গণপতির কাছে গিয়ে বসে বলল, 'তোমাকে কয়েকটা পিতিজ্ঞে করতে হবে।'

'কি বলো?'

'রেঁধে তোমাকে খেতে ডাকলে তুমি আসবে।'

'আসব।'

'কাপড় গামছা চাদর এসব কিনে দিলে নেবে।'

'নোব।'

'আর প্রতি হপ্তায় আমাকে দেখা দিয়ে যাবে।'

'চেষ্টা করব।'

'না চেষ্টা নয়, বলো দেখা দিয়ে যাব।'

একটু চুপ করে থেকে গণপতি বলল, 'যাব।'

তারপর গণপতি বলল, 'এবার আমি যাব।'

মোহিনী হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। গণপতি ওর ছেলেকে কোলে নিয়ে অজস্র চুমুতে ভরিয়ে দিতে লাগল তার মুখ। মোহিনীকে আদর করল কতবার। হাত দিয়ে মোহিনীর চোখ মুছিয়ে দিল। এমনি করে ঘণ্টা খানেক সময় কাটলে মোহিনী কিছুটা শান্ত হলে মোহিনীর কোলে কার্তিককে তুলে দিয়ে ঘর থেকে নিজেকে ছিঁড়ে নিয়ে মাঠে নামল গণপতি। কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে দেখল মোহিনী কার্তিককে কোলে নিয়ে বাড়ীর সামনের একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে আঁচল তুলে চোখ মুছছে। হঠাৎ কান্নার ভীষণ উচ্ছ্বাসে কাতর হয়ে পড়ল গণপতি। চোখ দিয়ে ওর জল ঝরে পড়ল। কিন্তু আর সে পিছন ফিরে তাকাল না। দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগল।

॥ ৩০ ॥

গণপতি গেল শ্রীচরণের কাছে।

শ্রীচরণকে বলল গণপতি, 'ছিচরণ, আমি আজ থেকে ঘর ছেড়ে সমস্ত সুন্দরবনকেই আমার ঘর করলাম। আজ থেকে সকলের দুঃখকে আমি নিজের দুঃখ বলে মনে করব, সকলের কষ্টের কথা জানব, নিজে সে-কষ্টের ভাগ নোব। সকলের কাছে আমি শিখব, সকলকে আমার মাস্টার করব।'

শ্রীচরণ বলল, 'তুমি কি মনে কর, লোকে একজোট হয়ে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বে? এরা সব না খেয়ে মরে তবু কেড়ে খায় না। এদের ভরসায় তুমি ঘর ছাড়লে?'

'ছিচরণ, তুমি মানুষকে চিনতে পার নি। তুমি শুধু ওপর থেকে দেখেই ওদেরকে বিচার করেছ। আমি বলছি ভিতরে ভিতরে মানুষের মনে মনে আগুন মোচড দিয়ে উঠছে।'

'আমি তো বাপু কিছু বুঝতে পারি না।'

'আমার কথা শোনো ছিচরণ, শুনেছি একরকমের পাহাড় আছে তাকে পাথর বলেই মনে হয়। হঠাৎ একদিন তার মাথা ফেটে আগুন-গলানো ধাতু বেরিয়ে এসে মহাপ্রলয় করে। তেমনি সুন্দরবনকে সুন্দরবনের গরীব চাষীদের আজকে পাথর বলে মনে হচ্ছে কিন্তু শীঘ্রি দেখবে আগুন জ্বলে উঠেছে আর সেই আগুনে পুড়ে মরছে জোতদার, মহাজন, নায়েব, গোমস্তা।'

শ্রীচরণ হিসেবী লোক। সে বলল, 'তুমি যে ঘর ছেড়ে এলে তুমি খাবে কোথায়, থাকবে কোথা?'

'মানুষের মধ্যে থাকব আমি, মানুষের কাজ করব আমি, মানুষই আমাকে খাওয়াবে। জনগণের উপর সে বিশ্বাস আমার আছে। তারা না খেয়েও আমার অন্ন জোটাবে।'

শ্রীচরণ আর কোনো কথা না বলে চুপ করে রইল।

গণপতি বলল, 'চলো এখন আমার সঙ্গে বৈঠকী মিটিং করতে হবে। পূর্ণিমার রাত্রের মিটিংয়ে বহুলোকের জমায়েত করতে হবে।'

সেই রাত থেকেই গণপতির নতুন জীবন আরম্ভ হলো। সেদিন থেকে সে সমস্ত মানুষের আরও নিকটতর হলো। গাঁ থেকে গাঁয়ে, পাড়া থেকে পাড়ায়, ঘর থেকে ঘরে সে ঘোরে। মানুষের কাছে বলে, কী করতে হবে, কেন করতে হবে। আর আগামী পূর্ণিমারাত্রের মিটিংকে সফল করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে।

১৯৪৬ সালের কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে লয়ালগঞ্জে একজনের ঘরে মিটিং বসল। গণপতিরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল মেয়েপুরুষ করে প্রায় চারশ' লোক জমে গেল। সভাপতি হলো ভরত সাঁতরা। ঠিক হলো বক্তৃতা করবে গণপতি, কামদেব ঘড়ুই, আর বিশ্বনাথ। ওরা প্রথমে ঠিক করে নিল, কে কি-সম্বন্ধে বলবে। গণপতি বলবে তার অভিজ্ঞতা এবং কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে, কামদেব বলবে সংগঠনের দরকার সম্বন্ধে আর বিশ্বনাথ জমিদারি ব্যবস্থা এবং বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বিষয়ে বলবে।

সভাপতি বলতে বলতে গণপতি উঠে দাঁড়াল। একবার চারিদিকটা তাকিয়ে দেখে নিল। ঘরটা বড়। তিলধারণের জায়গা নেই। শুধু একপাশে যেখানে নেতারা বসে আছে সেখানে অনেকগুলি হারিকেন জ্বলছে।

যারা হারিকেন নিয়ে এসেছে তারা সভাপতির কাছেই নামিয়ে রেখেছে। অনেকগুলি হারিকেনের আলোতে মন্দ আলো হয় নি। সেই আলোর আভাস মানুষগুলির উপরে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আলোতে গণপতি দেখল মোহিনীও তার ছেলেকে নিয়ে একপাশে মেয়েদের মধ্যে বসে আছে। হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল গণপতির, কিন্তু মানসিক এই শিহরণকে সে প্রশ্রয় দিল না। সে বলবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে নিল। ইতিমধ্যে মিটিংয়ে বলার কায়দা কানুন সে শিখে ফেলেছে।

সে বলতে লাগল, 'সভাপতি, আমার বন্ধুরা এবং আমার চাষী ভাই ও মা বোনেরা, আজ আমরা যে একসাথে এত লোক এক জায়গায় জমতে পারলাম তাতে আমার আনন্দ যে কত হয়েছে আমি বোঝাতে পারব নি। আজ আমার আশা হলো যে, আমরা এবার উঠে দাঁড়াতে পারব। আজ আমি বিশ্বাস করছি যে, আমরা এবার থেকে অত্যাচারী জমিদার, জোতদার, নায়েবদের মার রুখতে পারব। আমরা যতই জোট বাঁধতে পারব, ততই আমরা বলশালী হয়ে পড়ব। একা মানেই তো বোকা। অনেক মানে শক্তি, অনেক মানে সাহস। এক ফোঁটা জল হাওয়ায় শুকিয়ে যায় আর হাজার হাজার ফোঁটা নিয়ে সমুদ্র। সমুদ্র খেপলে মহাপ্রলয় হয়, বান হয়।

ভাইসব পেরথমে চিনতে হবে, জানতে হবে, আমাদের শত্রু কে? আমাদের শত্রু তারাই যারা আমাদের ক্ষতি করে। আমাদের শত্রু, এক নম্বর জমিদার, দু নম্বর জোতদার, তিন নম্বর নায়েব গোমস্তা, চার নম্বর দারোয়ান পাইক, পাঁচ নম্বর মহাজন, ছ'নম্বর পুলিস, সাত নম্বর বড়োলোকদের দালাল পা-চাটা কুত্তারা আর এদের চেয়েও বড়ো শত্রু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। এতগুলো শত্রুর সঙ্গে আমাদের লড়তে হবে। আমাদের লড়াই বড়ো জবর লড়াই।

কেন এদের সঙ্গে লড়তে হবে? কারণ এরা আমাদের শোষণ করে। চাষীরা মাথার ঘাম মাটিতে ফেলে ধান ফলায়, সেই ধান জমির মালিকরা কেড়ে নেয়, বাজে আদায় জোর করে ছিনিয়ে নেয়, সারা বছর খেটে চাষী খালি হাতে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফেরে, খেটেও তার পেটের খিদের জ্বালা ঠাণ্ডা হয় না। আর ক্ষেতমজুরেরা বছরে দুটো সময় মাত্র কাজ পায়।

বর্ষাকালে ধান পোঁতার সময় আর শীতকালে ধান কাটবার সময়। কিন্তু তাদের মজুরী দিনে মাত্র ছ'আনা। তাতে তাদের পেট ভবে না। আর বছরের বাকী সময়ে তাদের কাজ থাকে না। কিন্তু জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তারা গরীব চাষীদের উপর কি নোংরা অত্যাচার চালায়! কতদিন ধরে অত্যাচার চালিয়ে আসছে। চাষীর ঘরের বৌ-ঝিদের টেনে নিয়ে গিয়ে ওরা ইজ্জত নষ্ট করে, চাষী জুতো পরে কাছারির সামনে দিয়ে গেলে গোঁজে বেঁধে জুতো পেটা করে, সামান্য প্রতিবাদ করলে ল্যাংটা করে গোঁজে বেঁধে চাবুক দিয়ে মারে, জোর করে বেগার খাটায়। কত বলব, আমরা তো প্রত্যেকেই ভুক্তভোগী, বেশি করে বলার তো কিছু নাই। আমরা যেন ওদের কাছে জানোয়ারের সামিল, আমাদের ঘরের বৌ-ঝিদের ওরা বেশ্যা বলে মনে করে। আমরা এতদিন শুধু কেঁদেছি, মন গুমরে মরেছি, সহ্য করেছি আর ভয় পেয়েছি। তাই ওদের অত বাড় বেড়েছে। আমরা ভয় পাই বলেই ওরা সাহস পায়। একবার সুন্দরবনের বাঘের বাচ্ছার মতো রুখে দাঁড়াতে পারলে ঐ খানকিব বাচ্চাবা ভয়ে পালাবে। কিন্তু পালাতে আমরা দোব না, এতদিন যত অন্যায় করেছে ওরা, তার সুদে আসলে শোধ নোব আমরা।'

চীৎকার করে উঠল গণপতি, 'শোধ যদি না নিই বাপে আমাকে জন্ম দেয় নাই, শোধ যদি না নিই আমি মানুষ নই, শোধ যদি না নিই আমাব যেন মরণ হয়।'

মানুষগুলি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে গণপতির কথা শুনতে লাগল। সে ঘরে কোনো শব্দ ছিল না। শুধু গণপতির কণ্ঠস্বর বাজছে বজ্রের গর্জনের মতো।

গণপতি বলেই চলল, 'আর যদি শোধ নিতে হয়, মানুষের মতো যদি বাঁচতে হয় তাহলে আমাদের জোট বাঁধতে হবে, যত শক্ত করে আমরা জোট বাঁধব তত বেশি শক্তি হবে আমাদের। আমরা কী করতে চাই, আমি ভেবেছি। অনেকগুলি বছর ধরে আমি ভেবেছি। তা আমি লেখাপড়া তো জানি না বেশি। আমার একার ভাবনাতে ভুলও থাকতে পারে। আপনারা আমার ভাবনাকে শুধরে দেবেন। আলোচনা করে ঠিক করবেন আমাদের কাজ কেমন করে করতে হবে। আমি ভেবেছি—

১। যারা দিনমজুর তাদের মজুরী দিতে হবে ছ'আনার বদলে ছ'টাকা

ক'রে।

২। ভাগচাষীরা ফসলের তেভাগা দাবি করবে। মানে হলো তিন-ভাগের দুভাগ। চাষীর পরিশ্রম, চাষীর মেহনত, চাষী জমিকে ভালোবাসে নিজের ছেলের মতো। তাই আধাআধি ভাগ আর নয়, তিনভাগের দুভাগ দিতে হবে ভাগচাষীকে।

৩। জমিদার, জোতদারদের কাছে চাষীর যে বকেয়া দেনা আছে তা মকুব করতে হবে।

৪। চাষী তার নিজের খামারে ধান তুলবে।

৫। বাজে আবওয়াব দোব না। কোনো রকম আদায় আমরা দোব না।

৬। এবার থেকে একমন ধান ধার নিলে দশ সের সুদ দোব। আধ মণ সুদ আর দোব না। জোতদার বেশি হৈ হৈ করলে দশ সেরও দোব না, দোব পাঁচ সের।

৭। জোতদার চাষীর মধ্যে কোনো গণ্ডগোল হলে তার বিচার-কমিটি থাকবে। বিচার-কমিটিতে থাকবে চাষীর লোক, জোতদারের লোক আর সরকারী লোক। ছ'জন নিয়ে বিচার কমিটি হবে। দুজন জমিদার-জোতদার প্রতিনিধি, তিনজন ভাগচাষী প্রতিনিধি আর একজন সরকারী লোক।

৮। জমির বড়ো মালিকদের কাছ থেকে তেভাগা তো নোবই তাছাড়া তারা সুদ হিসেবে আর বাজে আবওয়াবের দরুন এতদিন অন্যায় ভাবে চাষার অনেক ধান চুরি করেছে ব'লে চক্রবৃদ্ধি হারে মনে পনের সের করে ধান তার কাছ থেকে কেড়ে নোব।

৯। মূল জমিদারকে লাটদার জোতদাররা মোটে সাত পাই করে খাজনা দেয় বিঘে প্রতি, আমাদের কাছ থেকে আদায় করে তিনটাকা করে, আমরা খাজনা অনেক কম দোব।

১০। প্রতি একশ' বিঘে ভাগের জমির জন্যে দেড় বিঘে জায়গা দিতে হবে ভাগচাষীকে ঘর বাঁধতে।

১১। আর কোনো চাষীর উপর অত্যাচার হবার জো হলে আমরা সবাই মিলে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।

১২। আর আমাদের মধ্যে কাউকে বেকার হয়ে থাকতে দোব না।

সকলকেই কাজ দিতে হবে, সকলেই কাজ করবে।

কিন্তু এসব দাবি আদায় করতে হলে আমাদের একতা চাই। আমাদের শত্রুদের শক্তি অনেক। তাদের দারোয়ান আছে, পাইক আছে, তাদের পক্ষে পুলিশ আছে, ব্রিটিশ গরমেণ্ট আছে, তাদের টাকা আছে। আর আমাদের আছে শুধু মানুষ আর মনের জোর। তাই আমাদের জোট বাঁধতে হবে। সুন্দরবনের সমস্ত চাষীকে কৃষকসমিতির মেম্বার হতে হবে। আমি বলছি, আমাদের দুঃখ কষ্ট শেষ হবেই। তবে লড়াই করতে হবে। আপনারা সকলেই আমাদের মাস্টার। আপনাদের কাছে আমরা শিখব।'

গণপতি সকলের উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার করে বসে পড়ল।

বিশ্বনাথ গণপতির হাতটা নিজের হাতের মুঠিতে নিয়ে বলল, 'বেশ বলেছ, কমরেড!'

বিশ্বনাথের কাছে কমরেড কথাটা আরও দু একবার শুনেছে গণপতি, মানে ঠিক জানে না। আবছা ভাবে কিছু একটা বোঝে। কিন্তু মাঝে মাঝে কথাটা সে নিজেও ব্যবহার করে। ভেবে রাখল গণপতি, মিটিং শেষ হলে কমরেড় কথাটার মানে সে জেনে নেবে বিশ্বনাথের কাছ থেকে।

এরপর সভাপতি কামদেবকে বলতে বললেন।

কামদেব তখনও একেবারেই নতুন। বয়েস তার অল্প। এখনও ব্যাপারটা সে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে নি। কিন্তু তার তরুণ রক্তে আগুন ধরে গেছে। সে আগে কখনও বক্তৃতাও দেয় নি। ভয়ে ভয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'বন্ধুগণ, আমার বিশেষ কিছু বলবার নাই। গণপতিদা যা বলেছে তা খাঁটি কথা বলেছে। এখন আপনারা বিচার করে দেখুন কি করা যায়। তবে এটা আমি বুঝেছি যে, সহ্য করা মানেই মরে থাকা, রুখে দাঁড়ালে তবেই আমরা বাঁচব। আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না।' বলে সে বসে পড়ল।

এরপর সভাপতির ডাকে উঠে দাঁড়াল বিশ্বনাথ।

বিশ্বনাথ বলতে লাগল, 'মাননীয় সভাপতি এবং উপস্থিত চাষী বন্ধুরা, মা ও বোনেরা আজ আমরা যে সভা ডেকেছি এ সভা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে। এ সভা আমাদের আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ। আমাদের প্রথম অঙ্কুর, প্রথম প্রস্তুতি, প্রথম জেগে ওঠা। গণপতি ভাই আপনাদের

কাছে আমাদের কি করা দরকার তা বলেছে, আপনারা আপনাদের মতামত দেবেন। সেই অনুসারে কাজ আরম্ভ হবে। আমি আজ আপনাদের কাছে সুন্দরবনের পুরনো কথা একটু বলব। আগে সুন্দরবনে পর্তুগীজ আর আরাকানী দস্যুরা হামলা করত। তাদের হামলায় নাজেহাল হয়ে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজের স্বার্থরক্ষা করবার জন্যে বন হাসিল করে লোক বসতির ব্যবস্থা করেছিল। ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি তার পেটোয়া জমিদার ইত্যাদি শ্রেণীর লোকেদের নামমাত্র খাজনায় হাজার হাজার বিঘে জঙ্গল-জমি বিলি করে। এই সব জমির মালিকদেরই আমরা লাটদার বা জমিদার বলি। এবং এই জমি লীজ দেওয়ার এই ব্যবস্থাকে লাটদারি ব্যবস্থা বলা হয়। এই লাটদাররা আবার চকদারদের কাছে জমি বিলি করে দিয়েছে। চকদাররা বলেছিল, জঙ্গল হাসিল করে জমি যে চাষের যোগ্য করবে তাকে বিনা খাজনায় কিছুটা জমি দেবে এবং নামমাত্র খাজনায় বাকী জমি দেবে। তা এই জমি পাবার আশায় মেদিনীপুর, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি দূর দূর থেকে ভূমিহীন চাষীরা এসে সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করেছিল। তাদের কেউ কেউ জঙ্গল হাসিল করে কিছু কিছু সামান্য জমি পেয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ চাষীই কিছুই পায় নি। জমি হাসিল করিয়ে নিয়ে চকদার জমিদাররা তাদের লবডঙ্কা ঠেকিয়েছিল। তাদের যা দশা তাই থেকে গেল। তারপর দেশত্যাগী ভূমিহীন চাষীরা সুন্দরবনেই পড়ে থাকতে বাধ্য হলো আর জমিদার জোতদারদের ক্রীতদাস বনে গেল।

আপনারা জানেন ভাগচাষী ধানের অর্ধেক ভাগ পায়। কিন্তু সুন্দরবনে অর্ধেক ভাগ পেলেও সেই ভাগ থেকে জমিদারকে কুড়ি রকমের বাজে আবওয়াব দিতে হয়।

১। দেড়াবার অর্থাৎ জমিদারের কাছে চাষী যত মন ধান ধার নেবে তার দেড়া দিতে হবে সুদেআসলে ২। খামারছিলা ৩। খামার ঘেরা ৪। দারোয়ানি ৫। জমিদারের মেয়ের বিয়ের খরচা ৬। স্কুলের চাঁদা ৭। ঈশ্বরবৃত্তি ৮। কয়ালি, এমনি কুড়ি রকমের আদায় চাষীর ভাগের অর্ধেক ধান থেকে জমিদারকে দিতে হয়। ফলে চাষীকে জমির মালিকের কাছ থেকে ধান ধার করতেই হয়। জমিদার চাষীকে ধান ধার দেবার

সময় দেয় পঁয়ত্রিশ সেরে মন, কিন্তু দেড়াবার নেবার সময় নেয় পঁয়তাল্লিশ সেরে মন। দু'রকম ওজনের বাটখারা জমিদারদের কাছে থাকে। মাঝে মাঝে জমিদাররা ধরাও পড়েছে, কিন্তু তাতে ওদের লজ্জা নাই। ওরা বেহায়া, মানুষের মন ওদের নাই।

চাষীর অর্ধেক ধানের ভাগ থেকে এই সব অন্যায় আদায় কেটে নেয় জমিদার বা জমির মালিক। এ ছাড়া জমির উপর ভাগচাষীর কোনো দাবি নাই, যখন খুশি তাকে উচ্ছেদ করতে আরে জমিদার। এবং উচ্ছেদ করে মিথ্যা ঋণে জড়িয়ে। মামলা ক'রে ডিক্রি নেয়। কমরেডস্, তাই আজ থেকে আমাদের শ্লোগান হবে—

১। দেড়াবার বন্ধ কর
২। বাজে আবওয়াব বন্ধ কর
৩। চাষীকে বেআইনী উচ্ছেদ করা চলবে না।
৪। তেভাগা চালু করতে হবে
৫। প্রাণ দোব তো ধান দোব না
৬। জমিদারি ব্যবস্থা নিপাত যাক
৭। ভাগচাষীকে জমির স্বত্ব দিতে হবে
৮। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'

এই বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বনাথ বসে পড়ল। অনেকক্ষণ সভা একেবারে নির্বাক রইল। তারপর ধীরে ধীরে গুঞ্জন জেগে উঠল।

বিশ্বনাথ সভাপতিকে বলল, 'আপনি জিজ্ঞাসা করুন কারও কিছু বলবার আছে কিনা। সবাই যেন মন খুলে কথা বলে।'

সভাপতি বললেন, 'যদি কারও কিছু বলবার থাকে বলো।'

একজন বৃদ্ধ বসেই বলল, 'এ যা বললে তোমরা, এতো খুব খাঁটি কথা, শুধু সহ্য করলে কিছু হবে নি। দল বাঁধতে হবে। সবাইকে কৃষক-সমিতির লোক হতে হবে।'

অন্যান্য কয়েকজন বুড়োকে সমর্থন করে বলে উঠল, 'ঠিক কথা, ঠিক কথা!'

আর একজন বলল, 'আলাদা আলাদা ভাবে থাকলে হবে নি, একসঙ্গে মিলতে হবে, তাহলেই আর ভয়ের কিছু থাকবে নি।'

ধীরেন প্রামাণিক নামে একজন চাষী উঠে বলল, 'আমার একটা কথা বলবার ছিল।'

সভাপতি বললেন, 'বলো, কী কথা'

সে বলল, 'আমি বলি কি, দাবিগুলো তো খুব ভালোই হয়েছে। কিন্তু যারা জমির মালিক তারা কেনে তেভাগা দেবে? যাদের জমি তারা যদি না দেয় তাহলে আমাদের তো বলবার কিছু নাই। জমি তো আর চাষীর লয় যে, সে তেভাগা চারভাগা যা খুশি তাই চাইবে।'

গণপতি বলে উঠল, 'তাহলে তুমি কি করতে বলো ধীরেন?'

ধীরেন বলল, 'আমি বলি কি, ওসব ঝামেলায় গিয়ে কাজ নাই। আমরা ববং জমিদারদের বলি যে বাজে আবাবগুলো ক্ষেমা করে দেন।'

মাখন বলে উঠল, 'অমনি জমিদার ধম্মপুত্র হয়ে বাজে আবাব নেওয়া বন্ধ করে দেবে। তুই তো আচ্ছা দালাল রে!'

ধীরেন তর্ক না করে নতি স্বীকার করে বলল, 'তাই বলছিলাম।'

আর একজন চাষী বলে উঠল, 'তা বলবে কেনে হে, চাষীরা এতদিন কি জমিদারের কাছে কাকুতিমিনতি ক'রে বাজে আবাব ক্ষমা করতে বলে নাই, তা কোন জমিদারটা কথা শুনেছে বাপু, উল্টে গোঁজে খুঁটিতে বেঁধে চাবুক দিয়ে পিঠ কেটে ফালা ফালা করে দিয়েছে।'

নায়েব মহিমঘোষের পেয়ারের ভাগচাষী সহদেব মাইতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি গণপতির একটা কথার জবাব দিতে চাই।'

গণপতি তাকিয়ে দেখল সহদেবকে। সহদেবকে দেখলেই গণপতির কেমন যেন খারাপ লাগে। লোকটাকে কেমন যেন নোংরা আর বদমাশ বলে মনে হয় ওর। ওকে দেখলেই গাটা কেমন যেন ঘেন্নায় ঘুলিয়ে ওঠে। গণপতি ভেবে পেল না, সহদেবকে এই মিটিংয়ের খবর কে দিল। ওকি কোনো রকমে খবর পেয়ে এমনিই এসেছে গুপ্তচরের কাজ করতে।

সহদেব বলতে লাগল, 'গণপতি বলল জমিদার, জোতদার, নায়েব নাকি চাষীদের ঘরের বৌ-ঝিদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করে। আমি বলব অনেক তো চাষী আছে সুন্দরবনে, ক'জনার বৌ-ঝিদের দিকে নজর দিয়েছে নায়েবরা? যারা নষ্ট মেয়ে-মানুষ, নায়েবদের কাছে শুতে যায় তারা তো বেশ্যা। বেশ্যাকে আবার নষ্ট করার কি আছে?'

বিশ্রী একটা অবস্থার সৃষ্টি হলো।

কামদেব বলে উঠল, 'তোমার বাড়ীর বৌ-ঝি ঠিক থাকলেই ভালো সহদেব, তাদের একটু সামলে রেখো, নাকি এর মধ্যেই বোধহয় নায়েব বাবুর পেসাদ করে নিয়েছিস?'

রাগে কুকুরের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক ক'রে উঠল সহদেব, 'বানচোত, তোর যতবড় মুখ লয় ততবড় কথা, জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দোব বলছি।'

গণপতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সহদেব এটা মিটিং, মুখ খারাপ করবার জায়গা লয়, তুমি বাড়ী যাও। এখানে দাঁড়িয়ে চেঁচামিচি করো না।'

'বাড়ী তো যাবই, এ শালার মিটিংয়ে থাকছে কে? ভাবি আমার ইয়ের মিটিংরে, মিটিং মারাতে এয়েছে।' বলতে বলতে সহদেব ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

তখন বিশ্বনাথ উঠে বলল, 'তাহলে বন্ধুগণ, কৃষকসমিতির সভ্য হতে আপনাদের কারও আপত্তি নেই তো? যদি কারও আপত্তি থাকে হাত তুলে জানান।'

কোনো হাত উঠল না।

তখন বিশ্বনাথ আবার বলল, 'কৃষক-সমিতিকে বছরে দুপয়সা চাঁদা দিতে হবে। নানান রকম কাজকর্ম আছে। যাঁরা পারবেন, এখন চাঁদা দিয়ে যান। আর সবাই নাম দিয়ে যান। আর চাঁদা দিয়ে চেকমুড়ি নিয়ে নেবেন।'

অনেকেই চাঁদা দিল। রসিদ কেটে নিল গণপতির কাছ থেকে। যারা পয়সা দিতে পারল না তারা নাম দিয়ে গেল, পরে চাঁদা দেবে বলে গেল।

একে একে সবাই বিদায় নিল, রইল শুধু নেতৃস্থানীয় মানুষগুলি।

গণপতি লক্ষ করল মোহিনী তখনও একা বসে আছে।

গণপতি বিশ্বনাথদের বলল, 'তোমরা একটু বসো, আমি আসছি।'

বিশ্বনাথ বলল, 'ফিরে আসবে কিন্তু, অনেক কথা আলোচনা করবার আছে।'

গণপতি মোহিনীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি একা বসে রইলে যে, খোকা গেল কোথায়?'

মোহিনী বলল, 'খোকা ঘুমিয়ে পড়েছিল, আমি ওকে সীতাপজিকে

দিয়ে পাঠ্‌টে দিয়েছি।'

'চলো তোমাকে বাড়ী দিয়ে আসি।'

মোহিনী উঠে দাঁড়াল।

গণপতি মোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বাইরে গেল। সেই বাড়ীর এলাকাটুকু পেরিয়ে মাঠের পথে পড়ল তুজনে। কোজাগরী পূর্নিমার উজ্জ্বল আলোয় চারদিকে যেন ভেসে যাচ্ছে। আকাশ যেখানে মাটিতে মিশেছে ততদুর পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছে যায়। রহস্যভরা আলোর বানে থৈ থৈ করছে সারা মাঠ, ঝিলমিল করছে শিশিরভেজা ঘাস, শিশিরভেজা গাছের পাতাগুলি। মোহিনীর কোমরে হাত বেষ্টন করে ধরে গণপতি চলতে লাগল।

মোহিনী বলল, 'তুমি আজ তিনদিন হলো বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছ, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমার দিনরাত কাটছে না। রাতে ঘুমোতে পারি না, মুখে ভাত রোচে না।'

গণপতি নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ পথ চলার পর বলল, 'আমি তোমার কাছেই আছি মোহিনী। তুমি সারাক্ষণ আমার মনের মধ্যে থাকো। কোথায় যাব? আবার শীগ্রি তোমার কাছে ফিরে যাব। আমি ভুল বুঝেছিলাম। তোমাকে ছেড়ে আমিও থাকতে পারব না।'

তুজনে ভরা-গঙ্গার মতো টৈ-টুম্বুর মন নিয়ে জড়াজড়ি করে মাঠের সেই জনশূন্য পথ ধরে হেঁটে চলল। কচি ধানের উপর বাতাসের হিল্লোল বইছে আর সেই ঢেউয়ের উপর জ্যোৎস্নার কল্লোল বয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সারামাঠে যেন পরীরা ছুটোছুটি লাগিয়েছে, চাঁদের আলোয় মাটিতে গাছ-পালার শাখাপ্রশাখার সুন্দর ছায়া পড়েছে, তাও দেখতে হয় মুগ্ধ হয়ে।

মোহিনী আবার বলল, 'আমি তোমাকে ছেড়ে একটা দিনও থাকতে পারব নি। তুমি মানুষের মধ্যে ঘুরতে চাও ঘোরো, কিন্তু বাড়ীতে আর থাকবে নি, তা বোলো না। আমি তোমার আসার অপেক্ষায় দিনরাত বসে থাকব। তুমি আমার কাছে এসো।'

গণপতি হঠাৎ মোহিনীকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে বলল, 'তাই হবে গো মেয়ে, অত ভয় কোরো না। আমি তোমারই থাকব। বাড়ী ছেড়ে কোথায় যাব? বাড়ীতেই থাকব আমি।'

মুগ্ধ সুখে মোহিনীর মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠল। নিজের বাড়ীতে মোহিনীকে পৌঁছে দিয়ে গণপতি বলল, 'কালকেই হয়তো ফিরে আসব।' বলে বিদায় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আবার মিলাতে গেল।

গণপতি ঘরে ঢুকতেই বিশ্বনাথ বলল, 'এসো গণপতি, তোমার জন্যেই আমরা আলোচনা আরম্ভ করতে পারছি না।'

গণপতি এসে বসল।

বিশ্বনাথ বলল, 'আজকেই আমাদের কাজের ছক ঠিক করে নিতে হবে।'

গণপতি দেখল নেতৃস্থানীয় সবাই উপস্থিত আছে। সাধুচরণ, বিশ্বনাথ, সাগর, বিহারী, কামদেব, ইন্দ্র, অভিমন্যু, সতীশ, নিবারণ, বিষ্ণুপদ, ফরমান শেখ, সুবল হাঁসদা, বেণুপদ, অর্জুন, বীরচন্দ্র, নরেন, সিন্ধু, অজয়, শ্রীচরণ, নৃপতি, কেষ্ট, সুধীর, শম্ভু, যোগেশ, শিবনাথ ছাড়াও আছে ভারত, বলরাম কাজলী, নিতাই মণ্ডল।

অভিমন্যু গণপতিকে জিজ্ঞাসা করল, 'গণদা, তুমি কী ঠিক করেছ বলো।'

গণপতি বলল, 'তার আগে আমি বিশ্বনাথের কাছে একটা কথা জানতে চাই।'

বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'বিশ্বনাথ, কমরেড মানে-কি ?'

বিশ্বনাথ বলল, 'কমরেড মানে বন্ধু, সাথী। কিন্তু কেবলমাত্র সংগ্রামের সাথীকেই বলা হয় কমরেড। সংগ্রামী বন্ধুরা পরস্পরকে কমরেড বলে ডাকে।'

'এটা কোথাকার কথা ?'

'এ রাশিয়ার কথা। কমিউনিস্টরা পরস্পরকে কমরেড বলে ডাকে। এখন থেকে আমরাও প্রত্যেকে প্রত্যেককে কমরেড বলব।'

গণপতি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, 'তাহলে আমি প্রথমে তোমাকে কমরেড বলে ডাকি।'

'ডাকো !'

সবাই অল্প হেসে উঠল।

গণপতি বলল, 'কমরেড বিশ্বনাথ, আমার কিছু কিছু পড়তে ইচ্ছে করে, বই পাব কোথা ?'

বিশ্বনাথ বলল, 'এই কথাটাই আমি তোমাকে বলব ভাবছিলাম কমরেড। আমাদের পার্টি হচ্ছে শ্রমিক কৃষকের পার্টি। আমাদের পার্টির দুখানা বাংলা কাগজ আছে। 'জনযুদ্ধ' আর 'স্বাধীনতা'। স্বাধীনতা বেশি দিনের কাগজ নয়। সবে ১৯৪৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন থেকে বার হচ্ছে। এই কাগজদুটো নিয়মিত তোমাকে চেষ্টা করে পড়তে হবে।'

গণপতি উল্লসিত হয়ে বলল, 'তুমি আমাকে কাগজ দিও। আমি দাম দোব। আমি পড়তে চাই, না পড়লে অনেক কিছু আমি বুঝতে পারি না।'

বিশ্বনাথ ওর সাইড-ব্যাগ থেকে একখানা 'জনযুদ্ধ' আর একখানা 'স্বাধীনতা' বার করে গণপতির হাতে দিল। গণপতি পরমযত্নে কাগজ দুখানি ভাঁজ করে নিজের কাছে রাখল।

অভিমন্যু আবার তাগিদ দিল গণপতিকে, 'গণদা তুমি কী ভেবেছ বলো'

গণপতি বলল, 'বলছি'

বলে চোখ বন্ধ করে একটুখানি সময় সে নির্বাক হয়ে রইল।

তারপর বলল, 'এখন কিছুদিন আমরা যদি দিনের বেলা জনসভা আর রাতের বেলা বৈঠকীসভা করি তাহলে আমাদের কথা সব চাষীকে জানানো যাবে। আর অনেক চাষীকে আমরা কৃষকসমিতির মেম্বার করতে পারব।'

ইন্দ্র প্রশ্ন করল, 'তারপর?'

গণপতি বলল, 'তারপর আমরা আগামী ধানকাটার মরসুমে ক্ষেত-মজুরদের জন্য দিনে দু আনার জায়গায় দু টাকা মজুরী চাইব।'

সাধুচরণ বলল, 'জমির মালিক বা ভাগচাষীরা দু টাকা মজুরী দিতে রাজী হবে কেন?'

'ধানকাটার আগেই আমরা এই দাবি রাখব, রাজী না হলে ক্ষেত-মজুররা স্ট্রাইক করবে, ধানকাটা বন্ধ থাকবে।'

রেণুপদ বলল, 'তাহলে অন্য দাবিগুলো কবে চাওয়া হবে।'

গণপতি বলল, 'ধান মাঠে যখন কাটা পড়ে থাকবে তখনই তেভাগা চাইব, ভাগচাষীর খামারে ধান তোলার দাবি করব, আর তখনই লড়াই লেগে যাবে।'

একটু থেমে গণপতি বলল, 'কিন্তু একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, মধ্যবিত্ত বা ছোটো জোতদারদের কাছে আমরা তেভাগা চাইব না। কেননা তাহলে তাদের সংসার চলবে না।'

সাগর বলল, 'তাতে পক্ষপাতিত্ব করা হবে না?'

বিশ্বনাথ বলল, 'না, তাতে পক্ষপাতিত্ব হবে না। বরং তা না করলে ভাগচাষীদেরই ক্ষতি হবে। মধ্যবিত্তরা শত্রু হয়ে যাবে। মধ্যবিত্তদের শত্রু করলে হবে না। তাদেরও আমাদের কৃষক-সমিতির মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা করতে হবে।'

গণপতি বলল, 'হয় তো সব মধ্যবিত্ত আমাদের দলে আসবে না। তবে অনেকেই আসবে। মধ্যবিত্তদেরও আমাদের দলে নিতে হবে। কারণ মধ্যবিত্তরা অত্যাচারী নয়, তারা চাষীদের বিশেষ ক্ষতি করে না, চাষীদের সঙ্গে তাদের বরং দাদা ভাই এসব সম্বন্ধ পাতানো থাকে। আর মধ্যবিত্তরাও কোনোরকমে ধানের উপর ভরসাটুকু করে সংসার চালায়। তাই আমার মনে হয়, মধ্যবিত্তদের অনেকেই কৃষক পার্টিতে যোগ দেবে। মধ্যবিত্তরা জমিদার, নায়েব, গোমস্তার অত্যাচারের ভয়ে কাঁপে।'

বিহারী বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, গণদা ঠিকই বলেছে, মধ্যবিত্ত বা ছোটো জোতদারদের আমাদের দলেই রাখতে হবে।'

বিশ্বনাথ বলল, 'বিহারী, তোমাদের বুঝি বিষেকয়েক জমি আছে না?'

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

সাধুচরণ বলল, 'আচ্ছা, আর একটা জিনিস মনে আছে তো?'

বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলো তো?'

সাধুচরণ বলল, 'লীগ সরকার নাকি শীঘ্রি সেটেলমেণ্ট আরম্ভ করবে। পার্টি বলেছে, ভাগচাষীরা যাতে সেটেলমেণ্টের সময় নিজের নিজের নাম ভাগচাষী হিসেবে রেকর্ড করে নেয় তার জন্যে চাষীদের কাছে প্রচার করে দিতে হবে।'

বিশ্বনাথ বলল, 'ঠিক, ঠিক কথা, যাতে ভাগচাষীরা নিজেদের নামে সেটেলমেণ্টের সময় রেকর্ড করায় সে ব্যবস্থা করতে হবে; চাষীদের ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে হবে।'

নরেন জিজ্ঞাসা করল, 'কিভাবে জানানো হবে।'

সাধুচরণ বলল, 'কেন, প্রচারপত্র, হ্যাণ্ডবিল বিলি ক'রে, হাটেবাজারে ঢোল-শোহরত করে চাষীদের কাছে প্রচার করতে হবে, মিটিংগুলোতে বলে দিতে হবে।'

বিশ্বনাথ বলল, 'আরও একটা ব্যাপার আছে।'

সকলে উৎসুক হয়ে বিশ্বনাথেব কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

বিশ্বনাথ বলল, 'লীগসরকারের রেভিনিউ মিনিস্টার বিধানসভায় একটা বিল ইনট্রোডিউস কবেছেন। সেই বিলে বিধান আছে যে, ১৩৫৩ সালের মানে ১৯৪৬ সালের উৎপন্ন ফসল বর্গাদার পক্ষ নিলে সে ফসল তার হয়ে যাবে।'

সকলে অবাক হয়ে বিশ্বনাথের কথা আরও শুনবার জন্যে অপেক্ষা করে রইল।

বিশ্বনাথ বলল, 'ভাগচাষীদের কাছে একথাও জানিয়ে দিতে হবে। আব এই স্লোগান চালু করতে হবে 'লাঙ্গল যার জমি তার', কেননা লাঙ্গল দিয়ে চাষী জমি চষে। সেই জমিকে সন্তানেব মতো ভালোবেসে, পালন কবে, জমিতে রক্তজলকরা পরিশ্রম ঢালে। জমির উপব সেই চাষীর স্বত্ব কায়েম কবতেই হবে। তারই স্লোগান হচ্ছে 'লাঙ্গল যার জমি তাব।"

এমনি কবে অনেক বাত্রি পর্যন্ত আলোচনা চলল। সিদ্ধান্তগুলিকে নানান দিক থেকে বিচাব কবা হলো। এবং অবশেষে কার্যসূচী তৈরি কবা হলো। ঠিক হলো:

১। কৃষকসমিতিব নেতারা কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় এক এক গ্রুপ জনসভা করবে।

২। এবং রাত্তেব বেলা বৈঠকী মিটিং করবে।

৩। প্রত্যেক গ্রুপের একজন করে প্রধান থাকবে।

৪। ঢোল-শোহরত করে এবং প্রচারপত্র বিলি করে হাটে মাঠে গ্রামে প্রচার করা হবে যে, আগামী সেটেলমেণ্টে ভাগচাষী যেন তার নামে রেকর্ড করায়।

৫। ভাগচাষী যেন আগামী ধানকাটা মরসুমে ফসলের উপর দখল রাখে, তাহলে ফসল তারই হয়ে যাবে। লড়াই করে ফসল দখলে রাখতে

হবে।

৬। রাত্রের বৈঠকী মিটিংগুলিতে চাষীদের বল্লম, লাঠি, তীর, কাঁড়, টাঙ্গি ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে বাহিনী তৈরি করতে প্রেরণা দিতে হবে। কেননা ধানের উপর দখল রাখতে গেলে তাদের লড়তেই হবে।

৭। আগামী ধানকাটা মরশুম আরম্ভ হবার ঠিক আগেই ক্ষেত-মজুররা দু আনার জায়গায় দু টাকা মজুরী দাবি করে ধর্মঘট করবে।

৮। ধানকাটা হয়ে গেলে ভাগচাষীরা ধান নিজের নিজের খামারে তুলবে। পারলে ধানের উপর সম্পূর্ণ অধিকার রাখবে। আর তা সম্ভব না হলে তিনভাগের দু ভাগ কেটে নিয়ে এক ভাগ জমির মালিককে দেবে, যদি জমির মালিক ধান প্রাপ্তির রসিদ লিখে সই করে দেয়।

৯। কোনো রকম বাজে আবওয়াব দেওয়া হবে না।

১০। ঋণ বাবদে বহু ধান জোতদাররা অনেক বছর ধরে আদায় করেছে ব'লে চাষীদের বকেয়া দেনা মকুফ বলে গণ্য করা হবে। বরং বেশী জমির মালিকদের কাছ থেকে মনপ্রতি পনের সের করে ধান আদায় করা হবে, কেননা তারাই ভাগচাষীদের কাছে ঋণী হয়ে আছে বহুকাল থেকে ভাগচাষীদের কাছ থেকে অন্যায় ভাবে দেড়াবার (অর্থাৎ একমন ধান ধার দিয়ে আধমন সুদসহ দেড়মন) আদায় করেছে ব'লে।

সে রাত্রে ঐ বাড়ীতেই ওদের খাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। আলুসেদ্ধ আর মৌরলা মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে একসঙ্গে বসে বিড়ির ধূমপান করে ঐ ঘরেই ওরা শুয়ে পড়েছিল।

ইন্দ্র গণপতিকে ঠাট্টা করেছিল, 'বৌদি তোমার জন্যে জেগে আছে গণদা।'

গণপতি বলেছিল, 'সত্যিই ও জেগে আছে ইন্দ্র।'

ইন্দ্র বলল, 'তা জানি, বৌদি আমার সতীসাবিত্রী।'

ঘুমের অসুবিধা হবে বলে আলো নিভনো ছিল। গণপতি শুয়ে শুয়ে মোহিনীর কথা ভাবছিল। মোহিনীর মিষ্টি মুখ, মধুর ব্যবহারের কত মণিমাণিক্য স্মৃতি ওর মনে ঝিকমিকিয়ে উঠছিল। বন্ধুরা সব ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাদের ছন্দিত নিঃশ্বাসের গাঢ় শব্দ শুনছিল গণপতি। মোহিনীর কথা ভাবতে ভাবতে সহসা লক্ষ্মীর কথা জেগে উঠেছিল মনে।

লক্ষ্মীকে কখনই ও ভুলতে পারে না। আজও লক্ষ্মীর অন্তর্ধানটা ওর কাছে রহস্য হয়েই রইল। লক্ষ্মীকে কখনই ভুলবে না, কিন্তু কোনো কোনো সময়ে এত উগ্রভাবে তার স্মরণ মনে জেগে ওঠে যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে গণপতি। হাহাকার করে ওঠে সমগ্র অনুভূতি, হাহাকার করে ওঠে সারাটা জীবন। সান্ত্বনার অবলম্বন যেন মেলে না। বড়ো অসহায় মনে হয় নিজেকে। এ জীবনে আর কি সে দেখতে পাবে না লক্ষ্মীকে! লক্ষ্মীর কথা মনে পড়ায় ঘুম বিদায় নিল ওর চোখ থেকে। কত নিদ্রাহীন উদ্ভ্রান্ত রাত্রি ওর ভোর হয়েছে লক্ষ্মীর কথা ভেবে! এমনি সময়ে মোহিনী কাছে না থাকলে কষ্ট হয়। মোহিনী ওর শরীরের আবেশে, ওর সুরেলা কথার ঝঙ্কারে, ওর আঙুলের স্পর্শের যাদুতে সব হাহাকার ভুলিয়ে দেয়।

॥ ৩১ ॥

গণপতি এখন সারাদিন গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে মিটিং করে বেড়াতে লাগল। প্রত্যেক গাঁ থেকে ডাক আসত মিটিং করবার জন্যে। ধানকাটা মরসুম তখনও শুরু হতে অনেক দেরি ছিল। তাই সকালবেলাতেও বৈঠকী মিটিংয়ের আয়োজন করা যেত। বিকেলের দিকে হতো কোনো মাঠে জনসভা। আবার সন্ধের পর হতো বৈঠকী মিটিং। প্রায়ই গণপতি বাড়ী ফিরতে পারত না। রাত্রে মিটিং করতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে যেত। সেইখানেই গাঁয়ের লোক খেতে দিত, শোবার ব্যবস্থা করত। ওরা কৃষক-সমিতির কেন্দ্রীয় অফিস করল লয়ালগঞ্জে। তার কারণ লয়ালগঞ্জ এই এলাকার মধ্যবর্তী গাঁ আর লয়ালগঞ্জের কর্মীর সংখ্যা বেশি। নিয়ম করা হলো, সপ্তাহের একটা দিন কৃষকসমিতির নেতৃস্থানীয় সভ্যরা সবাই অফিসে মিলিত হবে, নিজেদের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করবে, ভুলত্রুটি নিয়ে আলোচনা করবে।

তারপর নিজেদের মধ্যে অনেক মিটিং করেছিল ওরা। এবং বিভিন্ন গ্রামে মিটিং করে করে ক্রমশই ওদের বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। ওদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলি আরও নিখুঁত হয়ে উঠল। ওরা প্রধানভাবে বারোটি পরিকল্পনা গ্রহণ করল:

১। কৃষক-সমিতির মধ্যে কৃষকদের সংগঠিত করা

২। জমিদারদের সমস্ত ক্ষমতার উচ্ছেদ

৩। কৃষকদের সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলা

৪। মেয়েদের উপর সমস্ত রকম অত্যাচার বন্ধ করা

৫। রাজনৈতিক বিক্ষোভের বিস্তার

৬। ঈশ্বরকে ডেকে হা হুতাশ বন্ধ করা

৭। কৃষকদের বদ অভ্যাস বন্ধ করা

৮। দস্যুবৃত্তি (চুরি ডাকাতি) নির্মূল করা

৯। বাজে আবওয়াব ও ঋণের বিলোপ

১০। সাংস্কৃতিক আন্দোলন

১১। রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ

১২। বিশ্বাসঘাতক ও দালালদের ধ্বংস করা

অনেক রাত পর্যন্ত মিটিং ইত্যাদি করেও গণপতি চেষ্টা করত কিছু পড়াশুনো করতে। ছেলেবেলাতে সামান্য কিছু বাংলা লেখাপড়া সে শিখেছিল ; রামায়ণ, মহাভারত পড়তে পারত। কিন্তু এই সুন্দরবনে এসে অনেকদিনের চর্চার অভাবে প্রায় সবই ভুলে গিয়েছিল। নতুন করে বাংলা বর্ণমালা আর যুক্তাক্ষরের সঙ্গে ও পরিচিত হতে লাগল। 'জনযুদ্ধ', 'স্বাধীনতা' এবং বাংলা অনুবাদে লেনিন ও স্ট্যালিনের কিছু কিছু বই সে পড়াশুনো করবার চেষ্টা করত।

সমস্ত সুন্দরবন ঘুমোত আর প্রদীপ জ্বেলে তারই স্নিগ্ধ অল্প আলোতে সে সংবাদপত্র এবং বইগুলির অর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টা করত। প্রথম প্রথম কিছুই বুঝতে পারত না। লেনিনের ক্ষুদ্র 'রাষ্ট্র' বইটি পড়তে গিয়ে দেখল সমস্ত ব্যাপারটাই ওর কাছে কেমন যেন দুর্বোধ্য এবং অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। গণপতি ভাবত, ভাষা কি খুব কঠিন ? তা খানিক কঠিন বৈকি। এ ভাষাতে তো চাষীরা কথা বলে না। চাষীদের ভাষা খুবই সহজ সরল, একটু হয়তো সাদামাটা। কিন্তু সেই ভাষার মানেই ওরা সহজে বোঝে। চাষীদের ভাষাতে কি চাষীদের জন্য বই লেখা যায় না ? তাহলে অনেক সহজে তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারে। কিন্তু সহজে হাল ছাড়তে রাজী হলো না গণপতি। বিশ্বনাথের কাছে বারংবার জিজ্ঞাসা

করে করে প্রতিটি লাইনের মানে নিখুঁত ভাবে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল ও। কিন্তু মুস্কিল হয়েছিল এই যে, বিশ্বনাথ কমিউনিস্ট পার্টির লোক হয়েও সব জিনিস স্পষ্ট ভাবে বুঝত না, গণপতিকে ঠিকমতো বোঝাতে পারত না।

তাই কৃষকসমিতির মিটিংয়ে গণপতি প্রস্তাব করল, 'কলকাতা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির লোকেদের আনিয়ে আমাদের একটু পড়াশুনোর ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।'

গণপতি আরও বলল, 'দিন দিন কৃষকসমিতির মেম্বার অনেক বেড়ে যাচ্ছে। সমস্ত সুন্দরবনের মানুষই কৃষকসমিতির সভ্য হয়ে যাবে। সবাই যদি আমাদের কাগজপত্র একটু পড়তে পারে তাহলে ভালো হয়। যদি সব সভ্যকে বাংলা লেখাপড়া শেখাবার একটু ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে খুব ভালো হয়।'

গণপতির প্রস্তাব কৃষকসমিতি গ্রহণ করল। তারপর থেকে কলকাতা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা আসতেন। গাঁয়ে গাঁয়ে সান্ধ্য স্কুলও খোলা হলো। কমিউনিস্ট পার্টি শহর থেকে ছাত্রদের পাঠাতো স্কুলগুলি চালাবার জন্যে। এমনি, শহর থেকে দুটি একটি মেয়েও আসতে লাগল চাষী মেয়েদের বাংলা লেখাপড়া শেখানোর জন্যে।

হাটে হাটে গ্রামে গ্রামে কৃষকসমিতি ঢোল-শোহরত করে প্রচার-পত্র ছড়িয়ে প্রচার করতে লাগল, এ বছর চাষী যদি ধানের উপর দখল রাখে তবে ধান তার হয়ে যাবে, গভর্ণমেন্ট বলেছে। আর শীঘ্রি সেটেলমেণ্ট হবে, সেই সেটেলমেণ্টে ভাগচাষী যেন তার নামে জমি রেকর্ড করিয়ে নেয় তাহলে ভাগচাষীকে আর যখন তখন জোতদাররা উচ্ছেদ করতে পারবে না। গাঁয়ে গাঁয়ে পোস্টারও লাগিয়ে দিল কৃষকসমিতি, 'এ বছর ধানের উপর দখল রাখো। আগামী সেটেলমেণ্টে ভাগচাষী নিজের নামে জমি রেকর্ড করিয়ে নাও।'

আরও পোস্টার দিল কৃষক সমিতি

চাষীদের দাবী মানতে হবে :

১। ক্ষেতমজুরকে দৈনিক দু টাকা মজুরী দিতে হবে।

২। ভাগচাষীকে তেভাগা দিতে হবে

৩। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক

৪। বিনা খেসারতে জমিদারি-ব্যবস্থা উচ্ছেদ করতে হবে

৫। সমস্ত চাষী কৃষকসমিতির সভ্য হও

৬। কৃষকদের সমস্ত অন্যায় ঋণ মকুফ কবতে হবে

৭। বাজে আবওয়াব বন্ধ কর

৮। চাষী তোমার নিজের খামারে ধান তোলো

৯। কৃষকসমিতির শক্তিকে জোরদার করো

১০। চাষীদের উপর খাজনার বোঝা কমাতে হবে

১১। যে কোন অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত চাষী রুখে দাঁড়াও

১২। বেড়াবার বন্ধ কর

১৩। চাষীকে বেআইনী উচ্ছেদ কবা চলবে না

১৪। ভাগচাষীকে জমির স্বত্ব দিতে হবে

১৫। সমস্ত চাষী সান্ধ্য স্কুলে লেখাপড়া শেখো। চাষীদের মদ খাওয়া, চুরি কবা, মেয়েদের উপব অত্যাচার করা বন্ধ করতে হবে।

ক্রমশ কৃষকসমিতিব কাজ অনেক বেড়ে যেতে লাগল। মেম্বারদেব নাম লিখে বাখবাব ছ'খানা খাতা তৈরি হলো। একটা যাবা কৃষকসমিতির ভালো মেম্বাব তাদেব খাতা—অর্থাৎ যারা ক্ষেতমজুব, গবীব চাষী এবং ভাগ চাষী। আব একখানা খাতা বাখা হলো, তাতে লেখা হত সেই সব লোকেদেব নাম যাবা ধনী কৃষক, ছোটো জোতদার, মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক এবং যাবা সন্দেহভাজন লোক। ঠিক হলো, এখন কৃষকসমিতিব গবীব সভ্যদেব কাছ থেকে বছরে ছ'পয়সা চাঁদা নেওয়া হবে, কিন্তু অবস্থা যাদেব ভালো সেই সব চাষীব কাছ থেকে আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী ধান নেওয়া হবে কৃষক সমিতির চাঁদা হিসেবে।

কৃষকসমিতিকে সান্ধ্য স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে হতো, কৃষকসমিতির সৈন্যবাহিনী তৈরি করবার দায়িত্ব পালন করতে হতো, প্রতিদিন বাত্রে ও দিনে বৈঠকী মিটিং, জনসভা চালাতে হতো, পোস্টার লিখবার এবং গাঁয়ে গাঁয়ে হাটে হাটে সেঁটে বেড়াবার কাজ করতে হতো। এছাড়াও কৃষকদের আর্থিক সাহায্য করবার জন্যে একটা ফাণ্ড খুলতে হলো এবং সাহায্য দেবার আগে অনুসন্ধান বিভাগও রাখতে হলো। এবং বিচারের

দায়িত্বও এসে পড়ল কৃষকসমিতির উপর। পারিবারিক সমস্যা এবং অন্যান্য অজস্র দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে হতো কৃষকসমিতিকে।

এত রকম কাজ কর্মের দায়িত্ব এসে পড়ার জন্যে এবং আগামী ধানকাটা মরসুমের সময় যে আন্দোলনের পরিকল্পনা আছে তাকে নিখুঁতভাবে কার্যকরী করার জন্য কৃষকসমিতি একটা মিটিং ডাকল।

বিশালাক্ষী থানের নির্জন মাঠে দুপুর বেলায় এই মিটিং বসল। চারিদিকে গাছপালা থাকাতে ছায়ার অভাব ছিল না সেখানে। মাঝখানে মাটি দিয়ে তৈরী একটা উঁচু বেদির চারদিকে কৃষকসমিতির সভ্যরা ঘিরে বসল। সে সভায় লোক হলো প্রায় হাজার দুয়েক। মেয়েরাও অনেকেই যোগদান করল সে সভাতে। সভার সভাপতি হলেন কলকাতা থেকে আগত কমিউনিস্ট নেতা বৃন্দাবন ঘোষ।

বৃন্দাবন ঘোষ বললেন, 'কৃষক সমিতির উপর অনেক দায়িত্ব এসে পড়েছে ব'লে এক একটা কাজের জন্যে এক একজন সদস্যের উপর প্রধান দায়িত্ব আমরা দিতে চাই। কাকে কোন দায়িত্ব দেওয়া হবে তা ঠিক করে দেবেন এখানে সমবেত সমস্ত সদস্যরা। আমরা আপনাদের ভোট নিয়েই তা ঠিক করব। আমরা কৃষকসমিতির পক্ষ থেকে একটা তালিকা তৈরি করেছি। দেখুন সেটা আপনাদের পছন্দ হয় কিনা।'

বৃন্দাবন একটা কাগজ থেকে পড়ে যেতে লাগলেন:

১। সভাপতি: কমিউনিস্ট নেতা শ্রীকৃষ্ণ হালদার।

২। সাধারণ সম্পাদক: গণপতি হালদার।

৩। মিটিং সম্পাদক: সাধুচরণ মাইতি, তিনি মিটিংয়ের দিন সময় এগুলি ঠিক করবেন।

৪। রাত্রের বৈঠকী মিটিং সম্পাদক: বিহারীলাল ঘড়ুই, তিনি রাতের বৈঠকী মিটিংয়ের তারিখ সময় ঠিক করবেন।

৫। কোষাধ্যক্ষ: বিশ্বনাথ মাইতি, তাঁকে সাহায্য করবেন রমেন বারুই, কেষ্ট দিন্দা, শিবেন মণ্ডল, আর সুখেন শি

৬। বিচার-বিভাগের সম্পাদক: সাগর জানা, তিনি বিচারের বিষয় এবং সময় লিখে রাখবেন, অবশ্য সকলের সঙ্গে পরামর্শ করেই বিচার করবেন।

৭। সৈন্যবাহিনী তৈরি বিভাগের সম্পাদক: সাধারণ সম্পাদক গণপতি।

সহকারী: সাগর জানা, বিহারীলাল ঘড়ুই, ইন্দ্র মাইতি, রেণুপদ, অর্জুন, বীরচন্দ্র, নরেন্দ্র, সিন্ধু, অজয়, শ্রীচরণ, সুবল হাঁসদা, ফরমান শেখ।

৮। প্রচার সম্পাদক: অভিমন্যু সাউ।

৯। সান্ধ্য বিদ্যালয় সম্পাদক: কামদেব ঘড়ুই, নন্দ ইত্যাদি

১০। সাহায্য ফাণ্ডের সম্পাদক: নৃপতি মণ্ডল।

এখন এই দশটি বিভাগই আমাদের থাকবে। বিভাগ করা হলো, মানে এমন নয় যে, সবাই আলাদা আলাদা হয়ে থাকবে। দরকার পড়লেই সবাই সব বিভাগের কাজে সাহায্য করবে। কিন্তু তবু আলাদা আলাদা দায়িত্বও থাকল।'

এই কথা বলে সভাপতি থামতেই মেয়েদের মধ্যে থেকে মোহিনী উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমরা মেয়েরাও একটা অস্ত্র বাহিনী করতে চাই।'

কৃষকসমিতির নেতারা একটু অবাক হলো। পুরুষরা মোহিনীর দিকে তাকালো।

দুর্গা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবু চাষীদের ঘরের মেয়েদের দুঃখ্ মেয়েরা ছাড়া কেউ বুঝবে নি।'

সভাপতি বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা যা চাইবে তাই হবে।'

সভাপতি একবার পুরুষদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। রৌদ্র ছায়া পরিবেশে হাজার দুয়েক লোক জমাট বেঁধে বসে আছে। রৌদ্রের ঝাঁঝে থম্ থম্ করছে মুখগুলি। মাঝখানে মাটি উঁচু করে মঞ্চ করা হয়েছে। সেখানে কৃষকসমিতির নেতারা দাঁড়িয়ে বসে আছে। ওদের মাথায় লাল কাপড়ের ফেটা বাঁধা। কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে বল্লম। কারও কারও বল্লমের ঝক্‌ঝকে ফলার নীচে লাল কাপড়ের টুক্‌রো বাঁধা, সেই কাপড় উত্তুরে হাওয়ায় পতাকার মতো উড়ে উড়ে ফুলে উঠছে। মাঝে মাঝে উত্তুরে হাওয়া গাছের পাতা মর্মরিয়ে বয়ে যাচ্ছে, রৌদ্রের তাপকে মধুর করে তুলছে।

সভাপতি অনুভব করলেন, এই দু হাজার লোকের মধ্যে জমিদার এবং

জোতদাররা তাদের প্রতিনিধি দালাল পাঠাতে নিশ্চয়ই ভোলে নি। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন অচিরেই সুন্দরবনে রক্তাক্ত সংঘর্ষ আরম্ভ হবে। এবং পদানত চাষীদের ক্রীতদাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে পড়বে।

দুর্গা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

সভাপতি বললেন, 'বলো কি বলবে?'

দুর্গা বলতে লাগল, 'এখানে সবাই কিষক-সমিতির লোক। এখানে আমার সব কথা বলতে লজ্জা নাই। মরদরা আর কি কষ্ট পেয়েছে বাবু! মেয়েদেরই কপালে যত কষ্ট। মরদরা মেয়েদের মারধোর করেছে, ঘরে চাল নাই, পেটে ভাত নাই তো বৌকে সন্ধে বেলায় পাঠিয়েছে জমিদারের কাছারিতে।' হঠাৎ কেঁদে ফেলল দুর্গা। সবাই স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে বসে রইল। নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে দুর্গা আবার বলতে লাগল, 'বাড়ীর লোকে উপোসে থাকলে মেয়েদেরই বড় কষ্ট বাবু, মেয়েদিগে যে ভাত রেঁধে সকলার মুখের সামনে বেড়ে দিতে হয়। মরদ খেটে খুটে তেতে পুড়ে এলে তাকে খেতে দিতে না পারলে মেয়েদের বড় কষ্ট। কোলের ছেলের মুখে দুধ দিতে হয় মেয়েদেরই, তাদের পাণের দুঃখু তাই পুরুষ বুঝতে পারবে নি।'

একটু চুপ করে থেকে দুর্গা আবার বলতে লাগল, 'আর মুখপোড়া খানকির বাচ্ছা ঐ জমিদার, জোতদার, নায়েবরা মেয়েদের চুরি করে নিয়ে যায়, মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করে জোর করে। সে অপমানের চেয়ে আত্মঘাতী হওয়া ভালো বাবু।'

আর একটু থেমে দুর্গা বলল, 'তাই মোহিনী বৌদি যে কথা বলেছে তা ন্যায্য কথা। মরদরা শুধু অস্ত্র ধরবে আমরা কেন ধরব না? মরদ বাড়ীতে না থাকলে তখন আমরা নিজেদের রক্ষা করব কেমন করে?'

গণপতি মাথায় লাল ফেটা বেঁধে বল্লম হাতে দাঁড়িয়েছিল পাথরের মূর্তির মতো। শাখা-চ্যুত রৌদ্রের কিরণে তীব্র আলোকিত মোহিনীর বিচিত্র আবেগে থমথমে সুন্দর মুখখানি সে এক দৃষ্টিতে দেখছিল। মাঝে মাঝে মোহিনীর সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিল।

গণপতি হঠাৎ বলল, 'সভাপতি মশায় আমি কিছু বলতে চাই।'

বৃন্দাবন বললেন, 'বলো, কি বলবে বলো।'

গণপতি বলল, 'কৃষকসমিতির হয়ে আমি বলছি, আমি আগেও বলেছি, মেয়েরাও যুদ্ধ করবে। সুন্দরবনের চাষীদের অর্ধেক শক্তি তো মেয়েরা। তারা পেছিয়ে থাকলে আমাদের লড়াই টিকবে না। তাহলে পুরুষদের দোষ দেওয়ার কোনো মানে হয় না। ওরা বলুক কে কে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে চায়।'

মেয়েদের মধ্যে থেকে অনেক হাত উঠল। কলস্বরে কথা বেজে উঠল, 'আমি, আমি।'

গণপতি বলল, 'সভাপতি মশায়, শুধোন, ওদের মধ্যে কেউ অস্ত্র চালাতে জানে কিনা।'

সভাপতি বললেন, 'মেয়েদের মধ্যে কেউ কি অস্ত্র চালাতে জানে?'

মোহিনী পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কী অস্ত্র?'

সভাপতি বললেন, 'এই, বর্শা, ছোরা, তীর-ধনুক, টাঙ্গি, লাঠি।'

মোহিনী বলল, 'আমি বর্শা চালাতে জানি, লাঠির প্যাঁচও জানি কিছু কিছু, ছোরা চালাতেও জানি, যুযুৎসু জানি।'

সভাপতি বলে উঠলেন, 'আর ঝাঁটা চালাতে?'

হো হো করে হেসে উঠল তু হাজার লোক। গাছের পাখিরা ভয় পেয়ে ডেকে ডেকে উঠল। মোহিনীও হাসল। লজ্জা পেয়ে বলল, 'তাও জানি বাবু। তবে আমার মরদ বড় ভালো লোক। তার পিঠে ঝাঁটা পিটতে হয় নি। ঝাঁটা চালাতে আমি আগেই জানতাম। আর বর্শা, ছোরা এই সব চালাতে শিখিয়েছে আমার স্বামী।'

সভাপতি জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েরা কে কি অস্ত্র ধরতে জানো বলো।'

একে একে তু'একজন উঠল, বলল, 'শিখি নি বটেঅস্ত্র ধরতে। তবে শিখে নিতে পারব। ও আর শক্ত কাজ কি?'

আর তুর্গা বলল, 'আমি বঁটি চালাতে জানি।'

আবার হেসে উঠল জনতা।

সভাপতি গণপতিদের বললেন, 'তাহলে মেয়েদের একটা সংগ্রাম কমিটি তৈরি হোক। আর তোমাদের কেউ কেউ ওদের অস্ত্র-চালানো শেখাবার ভার নাও।'

ওরা সম্মতি জানাল, বলল, 'তাই করুন।'

সভাপতি বললেন, 'মোহিনী হালদার হোক মেয়েদের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়িকা আর পরিচালিকা। মোহিনী, গণপতি আর সাগর মেয়েদের অস্ত্র শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নিক।'

সকলের সম্মতিতে তাই ঠিক হয়ে গেল।

সভাপতি বৃন্দাবন ঘোষ আবার বললেন, 'তাহলে, আমরা দায়িত্ব যেভাবে ভাগ করে দিয়েছি তাতে যদি কারও আপত্তি থাকে হাত তুলে জানান।'

কোনো আপত্তি এল না।

তখন গণপতি সভাপতির অনুমতি নিয়ে বলল, 'এবারের ধান কাটার আগে ক্ষেতমজুররা দু'আনার জায়গায় দুটাকা মজুরী নিয়ে ধর্মঘট করবে, আমরা এই ঠিক করেছি, কারও যদি আপত্তি থাকে জানাও।'

কোনো আপত্তি এল না। তখন ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

মিটিং থেকে আবার একবার ঘোষণা করা হলো যে, এবারের ধান চাষী তুলে নিতে পারলে সমস্ত ধানের উপর তারই অধিকার থাকবে। আর আসছে সেটেলমেণ্টের সময় চাষী যেন তার নামে জমির ভাগ রেকর্ড করিয়ে নেয়। আর আগামী ধানকাটা মরসুমের সময় ক্ষেতমজুরদের আন্দোলনের পরই তেভাগা আন্দোলন আরম্ভ হয়ে যাবে। তখন চাষীদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। কৃষক-সমিতিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। আর যে সব ভাগচাষীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো তারা গরীব চাষীদের সাহায্যের জন্যে এবং কৃষকসমিতির কাজকর্ম চালাবার জন্যে সমিতিকে ধান দিয়ে চাঁদা দেবে।

মিটিং শেষ হলে ঠিক হলো শ্লোগান দিয়ে দিয়ে মিছিল করে সমস্ত অঞ্চলটা একবার ঘোরা হবে। জমিদার জোতদারদের জানিয়ে দিতে হবে যে, চাষীরা ভয় কাটিয়ে ফেলেছে, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে এবং হাজার হাজার চাষীর মিলিত শক্তিতে যে মহাশক্তির জন্ম হয়েছে তা ১৩৪৯ সালের ঝড়ের চেয়ে কম ভীষণ নয়।

মিছিলের আগে রইল মেয়েরা। দু'হাজার লোকের এক বিশাল মিছিল তৈরি হলো। শ্লোগান উঠল মেঘগর্জনের মতো :

১। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক !

ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক !

২। জমিদারি ব্যবস্থা নিপাত যাক !

নিপাত যাক, নিপাত যাক !

৩। কৃষকসমিতি জিন্দাবাদ !

জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ !

৪। ক্ষেত মজুরদের মজুরী দুটাকা করতে হবে !

করতে হবে, করতে হবে !

৫। চাষীকে তেভাগা দিতে হবে !

দিতে হবে, দিতে হবে !

৬। বাজে আবওয়াব বন্ধ কর !

বন্ধ কর, বন্ধ কর !

৭। জমিদারি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমস্ত চাষী রুখে দাঁড়াও !

রুখে দাঁড়াও, রুখে দাঁড়াও !

৮। জান দোব তো ধান দোব না !

ধান দোব না, ধান দোব না !

৯। বিশ্বাসঘাতক আর দালালরা ধ্বংস হোক !

ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক !

১০। সুন্দরবন আমাদের দেশ !

আমাদের মাটি, আমাদের দেশ !

মিছিল চলল মাঠে মাঠে গ্রামে গ্রামে বিপুল গর্জনে সমুদ্রের প্রমত্ত ঢেউয়ের মতো। আর হৃৎকম্প হতে লাগল জমিদারদের, জোতদারদের, নায়েব, গোমস্তা, মহাজন আর দালালদের।

॥ ৩২ ॥

এতদিনে জোতদারদের টনক নড়ে উঠল। কিন্তু শুধু টনক নড়লেই হয় না, একসঙ্গে মিলতে না পারলে চাষীদের এই বেয়াদবির যে যথেষ্ট জবাব দেওয়া সম্ভব নয় তাও অনেকে বুঝতে পারল। অতএব একজন

সংগঠক, একজন নেতা না হলে চলে না। জমিদার অনন্ত শাসমল জমিদার জোতদারদের কাছে কাছে গেল, চাষীদের বিদ্রোহের ভবিষ্যৎ ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা ব্যাখ্যা করতে লাগল এবং বলল, 'আসুন, আমরা সুন্দরবনের সব জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা বসে ঠিক করি, কি করব, না করব। তেমন বিপদ হলে কমিউনিস্টদের হাত থেকে বাঁচবার তো একটা উপায় করতে হবে মশায়, না হলে যে ধনে প্রাণে মরব।'

অতএব এক দুপুরবেলা অনন্ত শাসমলের কাছারিতে জমিদার, জোতদার আর নায়েবরা এলো। একটা ঘরের মধ্যে বিরাট শতরঞ্জি বিছিয়ে তার উপর অনেকগুলি তাকিয়া দিয়ে বসবার জায়গা হলো।

দ্বারিকনগর থেকে এল জমিদার বালক কর, বীরেন দিন্দা, জোতদার বলরাম কাজলী। রাজনগর থেকে এল জমিদার জগন্নাথ ধর, মোহনানন্দ গিরি। লয়ালগঞ্জ থেকে এল জমিদার আদ্যনাথ হাজরা, বৈদ্যনাথ হাজরা, জমিদার দিনেন্দ্রনাথ দিন্দা, হরেন্দ্রনাথ সামন্ত, সরোজ সামন্ত, রাধামোহন গিরি আর মহারাজ বারীশ মন্দীর সুযোগ্য দুই নায়েব বীরেশ্বর ভট্টাচার্য, যামিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী। দক্ষিণ চন্দনপিঁড়ি থেকে এল জমিদার গিরীন্দ্র সেন আর তার কুখ্যাত নায়েব ভবেশ দাস। উত্তর চন্দনপিঁড়ি থেকে এল জমিদার গঙ্গাধর বর্মণ। বুধাখালি থেকে এল জমিদার দিনেন্দ্রনাথ রায় আর তার জবরদস্ত নায়েব অবনী ব্যানার্জী। শিবনগর থেকে এল জমিদার কালীপদ বেরা। শিবরামপুর থেকে এল চকদার বৃন্দাবন গাঁথাই। 'সি' প্লট থেকে এল জমিদার জগদীশ পড়ুয়া, জমিদার বিপিন দাস। মথুরাপুর থেকে এল জমিদার বিধুনাথ। চন্দ্রনগর থেকে এল জমিদার শশিকান্ত অগস্তী। দুর্গাপুর থেকে এল জোতদার ছাত্তার খাঁ, জোতদার জগৎ মণ্ডল। হরিহরপুর থেকে এল জমিদার নুটবিহারী দাস, জোতদার ব্রজ সামন্ত, কার্তিক সামন্ত, কার্তিক পাত্র। আর এল, জমিদার আদ্যনাথ-বৈদ্যনাথ হাজরা, জমিদার বিপিনদাস আর জমিদার নুটবিহারী দাস এই তিন জমিদারের জমিদারির দোর্দণ্ড প্রতাপ নায়েব মহিম ঘোষ। এ ছাড়াও ছিল অনন্তের দালাল রাজনগরের ধীরেন প্রামাণিক। নায়েব মহিম ঘোষের অনুগত চাষী সহদেব মাইতি উপস্থিত ছিল। ছিল মুসলমান দালাল লাঠিয়াল আলাউদ্দীন।

আর যে ঘরে মিটিং বসল সেই ঘরের দরজায় পাহারা দেবার জন্যে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকল গিরীন্দ্রনাথ সেনের কাছারির দারোয়ান তুর্জয় সিং।

অনন্ত প্রস্তাব করল, 'আজকের সভায় সভাপতি হোক হরেন্দ্রনাথ সামন্ত মশায়।'

হরেন সামন্ত একেবারে বিগলিত হয়ে গেল এই প্রস্তাবে। তার বাবা ছিল চাষী, সেও ছিল গরীব চাষী। অনেক পরিশ্রম করে কায়দা করে আজ জমিদার হয়ে বসেছে। দারুণ কৃপণতা করে নগদ টাকাও জমিয়ে ফেলেছে অনেক। দেশে তার বৌ-ছেলে-মেয়ে আছে, এখানেও কাজ চালাবার জন্যে একটা রক্ষিতা রেখেছে। কিন্তু এখনও তার পোশাকে আশাকে জীবনযাত্রায় বাবুয়ানা আসে নি। এখনও হাঁটুর উপরে আটহাতি কোরা থান ধুতি, গায়ে ময়লা ফতুয়া। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মাথায় ছোট করে ছাঁটা খোঁচা খোঁচা চুল। আর তুই চোখের কোণে হলদেটে পেঁচুটি। তাই এমন মান্যগণ্যের সভায় তাকে সভাপতি করার প্রস্তাব ওঠাতে বড়ই আপ্যায়িত বোধ করল হরেন্দ্র। প্রস্তাব সমর্থিত হলো এবং হরেন্দ্র সভাপতি হলেন।

সুন্দরবনে এ ধরণের ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি। শোষণ, অত্যাচার, অবিচার এতদিন অপ্রতিহত গতিতে চলে এসেছে। সেটাই চিরাচরিত প্রথার মতো হয়ে গিয়েছিল। তার জন্যে দল পাকানো কিংবা মিটিং করার দরকার হয় নি। বিপদে পড়লে কাকদ্বীপ থানায় খবর দিলে বড় দারোগা নয়তো ছোট দারোগা পুলিশ নিয়ে এসেছে কাছারিতে! মদ, মেয়েমানুষ, মাংস, টাকা ইত্যাদি রমণীয় বস্তুসামগ্রী দিয়ে তাঁদের আপ্যায়িত করা হয়েছে। তারপর দারোগাই টিট্ করে দিয়ে চলে গেছে। তার জন্যে আবার মিটিং করার দরকারটা কোথায় ছিল—এই সব ভাবছিল সভাপতি হরেন্দ্র।

অনন্ত বলল, 'আজকে এই সভা আমি জোর করে ডেকেছি, আপনারা অনেকেই এসব ঝামেলা করতে রাজী হন নি। কিন্তু আপনারা সকলেই জেনেছেন, চাষীরা ঠিক আগেকার মতো আর নাই। এক আধজন কি দশবারোজনও বেয়াদপি করলে তাকে ঠাণ্ডা করে দেবার কল আমরা জানি। কিন্তু আপনারা এবং আমিও খবর পেয়েছি যে, দিনকয়েক আগে বিশালাক্ষীর

খানে দু'হাজার চাষী মেয়ে পুরুষ মিলে জমিদার জোতদার নায়েবদের ধ্বংস করবার ষড়যন্ত্র করেছে, মিছিল করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাই বলে বেড়িয়েছে সুন্দরবনময়, পোস্টার দিয়েছে গাঁয়ে গাঁয়ে। আর আপনারা সকলেই লক্ষ্য করেছেন দুর্ভিক্ষের পর থেকে গোবেচারা চাষীরা কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, আমরা কে ভাবতে পেরেছিলাম যে সুন্দরবনে কোনো জোতদার খুন হতে পারে। দুলালকে ওরা খুন করেছে।'

হরেন বলল, 'তা ওদের কি বলবার আছে ডেকে শুনলেই তো গোল মিটে যায়।'

অনন্ত বলে উঠল, 'না, গোল মিটে যায় না। ওরা যা চায় তা যদি আজ জমিদার কিংবা জোতদারদের দিতে হয় তাহলে এই সুন্দরবনে জমিদারি কিনবার কোনো মানে হয় না। সব ওদের হাতে তুলে দিয়ে সুন্দরবনের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

হরেন যেন ভয় পেয়ে গেল। কোনো কথা না বলে হতভম্ব হয়ে সে অনন্তের কথা শুনে যেতে লাগল।

জমিদার শশিকান্ত অগস্তী বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক আমি ভালো করে জানতে পারি নি অনন্তবাবু, একটু বিস্তারিত করে বলুন দেখি।'

অনন্ত তার বুক পকেট থেকে দুটো লীফলেট বার করল। তারপর বলল, 'চাষীদের মধ্যে এই লীফলেট ছড়ানো হচ্ছে, নীচে লেখা আছে কৃষকসমিতি, কিন্তু এ যে কমিউনিস্টদের কারসাজি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর কমিউনিস্টরা যদি একবার সুন্দরবনে গেড়ে বসতে পারে তাহলে আর জমি রাখতে হবে না। ওরা না করতে পারে এমন কাজ নেই।'

দিনেন্দ্রনাথ রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি আছে ওতে?'

অনন্ত বলল, 'প্রথমটায় আছে এই' বলে পড়তে লাগল :

সুন্দরবনের কৃষক বন্ধুগণের প্রতি

বন্ধুগণ,

লীগ সরকারের রেভিনিউ মিনিস্টার বিধান সভায় একটি বিল এনেছেন, তাতে বিধান দিয়েছেন যে ১৩৫৩ (১৯৪৬) সালের উৎপন্ন ফসল বর্গাদার পক্ষ নিলে সে ফসল তার হয়ে যাবে। অতএব এবার সমস্ত ভাগচাষী

ফসলের উপর দখল রাখো। দুর্ভিক্ষের ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচবার জন্যে এ কাজ চাষীদের করতেই হবে। কিন্তু ফসলের উপর দখল রাখতে গেলে জোতদার জমিদার আর তাদের পোষা কুকুর নায়েব গোমস্তা দারোয়ান আর দালালরা চুপ করে মেনে নেবে না। সেই জন্যে তাদের রুখবার জন্য প্রস্তুত হও। কৃষকসমিতির সদস্য হও। কৃষকসমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ হও। কেননা একতাই বল। অস্ত্রই শক্তি।

আর লীগ সরকার ধানকাটা মরসুমের আগেই সেটল্‌মেণ্ট আরম্ভ করবেন। সেই সেটল্‌মেণ্টে সমস্ত ভাগচাষী যেন নিজেদের নামে ভাগের জমির রেকর্ড করেন। তাতে পরে অনেক সুবিধা হবে। এবং জমির উপর ভাগচাষীর স্বত্বও কায়েম করা যাবে। এই সব কথা সব চাষী জানুন, অন্য চাষীকে জানান।

কৃষকসমিতিতে যোগদান করুন
কৃষকসমিতির সভ্য হোন
কৃষকসমিতি আপনার পরমবন্ধু
সুন্দরবন কৃষকসমিতি।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক্‌ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন সুন্দরবনের এই মাথাগুলি। তারপর জমিদার গিরীন্দ্র সেন হাঁকরে উঠলেন, ‘ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে। আর আমরা কিছুই জানি না। অনেক আগে এর ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। দেরি হয়ে গেছে। চাবকে হারামজাদাদের সিধে করে দিতে পারেন নি নায়েব মশায়? কি করছিলেন এতদিন?’

নায়েব ভবেশ দাস উত্তর না দিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল।

তখন অনন্ত আবার বলল, ‘এত উত্তেজিত হচ্ছেন সেনমশায়? তার-পরের কাগজটাতে কি লেখা আছে শুনুন একবার।’

আবার স্তব্ধতা নেমে এল। অনন্ত পড়ে যেতে লাগল :

“সুন্দরবনের কৃষক জনতার প্রতি

কৃষক বন্ধুগণ,

জেগে ওঠো। রুখে দাঁড়াও। এতদিন ধরে জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা, পাইক, দারোয়ান, মহাজন, ব্যবসাদার অসহায় চাষীর উপরে যে অত্যাচার করেছে সুদেআসলে তার শোধ নিতে হবে। গরীব

চাষীর কাছ থেকে বিশ রকম বাজে আবওয়াব নিয়ে চাষীকে নিঃস্ব করে ছেড়ে দিয়েছে, চাষী মেয়ে বৌদের কাছারিতে নিয়ে গিয়ে ইজ্জত নিয়েছে, চাষী জুতো পরে কাছারির সামনে দিয়ে গেলে জুতো-পেটা করেছে, কারণে অকারণে চাষীদের কাছারিতে ধরে নিয়ে গিয়ে গোরুর গোঁজে বা খুঁটিতে বেঁধে চাবুক মেরেছে। ওদের অপরাধ আর পাপের পাহাড় জমে উঠেছে। এবার তার শোধ নিতে হবে। এবার ধ্বংস করে দিতে হবে এই অন্যায়ের বনিয়াদকে। এই সুন্দরবনে অতি শীঘ্রই আমরা হাজার হাজার ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর আর দরিদ্র কিষাণ এমন প্রচণ্ড ঘূর্ণি ও ঝটিকার গতিতে অভ্যুত্থানে ঝাঁপিয়ে পড়ব যে, সেই দারুণ মারণশক্তিকে ধ্বংস করতে পারে এমন ক্ষমতা —সে ক্ষমতা যত বড়োই হোক না কেন—কোথাও নেই। সমস্ত রকম শাসন, শোষণ এবং অত্যাচার যা চাষীদের বেঁধে রেখেছে সে সব ভেঙ্গেচুরে উদ্দাম গতিতে মুক্তির পথে এগিয়ে যাব।

আগামী ধানকাটা মরসুমে ক্ষেতমজুররা দৈনিক দু'আনার জায়গায় দু'টাকা মজুরী দাবি করে ধর্মঘট করবে। কৃষকসমিতি সে ধর্মঘটে সমস্ত ক্ষেতমজুরকে অংশগ্রহণ করতে বলছে।

তারপর ভাগচাষীরা আন্দোলন শুরু করবে :

১। ভাগচাষীকে উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দু'ভাগ দিতে হবে।

২। ভাগচাষী তার খামারে ধান তুলবে, ধান ঝাড়বে। প্রাপ্তি রসিদ পেলে তবে জোতদারকে ধান দেবে।

৩। বাজে আবওয়াব বন্ধ করতে হবে।

৪। জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ান, মহাজন, ব্যবসাদারদের যে কোনো অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকসমিতি রুখে দাঁড়াবে।

৫। চাষীর সমস্ত ঋণ মকুফ করতে হবে।

৬। দেড়াবাড়ি বন্ধ করতে হবে। মন প্রতি দশ সেরের বেশি সুদ নেওয়া চলবে না।

৭। চাষীকে উচ্ছেদ করা চলবে না।

৮। ভাগচাষীকে জমির স্বত্ব দিতে হবে।

৯। প্রতি একশ বিঘে ভাগ জমির জন্যে চাষীকে দেড়বিঘে জায়গা দিতে হবে ঘর বাঁধবার জন্যে

আওয়াজ তুলুন

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক।

বিনা খেসারতে জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ চাই।

প্রাণ দোব তো ধান দোব না।

কৃষকদের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলো।

বিশ্বাসঘাতক ও দালালদের ধ্বংস কর।

অত্যাচারীর কবর দাও।

কৃষকসমিতির সভ্য হও।

জোট বাঁধো তৈরী হও।

সুন্দরবন কৃষকসমিতি।”

অন্তত পাঁচমিনিট থমথমে স্তব্ধতা জমাট বেঁধে বইল সমস্ত ঘরে।

তারপর সেই ভয়াবহ স্তব্ধতাকে আঘাত করে নায়েব মহিম ঘোষ বলল, 'আমি জানি, কমিউনিস্টরা এর পেছনে আছে। কিন্তু চাষীদের কে কে আছে এর লীডার তা জানতে পারলেই তাদের হাতে মেরে, ভাতে মেরে, কোমর ভেঙ্গে দেওয়া যায়।'

বলরাম কাজলী বলল, 'এ সবের এক নম্বর লীডার গণপতি।'

মহিম ফুঁসে উঠল, 'গণপতি! গণপতি!! সেই হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্ছা, যাকে এই সুন্দরবনে আমদানি করেছেন হরেন্দ্রবাবু। সেটা তো কেউটে সাপের মতো ফণা তুলেই আছে। হরেনবাবু, কিছু মনে করবেন না, আপনি নরম লোক বলেই আপনার ভাগচাষীরা এতটা বেড়ে উঠেছে।'

হরেন্দ্র বিব্রত বোধ করে বলল, 'কিন্তুক্ আমি, আমি কী করব?'

অনন্ত বলে উঠল, 'আপনিই এর জন্যে অনেকখানি দায়ী। আপনার প্রজা কেন এমন হয়ে উঠেছে? আপনি কেন ওকে অত জমি ভাগে দিয়েছেন? কেন ওর জমি কেড়ে নেন নি? শুনেছি কয়েক বছর ধরে আপনাকে আবাব-টাবাবও দিচ্ছে না। এর জন্যে আমাদেরও যে বিপদে পড়তে হবে তা কি আপনি বোঝেন না?'

'না, না, সে সব তো আমি ছাড়ি নাই, আমি তো ধার হিসেবে সব খাতায় লিখে রেখেছি।'

মহিম বলে উঠল, 'খাতায় লিখে রাখলে কী হবে, তার দাম কী আছে?

আমি তো শুনেছি আপনি প্রাপ্তি রসিদ লিখে দিয়ে তবে ধান আদায় করতে পেরেছেন গণপতির কাছ থেকে।'

হরেন্দ্র একেবারে চুপসে গিয়ে বলল, 'মানে দেশের ছেলে, তা আপনারা যা বলবেন তাই করব।' বলে বোকার মতো ভীরু হাসি হাসল হরেন্দ্র।

আত্মনাথ হাজরা বলল, 'অনন্তবাবু, আপনি তো ডায়মণ্ডহারবারে থাকেন, নিজেও আইনজ্ঞ মানুষ, দেখুন কি উপায় করবেন।'

অনন্ত বলল,' হাজরাবাবু আপনারা, সেনবাবুরা, পড়ুয়াবাবুরা, রায়বাবুরা আপনারা সকলেই তো কলকাতাতে থাকেন, কংগ্রেসী নেতাদের বলুন না, সুন্দরবনে এসে একটু চাষীদের ঠাণ্ডা করে যান। তাঁদের কথা চাষীরা নিশ্চয়ই শুনবেন।'

মণি রায় বলল, 'সে চেষ্টা, সে ব্যবস্থা আমি করব, আপনি ডায়মণ্ড-হারবার বা কাকদ্বীপ থেকে কোনো কংগ্রেসী নেতাকে আনবার ব্যবস্থা করবেন, স্থানীয় নেতাদের কথার ওজন থাকে অনেক বেশি।'

জমিদার জগন্নাথ ধর বলল, 'আমরা এতকাল ব্রিটিশকে সাহায্য সমর্থন করে এসেছি, কংগ্রেসীরা আমাদের কথা শুনবে কেন?'

মহিম ঘোষ বলল, 'শুনবে, ধর মশাই শুনবে! আমাদের না হলে কংগ্রেসীদেরও চলবে না। আর তাছাড়া এত কাল ব্রিটিশকে সমর্থন করে এসেছেন বলছেন, এবার কংগ্রেসকেই আমাদের ভজনা করতে হবে। কাগজপত্র পড়ে কি বুঝতে পারছেন না, দুদিন পরে কংগ্রেসই হবে এদেশের হর্তাকর্তা বিধাতা।'

অনন্ত তার কুটিল দৃষ্টির উপরে ভুরু নাচিয়ে মহিমের কথা তারিফ করে বলল, 'বাঃ বাঃ মহিমবাবু, আপনি মশায় এই বনে বাদাড়ে পড়ে আছেন, আপনি রাজনীতি করলেন না কেন? মিনিস্টার হয়ে যেতেন মশায়। আপনি ঠিকই বলেছেন। লীগ সরকার শেষ হয়ে এল ব'লে, এখন কংগ্রেসের ভক্ত হতে হবে আমাদের। আমি অবিশ্যি কয়েকবছর আগে থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে একটু দহরম-মহরম করবার চেষ্টা করেছি।'

সেনেদের নায়েব ভবেশ দাস বলে উঠল, 'কিন্তু কংগ্রেসী নেতাদের ভরসায় থাকলে তো এখনকার সংকট কাটবে না। অঘ্রান মাস এসে গেল। ধানকাটার কাজ তো আরম্ভ হলো ব'লে। তখন যে হামলা শুরু হবে তার

মোকাবিলা কেমন করে করবেন তাই ভাবুন এখন। নিজের তাগদ চাই, পর ভরসায় থেকে লাভ হবে না।'

অনন্ত আবার উৎফুল্ল হয়ে তারিফ করল ভবেশকে, 'বড় খাঁটি কথা বলেছেন ভবেশবাবু, নায়েব আর প্রধানমন্ত্রী তো একই কথা। জমিদারের প্রধানমন্ত্রী তো নায়েবই। আপনারা এত বিচক্ষণ বলেই জমিদাররা টিকে থাকে।'

বৈদ্যনাথ হাজরা বলল, 'আপনি কিছু ভেবেছেন নাকি অনন্তবাবু?'

অনন্ত এমন ভাব করল যেন এক্ষুনি সে রহস্য ফাঁস করতে রাজী নয়। তারপর বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ভেবেছি বৈকি।'

অনেকগুলি উদ্বিগ্ন প্রশ্ন পিংপং বলের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল, 'কি? কি? কি? কি?'

অনন্ত বলল, 'প্রথমেই বলব কাকদ্বীপ থানার দারোগাদের সুন্দরবনের জমিদারদের পক্ষ থেকে প্রচুর টাকা খাইয়ে রাখতে হবে। যেন কাজে অকাজে ডাকলেই পাওয়া যায়, যেন হুকুম করলে গুলি চালাতেও কিন্তু কিন্তু না করতে পারে।'

মহিম বলল, 'তারপর?'

অনন্ত উত্তর করল, 'তারপর আমি বলব কলকাতা থেকে কয়েক ডজন গুণ্ডা ভাড়া করে নিয়ে এসে প্রত্যেক জমিদার জোতদার নিজেদের কাছারিতে কাছারিতে রেখে দিন।'

নায়েব অবনী ব্যানার্জি বলল, 'আর কি ভেবেছেন বলুন।'

অনন্ত বলল, 'অত ব্যস্ত হবেন না, বলছি। আর ভি. ডি. পার্টি' তৈরি করতে হবে।'

বৃন্দাবন গাঁথাই বলল, 'সে কি জিনিস?'

অনন্ত বলল, 'ভি. ভি. পার্টি' (V. D. Party) মানে ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি', ভাবটা এমনি যেন গুণ্ডা চাষী বদমাশদের হাত থেকে গ্রামবাসীদের বাঁচাবার জন্যে চাষীরা এমন সংগঠন তৈরি করেছে। কিন্তু আসলে তাদের উদ্দেশ্য হবে কৃষকসমিতির মধ্যে আমাদের গুপ্তচর দু একজনকে ঢুকিয়ে রাখা, কৃষকসমিতির লোকেদের বেদম মারধোর করা। অর্থাৎ ভি. ডি. পার্টি' মানে জোতদারদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী। বাংলায় কিন্তু পবিত্র

একটা নাম দিতে হবে 'সেবাদল'।'

তারিফ করল নায়েব যামিনী চক্রবর্ত্তী, 'বা, বা, বা, বা, চমৎকার সত্যিই আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয় অনন্তবাবু।'

মৃদু হেসে অনন্ত প্রশংসাটুকু ধীরে সুস্থে উপভোগ করল। তারপর বলল, 'কিন্তু সবার আগে চাই 'জোতদার এ্যাসোসিয়েসন' আর এই এ্যাসোসিয়েসনের একটা ফাণ্ড, যাতে কাজকর্ম সব নিখুঁতভাবে চালাতে পারা যায়।'

অনন্ত কথা থামিয়ে চুপ করলে আবার একটা নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে এল। ঘরের ভিতরে সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল।

অনন্ত হাঁক দিল, 'নগেন, আলো দিয়ে যা।'

নগেনচাকর তিনখানা ঝক্‌ঝকে ডিজ হারিকেন আলো নিয়ে এসে মাঝখানে নামিয়ে দিল।

তখন জমিদার গিরীন্দ্র সেন বলল, 'কি অনন্ত বাবু, গলা যে শুকিয়ে গেল, গলা ভেজাবার ব্যবস্থা কিছু রেখেছেন তো?'

অনন্ত তার পানের ছোপ-ধরা দাঁত বার করে মিষ্টি হাসির ভঙ্গী করে বলল, 'সে কথা কি আর বলতে হয় সেন মশায়, আমার কত বড় সৌভাগ্য যে, সুন্দরবনের রাজা-মহারাজার, আজ আমার কাছারিতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন। সব ব্যবস্থা আছে, আপনাদের হুকুম হলেই হলো।'

বড় হুজুর বলল, 'তাহলে দেরি না করে ব্যবস্থা করুন।'

অনন্তের কাছ আদেশ পেয়ে নগেন চাকর মাথা হেঁট করে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর 'আজ্ঞে হুজুর' বলে চলে গেল

কিছুক্ষণ পরে একটা চাকর মেয়ে একটা ট্রেতে খান পাঁচেক বিলিতি মদের বোতল আর খান সাতেক সোডা-ওয়াটারের বোতল এনে মাঝখানে নামিয়ে দিল।

নারীরসিক ভবেশ এক নজরে খুঁটিয়ে দেখে নিল মেয়েটাকে। অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ল, ছেনাল ধরণের মেয়ে। বয়েস ত্রিশের মধ্যেই, ঢলে পড়া সুগঠিত বুক কাপড়ের আবরণে ঠেলে উঠেছে, কান ঢেকে পাতা করে চুল বাঁধা। রঙ মাজা মাজা কালো। পরণে চেক চেক রঙিন সবুজ শাড়ী।

শশিকান্ত অগস্তী বলল, 'আয়োজনের ত্রুটি নেই, তা এটি?'

অনন্ত হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, 'জলপাত্র'

'কার ?'

'আমরাই।'

(নতুন মানুষ বুঝবে না, জলপাত্র মানে কি। কিন্তু সুন্দরবনেব লোকেরা জানে 'জলপাত্র' মানে জমিদাবদেব সুন্দববনের রক্ষিতা।)

মেয়েটি চলে গেল। একটু পবে দুই হাতে দুটি পাত্র নিয়ে এসে ট্রেটার পাশে নামিয়ে দিল। এক গামলা মাংস আব থালায় চানাচব ইত্যাদি শুকনো খাবার। মদেব চাট আব কি। নগেন চাকব অনেকগুলি কাঁচেব প্লেট এনে দিল।

অনন্ত বলল, 'মাংসটা আপনাবা প্লেটে তলে নিন, চামচ আছে।'

ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতিব জমিদাববা সহসা যেন বড্ড উদার হয়ে পড়ল, প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলল, 'ওতো আপন ইয়েব মতো মশায়, ওই তুলে দিক প্লেটে প্লেটে।'

মেয়েটা প্লেটে প্লেটে মাংস তুলে দিল। নগেন ডজন দুয়েক ছোট চামচ আব কাঁচের গ্লাস নিয়ে এল। তারপব নগেন আব মেয়েটা আড়ালে গেল।

গ্লাসেব সঙ্গে বোতলের মিতালিব ঠুং ঠাং শব্দ এবং আমেজী কায়দায় অল্প অল্প পান-আহাব আব কথাবার্তা চলতে লাগল।

নগেন আবার এল গোটা দুই জলেব জাগ আব জল খাবাব ডজন দুয়েক গ্লাসও রেখে গেল।

পান-পর্ব সমাধা হলে আবাব আলোচনা আবন্ত হলো।

বীরেন দিন্দা প্রস্তাব করল, 'অনন্তবাবুকেই জোতদার-এ্যাসোসিয়েসনের সম্পাদক করা হোক।'

সবাই একবাক্যে সমর্থন করল।

আদ্যনাথ হাজরা বলল, 'আমরা প্রায় সবাই তো কলকাতায় থাকি। হরেন্দ্রবাবু বয়স্কলোক, নিজে থাকেন সুন্দরবনে, ওঁকে সভাপতি করা হোক।'

সবাই তাই সমর্থন করল।

তারপর উঠল চাঁদা সংগ্রহের কথা।

মহিম ঘোষ বলল, 'আগে সভাপতি থেকেই আরম্ভ হোক। বলুন সভাপতি কত দেবেন ?'

পুলকিত হরেন্দ্র বলল, 'আমি এক হাজার টাকা চাঁদা দোব।'

অনন্ত বলল, 'এক হাজার টাকায় কি হবে হরেনবাবু, কত খরচ তার হিসেব করেছেন তো। পুলিশকেই তো দিতে হবে হাজার দশেক টাকা।'

হরেন্দ্র ইতস্তত করে বলল, 'তাহলে কত দিতে হবে?'

ভবেশ বলল, 'আসল যে দলের পাণ্ডা সেই গণপতিকে আপনিই তো সুন্দরবনে আমদানি করেছেন, আপনাকে বাঁচাবার জন্যেই গণপতিকে টিট করতে হবে।'

হরেন্দ্র বলল, 'আমি পাঁচ হাজার দোব।'

অনন্ত বলল, 'ওটা দশ হাজার করুন।'

ইতস্তত করতে লাগল, খুঁত খুঁত করতে লাগল হরেন্দ্র।

জমিদার, জোতদার, নায়েবরা মজা পেয়ে তেল দিতে লাগল, 'মশাই, জমিদার বলতে তো আপনি। সুন্দরবনে যে সব জমিদার সশরীরে থাকে, আপনিই তাদের মধ্যে কর্তার মতো। আপনি না দিলে কে দেবে বলুন।'

এই ভাবে গ্যাস খেয়ে গিয়ে হরেন্দ্র শেষ পর্যন্ত দশ হাজার টাকা চাঁদা দিতে রাজী হয়ে গেল। হরেন্দ্রের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল সকলে।

একে একে অবস্থা এবং মর্যাদা অনুযায়ী হাজার দু হাজার পাঁচশ টাকা করে চাঁদা ধরা হলো।

অনন্ত বলল, 'চাষীদের এই আন্দোলন বানচাল করে দেবার জন্যে দরকার হলে ওদের নেতাদের পয়সা দিয়ে কিনে নিতে হবে।'

তারপর মহিম ঘোষকে করা হলো সহ-সম্পাদক।

সরোজ সামন্ত বলল, 'এবার ভিলেজ ডিফেন্স পার্টির কাজটা সেরে নিন'

নানান আলোচনা করে ঠিক হলো, দুর্গাপুরের বুলবুল খাঁ ভি. ডি. পার্টির ক্যাপটেন হবে, আর সহকারী হবে জগৎ মণ্ডল। ঠিক হলো, সমস্ত জমিদার, জোতদার, মহাজন, নায়েব তাদের অনুগত প্রজাদের ভি. ডি. পার্টিতে যোগ দিতে বলবে।

ঠিক হলো কয়েকজন স্পাইংয়ের কাজ করবে।

মোহন গিরি জিজ্ঞাসা করল, 'কোন কোন ধরণের লোককে চাষীরা কৃষকসমিতিতে রাখবে, শুনেছেন কেউ কিছু?'

বলরাম কাজলী বলল, 'কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে ওদের যে গোপন মিটিং হয় সেখানে আমি ছিলাম, আমাকেও ওরা কৃষকসমিতির সভ্য করে নিয়েছে। তবে দু'নম্বর খাতায় আমার নাম লেখা আছে।'

মুটবিহারী দাস জিজ্ঞাসা করল, 'দু'নম্বর খাতা মানে?'

বলরাম বলল, 'কেবলমাত্র গরীব চাষী, ক্ষেতমজুর আর ছোটো ভাগ-চাষীর নাম এক নম্বর খাতাতে থাকবে। তারা হচ্ছে কৃষকসমিতির খাঁটি মেম্বার। আর মধ্যবিত্ত চাষী আর ছোটো বা মাঝারি জোতদার যারা কৃষবসমিতিতে ঢুকতে চায় তাদের নাম থাকবে দু'নম্বর খাতায়।'

মুটবিহারী বলল, 'সে এক নম্বরই হোক আর দুনম্বরই হোক, ওদের মধ্যে ছুঁচ হয়ে ঢুকে পড় দেখি, সময় মতো ফাল হয়ে বেরিয়ে আসবে।'

নানান রকম আলোচনা করে ঠিক হলো, বলরাম কাজলী, বিষ্ণুপদ বর্মণ, ধীরেন প্রামাণিক আর সহদেব মাইতি কৃষকসমিতির সভ্য হয়ে থাকবে। বিভিন্ন গোপন সংবাদ জোতদারদের জানাবে।

পুলিশকে ঘুষ খাওয়ানোর দায়িত্ব নিল মহিম ঘোষ। মহিম ঘোষের সঙ্গে বড়ো দারোগার বড্ড জানাশোনা। প্রায়ই বড়ো দারোগা মহিম ঘোষের কাছারিতে এসে রাত্রি যাপন করে যায়। মদ, মেয়েমানুষ, মাংস ইত্যাদিতে চুর হয়ে মহিম ঘোষের কাছারিতে রাত কাটায়।

কলকাতা থেকে গুণ্ডা আনার দায়িত্ব নিল অনন্ত নিজে। সে বলল যে, শীঘ্রিই প্রত্যেক কাছারিতে সে গুণ্ডা পাঠিয়ে দেবে।

আর কংগ্রেসী নেতাদের দিয়ে সুন্দরবনের চাষীদের ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা করবে কলকাতা নিবাসী জমিদাররা আর অনন্ত শাসমল।

মহিম ঘোষ বলল, 'আসলে আমাদের সবাইকে আরও খানিকটা শক্ত হতে হবে। চাবুক ধরতে হবে শক্ত কব্জায়।'

সবাই কথাটা সমর্থন করল। এবং জোতদার-এ্যাসোসিয়েসন সিদ্ধান্ত করল, কৃষকদের উপরে আগেকার চেয়ে শাসন খানিকটা বাড়িয়ে দিতে হবে।

এই গোটা কয়েক সিদ্ধান্ত নেবার পর জোতদার-এ্যাসোসিয়েসনের সেদিনকার মিটিং শেষ হয়ে গেল। জমিদার, জোতদার, নায়েবরা নিজের নিজের বাড়ী ফিরে গেল।

কিন্তু পরের দিন থেকে কৃষকসমিতির বিরুদ্ধে গোপন ষড়্যন্ত্র আরম্ভ হয়ে গেল। কাকদ্বীপ থানাতে কয়েকশ' টাকা দিয়ে অনন্ত মহিমরা হরেন্দ্রের টাকাটা হজম করে ফেলল। ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি তৈরি করবার কাজ চলতে লাগল। অনুগত, অনুগামী, দালাল, স্থানীয় গুণ্ডা, বদমাশ, বদ-বাবুদের নিয়ে এই বাহিনী গড়ে তোলা হলো। বলরাম কাজলী, বিষ্ণুপদ বর্মণ, ধীরেন প্রামাণিক, সহদেব মাইতি কৃষকসমিতির মধ্যে ঢুকে গেল। এদিকে কিছু কিছু গরীব চাষী পরিবারও জোতদারদের অনুগত হয়ে গেল। তারা কৃষক-সমিতির গোপন খবরগুলি জোতদার-এ্যাসোসিয়েসনের কাছে পৌঁছে দেবার কাজে লেগে থাকল।

অবশ্য কয়েকজন ছোটো জোতদার আবার কৃষকসমিতির পক্ষে কাজ করতে লাগল। তারা জোতদার-এ্যাসোসিয়েসনের গোপন খবরগুলি কৃষকসমিতিকে আগে থেকে জানিয়ে দিত। সেই রকম একজন জোতদার বীরেন দাস।

তখনও কৃষকসমিতি তার সংগ্রামের কর্মসূচী আরম্ভ করে নি, অথচ গোপন সংবাদ আদানপ্রদানের স্পাইং চলতে লাগল। কৃষকসমিতি বুঝতে পারল, সমিতির গোপন খবর জোতদারদের কাছে এবং সেখান থেকে পুলিশের কাছে যাচ্ছে। কঠোর ভাবে এই সব স্পাইং বন্ধ করবার জন্যে তীক্ষ্ণ নজর রাখল কৃষকসমিতির নেতারা।

॥ ৩৩ ॥

কৃষকসমিতির প্রচারের কাজ পুরোদমে চলতে লাগল। বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে ওরা বিভিন্ন জায়গায় মিটিং করতে লাগল। গণপতি তার এলাকায় সমস্ত শক্তি এবং মনোযোগ দিয়ে কাজ করে যেতে লাগল। সি প্লটে লাটদার ভুবন ধরের নায়েব ওদের মিটিংয়ে বাধা দিতে এল।

ভুবন ধরের লাগানো লোকেরা বলল, 'চাষীরা তেভাগা চাইছে, তিন ভাগের দুভাগ ভাগচাষী নিয়ে নিলে কতটুকু ধান জোতদার পাবে?'

ওখানকার একজন চাষী বলল, 'কৃষকসমিতি তো ছোটো জোতদার কিংবা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকেদের কাছ থেকে তেভাগা নেবে না। সেখানে

ভাগচাষীরা আধাআধি ভাগ নেবে।'

অনেক গরীব চাষী জমে গিয়েছিল ব'লে সুবিধা হবে না বুঝতে পেরে ওরা পালিয়ে গেল।

দিন কয়েক পর তিনটে নাগাদ সি প্লটের গাঙের বাজারে মিটিং ডাকল কৃষকসমিতি। বহুলোক যাতে সেই মিটিংয়ে যোগদান করে তার প্রাণপণ চেষ্টা করল কৃষকসমিতি। গাঙের বাজারের এই জনসভায় প্রায় চার পাঁচ হাজার লোক হলো। এই মিটিংয়ে সভাপতি করা হলো বলরাম কাজলীকে। গণপতি এই সভাতে আধঘণ্টা বক্তৃতা দিল।

অন্যান্য বক্তারাও বক্তৃতা দিল।

সভার শেষে জনতার ভোট চাওয়া হলো এক একটি কার্যসূচীর উপরে।

গণপতি বলল, 'আমি কৃষকসমিতির আদেশে বলছি, আমরা অঘ্রান মাসে ক্ষেতমজুরদের মজুরী দু আনার জায়গায় দু টাকা করবার জন্যে ক্ষেতমজুরদের ধর্মঘট করব, আপনারা হাত তুলে আপনাদের মতামত দেন।'

হাজার হাজার হাত আকাশে উঠে গেল উদ্যত বন্দুকের মতো।

সাগর বলল, 'তাহলে এই সিদ্ধান্ত আপনাদের ভোটে গ্রহণ করা হলো।'

এমনি করে গণপতি কৃষকসমিতির প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত জনতাকে জানালো আর প্রত্যেকটির সমর্থনে হাজার হাজার হাত আকাশে উঠল উদ্যত সঙ্গীনের মতো।

তারপরে বজ্রগর্জনে স্লোগান দিতে দিতে জনসভা শেষ হলো।

সভাপতির আসনে বসে বসে গুপ্তচর বলরাম কাজলী ঘামছিল। এত লোক এসেছে মিটিং শুনতে! এত লোক কৃষকসমিতির সভ্য হয়েছে, কৃষকসমিতিকে মান্য করছে! বুক দুর্ দুর্ করতে লাগল বলরামের। বিপজ্জনক খেলায় সে হাত দিয়েছে! বিপদে পড়লে কি জমিদার, জোতদার, নায়েবরা তাকে রক্ষা করতে পারবে? ওর বজ্জাতি জেনে ফেলে দুলালের মতো হঠাৎ ওকে মেরেই যদি ফেলে কৃষকসমিতি! দুর্ভাবনায় অশান্তিতে মন বিষিয়ে উঠল বলরামের।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই সেটলমেণ্ট আরম্ভ হলো। কৃষকসমিতির প্রতিনিধিরা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই এক এক দলে সেটলমেণ্ট ক্যাম্পে পালা করে করে থাকতে লাগল। গাঁয়ে গাঁয়ে প্রত্যেক ভাগচাষীকে খবর দেওয়া হলো। অঞ্চল হিসেবে ভাগচাষীদের ডেকে নিয়ে এসে তাদের নামে ভাগ-জমি রেকর্ড করিয়ে দিতে লাগল কৃষকসমিতি। জোতদার, নায়েবরা অবিরত নানান ভাবে বাধা তৈরি করতে লাগল। টকঝক, তর্কাতর্কি, কথা কাটাকাটি লেগেই রইল।

একদিন কৃষকসমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে স্থানীয় জনকয়েক বদ-বাবুদের ঝগড়া লেগে গেল। একটা জমির ভাগচাষীকে তারা ভাগচাষী বলে অস্বীকার করতে লাগল। কৃষকসমিতির লোকেরা প্রতিবাদ করায় তারা অশ্লীল কথা বলে গাল দিয়ে উঠল। তাদের খেয়াল ছিল না যে, অবস্থা পাল্টে গেছে। গালাগালি করে বিশেষ সুবিধা হবে না, বরং মুশকিল বাধবার সম্ভাবনাই বেশি। কৃষকসমিতির একজন সদস্য বেশি বাক্যব্যয় না করে তাদের একজনকে ঝাড়ল একটা পেল্লায় ঘুঁষি। অমনি গণ্ডগোল বেধে গেল। সেই বদবাবুদের পক্ষে সেবাদলের জনা পনের লোক কোথা থেকে এসে হাজির হলো। কৃষকসমিতির যে সদস্য ঘুঁষি মেরেছিল তাকে ঘিরে ফেলল ওরা। এখুনি মার আরম্ভ হবে এমনি অবস্থা। সেবাদলের একজন লোক খপ করে কৃষকসমিতির সদস্যের চুলের মুঠি বাগিয়ে ধরল। কৃষকসমিতির আর দু একজন মাত্র সদস্য ওখানে ছিল। তারা এক মুহূর্ত অসহায় বোধ করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করে বলল, 'চাষী ভাইসব ঐ জমিদার জোতদারদের দালালগুলোকে আজ একটু টাইট দিয়ে দিতে হবে।' চারিদিকে জন পঁচিশ চাষী দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করছিল। হঠাৎ তারা অন্য মূর্তি ধারণ করল। সেবাদলের সেই জনপনের লোককে এলোপাথারি পিটতে শুরু করল। ওদের হাত কখনো ওঠে নি। মার-খেতে শিখেছিল ওরা। আজ হঠাৎ সেই হাত যেন মুক্তি পেল। শিরা-বহুল লাঙ্গলধরা হাতের সেই প্রচণ্ড থাপ্পরে আর ঘুঁষিতে সেবাদলের বাবুদের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল। তারাও প্রাণপণে চেষ্টা করল লড়তে। কিন্তু

বেশিক্ষণ টিকতে পারল না। দাঁত দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল তিনজনের, কপাল ভুরু ফুলে উঠল ক'জনের, চাষীরা অল্পবিস্তর আহত হলো, কিন্তু বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিল সেবাদলের মেম্বারদের। সেবাদল রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল সেদিন।

কিন্তু পরের দিন থেকেই জমিদারদের লাঠিয়াল, সেবাদলের জন্য পঞ্চাশেক লোক সেটলমেণ্ট ক্যাম্পে মোতায়েন হলো। কৃষকসমিতির সত্তরজন সভ্যও লাঠি হাতে উপস্থিত থাকাতে লাগল ক্যাম্পে। ক্ষমতার ভারসাম্য থাকাতে জোতদার পক্ষ আর কোনো ঝামেলা করতে সাহস করল না। ভাগচাষীরা নিজেদের নামে ভাগের জমির রেকর্ড করিয়ে তবে ছাড়ল।

সেটলমেণ্টের কাজ শেষ হতে না হতেই ধান কাটার সময় এসে গেল। জোতদাররা যারা নিজেদের খরচে জমি চাষ করিয়েছে তারা ধান কাটবার জন্যে মজুরদের ডেকে পাঠাল। মজুররা স্রেফ জানিয়ে দিল, 'দিনে দু টাকা করে মজুরী দিতে হবে।'

অধিকাংশ ক্ষেতমজুরই জোতদারদের কাছে ধার করে রাখে। রোয়ানো আর ধানকাটার সময় সেই ঋণ শোধ হয় সুদসমেত। তাই জোতদার বলল, 'আমার টাকা শোধ কর।'

ক্ষেতমজুর বলল, 'আপনার জমির ধান কেটেই শোধ করব বাবু, কিন্তু দু টাকা করে মজুরী দিতে হবে।'

জোতদার বলল, 'না দু টাকা মজুরী দোব না, দ্ আনা নিতিস, বাজার দর চড়েছে, না হয় চার আনা চাইতে পারিস, দু টাকা কি? যা বলবি তাই হবে নাকি?'

ওরা বলল, 'তাহলে আমরা কাজ করতে পারবু নি বাবু।'

'তোরা খাবি কি, তোদের চলবে কেমন করে?'

ওরা জবাব দিল, 'বছরে তো বাবু, মাস দুয়েক ধান পোঁতা আর মাস দেড়েক ধানকাটার কাজ। বাকী সাতমাস যেমন করে কাটে, তেমনি করেই কাটবে।'

জোতদাররা ওদের তাড়িয়ে দিয়ে নতুন মজুর খুঁজতে গিয়ে দেখে, তারাও সেই কথা বলে।

জমিদার জোতদাররা ভারি অসহায় হয়ে পড়ল।

এদিকে অধিকাংশ ভাগচাষীই দৈনিক দু টাকা করে মজুরী দিয়েই ধান কাটাতে লাগল। কৃষকসমিতির সদস্য ছোটো জোতদাররাও দু টাকা মজুরী দিয়েই ধান কাটাতে লাগল।

দিন চলে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে অঘ্রান শেষ হয়ে পৌষমাস পড়ে গেল। জমিদার জোতদারদের মাঠের ধান মাঠেই পড়ে রইল মুখ থুবড়ে। ধান চুরি হয়ে যেতে লাগল।

জোতদার-এ্যাসোসিয়েসন মিটিং ডাকল, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পারল না। কেউ কেউ প্রস্তাব করল, উড়িষ্যা থেকে মজুর আনা হোক। উড়িষ্যা থেকে মজুর আনার সময় ছিল না। তাছাড়া তাদের মজুরী অত কম দিলে চলবে না। তাছাড়া মুশকিল হল এই যে, অধিকাংশ ভাগচাষী এবং ছোটো জোতদাররাও দু টাকা করে মজুরী দিয়েই ধান কাটাতে লেগেছে।

অনন্ত বলল, 'এ ব্যাপারে পরাজয় মেনে নিলে এর পরে আবার ভাগ-চাষীরা ঝামেলা করবে, তখনই বা কি করবেন?'

মহিম বলল, 'ভাগচাষীদের ঠিক জব্দ করা যাবে, কিন্তু আকাশে মেঘ ঘুরছে এখন ধানটা তুলে না নিলে মুশকিল হবে, তাছাড়া শুনছি কিছু কিছু ধান নাকি চুরিও যাচ্ছে।'

অনেক আলোচনা চলল।

নায়েব ভবেশ বলল, 'ক্ষেতমজুরদের ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিলে কেমন হয়?'

মহিম বলল, 'অত ঘরে আগুন দেবে কে?'

'কেন, ভি. ডি. পার্টির লোক।'

অনন্ত বলল, 'কিন্তু ঘরে আগুন দিলে ওরা যদি জমির ধানে আগুন দিয়ে দেয়, কি রাতের বেলা যদি ধান কেটে নেয়?'

অগত্যা সে বছরের মতো দু'টাকা মজুরী মেনে নেওয়াই সাব্যস্ত হলো। জমিদার জোতদাররা পৌষের প্রথম দিকে দুটাকা মজুরী দিয়েই ধান কাটাতে রাজী হলো।

ক্ষেতমজুর ধর্মঘটের এই জয়ে আনন্দে ফেটে পড়ল সুন্দরবনের চাষীরা। কৃষকসমিতির উপর তাদের বিশ্বাস এবং আস্থা দৃঢ়তর হলো। প্রত্যেক গ্রামে

গ্রামে কৃষকসমিতির শাখা হিসেবে গ্রাম-কমিটি গঠিত হলো। বিপুল উদ্দীপনা, উৎসাহ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আর লড়িয়ে মনোভাব জেগে উঠল। যারা অবিশ্বাসী ছিল তাদের অবিশ্বাস দূর হয়ে যেতে লাগল। অনেক মধ্যচাষী কৃষকসমিতির সভ্য হতে লাগল।

যেন ক্রীতদাসত্ব থেকে ওরা মুক্তি পেয়েছে, যেন ওরা একতাবদ্ধ হয়ে ইচ্ছে করলেই যা খুশি তাই করতে পারে, এমনি একটা লড়াকু-ভাব ফুটে উঠল ওদের চোখে মুখে। টগ্‌বগ্‌ করে ফুটতে লাগল সমস্ত সুন্দরবনের আবহাওয়া।

॥ ৩৫ ॥

ক্ষেতমজুরদের ধর্মঘট অনায়াসে সফল হওয়াতে পরবর্তী আন্দোলনের পরিকল্পনা কাযকরী করার সময় এসে গেল। আগামী আন্দোলন আরম্ভ করবার আগে কৃষকসমিতির নেতারা একবার একদিন রাত্রে বসে নিলেন। এই নেতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ছিল একশ। এই একশ জনই কৃষকসমিতির সৈন্য-বাহিনীর লোক ছিলেন।

সেই সভায় গণপতি বলল, 'সমস্ত ভাগচাষীর ধানই প্রায় কাটা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও সব তোলা হয় নি, মাঠেই পড়ে আছে। না তোলার কারণ ভাগচাষীরা ঠিক করতে পারছে না, ধান নিজের খামারে তুলবে কি তুলবে না।'

নরেশ জানা বলল, 'অনেকে জমিদারের খামারেই তুলে ফেলেছে।'

কেষ্ট মণ্ডল বলল, 'তুলেছে, তবে এখনও সব ধান তুলতে পারে নি। ক্ষেতমজুরদের ধর্মঘটের জন্যেই তা হয়ে ওঠে নি।'

গণপতি বলল, 'আমাদের নিজেদের আগে আন্দোলন আরম্ভ করে অন্য লোককে সাহস দিতে হবে। তাই আমরা যারা ভাগচাষী তারা ধান নিজের খামারে তুলব, তেভাগা আদায় করব, কোনো আবাব দোব না, মন প্রতি দশ সের সুদ দোব। কিন্তু বড়ো জোতদার হলে মন প্রতি পনের সের ধান কেটে নোব। একদিন অন্যায় ভাবে দেড়াবার নিয়েছে ব'লে সেই ধানের চক্রবৃদ্ধিহারে হিসেব করে প্রত্যেকবছর পনের মন করে কেটে নিয়ে আমাদের

প্রাপ্য ধান আদায় করে নোব। অবশ্য সব থেকে ভালো হয়, যদি একেবারেই ফসলটা দখল করে ফেলতে পারি, কেননা লীগ-গভর্ণমেণ্ট বলেছে, ধানের উপর দখল রাখতে পারলে এবারে ধান ভাগচাষী পাবে।'

রমেন বারুই আর সুখেন শি বলল, 'তুমি আগে তোলো ধান, তবে দেখব।'

গণপতি বলল, 'আমি তো তুলবই, কিন্তু একা করলে ব্যাপারটার জোর থাকবে না।'

একটু থেমে বলল, 'সয়ালগঞ্জ, হরিপুর, মহারাজগঞ্জের আর কে কে আন্দোলনে নামবে নাম দাও। জমিদার-জোতদারদের সঙ্গে রসিদ আদান-প্রদানেব ব্যবস্থা সকলের হয়ে আমি করব। জমিদারি সিস্টেমের আর হয়ে এসেছে! চাষীরা যখন বানর থেকে মানুষ হয়ে উঠেছে তখন আর উপায় নাই। জমিদাররা জুতোর সুকতলা হয়ে গিয়েছে।'

কেষ্ট দিন্দা বলল, 'বেশ তুমি আগে নাও।'

'হ্যাঁ আমিই নোব।'

অভিমন্যু বলল, 'গণদা, বড় জোতদারদের কাছ থেকে মনপ্রতি পনের সের করে ধান কেটে নেবার কথা বলছ, ওটা ঠিক বুঝলুম নি।'

গণপতি বলল, 'একজন ছোটো ভাগচাষী যখন থেকে চাষ করছে তখন থেকে সে জোতদারের কাছে ধান ধার নিয়েছে আর মন প্রতি আধ-মন করে সুদ দিয়েছে। কিন্তু টাকায় দুআনা সুদ সরকারী আইনে। তাহলে ধানের দাম যখন আরও কম ছিল তখন জোতদারদের মন প্রতি পাঁচ সের সুদ নেওয়া উচিত ছিল। সেই হিসেবে মন প্রতি পনের সের করে বছরে বছরে বেশি সুদ নিয়েছে জোতদার। ভাগচাষী যেন ধানটা জোতদারকে ধার দিয়েছে এতদিন, তাহলে মন প্রতি পাঁচ সের সুদ হারে সেই ধার দেওয়া ধান চক্রবৃদ্ধি হিসেবে জোতদারের কাছে জমা আছে। সেইটেই এখন ভাগচাষী মন প্রতি পনের সের হিসেবে প্রত্যেক বছর কেটে নেবে।'

সুখেন শি, কেষ্ট দিন্দা, রমেন বারুই, শিবেন মণ্ডল নানা রকম অজুহাত দেখিয়ে এবারে আন্দোলনে নামতে রাজী হলো না। কিন্তু গণপতির পুরনো সহকর্মীরা মনের দিক থেকে প্রস্তুত হয়েই আছে।

শেষ পর্যন্ত সয়ালগঞ্জ-হরিপুর থেকে পঞ্চাশজন ভাগচাষী এই আন্দোলন

আরম্ভ করতে চাইল। কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের ভাগচাষীরা ঠিক অতটা সাহস করল না। দ্বারিকনগরের সাগর এই আন্দোলন করতে চাইল। কিন্তু আর সঙ্গী পেল না। একা একটা গাঁয়ে এই ধরণের আন্দোলন করা ঠিক হবে না ব'লে কৃষকসমিতি তাকে নিরস্ত করল।

পরের দিন সকালে লয়ালগঞ্জের মাঠ থেকে এই পঞ্চাশ জন ভাগচাষী কেটে রাখা ধান তুলতে লাগল নিজের নিজের বাড়ীর উঠোনে। খানিকটা বেলা হতেই জোতদারদের লাঠিয়াল আর গুণ্ডারা এসে হাজির হলো। অনন্ত শাসমল কলকাতা থেকে গুণ্ডা আমদানি করে কাছারিতে কাছারিতে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

গুণ্ডারা চাষীদের বলল, 'এই শালারা, এখ্‌খুনি জমি থেকে উঠে যাবি, নাহলে চাকু চালিয়ে দোব, জমিতেই লাশ রেখে যেতে হবে।'

মোহিনী দেওয়ালহীন উঠোনে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে চাষীদের ধান তোলা দেখছিল। গুণ্ডা আর লাঠিয়ালরা মাঠে মাঠে চাষীদের ঘিরে ফেলেছে দেখে লোকেদের কেমন করে খবর পাঠাবে, কি করবে বুঝতে না পেরে হঠাৎ ঘরে ঢুকে শাঁখটা বার করে এনে প্রাণপণ শক্তিকে ফুঁ দিয়ে বাজাতে লাগল। খোলা মাঠে শাঁখের শব্দ মেঘগর্জনের মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আশে পাশের গ্রামগুলিতে যে চাষীরা কাজকর্মে ব্যস্ত ছিল এই শাঁখের শব্দে কি একটা বিপদের আভাস পেয়ে তারা লাঠি সড়কি দা যে যা পেল হাতের কাছে তুলে নিয়ে মেয়ে-পুরুষ-নির্বিশেষে শাঁখের শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। মিনিট পনের কুড়ির মধ্যে শ তিনেক সশস্ত্র মেয়েপুরুষ জমে গেল ঘটনার জায়গায়। জমিদারের লেঠেল আর ভাড়া-করা গুণ্ডাদের সঙ্গে মারামারি লেগে গেল সেই চাষী নরনারীদের। গুণ্ডা এবং লেঠেলদের সংখ্যা জনতার তুলনায় অনেক কম ছিল। চাষী দুচার জন ঘায়েল হলো, লেঠেল এবং গুণ্ডারাও জখম হলো অনেকেই। তার পর গতিক খারাপ বুঝে ছুটে পালাতে লাগল লেঠেল আর গুণ্ডারা। জনতা খানিক দূর পর্যন্ত তাদের তেড়ে গেল।

তারপর কৃষকসমিতির বল্লম-বাহিনীর প্রহরাতে ধান তোলা চলতে লাগল। অনেক ধান তোলা হলো। কিন্তু অনেক ধান তোলা বাকীও থেকে গেল। সন্ধে হয়ে এল। অন্ধকার রাত্রি নেমে এল। আর সেই

রাত্রিতেই পুলিশ এসে বিভিন্ন গ্রাম থেকে কৃষক-সমিতির অনেক লোককে গ্রেপ্তার করে ফেলল। গণপতিদের গ্রামেও পুলিশ এল। কিন্তু আগেই খবর পেয়ে গিয়ে গণপতির গ্রামের কৃষক-সমিতির লোকেরা গা ঢাকা দিয়ে ফেলল।

গণপতি খবর পেল, লেঠেল গুণ্ডারা হেরে মার খেয়ে ফিরে গেলে মহিম ঘোষ থানাতে খবর পাঠিয়েছিল। তাই পুলিশ এসে কিছু লোককে ধরে নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু তাই বলে ধান তোলার কাজ বন্ধ থাকল না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই পঞ্চাশজন ভাগচাষী নিজেদের খামারে ধান তুলতে লাগল।

জমিতে পুলিশ ১০৭ ধারা জারি করল। যখন তখন লেঠেল আর গুণ্ডা এসে কখনও চাষীদের বাড়ীতে কখনও জমিতে হামলা করতে লাগল। আর চাষীদের সঙ্গে লেঠেল, গুণ্ডা আর সেবাদলের লোকেদের ছোটো বড়ো লড়াই চলতেই থাকল।

এই সব খবর আগুনের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এ অঞ্চল থেকে এই সব খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল মথুরাপুর, সন্দেশখালি আর ক্যানিং অঞ্চলে। সর্বত্রই চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহ আর অবাধ্যতা সংক্রমিত হতে লাগল।

জোতদার-জমিদাররা চাষীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করতে লাগল শহরের কোর্টে। মামলা করে ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করতে লাগল।

সুন্দরবনের গাঁয়ে গাঁয়ে মাঠে মাঠে যখন কৃষকদের লড়াই চরম পরিণতির দিকে চলেছে তখন কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বড়ো কর্তাদের আপোশ-আলোচনা ও গোপন বৈঠক চলছে ঘন ঘন।

এই সময় হঠাৎ সুন্দরবনে কংগ্রেসের এক জনসভা হলো। এই জনসভায় বক্তৃতা দিলেন ডায়মণ্ডহারবার ও কাকদ্বীপের কংগ্রেসী নেতারা, কলকাতা থেকেও একজন বিখ্যাত নেতা এসেছিলেন। তিনি বক্তৃতাতে বললেন, দেশ শীঘ্রি স্বাধীন হবে, তখন গান্ধীজীর স্বপ্ন সফল হবে, গান্ধীজী বলেছেন। লাঙ্গল যার জমি তার। যে লাঙ্গল ধরবে সেই হবে জমির মালিক। যখন স্বরাজ আসবে তখন কৃষকদের দুঃখ ঘুচে যাবে। সমস্ত শোষণ, নির্যাতন,

শাসনের অবসান হবে।

কংগ্রেস নেতারা আশ্বাস দিলেন, দেশ স্বাধীন হলে চাষীদের উপর থেকে সমস্ত মামলা মকদ্দমা তুলে নেওয়া হবে, উচ্ছেদ বন্ধ করা হবে। এখন যেন চাষীরা হাঙ্গামা করে স্বাধীনতাকে বানচাল করে না দেয়। তারা অনেক সহ্য করেছে, আর কিছুদিন তারা সহ্য করুক, তারপর স্বরাজ এসে গেলে চাষীর আর কোনো ভাবনা থাকবে না।

কংগ্রেসীরা মিটিং করে চলে গেল। কিন্তু ডায়মণ্ডহারবারের কোর্টে আর ইউনিয়ন বোর্ডের কোর্টে চাষীদের নামে জোতদার-জমিদাররা নানান ধরণের মামলা দায়ের করতে লাগল।

চাষীরাও তাদের আন্দোলন বন্ধ করতে পারল না। দল বেঁধে ধান কেটে নিজেদের খামারেই ধান তুলতে লাগল। জোতদাররা গিয়ে থানাতে ডায়্যারি করতে লাগল। আর পুলিশ চুরি ডাকাতি নানান রকমের মিথ্যা অভিযোগ এনে শত শত কৃষককে গ্রেপ্তার করতে লাগল।

রাত্রিগুলি সুন্দরবনে আতঙ্ক হয়ে উঠল। জমিদার জোতদারদের কাছারিতে কাছারিতে পুলিশ আছে, গুণ্ডা আছে, ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি আছে। তারা দিনের বেলা গা ঢাকা দিয়ে থাকে। আর রাতের বেলা চাষীদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে ঘরবাড়ীগুলি ছড়ানো ছিটোনো, জমাট-বাঁধা গ্রাম নয়, তাই পুলিশ, গুণ্ডা আর ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি বা সেবাদলের খুব সুবিধা হয়।

প্রতিদিন কৃষকসমিতির কাছে অজস্র ভয়ঙ্কর সংবাদ এসে পৌঁছোয়।

॥ ৩৬ ॥

রাতের বেলা মানুষের আর্ত চীৎকার শুনে ঘুম ভেঙ্গে যায় গণপতির। বাইরে এসে দেখে দূরে কোথাও দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, কারও ঘর পুড়ছে। পরের দিন খবর পায় দূরের গ্রামের কোন এক নিরীহ চাষীর ঘরে চড়াও হয়েছিল ভি. ডি. পার্টির লোকেরা। বাড়ীর লোককে মারধোর করেছে, দামী জিনিসপত্র যা ছিল নিয়ে পালিয়েছে আর যাবার সময় ঘরে আগুন দিয়ে গিয়েছে। কোদাল, গাঁইতি, শাবল দিয়ে চাষীর ঘর ভেঙ্গে

মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

একদিন রাত্রে ভি. ডি. পার্টির লোকেরা চন্দনপিঁড়ির এক চাষীর বাড়ীতে চড়াও হলো। তার বাড়ীর কাছাকাছি কারও বাড়ী ছিল না। রাত দুপুরে ভি. ডি. পার্টির জন দশেক লোক তার বাড়ীতে চড়াও হয়ে সেই চাষীকে আর তার ছোটো ছেলেটিকে খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেঁধে সেই চাষীর বৌকে পর পর দশজনে ধর্ষণ করল।

জোতদার আর পুলিশের সাহায্য আর সমর্থন পেয়ে ভি. ডি. পার্টির লোকেরা হত্যা-ধর্ষণ-লুণ্ঠনের এক বিভীষিকার রাজত্ব তৈরি করে ফেলল। ভি. ডি. পার্টির কয়েকটা বন্দুকও ছিল। গুলি করেও কয়েকজন কৃষককে ওরা হত্যা করল। তখন কৃষক-সমিতি ঠিক করল, পঞ্চাশজন করে তিনটি বাহিনী করে কৃষকসমিতি সারারাত সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে টহল দিয়ে বেড়াবে। ওরা খবর পেল ভি. ডি. পার্টিতে সর্বসাকুল্যে জন পঞ্চাশেক লোক আছে। ভি. ডি. পার্টিকে শেষ করতে না পারলে জমিদার, জোতদারদের কাছে হার স্বীকার করে আবার তাদের জুতোর নীচে থাকতে হবে।

কৃষকসমিতির বল্লমবাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে সারারাত্রি সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। একটা দল ভি. ডি. পার্টিকে একদিন ধরে ফেলতে ফেলতেও পারল না, তবে জনকয়েককে চিনতে পারল। ভি. ডি. পার্টি লুকোচুরি খেলতে লাগল কৃষকসমিতির বাহিনীর সঙ্গে। একদিন অন্ধকার মাঠে মুখোমুখি সংঘর্ষে আসতে হলো ওদের। ভি. ডি. পার্টির কাছে বন্দুক ছিল। বন্দুকের গুলিতে কৃষক-বাহিনীর একজন মারা গেল।

গভীর শোক এবং বেদনা নেমে এল কৃষকসমিতিতে। মৃতদেহকে সামনে নিয়ে বিরাট মিছিল বার করল কৃষকসমিতি, গ্রামে গ্রামে মিছিল থামিয়ে মিটিং করল। সমিতির এক একজন নেতা এক একটা মিটিংয়ে অশ্রুরুদ্ধ বেদনায় বক্তৃতা দিল। ওরা জমিদার জোতদারদের সৈন্যবাহিনী ভি. ডি. পার্টি বা সেবাদলের কীর্তিকলাপ বর্ণনা করল, সমস্ত মানুষকে এর প্রতিরোধ করবার জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ এবং সচেতন হতে বলল।

তারপর এক রাত্রে ভি. ডি. পার্টি চন্দনপিঁড়িতে একটা বাড়ীতে হামলা

করলে কৃষকবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলল। ভি. ডি. পার্টিতে ছিল তখন জন পনের লোক। বেদম পিটল তাদের কৃষকবাহিনী, বাপের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিল। কারও দাঁত ছেড়ে গেল, অনেকের ডান হাত ভেঙ্গে দেওয়া হলো, ঘুঁষি মেরে নাক ভেঙ্গে দেওয়া হলো, মারের চোটে রক্ত বমি করে গোটা তিনেক অজ্ঞান হয়ে গেল। কৃষকবাহিনী সেদিন দলে ভারি ছিল। তাই কৃষকসমিতির জনা দশেক চলে গেল ওই ভি. ডি. পার্টির পনের জনের বাড়ীতে আগুন দিতে। দারুণ মার খেয়ে মৃতপ্রায় তিনটে লাশ বয়ে নিয়ে ভি. ডি. পার্টির ওই কজন লোক বাড়ী গিয়ে দেখল ঘর-বাড়ী সব পুড়ে ছারখার হয়ে আছে। তারপর ভি. ডি. পার্টির অত্যাচার মাসখানেক একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

ভি. ডি. পার্টি আবার শক্তি সংগ্রহ করতে লাগল। ভি. ডি. পার্টির ক্যাপ্টেনের নাম জেনে নিয়েছিল কৃষকসমিতি, সুযোগ পেলে বুলবুল খাঁয়ের ব্যবস্থা করার প্রতিজ্ঞা রইল কৃষকসমিতির।

লয়ালগঞ্জের পঞ্চাশ জন চাষী নানান বাধাবিঘ্নের মধ্যে দিয়ে ধান শেষ পর্যন্ত নিজেদের খামারে তুলেছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। খামারে তোলা ধান ঝেড়ে ঘরে তুলে ফেলল ওরা। তারপর গণপতি গেল জোতদারদের কাছে। বলল, 'যদি 'প্রাপ্যধান বুঝিয়া পাইলাম.' লিখে নীচে সই করে তারিখ দিয়ে দেন, তাহলে ধান দোব, না হলে ধান পাবেন না।' জোতদাররা রসিদ লিখে দিয়ে তিনভাগের এক-ভাগ ধানই নিল। 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো', এই প্রবাদ বোধ হয় তাদের মনে এসেছিল, কিন্তু ধানটা বাগিয়ে নিয়ে কোর্টে গিয়ে ভাগ-চাষীর নামে মামলা ঠুকে দিয়ে এল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কয়েকজন কৃষক তেভাগা আদায় করে ছাড়ল, বাজে আবওয়াব দিল না, দেড়বার দিল না, কৃষকসমিতির বাহিনী যে ভি. ডি. পার্টির লোকেদের বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে ভেঙ্গে, ওদের আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ল, এতে করে বিরাট আশা আর প্রেরণা ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। চাষীদের মন থেকে ভীরুতা, দ্বিধা কেটে যেতে লাগল। প্রায় সমস্ত ভাগচাষী, ক্ষেতমজুর কৃষকসমিতির সদস্য হতে লাগল। কৃষকসমিতিকে চাঁদা দিল চাষীরা বস্তা বস্তা ধান দিয়ে।

কৃষকসমিতি হয়ে উঠল গ্রামগুলির প্রাণকেন্দ্র।

চাষী স্বামীস্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। তারা দুজনেই এসে কৃষকসমিতির কাছে অভিযোগ পেশ করল।

স্ত্রী বলল, 'ও আমাকে মেরেছে।'

কৃষক নেতা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন মেরেছে?'

'ওকেই শুধাও।'

স্বামীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তুমি মেরেছ কেন?'

'কাজ করে বাড়ী এসে দেখলাম তখনও ভাত-রাঁধা হয় নাই।'

কৃষকনেতা বলল, 'তাই বলে তুমি মারবে? আমরা তো বলেছি কোনো সময়ে, কোনো কারণেই মেয়েদের অপমান করা বা ওদের গায়ে হাত তোলা চলবে না, এমনিতেই তো ওদের ওপর কত দুঃখের বোঝা চাপানো আছে। ঠিক আছে, তুমি কৃষকসমিতির সামনে তোমার বৌয়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলো, আর কখনো এমন কাজ করবে না।'

সমিতির চাপে শেষ পর্যন্ত সে ক্ষমা চায়, বৌয়ের মুখে হাসি ফোটে, সমিতির অন্য চাষীরা হেসে ওঠে। স্বামীস্ত্রী হাসতে হাসতে খুনসুটি করতে করতে ঘরে ফেরে।

কৃষকসমিতি ঠিক করল নদীর বাঁধ বা মাছের ঘেরির দুর্বল ভেড়ি বাঁধগুলো কৃষকসমিতি নিজের গরজে, নিজের স্বার্থেই এবার মাটি ফেলে সারাবে। কেননা জমিদাররা এমনিতেই বাঁধ-ফাঁদ সম্পর্কে উদাসীন। তার উপর এবার তো চাষীদের পথে বসাবার জন্যে বাঁধে এক কোদালও মাটি ফেলবার ব্যবস্থা ওরা করবে না। অতএব কৃষকসমিতির ডাকে চাষীরা মেয়ে পুরুষ প্রত্যেকে একদিন করে পরিশ্রম দান করল বাঁধ তৈরির কাজে। মাসখানেকের চেষ্টায় বাঁধের দুর্বল জায়গাগুলি আবার শক্ত হয়ে উঠল।

সামাজিক আচার-আচরণ উৎসব আনন্দেও কৃষকসমিতির মতামতই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হতো। দুই বেয়াইয়ের ঝগড়াও কৃষকসমিতি মিটিয়ে দিত। জমিদারকে কাছারিতে কোনো রকম সিধে বা নজরানা দেওয়া একেবারে উচ্ছেদ করে ছাড়ল কৃষকসমিতি, জমিদার বা কাছারি বাড়ীর সমস্ত উৎসব বর্জন করল, নিজেদের উৎসবে জমিদার নায়েবদের নিমন্ত্রণ করার রীতিও তুলে দিল।

আর কৃষকসমিতির সঙ্গে জমিদার পক্ষের লোকেদের ছোটো-বড়ো দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই রইল। এখন থেকে কৃষকসমিতি গুপ্তচরদের ধরবার দিকে সজাগ দৃষ্টি দিল, নতুন স্লোগান চালু করল :

'দালালদের হালাল কর।'

॥ ৩৭ ॥

১৯৪৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি কাকদ্বীপের কাছে বেরার লাটের চাষীরা মিছিল করে জমিদারের কাছারিতে যাত্রা করল জমিদারের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া জানাতে। চাষীরা যখন স্লোগান দিতে দিতে কাছারির কাছাকাছি এসেছে সেই সময়ে বেরা-জমিদার নিরস্ত্র চাষীদের উপর গুলি ছুড়ল। দু জন চাষী লুটিয়ে পড়ল। এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে গণপতি-সাগররা বেরার লাটে গিয়ে উপস্থিত হলো। কাছারিতে লোকজন বেশি থাকে না। সন্ধের পর চাষীরা কাছারিতে ঢুকে জমিদার আর তার ছেলেকে ধরে নিয়ে এল চাষীদের আড্ডায়। তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। খাঁড়া, রামদা, বগীদা নিয়ে এসে সে ঘরের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখলো চাষীরা।

চাষীবা নেতা বৃন্দাবন ঘোষকে বলতে লাগল, 'আপনি বলুন, ওদের বাপবেটাকে আজ এইখানে বলি দিয়ে দিই।'

অস্থির অধৈর্য হয়ে উঠল ওরা।

বৃন্দাবন কিন্তু তাতে সম্মতি দিতে পারলেন না। বললেন, 'মারধোব কর, কিন্তু খুন টুন কোরো না। তাতে বিশ্রী বিপদ হবে।'

একজন চাষী বলল, 'আর ও যে গুলি করে আমাদের দু জনকে খুন করেছে!'

চাষীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, 'হোক বিপদ, তবু আপনি বলেন,.এ পাঁঠা দুটোকে শেষ করে দিই।'

বৃন্দাবন তা বলতে পারলেন না।

অবশেষে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে, বেদম মার দিয়ে ওদের ছেড়েই দেওয়া হোক। প্রচণ্ড মার দেওয়া হোলো জমিদার বাপবেটাকে।

আহত রক্তাক্ত করে ওদের ছেড়ে দেওয়া হলো। সেই নিয়ে পরে কেস করে জমিদার, বন্দুক চালাতে সে নাকি বাধ্য হয়েছিল আত্মরক্ষার তাগিদে।

কলকাতা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা আসতে লাগলেন। মাঝে মাঝে এসে কৃষকসমিতির মেম্বারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। রাতের বেলা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বৈঠকী মিটিং করে বোঝাতে লাগলেন যে, সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তির জোরে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে না নিলে কৃষকরা বাঁচবে না, জমিদার জোতদারদের পায়ের তলায় চিরকাল পড়ে থাকতে হবে।

গণপতি এখন আর বাড়ীতে থাকে না। তার নামে পুলিশের ওয়ারেন্ট আছে ব'লে তাকে দিনের বেলাটা প্রায়ই লুকিয়ে থাকতে হয়। রাতের বেলা সে গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং করে করে বেড়ায়।

একদিন সন্ধেবেলা কৃষক সমিতির সভ্য বুধাখালির কুমুদ গণপতির গোপন আবাসে এসে পৌছল। কুমুদ কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। পার্টির 'ডাক' নিয়ে আসত, কাগজপত্র পত্র-পত্রিকা নিয়ে আসত।

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার কুমুদ, তুমি যে একেবারে আমার গুহাতে চলে এসেছে, কি খবর বলো।'

কুমুদ বলল, 'একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'কে লোক? কি দরকার?

'কে লোক সে তুমি দেখলে বুঝবে। দরকার, আমাদের আন্দোলন নিয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে চান।'

'কোথাকার লোক?'

'কলকাতার'

'তুমি যখন খোঁজ এনেছ, তখন নিশ্চয়ই বিশ্বাসী লোক। তা কোথায় আছে, নিয়ে এসো।'

'তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।'

কুমুদ বাইরে চলে গেল।

গণপতি বসে ভাবতে লাগল, 'কে হতে পারে! কুমুদ কেমন যেন একটু

রহস্য সৃষ্টি করে গেল।'

কিছুক্ষণ পরে কুমুদ একজন চশমা-পরা মানুষকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

গণপতি দেখতেই চিনতে পারল মানুষটিকে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গণপতি। বলল, 'আনন্দবাবু, আপনি এতদিন পরে এলেন, আমি যে কতদিন ধরে আপনার কথা ভাবছি। আমার কতদিন মনে হয়েছে আপনি নিশ্চয়ই আসবেন। বসুন আপনি, দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন?' বলে খেজুরের চাটাইয়ের উপর ভাঁজ করে একটা পরিষ্কার কাপড় পেতে দিল। কাপড়টা তুলে রেখে শুধু চাটাইয়ের উপর বসলেন আনন্দ।

আনন্দ বললেন, 'গণপতি, তোমার কথা আমার মনে ছিল। সেদিন কলকাতার পার্কে বসে তোমার কথা অনেক শুনেছিলাম, কিন্তু আমার কথা কিছুই বলি নি। আজকে বলি শোনো। আমি কমিউনিস্ট পার্টির লোক। উত্তর বাংলায় আমার বাড়ী। আমিও চাষী পরিবারের ছেলে। কিন্তু লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। পড়াশুনোয় খারাপ ছিলাম না ব'লে কলকাতায় এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে থাকবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করেছি। ছাত্রজীবন থেকেই কমিউনিস্ট পার্টিতে আছি।'

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ে থা করেছেন? ছেলেপুলে আছে?'

'না বিয়ে করি নি, বিয়ে থা করবার ইচ্ছেও নেই।'

গণপতি আনন্দ রায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। দৃষ্টিকে একাগ্র করে আর একবার ভালো করে দেখতে লাগল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। মাথার চুল হালকা হয়ে গেছে। চোখদুটি শান্ত, স্নিগ্ধ, করুণাময়।

আনন্দও গণপতির দিকে তাকিয়ে রইলেন। ইতিমধ্যেই তিনি গণপতি সম্বন্ধে সমস্ত কথা শুনেছেন। এখন মানুষটির দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। সাধারণ উচ্চতা এবং চেহারার মানুষ। মুখখানি বিনয় এবং হাসিতে মাখামাখি। সুগঠিত নাকের নীচে মস্ত গোঁফ। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে সে খিক্ খিক্ করে হেসে ওঠে, তখন তাকে মেয়েদের মতো লাজুক আর কোমল মনে হয়। কামানো দাড়ি আর মাথার চুল ছোটো করে ছাঁটা। ওর শরীরে লেশমাত্র মেদ নেই। হাড়ে আর মাংসে ছিপ্‌ছিপে শরীর। কিন্তু বুক আর হাত পেশল। হাতের

থাবা রুক্ষ, শক্ত, শিরাবহুল। এ হাত ভারতের কৃষকের লাঙ্গল-চালানো, বলদের লেজ-মোচড়ানো, কোদাল-চালানো, ঘাঁটাপড়া শক্ত হাত, এ হাত একদিন অস্ত্র ধরবে অত্যাচারী এবং শোষকদের বিরুদ্ধে। গণপতির চোখে একবার চোখ রাখলেন আনন্দ। এ কী চোখ! এ চোখের দিকে যে তাকানো যায় না! বেদনা, যন্ত্রণা, গভীর শোক আর উগ্র ক্রোধে মিলে এ চোখ সমুদ্রের আগুনের মতো; এ যেন কান্নার সমুদ্রে আগুন লেগেছে। এ চোখ কখনো সাপের মতো জ্বলে উঠছে, কখনো পাখির চোখের মতো বেদনায় সজল হয়ে উঠছে। এ চোখের দিকে তাকালেই থমকে দাঁড়াতে হয়, বুঝতে পারা যায়, এখানে চ্যাংড়ামি চলবে না, এখানে একটু সমঝে চলতে হবে।

গণপতি আনন্দের দিকে একটা বিড়ি আগিয়ে দিয়ে বলল, 'খান।'

আনন্দ বললেন,' আমি বিড়ি খাই না গণপতি, জীবনে তো এক পয়সা রোজগার করি নি, বিড়ি টিড়ি খাবার পয়সা জোটাব কোথা থেকে, তাই—'

কুমুদকে জিজ্ঞাসা করল গণপতি, 'ওঁর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছ তো?'

'হ্যাঁ'

গণপতি বলল, 'তা আজ উনি এখানেই থাকুন না, এ বাড়ীতেই চান করবেন, খাবেন।'

কুমুদ বলল, 'আজকে কৃষকসমিতিতে উনি বক্তৃতা করবেন।'

গণপতি বলল, 'কৃষকসমিতির মিটিংয়ে আমিও তো যাব।'

আনন্দ বললেন, 'ঠিক আছে। আমি আজ গণপতির কাছে থাকি। কৃষকসমিতির মিটিং তো রাত্রে। আমরা দুজনে একসঙ্গেই মিটিংয়ে যাব।'

কুমুদ তখন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তারপর বলো গণপতি, তোমরা এর পরে কী করতে চাও?'

'আমরা ক্ষেতমজুরদের মজুরী বাড়িয়েছি। আসছে ধানকাটার সময় তেভাগা আন্দোলন আরম্ভ করব।'

'শুনলাম তোমার গাঁয়ে পঞ্চাশ জন নাকি এবারে তেভাগা চেয়েছিল। তেভাগা নাকি জোতদাররা দিতে বাধ্যও হয়েছে। কিন্তু তোমাদের নামে

নাকি কোর্টে মামলা করেছে, তোমাদের উচ্ছেদ করতে চায়।'

'হ্যাঁ কমরেড, আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, এখন আমরা কী করব আর কী না করব। আপনি এসেছেন, খুব ভালো হয়েছে।'

'কেন? বৃন্দাবন তো প্রায়ই আসে এখানে। সাধুচরণ, বিশ্বনাথও তো আছে। অবশ্য আমার সঙ্গে আরও দুজন কমরেড এসেছে, মধু হালদার আর বিদ্যুৎ বসু।'

'ভালোই হয়েছে, আমরা কি করব না করব, কেমন করে এগোব, আপনারা বলে দিন।'

'মামলাগুলো চালিয়ে যেতে হবে, তবে মামলাতে হারলেও, জমি থেকে উচ্ছেদ করতে এলেও ঠেকাতে হবে। আর আগামী ধানকাটার সময় তেভাগা-আন্দোলন করতে হলে সমস্ত চাষীকে আরও সজাগ, আরও সংঘবদ্ধ করতে হবে।'

'সে চেষ্টা আমরা প্রাণপণে করছি। প্রতিদিন মিটিং করছি।'

আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের গেরিলা-বাহিনীতে কত লোক আছে?'

'সব ধরে প্রায় শ'পাঁচেক লোক হবে।'

'তাদের মধ্যে খাঁটি লোক কজন ব'লে তোমার মনে হয়।'

'শ'দুয়েক, শ'দুয়েক চাষী ঠিক যোদ্ধা, যাকে বলে গেরিলা।'

'কি কি অস্ত্র সস্ত্র তোমাদের আছে?'

'বল্লম, লাঠি আর তীরধনুক'

'মেয়েদের বাহিনীতে কতজন আছে?'

'মেয়েদের বাহিনীতে আছে জনা পঞ্চাশেক'

'তারা অস্ত্র চালাতে শিখেছে?'

'জনা পঁচিশেক লাঠি আর বল্লম চালাতে পারে। বাদ বাকীরা শিখছে।'

'আরও বেশি মেয়েকে শেখানো যায় না?'

'চেষ্টা করা হচ্ছে, মানে গাঁয়ের মেয়ে তো। এখনও লজ্জা আছে, ভয় আছে। তা পরে মাথার ওপরে আছে সংসার। ছেলে মেয়ে আছে, রান্না-বান্না আছে, এসব কাজে তাই ঠিক আসতে পারছে না।'

'মেয়েরাও যদি অস্ত্র চালানোটা শিখে রাখতে পারত তাহলে বড্ড ভালো

হতো। অন্তত নিজেদের তারা ওদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত।'

এমনি ভাবে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো।

সন্ধেবেলা দুজনে গেলেন মিটিংয়ে। গোপন মিটিং। সেখানে আর দু জন কমিউনিস্ট নেতা মধু হালদার আর বিদ্যুৎ বসুর সঙ্গে দেখা হলো গণপতির।

সুন্দরবনের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হলো। ঠিক হলো, মধু হালদার আর বিদ্যুৎ বসু সুন্দরবনেই থেকে যাবে। চাষীদের মধ্যে থাকবে এবং কৃষকসমিতির কাজ করবে।

দিনকয়েক থেকে আনন্দ রায় চলে গেলেন। বলে গেলেন, তিনি আবার আসবেন। মাঝে মাঝে এসে খোঁজখবর নিয়ে যাবেন।

কংগ্রেসী নেতারা আবার এল। আবার মিটিং করে বক্তৃতা দিয়ে গেল। বলে গেল, চাষীদের সব মকদ্দমা তুলে নেওয়া হবে। ভাগচাষী উচ্ছেদ বন্ধ করা হবে। সরকারী কর্মচারীর সভাপতিত্বে জমিদার জোতদার আর ভাগচাষীদের প্রতিনিধি নিয়ে সালিসি বোর্ড গঠন করে ভাগচাষী উচ্ছেদ বন্ধ করা হবে।

এদিকে চাষের সময় এসে গেল। অনেক ভাগচাষীকে জোতদার জমিদাররা উচ্ছেদ করার হিংস্র চেষ্টা করতে লাগল। কৃষকসমিতি গায়ের জোরে জমিতে চাষীর দখল বজায় রাখতে সাহায্য করল। যে সব চাষী কৃষকসমিতির শত্রুতা করছিল তারাই কৃষকসমিতির সভ্য ভাগচাষীর ভাগের জমিতে লাঙল নামাবার চেষ্টা করত। কিন্তু কৃষকসমিতি তাদের ভয় দেখাত, দরকার হলে মারধোরও করত। এমনি করে ভাগচাষীরা চাষের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল।

লয়ালগঞ্জের যে পঞ্চাশজন তেভাগা আদায় করেছিল তাদের কয়েকজনের নামে উচ্ছেদের নোটিস এল।

অভয় সাঁতরার কাছে নোটিস জারির পেয়াদা এলে অভয় বলল, 'জমি আমার একলার নয়, আমার ভাই আর আমি ভাগে চষি। আগে জমি ভাগ কর, তারপরে আমার অংশটুকু থেকে আমাকে উচ্ছেদ কর।'

পেয়াদা পড়ল বিপদে। পেয়াদাকে সাহায্য করতে এল অভয়ের জোতদার আর তার লেঠেলরা, এল ভি. ডি. পার্টির লোকেরা। কিন্তু

ততক্ষণে কৃষকসমিতির জঙ্গী কর্মীরাও জমায়েত হয়েছে।

কৃষকসমিতির পক্ষ থেকে বীরচন্দ্র বলল, 'ওসব নোটিস ফটিস বুঝি না, জমি থেকে চাষীকে উচ্ছেদ করা চলবে নি।'

জোতদার বলল, 'এ কোর্টের হুকুম, এ তো আর মগের মুল্লুক নয়।"

বীর বলে উঠল, "মগের মুল্লুক তো তোমরাই করে তুলেছ হে। মগের মুল্লুক নয় বলেই তো উচ্ছেদ করা চলবে নি। কোন বাপের বেটা আছে আসুক, দেখি, কেমন করে উচ্ছেদ করে।'

লেঠেলরা লাঠি উঁচিয়ে আগিয়ে এল। কৃষকসমিতির লেঠেলদের সঙ্গে মারামারি লেগে গেল। জমিদারদের লেঠেলরা জখম হলো, রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে বাধ্য হলো।

এমনি ঘটনা ঘটতে লাগল সারাটা অঞ্চল জুড়ে।

জমিদারদের লেঠেল আর কৃষকসমিতির লেঠেলদের মধ্যে এমনি যখন লড়াই চলছে সমস্ত অঞ্চল জুড়ে, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করে চাষীরা যখন চাষের কাজ শেষ করে এনেছে জমিতে জমিতে, শ্রাবণমাস শেষ হয়ে এসেছে, তখন বৃটিশ বণিক তার মানদণ্ডটি বজায় রেখে রাজদণ্ডটি কংগ্রেসের হাতে দিয়ে দিল। তথাকথিত স্বাধীনতা এল দেশে। সমস্ত ভারতবর্ষ বিপুল উৎসবে মেতে উঠল। তখন কি উচ্ছ্বাস! কি উন্মাদনা! কিন্তু সুন্দরবনে স্বাধীনতা আন্দোলনেরও যেমন বিশেষ তোড়জোড় ছিল না, পনেরই আগস্টেও তেমনি সেই উচ্ছ্বাসও ছিল না। তবে বন্দী কৃষক নেতারা মুক্তি পেয়েছিল পনরোই আগস্টের উৎসব উপলক্ষে। কিন্তু সুন্দরবনের সাধারণ অবস্থার বিশেষ হেরফের হয় নি। কেবলমাত্র একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল, যে জমিদার এবং জোতদাররা এতদিন বৃটিশের বশংবদ দাস ছিল আর কংগ্রেসকে শত্রু মনে করত, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করত, তারাই রাতারাতি হঠাৎ কংগ্রেসের ভক্ত হয়ে গেল। অনেক জমিদার বা জোতদার খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি, এমন কি খদ্দরের টুপি পর্যন্ত পরতে আরম্ভ করল।

ধানকাটার সময়ে আবার গণ্ডগোল আরম্ভ হলো। এবারে কৃষক-সমিতি ছিল অনেক বেশী সংগঠিত। গতবারে লয়ালগঞ্জের মাত্র পঞ্চাশজন ভাগচাষী তেভাগা চেয়েছিল, এবারে সমস্ত অঞ্চল জুড়ে প্রায় সব ভাগচাষীই

তে-ভাগা চেয়ে বসল। অমনি জোতদার-জমিদারদের পক্ষে লেঠেল, ভি. ডি. পার্টি আর পুলিশ এসে উপস্থিত হলো সুন্দরবনে। প্রত্যেক কাছারিতে কাছারিতে দুচারজন করে গুণ্ডা আর পুলিশ মজুত রইল। আর ভি. ডি. পার্টি ওরফে সেবাদলের লোকেরা কৃষকদের সর্বনাশ করবার জন্যে সবসময়েই সুযোগ সন্ধান করতে লাগল।

গণপতি ওর খামারে ধান তুলল। গণপতির অনুগামী ভাগচাষীরাও তাদের খামারে ধান তুলল।

গণপতি ধান ঝাড়ার পর হরেন্দ্রকে ডাকতে গেল।

হরেন্দ্র বলল, 'আমি যাব না, আমি তোমার বিরুদ্ধে কোর্টে কেস করব।'

গতবারে রসিদ লিখে দিয়ে হরেন ধান নিয়েছিল। কিন্তু জোতদার এ্যাসোসিয়েশনের কুপরামর্শে এবার বেঁকে বসল। জোতদার-এ্যাসোসিয়েশন হরেনকে বলেছে, 'তোমার ভাগচাষী গণপতি যত নষ্টের গোড়া। ওকে তুমি জব্দ করো। রসিদ দিয়ে আর ধান নেবে না।'

গণপতি হরেনকে বলল, 'না যান আমি পাঠিয়ে দোব, আপনি রসিদ লিখে দেন।'

হরেন বলল, 'রসিদ ফসিদ দিতে পারবু নি। বিনা রসিদে ধান দিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, আমি বিনা রসিদে ধান দিয়ে যাই, আর আপনি আমার নামে কোর্টে মামলা করে আমাকে উচ্ছেদ করে দেন। খড় ধান সব আমার খামারে পড়ে আছে। খড়ের তিনভাগের দুভাগ, ধানের তিনভাগের দুভাগ নিয়ে বাকীটা আমি ফেলে রাখব, খুশি হলে আনবেন, না হলে পড়ে থাকবে, বৃষ্টি হয়ে পচে গেলে আমার দোষ নাই।'

'কেন, তোমার দোষ থাকবে নি তো কার দোষ থাকবে?'

'আর যদি বলেন, ধান খড় বেচে আমি টাকাও দিয়ে যেতে পারি। ভি. ডি. পার্টির লোকেরা বদমাইশি করে বেড়াচ্ছে, ওরা খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে দিতে পারে। খড়টা আমি বেচে দোব, ধানটা পড়ে থাকবে, খুশি হলে আনবেন, না হলে পড়ে থাকবে।'

হরেন বলল, 'ঠিক আছে হাজিপুরের (ডায়মণ্ডহারবার) কোর্টে দেখা

হবে তোমার সঙ্গে আমার।'

চলে এল গণপতি।

খড়ো মহাজনদের কাছে সব খড়টা বিক্রি করে দিয়ে বিক্রির রসিদটা নিজের কাছে রেখে দিল গণপতি। সেই রসিদের দাম অনুসারে একের তিন অংশের দাম সে দিয়ে দেবে হরেনকে। আর সমস্ত ধানটা সে কয়াল ডেকে মাপিয়ে নিল। কয়ালের স্বাক্ষরকরা রসিদ রাখলো নিজের কাছে। কিন্তু জোতদারদের পরামর্শে হরেন এল না ধান আর খড়ের ভাগ নিতে। ধানগুলো খামারে পড়ে পড়ে শুকোতে লাগল। মাঝখানে একদিন বৃষ্টি হয়ে ওপর ওপর খানিক ধান ভিজেও গেল।

আবার একদিন গেল গণপতি হরেনের কাছে। বলল, 'বাবু, ধান কিন্তু এবার আমি ভুখা মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দোব। আপনি কিন্তু এবছরের ফসল আর পাবেন না। ভালো চান তো খড়ের দাম নিয়ে নেন, ধান তুলে নিয়ে আসুন।'

হরেন বলল, 'ধান তো তুমি পচিয়ে ফেলেছ।'

'না পচে নি, ওপর ওপর খানিক ভিজেছে। ধান তো অনেক, ধান ভেতরে ঠিক আছে।'

হরেন বলল, 'যদি আধাআধি ভাগ দাও, আমি নিতে পারি। তেভাগা নিলে জমিদাররা আমাকে মুখ করবে। কেউ তেভাগা দিল না, আমি দিলে মুশকিল হবে। ভালোবেসে তোকে নিয়ে এলাম গণ, তুই আমার আচ্ছা উপকারটা করলি!'

'অপকারই বা কি করলাম বাবু? তোমরা গরীব চাষীদের রক্ত চুষে মেরে ফেলবার জো করেছিলে যে! আর আমি তোমার ঐ অত জমি জঙ্গল হাসিল করে পরিষ্কার না করে দিলে বছর বছর এত ধান তোমার আসত কোথা থেকে?'

হরেন বলল, 'অনেক টাকা আমার লোকসান হলো। তা হোক, আমি জমিদারদের কথা অবহেলা করে তোর ধান নিতে পারব নি। আমি তোকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে ছাড়ব।'

গণপতি বলল, 'তাই চেষ্টা কোরো। কে কাকে উচ্ছেদ করে দেখব।' বলে ফিরে এল।

অধিকাংশ জোতদারই ধানের খড়ের ভাগ নিল না। ভি. ডি. পার্টির লোকেরা ঘরে আগুন দিতে লাগল, সুযোগ পেলেই কৃষকসমিতির লোকেদের মারধোর করতে লাগল। কৃষক মেয়েদের অসহায় অবস্থায় পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। খামারে খামারে ছোটো বড়ো সংঘর্ষ অবিরত চলতে লাগল।

একদিন সি প্লটে মিটিং করছিল গণপতি, এমনি সময় লঞ্চের বাঁশি এবং শব্দ শুনতে পেল। একজন লোককে পাঠাল গণপতি ব্যাপারটা কি জেনে আসবার জন্যে। সে চলে গেলে আবার আলোচনা চলতে লাগল। কিন্তু সকলের মধ্যেই একটা অস্থিরতা এল। লঞ্চ কেন এল, ব্যাপারটা জানতে না পারলে কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না। বনবিভাগের লঞ্চ হতে পারে, হতে পারে আরও পুলিশ এল সুন্দরবনে। কিছুক্ষণ পরে লোকটি ফিরে এসে জানাল, 'ডায়মণ্ডহারবার থেকে এস. ডি. ও. এল লঞ্চে।'

মিটিং চলতে চলতে একজন লোক এসে বলল, 'বীরেন দাসের কাছারিতে এস. ডি. ও. এসেছে। এস. ডি. ও. গণপতিকে আর কৃষকসমিতির নেতাদের ডেকে পাঠিয়েছে তাদের সঙ্গে আলোচনা করবে বলে।'

তখন কারও নামে ওয়ারেন্ট ছিল না। কিছুদিন আগেই সব কৃষকবন্দীদেরও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব ভয়ের কিছু ছিল না।

গণপতি তার সঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে বীরেন দাসের কাছারিতে গিয়ে হাজির হলো।

বীরেন পরিচয় করিয়ে দিল, 'এই হচ্ছে গণপতি, এখানকার কৃষক-সমিতির সাধারণ-সম্পাদক।'

গণপতি দুহাত তুলে নমস্কার জানাল। এস. ডি. ও. এই নমস্কার ন্যায্য পাওনা মনে করে স্থির দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য বজায় রাখলেন।

গণপতির সঙ্গে ছিল বিহারীলাল, রেণুপদ, অর্জুন, বীরচন্দ্র, নরেন আর সাগর। সকলের সঙ্গেই এস. ডি. ও.র পরিচয় করিয়ে দিল বীরেন।

এস. ডি. ও. বললেন, 'তাহলে তোমার নামই গণপতি?'

গণপতি বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি গণপতি। আপনি কে?'

'আমি এস. ডি. ও.'

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি চাষীদের অবস্থা জানতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ, বলো তো গণপতি, তোমাদের দাবিটা কি ?'

গণপতি বলল, 'আমরা তেভাগা চাই, আমরা জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ চাই। জমিদার, জোতদার আর নায়েবরা যে আমাদের উপরে অকথ্য অত্যাচার করে, আমরা তার প্রতিকার চাই। আপনি আমাদের কথা শুনুন, দেখুন আমরা অন্যায় কিছু বলছি কিনা।'

গণপতিরা দাঁড়িয়ে রইল। এস. ডি. ও. কাউকে বসতে বললেন না। এস. ডি. ও. এক মধ্যবয়সী যুবক। প্যান্ট-কোট-পরা সুন্দর চেহারা, অবিরত সিগারেট টানছেন।

এস. ডি. ও. বললেন, 'তেভাগা ব্যাপারটা কি ?'

'তেভাগা মানে উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুভাগ পাবে ভাগচাষী, আর একভাগ পাবে জোতদার।'

'এখানে কোথায় কোথায় ভাগচাষীরা তেভাগা নিয়েছে ?'

'এখানে সব গাঁয়ে ভাগচাষীরা তেভাগা চেয়েছে, তেভাগা নিয়েছে, কিন্তু জোতদাররা চাষীদের এই ন্যায্য দাবি মেনে নিচ্ছে না।'

'চাষীদের আর কি কি দাবি আছে ?'

'চাষীরা বাজে আবাব আর দেবে নি।'

'বাজে আবাব ?'

'হ্যাঁ, কুড়ি রকমের বাজে আবওয়াব জমির মালিক জোর করে আদায় করে ভাগচাষীদের ভাগের ধান থেকে। সে সব তারা আর দেবে না।'

গণপতি বলে যেতে লাগল, 'আর জোতদার ভাগচাষীর কাছ থেকে দেড়াবার আদায় করে। ভাগচাষী দেড়াবার দেবে না। সে এক মন ধান ধার করলে দশ সের পর্যন্ত সুদ দিতে রাজী আছে। তার বেশি দেবে না।'

'দেড়াবার কি ?'

দেড়াবার মানে ভাগচাষী জোতদারের কাছে এক মন ধান ধার নিলে নতুন ধান উঠলে ভাগচাষীকে তার ভাগ থেকে সুদে আসলে দেড় মন দিতে হয়, এটা বেআইনী।'

'কিন্তু হঠাৎ তোমরা আধাআধি ভাগের জায়গায় তেভাগা চাইছ কেন ?'

'চাষী পরিশ্রম করে জমিতে, চাষীকে খরচ করে চাষ তুলতে হয়, চাষীর পড়তা থাকে না। তাছাড়া, জমিও নানান রকমের আছে, ভালো জমিতে

পরিশ্রম করে ধান পেলাম অর্ধেক। আবার খারাপ জমিতে বেশি পরিশ্রম করে ধান কম হলো, ভাগ পেলাম মোটে অর্ধেক। আরও খারাপ জমিতে আরও পরিশ্রম করে আরও কম ধান হলো, আর অর্ধেক মোটে ভাগে পেলাম, এতে চাষীদের শুধু পরিশ্রমই সার হয়, তাই আমরা তেভাগা চেয়েছি।'

'আর দেড়াবার বেআইনী কেন?'

'আপনি আইন রক্ষার মালিক। আপনি জানেন টাকায় দুআনা সরকারী সুদ। সেই হিসেবে একমন ধানে পাঁচসের সুদ হওয়া উচিত। কিন্তু জোতদাররা একমন ধানে আধমন সুদ নেয় মানে টাকায় আটআনা সুদ নেয়, কোনো কোনো সময় ভাগচাষী বেশি বিপদে পড়লে জোতদাররা মনে মন সুদ নেয়, মানে টাকায় টাকা সুদ নেয়। এতকাল জমিদার-জোতদাররা ভাগচাষীর কাছ থেকে বেআইনী ভাবে দেড়াবার আদায় করেছে। তাহলে হিসেব করে দেখুন কত ধান জমির মালিকরা ভাগচাষীর কাছ থেকে আদায় করেছে। সেই ধানের চক্রবৃদ্ধি সুদের হিসেব ধরে এবার থেকে ভাগচাষীরা জমির মালিকের ভাগ থেকে মন প্রতি পনের সের করে ধান কেটে নেবে।'

এস. ডি. ও. ভুরু কুঁচকে তাকালেন গণপতির দিকে। তারপর বললেন, 'কিন্তু দেড়াবার দেওয়ার বদলে মনে দশ সের সুদ দেওয়া বা পাওনা বাবদ জমির মালিকের কাছ থেকে পনেরো সের করে ধান কেটে নেওয়ার কোনো আইন তো নেই।'

'আইন আপনি করান।'

'আইন না হলে কি হবে?'

'আইন করতে হবে সরকারকে।'

'কিন্তু আইন না হওয়া পর্যন্ত এই তেভাগা আদায় করা, মানে পনের সের করে ধান কেটে নেওয়া তো বেআইনী।'

'একটা কথা বলব হুজুর।'

'বলো।'

'ডাকাতি আগে করলে দশ বার বছর পরে ধরা পড়লে তার শাস্তি হয়। আইন তো একটা। তেমনি এই সামন্ত ডাকাতরা যে গরীব চাষীদের

লক্ষ লক্ষ টাকা মেরেছে, আজ আমরা সেই ডাকাতি ধরেছি, তাহলে কেনে সেই অপরাধের শাস্তি হবে না ?'

এস. ডি. ও. বললেন, 'এখন একটা কথা আমি তোমাদের বলে যাই, তেভাগা বা মন প্রতি পনরো সের ধান আদায় করা বেআইনী। বেআইনী কাজ করতে গেলে আমি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব। তোমরা বরং গাভ্‌মেণ্টের কাছে আবেদন কর, এসব গায়ের জোরে তেভাগা ইত্যাদি আদায় করা ছেড়ে দাও।'

গণপতি বলল, 'হুজুরকে অনেক নমস্কার, কিন্তু আপনার কথায় আমরা উপোস দিয়ে মরতে পারব নি। হুজুরও জমিদার-জোতদার শ্রেণীর লোক। আপনি গরীব চাষীদের পেটের আগুনের দুঃখু ঠিক বুঝতে পারবেন নি।'

'তাহলে তোমরা এই সব আন্দোলন থামাবে না !'

'কি করে থামাই বলুন আজ্ঞে !'

'আমি কিন্তু বলে যাচ্ছি, বেআইনী কাজকে আমি প্রশ্রয় দেবো না।'

'বেআইনী কাজকে যদি প্রশ্রয় না দিতে পাবেন তাহলে ধরুন তাদের যারা চাষীদেব ঘব জ্বালিয়ে দিচ্ছে, যারা চাষীব ঘরে ঢুকে মেয়েদের উপব অত্যাচাব করে, চাষীদেব খুন করে '

'খুন ?'

'হ্যাঁ, খুন ! ওরা আমাদের লোকেদেব খুন করেছে, খুন কববাব মতলবে ঘুরছে।'

'খুন তো চাষীরাই এখানে করেছে, দুলালেব খুনের তো কোনো খোঁজই পাওয়া যায় নি। সেবাদলেব একজন লোককে তোমবা এমন করে মেরেছিলে যে, সে পবে মারা যায়। তোমবা কি ভেবেছ, এই গুণ্ডামি, এই খুন জখম আমি বরদাস্ত করব ?'

গণপতি বলল, 'হুজুর, আমরা তো তা বলিনি, আমরা দুবেলা খেয়ে পরে বাঁচতে চেয়েছি, কারা আমাদের উপবাসে মারবার ষড়যন্ত্র করছে, কারা আমাদের পশু বানিয়ে দিতে চাইছে তা কি আপনি দেখবেন না ? ওদের এতকালের অন্যায় অপরাধেব বিচাব আপনি কববেন না ? ওদের ভি. ডি. পার্টির লোকেরা আমাদের লোককে যে মেরে—'

'ওসব বক্তৃতা অন্য জায়গায় দেবে। আমি বলছি, এসব বন্ধ করতে হবে।'

'আচ্ছা, আমরা তাহলে এখন যাই হুজুর।'

'কথা দিয়ে যাও।'

'আমরা মিটিং করে সকলের পরামর্শ নিয়ে আপনাকে জানাব।' ব'লে সঙ্গীসাথীদের নিয়ে গণপতি সেখান থেকে চলে এল।

কৃষকসমিতি মিটিং করে এই ঘটনার পর্যালোচনা করল। তাতে তারা অনুভব করল যে, নতুন কংগ্রেস সরকারের কাছ থেকেও তাদের প্রত্যাশা করবার কিছু নেই। এও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মতো তাদের দুঃখ কষ্টের দিকে কোনো দৃষ্টিই দেবে না। এ সরকারও জমিদার-জোতদারদের স্বার্থই রক্ষা করবে।'

কৃষকসমিতি আবার সংগঠনের কাজে উঠে পড়ে লাগল। মধু, বিদ্যুৎ, জহর, বিশ্বনাথ প্রভৃতি কমিউনিস্টরা, গণপতি, সাগর, ইন্দ্র, বিহারী প্রভৃতি কৃষকনেতারা দিনে রাতে কৃষকদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা, বৈঠকী মিটিং, জনসভা করতে লাগল।

যে সব চাষারা তেভাগা নিতে পারে নি তাদের বাড়ীর মেয়েরা তাদের দুষতে লাগল। বলতে লাগল, 'গণপতি, সাগর, দিগম্বর আরও সব ভাগচাষীরা তেভাগা আদায় করল, তোমরা কেন নিলে না? আমরা সংসার চালাতে পারি না, পেটে ভাত জোটে না, পরনে কানি জোটে না। গণপতি তো ব'লেছিল, তিনি জমিদার জোতদারের বাড়ি গিয়ে জবাবদিহি করবে।'

সুন্দরবনে মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেশি অত্যাচার সহ্য করেছে ব'লে জমিদারদের উপর তাদের আক্রোশ অনেক বেশি। কৃষকসমিতিকে তারা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সমর্থন করেছে।

তিন জমিদারের নায়েব মহিম ঘোষের সঙ্গে তার ভাগচাষীদের তেভাগা নিয়ে গণ্ডগোল চলছিল। মহিম ঘোষ পুলিশ আর লাঠিয়ালের সাহায্যে সব ধান কেটে নিয়েছিল। পরে ভাগচাষীদের ঘর জ্বালিয়ে দিল। সাতজন ভাগচাষীকে ধরে এনে পৌষমাসের এই শীতে গোরুর গোঁজে বেঁধে উলঙ্গ করে দিল। তারপর সেই সাতজনকে নিষ্ঠুরভাবে চাবুক দিয়ে পিটে ছেড়ে দিল।

সেই সাতজন চাষী কৃষকসমিতির কাছে একরাত্রে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা

করল। কৃষকসমিতি সিদ্ধান্ত করল, এর প্রতিশোধ নিতেই হবে। গণপতির বুকের ভিতরটা আলোড়িত হয়ে উঠল। লক্ষ্মীকে হঠাৎ দুর্বার ভাবে মনে পড়ল ওর। মহিম ঘোষ ওর প্রধান শত্রু। মহিম ঘোষকে শেষ করতে না পারলে মরেও ও শান্তি পাবে না। মহিম ঘোষের উপর প্রতিশোধ নেবার পরিকল্পনা করলেও হঠাৎ তার কাছারি আক্রমণ করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারল না সমিতি। কেননা মহিম ঘোষ তার কাছারিতে পুলিশের ক্যাম্প বসিয়েছে, গুণ্ডা এনে রেখে দিয়েছে, ভি. ডি. পার্টির লোকেরা আছে। ওদের কাছে বন্দুক আছে। লাঠি বল্লম নিয়ে আক্রমণ করতে গেলে মহিম ঘোষকে হয়তো ছুঁতেই পারা যাবে না। অন্য দু'একজনকে খুন করতে পারলেও নিজেদের অনেক লোককে মরতে হবে বন্দুকের গুলিতে। কৃষকসমিতি অনুভব করল, বন্দুক না হলে কোনো রকমেই চলবে না। বন্দুক চাইই-চাই।

এরই কিছুদিন পরে একদিন কৃষকসমিতি জানতে পারল, মহিম ঘোষ রাত্রিবেলা বোটে করে ধান চালান দিচ্ছে। চাষীদের বঞ্চিত করে যে ধান সে তুলে নিয়েছে সেই ধান সুন্দরবন থেকে পাচার করে দেবে। সমিতি তার সমস্ত বাহিনীকে নির্দেশ দিল, যেখানে নৌকা আছে তার আশপাশে ঝোপে-ঝাড়ে-বনে যেন তারা অস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে থাকে, ধান কোনো রকমেই পাচার করতে দেওয়া হবে না; চাষীদের ভাগ আদায় করে তবে ছাড়া হবে। নির্দেশ দেওয়া হলো, বাঁশি বাজলেই বাহিনী যেন একযোগে আক্রমণ শুরু করে। রাতের বেলা বন্দুক নিয়েও পুলিশরা সুবিধা করতে পারবে না।

যখন ধান উঠছে নৌকায়, তখন গণপতি তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে উপস্থিত হলো।

দারোগা অমর বসু কয়েকজন পুলিশ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘাটে। গণপতিকে দেখে বলল, 'কি গণপতি, এত রাতে? ব্যাপার কি হে?'

গণপতি বলল, 'আপনারা কেন?'

'ধান নেবার জন্যে।'

'ধান তো আমরা নৌকোয় তুলতে দোব না।'

'আমরা এত লোক এসেছি, কেমন করে ধান কাড়বে?'

অমর হুকুম করতেই পুলিশ কজন ঝনঝনিয়ে বন্দুক তুলে ধরল।

গণপতি বাঁশি বাজাতেই চার পাঁচ শ লোক লাঠি বল্লম তীর কাঁড় নিয়ে ছুটে এল চার দিক থেকে।

অমর বলে উঠল, 'আরে থামো থামো।'

গণপতি বলল, 'থামব কি, আগে বন্দুক ফেলুক। না হলে এখ্‌খুনি সব শেষ করে দিয়ে যাব। চাষীদের ধান লুটে নিয়ে এখন সেই ধান বিক্রি করতে পাচার করছে।'

দারোগা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি মিটে যাবে?'

'কেন যাব না? চাষীদের ধানের ভাগ দিয়ে যাও, আর মহিম ঘোষ কেন চাষীদের ধরে মেরেছে তার জবাবদিহি করুক।'

পুলিশ ছিল কম আর কৃষকদের সংখ্যা ছিল অনেক।

দারোগা সরে গিয়ে মহিমকে বলল, 'মন প্রতি একটাকা করে দিতে হবে আমাদের।'

নানান দরকষাকষি করে হাজার তিনেক টাকা নিয়ে পুলিশ সরে গেল। তেভাগা অংশ আর মন প্রতি পনের সের করে হিসেব করে যত বস্তা হয় তত বস্তা চাষীরা বয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

মহিম ঘোষ ঠিক বুঝতে পারে নি যে, ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে। চাষীরা যে এত লোককে এক জায়গায় জমায়েত করতে পারবে তাও ভাবতে পারে নি মহিম। নাহলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা সে করে রাখত।

তখন কার্তিকমাস। গোপী-গিরিতে মিটিং করছিল গণপতি। এমন সময় খবর পেল বিপিন দাসের কাছারিতে অনেক লোক জমেছে।

গণপতি জিজ্ঞাসা করল 'কি জন্যে?'

কেউ বলল, 'অফিসার এসেছে।'

কেউ বলল, 'অফিসার তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে।'

গণপতি বলল, 'আমি কৃষকসমিতির বন্ধুদের নিয়ে কাল যাব।'

খানিক পরে খবর পেল গণপতি সেটলমেন্টের অফিসার এসেছে।

পরের দিন সকালে জন দশেক লোক নিয়ে বিপিন দাসের কাছারিতে গেল গণপতি। গিয়ে দেখল একটি মাত্র দরজা খোলা রাখা হয়েছে; আর চারিদিক বন্ধ। চারিদিকে জমিদারের দারোয়ানরা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে

আছে। গণপতি বন্ধুদের নিয়ে ভিতরে ঢুকতে সরকারী কর্মচারীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কানুনগো জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি?'

গণপতি বলল, 'আমি গণপতি, আমরা এখানকার কৃষকসমিতির লোক।'

কানুনগো বলল, 'আজ সাতের দিন এসেছি। শুধু জমিদার, জোতদার, আর নায়েব গোমস্তারা আসে আর কেউ আসে না।'

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'সরকার থেকে কি হিসেবে জমি জরিপ করতে এসেছেন, দখল হিসেবে না জোত হিসেবে?'

কানুনগো জিজ্ঞাসা করল, 'তার মানে?'

'বলুন না?'

'জোত হিসেবে এবং দখল হিসেবে।'

'জোতদার ঘুষ দিতে পারবে, কিন্তু চাষীরা গরীব, তারা তো ঘুষ দিতে পারবে না।'

'ঘুষ? কি বলছ তুমি?

'গত সেটলমেণ্টে ভাগচাষীরা তাদের নামে ভাগের জমি রেকর্ড করিয়েছে, নিশ্চয় জোতদাররা সেই ভাগ-রেকর্ড কেটে দিয়ে চাষীদের উচ্ছেদ করার মতলব করছে। তাই আপনারা জোত হিসেবে রেকর্ড করে চলে যাচ্ছেন, ভাগচাষীর দখলের কোনো প্রমাণ রাখছেন না।'

কানুনগো গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনাদের যা অভিযোগ আছে লিখে জানাবেন, দরখাস্ত দিয়ে যাবেন।'

'আমরা দরখাস্ত-ফরখাস্ত বুঝি না, আমরা বুঝি লড়াই। আমরা বুঝে গিয়েছি, আপনাদের কাছে হাত-জোড় করে কোনো সুরাহা হবে না, লড়ে দখল নিতে হবে আমাদের।'

এমন সময় মহিম ঘোষ উপপত্নীকে সঙ্গে নিয়ে অন্দরের দিক থেকে বাইরের ঘরে এল। (মহিম ঘোষ বিপিন দাসেরও নায়েব) গণপতিকে দেখে বলল, 'তুমি এখানে কেন? তুমি হরেন্দ্রবাবুর, আরও অনেক জোতদারের আড়াইশ বিঘে জমির ধান নিয়ে নিয়েছ।'

'আমি তো রসিদ দেওয়া-নেওয়া করতে চেয়েছি।'

মহিম বলল 'তা এস. ডি. ও. কি বলে গেল।'

গণপতি বলল, 'এস. ডি. ও. কি বলল না-বলল তার দোষ কি আমার?'

মহিম রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠল, 'তুমি বেরিয়ে যাও।'

গণপতি হিসিয়ে উঠল, 'শুয়োরের বাচ্ছা, কেন তুমি কানুনগোকে ঘিরে রেখেছে, কেন তুমি কানুনগোকে চাষীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছ, চুপি চুপি আমাদের সবনাশ করার মতলব, আমরা বুঝি না মনে করেছ?'

রাগে আগুন হয়ে চীৎকার করে উঠল মহিম, 'বেরো হারামজাদা না হলে—'

গণপতি খেঁকিয়ে উঠল, 'জারজপুত্র, এসব মেজাজ অন্য ঠেঁয়ে দেখাবে। শালো, জবাব দাও কেন ভাগচাষীদের বঞ্চিত করে তিন হাজাব মন ধান—ভাগচাষীদেব পরিশ্রমের ধান—রাতের বেলা গোপনে চালান দিচ্ছিলে? তোমার কাছারির কাছে চাষীদের বাড়ীগুলোকে কেন পুড়িয়ে দিয়েছিলে?'

দশজন জোয়ান বলিষ্ঠ চাষী গণপতির গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিহিংসায় জ্বলছে ওরা। উপপত্নীকে নিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে মহিম। কানুনগো আর তার কয়েকজন কর্মচারী হতভম্ব হয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপ নায়েবের সঙ্গে জনকতক চাষীর দাঁতে-দাঁত-পেষা সংঘাত দেখছে, ব্যাপারটা ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারছে না।

কানুনগো মহিমকে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আমরা কি করব মহিমবাবু?'

মহিম বলল, 'আপনারা আপনাদের কাজ করে যান, যে কি বলল সেদিকে কান দেবার দরকার কি আছে?'

গণপতি বলল, 'যে সব চাষীদের ঘর পুড়িয়ে উচ্ছেদ করা হয়েছে, যে সব ভাগচাষীর ভাগের জমির স্বত্ব উচ্ছেদ করা হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের দখল দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত জরিপ হবে না।'

একটু থেমে গণপতি কানুনগোকে বলল, 'কত বছর ধরে চাষী জমি ভাগে করছে তা আপনাকে লিখে নিতে হবে, আর লাঙলপ্রতি দেড়বিঘে জমিতে চাষীকে বাস্তুভিটে করবার অধিকার দিতে হবে।'

কানুনগো বলল, 'তাহলে এখন আমি জরিপ বন্ধ রেখে চলে যাব। পরে

এসে যা হোক করা যাবে।'

গণপতি বলল, 'কিন্তু ভাগচাষীদের উচ্ছেদ করার চক্রান্ত করলে আমরা সইব না। আমরা জীবন দিয়েও লড়াই করব।' বলে সঙ্গীদের নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কানুনগো জরিপ বন্ধ রেখে ফিরে গেল।

আবার ধানকাটার সময় এসে গেল। এবারে অনেক বেশী জোরালো হলো তেভাগা আন্দোলন। জমিদার-জোতদাররাও এবার প্রস্তুত ছিল, তারা ভাগচাষীদের খামারে ধান তুলতে বাধা দিতে লাগল। গাদা গাদা পুলিশে ভর্তি হয়ে থাকল কাছারিগুলো। আরও গুণ্ডা আমদানি করল জোতদার-এ্যাসোসিয়েশন, ভি. ডি. পার্টির লোকেরা আরও সংঘবদ্ধ হলো।

•চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে রাতের বেলাতেও ধান কাটতে লাগল। কোনো জমিতে ভাগচাষী ধান কাটতে নামলে গুণ্ডা, লেঠেল কিংবা ভি. ডি. পার্টির লোকেরা হামলা করলেই ভাগচাষীর লোকেরা শাঁখ বাজিয়ে দিত। অমনি শাঁখের শব্দ লক্ষ্য করে আশেপাশের গ্রাম-গ্রামান্তরের মেয়েপুরুষ লাঠি, বল্লম, তীরকাঁড় নিয়ে লাঠির ডগায় লাল পতাকা উড়িয়ে ছুটে আসত অধিকাংশ সময়ে পালাত গুণ্ডারা। কিন্তু মাঝে মাঝে লড়াই চলত, উভয় পক্ষেই হতাহত হতো।

কৃষকসমিতি ঠিক করল, রাতের বেলাতেই যত বেশি সম্ভব ধান কেটে ফেলা উচিত। এক একদিন রাত্রে কৃষক-সমিতির সৈন্যবাহিনীর প্রহরায় আশি বিঘে পর্যন্ত জমির ধান কাটতে লাগল চাষীরা।

একদিন এক জোতদার পুলিশ দাঁড় করিয়ে তার লেঠেল আর গুণ্ডা-বাহিনী নিয়ে এসে ভাগচাষীদের জমির ধান কেটে নিচ্ছিল। ভাগচাষী প্রাণপণে শাঁখ বাজাতে লাগল। তখনই গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ঝাণ্ডা-ডাণ্ডা মিছিল ছুটে আসতে লাগল। মিছিলগুলি এসে থমকে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নামতে সাহস করল না। কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক লোক জুটে গেল।

কৃষকসমিতির একজন নেতা বলে উঠল, 'বন্ধুগণ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কী! পেটো দুশমনদের।'

অমনি রে রে করে আক্রমণ আরম্ভ করল কৃষকরা। দারুণ মারামারি

শুরু হয়ে গেল। আর পুলিশকে ঘিরে ফেলল চাষীরা। পুলিশ গুলী চালাল। জনতা থমকে দাঁড়াল। আর ছুটে পালাতে লাগল গুণ্ডারা, লেঠেলরা, পুলিশরা।

এবারে অধিকাংশ ভাগচাষীই ধান দিতে গেল না জোতদারদের কাছে, বলল, 'জোতদারদের গরজ থাকে আমাদের খামারে এসে নিজের নিজের ধান বুঝে নিয়ে যাবে।'

সে সময়ে ফ্রেজারগঞ্জ ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিল জমিদার বারীশ নন্দীর ভূতপূর্ব নায়েব যামিনীরঞ্জন চক্রবর্তী। সে সময়ে ইউনিয়ন বোর্ডের নিয়ম অনুসারে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ছিল ব্রাঞ্চ-কোর্ট করবার। জমিদার-জোতদাররা সেই প্রেসিডেন্টের কাছে চাষীদের নামে মামলা করতে লাগল। প্রতিদিন দফাদার চৌকিদার এসে চাষীদের কাছে সমন জারি করতে লাগল।

কৃষকসমিতির মিটিং বসল। সেই মিটিংয়ে মধু হালদার বলল, 'কোর্টের কোনো মূল্য নেই আমাদের কাছে। যে সরকার আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে পুলিশ পাঠিয়ে বন্দুকের গুলী দিয়ে হত্যা করতে চায়, সে-সরকারের কোর্ট আমরা মানি না।'

অতএব সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে, কোর্ট বর্জন করা হবে। ইউনিয়ন-বোর্ডের কোর্ট বর্জন করা হবে, ডায়মণ্ডহারবারের মহকুমা-কোর্টও বর্জন করা হবে। কৃষকসমিতি সিদ্ধান্ত নিল, 'আমরা কোর্ট মানি না, আমরা কোর্টের সমন, কোর্টের বিচার গ্রাহ্য করি না, ভাগচাষীকে উচ্ছেদ করতে এলে আমরা মেরে তাড়িয়ে দোব। আমরা আমাদের অঞ্চলে স্বাধীন হয়ে থাকব। ওসব কোর্ট-কাছারি থানা-পুলিশের ধার ধারি না আমরা।'

কিন্তু কৃষক-নেতাদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ-বাহিনী ঘুরতে লাগল গ্রামে গ্রামে। অনেকেই গা ঢাকা দিল। কিন্তু অনেকেই ধরা পড়ে গেল। ধৃত কৃষক নেতাদের কয়েকজনের সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল। আবার কয়েকজন ছাড়াও পেলেন।

॥ ৩৮ ॥

দেখতে দেখতে ১৯৪৮ সাল এসে গেল। কৃষক এবং জোতদারদের

লড়াই চলতেই লাগল সারা সুন্দরবন জুড়ে। এ লড়াই বছরের অন্য সময়ে মন্দীভূত হয়ে পড়ে, কিন্তু প্রখর হয়ে ওঠে ধান-রোপন আর ধান-কাটার সময়। মহকুমা-আদালতে কৃষকদের বিরুদ্ধে একটার পর একটা মিথ্যা মামলা চলতেই লাগল। কৃষকরা কোর্ট বর্জন করাতে জোতদাররা এক তরফা ডিক্রি পেতে লাগল। পুলিশ পেয়াদা নিয়ে এসে তারা জমির উপর দখল নিতে চাইল। কৃষকসমিতির সঙ্গে লড়াই চলতে লাগল সে-নিয়ে। কৃষকরা গ্রেপ্তার হতে লাগল। ভি. ডি. পার্টি, গুণ্ডাদল, লেঠেলরা ঘর জ্বালিয়ে দিতে লাগল, অসহায় চাষী মেয়েকে পেলেই ধর্ষণ করতে লাগল।

বুধাখালির কুমুদ কলকাতার কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক অফিস থেকে বুলেটিন আনত কৃষকসমিতির কাছে। বুলেটিনে লেখা থাকত, রক্তের বিনিময়ে রক্ত চাই, দালালদের হালাল কর, জমিদারদের শেষ কর। ১২নং পর্যন্ত বুলেটিন এসেছিল, তারপর বুলেটিন আসা বন্ধ হয়ে গেল।

এমনি যখন অবস্থা চলছে সুন্দরবনে তখন ১৯৪৮ সালের আগস্ট মাসে কমিউনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেস সরকার নিষিদ্ধ করে দিল। বাংলা তথা সমস্ত ভারতের বহু কমিউনিস্ট নেতা গ্রেপ্তার হলেন। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকা আগেই বেআইনী হয়ে গিয়েছিল, পার্টি ব্যানড্ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'স্বাধীনতা' কাগজের অফিস বন্ধ হয়ে গেল বটে, কিন্তু গোপন কার্যালয় থেকে প্রায় নিয়মিত স্বাধীনতা বেরত। বুলেটিন আসাও বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সুন্দর-বনের সংগ্রাম থেমে রইল না। প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত উদ্বেগ, যন্ত্রণা, আঘাত আর প্রতিঘাতের কঠিন দ্বন্দ্বে প্রজ্বলিত হয়ে রইল।

বুধাখালিতে তখনও তেমন কিছু ঘটে নি। তবু এখানকার জোতদাররাও সাবধান হচ্ছে, প্রস্তুত হচ্ছে। মাঝে মাঝেই পুলিশ আসছে কাছারিতে।

চাষীদের মধ্যেও উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে। খবর আসছে দক্ষিণের চাষীদের মরণ-পণ লড়াইয়ের। রাতের বেলা মিটিং হচ্ছে কারও না কারও বাড়ীতে। উত্তেজনা এবং উদ্বেগের শেষ নেই। ঠিক হয়েছে আসছে ফসল-তোলার সময়ে তেভাগা-আন্দোলন শুরু করবে ওরা। জান দিয়েও ধান রক্ষা করবে। অত্যাচার আর সহ্য করা হবে না।

গাঁয়ের ভিতরে ভিতরে যখন এমনি করে বিদ্রোহ ধুঁইয়ে উঠছে, চাষীরা যখন ওদের ভয় কাটিয়ে ফেলছে, মুখে মুখে যখন একই আলোচনা

মনে মনে ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের মতো, সবুজ দানা বেঁধে উঠছে, তেমনি সময়ে একদিন বিকেলবেলায় নদীর ঘাটে নেমে জগু আসছিল তার বৌ ময়নাকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে। এ গাঁ ময়নার বাপের বাড়ী। ময়না প্রথম অন্তঃসত্ত্বা হয়ে মায়ের কাছে আসছে। জমিদারের কাছারির সামনে দিয়ে মাঠের রাস্তা গাঁয়ে গিয়ে ঢুকেছে। জগু যাচ্ছে আগে আগে, পিছনে চলছে ঘোমটা-ঢাকা ময়না। শ্বশুরবাড়ীর সাজ জগুর গায়ে। গায়ে লংক্লথের নতুন পাঞ্জাবি, পরনে নতুন কোরা ধুতি। পায়ে রঙিন মোজা আর কম দামী জুতো। জগুর মাথায় তেল-চক্‌চকে বড়ো বড়ো চুল যত্ন করে আঁচড়ানো।

কাছারির সামনে দিয়ে যখন ওরা চলেছে তখন কাছারির দাওয়ায় বসে নায়েব অবনী ব্যানার্জী হেঁকে উঠল, 'দেখতো কে যায় কাছারির সামনে দিয়ে জুতো মোজা পরে?'

জমিদারের চেয়ে নায়েবের চোট বেশি। জমিদার থাকে কলকাতায়, নায়েব জমিদারের প্রতিনিধি হিসেবে থাকে কাছারিতে।

দারোয়ান জগুর সামনে এসে পথ আটকাল, বলল, 'বাবু ডাকছেন।'

জগু জানে না যে, ওটা কাছারি। ঝেঁঝে জবাব দিল জগু, 'বাবুটা কে? আমারেই বা ডাকবে কেনে?'

ময়না বলল, 'এটা জমিদারের কাছারি।'

কাছারি শুনে ভয় পেল জগু। দারোয়ানের পিছু পিছু গুটি গুটি কাছারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দাওয়ার উপর একটা ইজি চেয়ারে বসেছিল নায়েব অবনী ব্যানার্জী। খানিকক্ষণ জগুর দিকে তাকিয়ে থেকে বলে উঠল, 'খুব যে বাবু সেজে জুতো পায়ে দিয়ে কাছারির সামনে দিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাছারির সামনে দিয়ে জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটবার আস্পর্ধাটা হল কেমন করে? দারোয়ান, ওকে বাঁধ তো খুঁটির সঙ্গে। আর নিয়ে আয় আমার চাবুক।'

জগু রুখে উঠল, 'জুতো পায়ে গালে খেতিটা কি?'

'আচ্ছা? এ যে একেবারে কেউটে সাপের বাচ্চা! এই, বানচোতকে বাঁধ।'

তিনজন গুণ্ডা মতো লোক এসে জগুকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে দাওয়ার শাল খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। ততক্ষণে ভয়ে বিস্ময়ে

ময়নার ঘোমটা গিয়েছে উঠে।

ময়না চীৎকার করে উঠল, 'বাবু ওকে ছেড়ে দেন, ও জানে না এটা কাছারি।'

ময়নায় কচি ঢলঢলে মুখটা চোখে পড়তেই নায়েব চোখ-খাবলার মতো ওর দিকে তাকিয়ে রইল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ময়নার শরীরটা যেন অবনী চাটতে লাগল। হাতে চাবুক নিয়ে জগুর সামনে দাঁড়িয়েছিল সে, ময়নার অশ্রুভরা চোখ দুখানি দেখে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল জগুকে, 'কি নাম তোর?'

জগু বলল, 'জগমোহন।'

'কোথায় যাওয়া হচ্ছিল এত বাবু সেজে?'

'শ্বশুরবাড়ী।'

'শ্বশুর কে?'

'পালান মাইতি।'

'পালান মাইতি?'

'হ্যাঁ।'

'হ্যাঁ কিরে শালা, হুজুর বলতে পারিস না? বিয়ে হয়েছে কতদিন?'

'মাস ছয়।'

'ও, বিদেশী জামাই মানুষ। তা কাছারির সামনে দিয়ে জুতো পায়ে যাওয়ার সাহস হল কেমন করে? আর খুব দেখি তেজ হয়েছে? জামাই মানুষ, নতুন লোক, যা তোকে আর চাবুক দিয়ে মারব না।'

বলে জগুর কান দুটো ধরে আচ্ছা করে মলে দিয়ে বলল, 'জুতো খুলে হাতে করে নিয়ে যা। কাছারি পার হয়ে গিয়ে পরতে হয় পরবি।'

দারোয়ানকে হুকুম করল, 'হরি সিং, ওকে খুলে দাও।'

দারোয়ান এসে বাঁধন খুলতে লাগল আর অবনী তার বক্রাক্ত অশ্লীল দৃষ্টি দিয়ে ময়নার শরীরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, 'এই কচি কাঁচা মেয়েটাকে তাহলে ভোগ করে এই ছোঁড়াটা। ভোগ করাচ্ছি তোকে।' মনে মনে উচ্চারণ করল অবনী।

অপমানিত, লাঞ্ছিত জগমোহন জুতো মোজা খুলে হাতে নিয়ে ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে কাছারির সীমানা থেকে বাইরে চলে গেল।

দিনকয়েক পর একদিন বিকেলবেলা অবনীর পাইক গেল পালানের বাড়ী। পালানকে ডেকে বলল, 'নায়েববাবু কাছারিতে ডাকতেছে, চলো।'

পালান কাছারিতে গিয়ে দেখল অবনী সেই ইজি চেয়ারে বসে আছে। তার সামনের টেবিলে মদের বোতল, পাখির মাংস আর একটা কাঁচের গেলাসে টলটল করছে রঙিন মদ।

পালান দাঁড়িয়ে রইল।

অবনী একবার উদাসীন দৃষ্টিতে তাকে দেখে নিয়ে ধীরে সুস্থে গ্লাসটা নিঃশেষ করল। তারপর গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কে? পালান নাকি?'

'এজ্ঞে হ্যাঁ বাবু।'

'আজকাল জমিদারকে আর তোরা গ্রাহ্য করিস না, নারে?'

'কেনে বাবু!'

'মেয়ের বিয়ে দিলি, তা ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিতে হলে যে কাছারির অনুমতি নিতে হয়, জমিদারের পাওনাটা দিতে হয়, সে সব ভুলে গেলি কেমন?'

'না বাবু, ভুলি নাই, ধার দেনা করে তো বিয়ে দিলাম। ধান উঠলে জমিদারের পাওনা মিটিয়ে দোব ভেবেছি।'

'ধান আর ক'মুঠো পাবি রে? তোর কাছে তো অনেক ধান পাওনা হয়েছে কাছারির।'

'সবটা এবছর দিতে পারব নি বাবু।'

'সেই রকম মতলব আছে নাকি তোর?'

পালান উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ভক্ ভক্ করে বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢেলে আর এক পাত্র চুমুক দিয়ে দিয়ে নিঃশেষ করে অবনী বলল, 'তোর আর কিছু জমি ভাগে পেলে ভালো হয়, না রে?'

'এজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আপনার কাছে গত বছর আমি আর বিঘে কতক জমি চেয়েছিলাম।'

'দোব দোব, এবার তোকে বেশি করে জমি ভাগে চষতে দোব। না হয় যে ধার তোর জমেছে কাছারির কাছে, তার থেকে সুদটাও মাপ করে দোব।'

'হুজুর মা বাপ।'

'না হে, কারও বাপ টাপ হবার শখ আমার নেই।'

একটুখানি চুপ করে রইল নায়েব। আর পালানের মনে হল, ওর চারপাশে যেন একটা হিংস্র মানুষ-খেকো বাঘ লক্‌লকে জিব নিয়ে পাক খাচ্ছে, গোল হয়ে ধীর গতিতে পা টিপে টিপে ঘুরছে, আস্তে আস্তে চক্করটাকে ছোট করে আনছে, যে কোনো মুহূর্তেই ওর উপরে লাফিয়ে পড়বে ব'লে।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। এ অঞ্চলে আকাশের সীমানা-ছোঁয়া মাঠ বেশি। গাঁ গুলিতে ছাড়া ছাড়া লোকবসতি। কাছারিটা একটু দূরে লোকালয় থেকে আলাদা হয়ে আছে। কাছারির সামনে মাঠ, মাঠের শেষে নদীর ওপারে নানান রঙে রাঙানো আকাশ হা হা করছে খোলা, সেখানে অন্ধকার নেমে আসছে শ্বাপদ জন্তুর মতো। পালান সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়েছে কয়েকবার। ওর মনে হল, জঙ্গলে অন্ধকার নামছে আর ওকে ঘিরে পাক খাচ্ছে একটা সাংঘাতিক জানোয়ার।

অবনী কথা বলল, গম্ভীর গোঙা স্বরে, 'পালান তোর জামাই ফিরে গেছে?'

ক'দিন আগে কাছারির সামনে দিয়ে জুতো পায়ে আসছিল বলে নতুন জামাইকে বেঁধে নায়েব কান মলে দিয়েছে, মনে পড়ে পালানের মাথাতে রক্ত চড়ে গেল। নিষ্ফল ক্রোধে আর অসহায় ব্যথায় ভিতরটা মোচড়াতে লাগল ওর। কি কঠিন দম-আটকানো অদৃশ্য বাঁধনে সে বাঁধা আছে! ঋণের বাঁধনে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে অবনী। ডাকলেই বেগার খেটে যেতে হয়। কবেই ঘরের অল্প ধান ফুরিয়েছে। কাছারির কাছ থেকে সমানে ধান ধার নিতে হবে। সেই ধান দেড়াবাড় দিয়ে শুধতে হবে নতুন ধান উঠলে। তাছাড়া আরও নানান জমিদারী পাওনা আছে, মেয়ের বিয়ের বাবদ আরও কত আদায় করবে অবনী তাই বা কে জানে! ধার, বাজে আবওয়াব সব দিয়ে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না ওর কাছে। অথচ কি পরিশ্রমটাই ওকে ঢালতে হয়েছে জমিতে। বেরোবার পথ নাই। আমৃত্যু মুক্তি নাই! অদৃশ্য গারদে দেনার শেকল পরিয়ে ওকে চিরবন্দী করে রেখেছে নায়েব। কিন্তু এবারে ধান উঠবার সময় তেভাগা সে

চাইবেই। দক্ষিণের গ্রামগুলির মতো জোট বাঁধছে ওরাও। এই নায়েবকে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে পারবে না ওরা!

নায়েব গর্জন করে উঠল মত্তস্বরে, 'কি হলো জবাব দিলি না?'

'হ্যাঁ বাবু, জামাই চলে গিয়েছে, যেদিন এসেছিল তার পরের দিনই চলে গিয়েছে।'

'অ', বলে একটা বিশ্রী অব্যক্ত শব্দ করল নায়েব। ফস্ করে দেশেলাই কাঠি জ্বেলে একটা সিগারেট ধরাল। এক গাদা ধোঁয়া পালানের মুখের উপরে উগরে দিয়ে ফের জিজ্ঞাসা ছুঁড়ল, 'তোর বাড়ীতে গাই বিইয়েছে শুনলাম।'

'এজ্ঞে'

'সের খানেক দুধ পাঠাতে পারবি?'

'দোব পাঠিয়ে আজ্ঞে।'

'তাহলে বাড়ী গিয়ে তোর মেয়েকে দিয়ে সের খানেক দুধ পাঠিয়ে দিবি তো।'

চমকে উঠল পালান। ভয়ে ওর বুকের ভিতরটা থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। ভিতরে ভিতরে ও অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করতে লাগল। ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে পালানের কাছে। এ ঘটনা নতুন নয়। কত মেয়ের সর্বনাশ হয়েছে, কত ঘরের বৌ সতীত্ব হারিয়েছে অবনীর লালা-ঝরা কবলে পড়ে। বুক গুর্ গুর্ করে উঠল পালানের। একবার ঢোক গিলে হঠাৎ মরিয়া হয়ে বলে উঠল, 'মেয়া আমার আসতে পারবে নি বাবু। আমি নিজে এসে দিয়ে যাব।'

'না, তোর মেয়েকেই পাঠিয়ে দিস।'

বাজের মতো ভীষণ হয়ে বাজল এই আদেশ পালানের মনে। তবু বলল, 'না বাবু, মেয়া আমার আসতে পারবে নি, আমিই দিয়ে যাব।'

দর-কষাকষিতে প্রবৃত্ত হল অবনী, 'তোর মেয়ের নামে বিঘে দুয়েক জমি লিখে দেব। ওকে এখন থেকে তোর কাছেই রেখে দে। আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কি করবে, সেখানেও তো অভাব দুঃখ।'

'না বাবু মেয়ার আমি বিয়া দিছি এয়োতি মেয়াকে আমি নিজের কাছে রাখতে পারব নি।'

রাগে নায়েবের লাল চোখ যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গর্জন করে উঠল সে, 'আমি বলছি, মেয়েকে তোর এখানেই রাখতে হবে, এখান থেকে কোথাও যাওয়া চলবে না।'

পালান হঠাৎ খেপে উঠল, 'মেয়ার বিয়া হইছে, মেয়াকে আমি স্বামীর ঘরে পাঠায়ে দিব।'

হুঙ্কার করে উঠল নায়েব, 'হারামজাদা, শুয়োর, আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে গলা তুলে তর্ক করা হচ্ছে। বড্ড সাহস বেড়েছে দেখি। খুব দেখি বেড়েছিস বানচোত।'

'তাই বলে আপনি আমার মেয়াকে চাইবেন, আমি বাপ হইয়ে তাই সইব ?'

'চুপ থাকবি শালা, তোর তাঁদড়ামি আমি ছাড়িয়ে দোব।' বলে হাঁক দিল, 'দারোয়ান।'

হিন্দুস্থানী দারোয়ান হরি সিং পোষা কুকুরের মতো এসে দাঁড়াল। অবনী রক্তচক্ষু তুলে আদেশ করল, 'বাঁধো এই শালাকে উঠোনের ঐ গোরুর গোঁজে।'

দারোয়ান হাঁক দিতেই জনকয়েক গুণ্ডা এসে দাঁড়াল সামনে। কলকাতা থেকে গুণ্ডা ভাড়া করে নিয়ে এসেছে নায়েব। তখন প্রায় সব কাছারিতে কিছু কিছু গুণ্ডা এনে রাখা হয়েছিল। অনেক কাছারিতে পুলিশও ছিল। দারোগা মাঝে মাঝে এসে বিভিন্ন কাছারিতে রাত কাটিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশকে প্রচুর টাকা অগ্রিম ঘুষ দিয়ে রাখা হয়েছে। দারোগাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসে অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে বিলিতি মদ, মাংস আর গেঁয়ো মেয়েমানুষ।

গুণ্ডা আর দারোয়ানে মিলে পালানকে টেনে হিঁচড়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে নিয়ে গিয়ে উঠোনের গোরুর গোঁজে বেঁধে ফেলল।

'আমার চাবুক নিয়ে আয়।' হেঁকে উঠল নায়েব।

চাবুক আনা হলে চাবুক হাতে উঠোনে নেমে গেল। তারপর বলল, 'ওকে ল্যাংটো করে দে, না হলে পাছাতে চাবুক ঠিকমতো লাগবে না।'

দারোয়ান টেনে হিঁচড়ে উলঙ্গ করে দিল পালানকে। পালান হঠাৎ নিশ্চেষ্ট হয়ে নিষ্প্রাণ কঠিন পাষাণের মূর্তির মতো স্থির দৃষ্টি দূরে মেলে

তাকিয়ে রইল। নিজেকে ওর অসহায়, বিপন্ন, একা বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু সহসা ওর মনের পটে একে একে জেগে উঠল গ্রামের জনতার মুখ। সে যেন দেখতে পেল নায়েবের উপর ভীষণ রাগে আর দারুণ ঘেন্নায় সকলের মুখ কঠিন হয়ে আছে, চোখে জ্বলছে আগুন!

মাতাল নায়েব উলঙ্গ পালানের সামনে দাঁড়িয়ে হিসিয়ে উঠল, 'শালা, বেজন্মা, বড্ড আস্পর্ধা হয়েছে। ভেতরে ভেতরে দল পাকানো হচ্ছে। তোর মেয়েকে যদি আমি জোর করে ধরে আনি, শালা, তোর কোন বাপ রক্ষা করতে আসবে? ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি, আর কখনো মেজাজ দেখিয়ে কথা যাতে না বলিস তারই ব্যবস্থা করছি।'

কথা শেষ হতে না হতেই বিষাক্ত সরীসৃপের লেজের ঝাপটার মতো চাবুক শিস্ দিয়ে উঠল। কদর্য নিষ্ঠুরতায় এলোপাথাড়ি চাবুক পড়তে লাগল উলঙ্গ পালানের সর্বাঙ্গে। পালানের আর্ত কান্না অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে ছড়িয়ে গেল। গঙ্গার ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিস্তৃত হয়ে দূর দিগন্তে হারিয়ে গেল।

ক্লান্ত হয়ে নিরস্ত হল নায়েব। চাবুকটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'দে ওটাকে এবার খুলে দে। এবার থেকে ঠিক সিধে থাকবে।' বলে ঘরে ঢুকে গেল।

দারোয়ান বাঁধন খুলে দিতে কাপড়টা পরে নিল পালান। দারোয়ান পালানের একটা হাত ধরে কাছারির সীমানার বাইরে টানতে টানতে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'বাবু তোব মেয়েকে চাইছে, এ তো তোর ভাগ্যি রে বেটা, আহম্মক কোথাকার।'

মাঠের রাস্তায় নেমে একা হতেই পালান হু হু করে কেঁদে ফেলল। কিন্তু ওর চোখের জলের উৎস-মুখ সহসা যেন রুদ্ধ হয়ে গেল। প্রতিজ্ঞা ভীষণ হয়ে উঠল ওর মনে। শোধ এব নিতেই হবে। যত অত্যাচার, যত অন্যায় করেছে নায়েব, কড়ায় গণ্ডায় তার শোধ তুলতে হবে। দক্ষিণের বীর চাষীদের মনে মনে প্রণাম জানাল পালান। সর্বাঙ্গ ওর হু হু করে জ্বলে যাচ্ছে। মনের ভিতরে ঝড় বইছে। প্রবল বক্ষোচ্ছ্বাসে ওর মাথা ঘুরছে, চোখ জ্বালা করছে।

বাড়ী ফিরে ঘরের দাওয়ার উপরে লুটিয়ে পড়ল পালান।

পালানের বৌ আর্তনাদ করে উঠল, 'কি হল গো, অমন কেন করছ !'

প্রদীপ এনে পালানের মুখ দেখতে গিয়ে সর্বাঙ্গে লাল লাল লম্বা লম্বা দাগ দেখে শিউরে উঠল বৌ। ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় ভেঙ্গে পড়ল, 'কি হয়েছে, কে মেরেছে, কাছারিতে গেছিলে, মুখপোড়া নায়েব মেরেছে তোমাকে ?'

পালান ক্লান্ত স্বরে বলল, 'জল দে, একটু জল দে, শালার বেটা শালা নায়েব আমাকে মারল। অধীর, ভোলানাথ, নীরেন, শক্তিপদকে খবর দে।'

খবর পেয়ে অধীর, ভোলানাথ, নীরেন, শক্তিপদ আর পাড়ার আরও অনেক মেয়ে পুরুষ ভেঙ্গে এল।

খানিক পরে এল গণপতি, সাগর, ইন্দ্র আর বিহারীলাল। ওরা আজ এখানে এসেছিল মিটিং করতে, পালানের জামাইয়ের কান মলে দেবার খবর লোক-পরম্পরায় শুনেই এসেছিল ওরা। এ গ্রামের সাধুচরণ, বিশ্বনাথ, শক্তিধর মাইতি কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিল।

পালান সব কথা বলে পাগলের মতো শুধোল, 'তোমরা বদলা নেবে না ভাই ? আমি বিনা দোষে বিনা কারণে এমনি করে চাবুক খেলাম। তোমরা শোধ নেবে না ?'

গান্ধারী পাড়ার এক মধ্যবয়সী বিধবা। ধান ভেঙ্গে ওর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের পালন করে। সেও এখানকার কৃষকসমিতির সভ্য। সাহসে তেজে বাঘিনীর মতো। গান্ধারী চীৎকার করে বলে উঠল, 'এর শোধ নিতেই হবে, ঐ অবনীকে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়তে হবে।'

ভোলানাথ বলল, 'তার আগে মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে।'

কে একজন বলল, 'আমরা এতগুলোন মানুষ আছি, মেয়েটাকে হারামজাদাদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব নি ?'

ভোলানাথ বলল, 'হয়তো ঘরে আগুন দেবে, হয়তো গুণ্ডা আর পুলিশ নিয়ে ঘর চড়াও করবে। পোয়াতি মেয়ে। কি দরকার আছে বাপু ওকে এখানে রেখে। কালকেই নৌকো ঠিক করে ফেলব। ওকে নিয়ে পালান চলে যাক।'

ডিবের কম্পমান মৃদু আলোয় চার পাশে এলোমেলোভাবে বসে বসে অনেকক্ষণ উত্তেজিত কথাবার্তা চলল। আগামী ধানকাটা মরসুম এসে পড়ছে। তেভাগা আন্দোলন এবারে আরম্ভ করতেই হবে। অনেক দিনের ভয় দুর্বলতায় কেঁপে কেঁপে উঠল বুকের ভিতর। কিন্তু বাঁচবার অন্য কোনো পথও খোলা নেই।

নীরেন বলল, 'পালান তোকে যখন কাছারিতে ডেকেছিল, যাবার সময় আমাদের খবর দিতে পারলি না? এখন চারদিকে আগুন জ্বলছে, এসময়ে কি একা কাছারি যায়?'

'খবর দোব কি? খবর দেবার কি সময় দিল বজ্জাত পাইকটা? একবারে টানতে টানতে নিয়ে গেল। কাছারির কাছে ধান কর্জ করে পেট চলছে। না গিয়ে আর করবই বা কি?'

অধীর বলল, 'চলো আজ রাত থেকেই আমাদের কাজ আরম্ভ করে দি। চলো কাছারিতে আগুন দিয়ে নায়েবকে খুন করব। ওর ক'খানা গুণ্ডা আছে দেখে নোব।'

গান্ধীরী বলে উঠল, 'তাই চলো সব। এখন কাছারিতে পুলিশ নাই। খানকীর ছাওয়াল ঐ নায়েবটাকে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে আসি।'

ভোলানাথ বলল, 'কিন্তু এখনও আমরা ঠিক মতো জোট বাঁধতে পারি নি, ডাক দিলে কাছারি আক্রমণ করতে যেতে হয়তো সবাই রাজী হবে না। ঘর থেকে অনেকে হয়তো বেরতেই চাইবে নি।'

শক্তিপদ বলল, 'লয়ালগঞ্জ থেকে কৃষকসমিতির নেতারা এসেছেন। ষষ্ঠীতলায় আজ রাতেই মিটিং ডাকা হোক।'

বেরিয়ে পড়ল সবাই বাড়ী বাড়ী খবর দিতে।

পাড়া গাঁয়ে যে সময় সবাই দীপ নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সেই সময় ষষ্ঠী-তলায় মশালের আলোতে বসেছে মিটিং। শ চারেক লোক হয়েছে।

গ্রামের কুকুরগুলি এতক্ষণ চীৎকার করে আকাশ ফাটাচ্ছিল, মিটিং বসে যেতে থাবার উপর মুখ রেখে কিংবা লেজেমুখে কুণ্ডলী পাকিয়ে একেবারে সব শুয়ে পড়ল মিটিংয়ের ধারে পাশে।

প্রথমে সবাই বলল, পালান সমস্ত ব্যাপারটা সভাতে বলুক।

পালান জামাই আসার ব্যাপার থেকে তাকে চাবকানোর ঘটনা সব বলে

গেল। বলতে বলতে কখনো তার গলা বেদনায় ভেঙ্গে পড়ল, কখনো দারুণ রাগে সে জ্বলে উঠতে লাগল।

নানান রকম মন্তব্য ভেসে এল :

'কি শয়তানি।'

'মেয়েটার ওপর হারামজাদা ছেনালের বাচ্ছার চোখ পড়েছে।'

'মা-মেগো শুয়োরটাতো মানুষ লয়, পশু।'

'ওর পাপের প্রাচিত্তিরের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে।'

দুর্ভিক্ষের সময় একজনের বৌকে যেতে হয়েছিল কাছারিতে নায়েবের হুকুমে, না গেলে বাঁচবার আর উপায় ছিল না, সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, স্মৃতি তাকে কাঁদিয়ে ছাড়ে। সে চীৎকার করে উঠল, 'ভাই সব আমরা যদি এর শোধ না নিই, আমরা মানুষ না, আমি আগে যাব, তোমরা আমার পিছনে থাকবে।'

তখনই কাছারি আক্রমণ করতে যাওয়া হবে কি হবে না কেউই স্থির করতে পারল না। নানান আলোচনা তর্ক বিতর্ক চলতে লাগল। অধিকাংশ মানুষ বসে বসে শুনতে লাগল। তারা যেন সৈনিকের মতো। যা সিদ্ধান্ত হবে পালন করবে। অবশেষে এ গ্রামের লোকেরা গণপতি, সাগর, ইন্দ্র, বিহারীদের কিছু বলতে বলল।

সকলের অনুরোধে গণপতি উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'বন্ধুগণ, আমরা কৃষকসমিতির সদস্যরা একটা খাঁটি কথা বুঝি, যে-মানুষরা অস্ত্র ব্যবহার করতে শেখে না আর অস্ত্র যোগাড় করতে চেষ্টা করে না, তাদের অত্যাচার সহ্য করতেই হবে। আজকে যদি আপনারা তৈরি না থাকেন তাহলে কাছারি আক্রমণ করতে যাওয়া হয়তো ঠিক হবে না। কিন্তু যদি আপনারা কৃষকসমিতিতে না জোট বাঁধেন, যদি আপনারা বল্লম, লাঠি, সড়কি, তীর ধনুক আর বন্দুক নিজেদের কাছে রাখতে বা চালাতে না শেখেন তাহলে চিরদিন অত্যাচার সইতে হবে, ঘরের বৌ ঝিদের ইজ্জত ওরা কেড়ে নেবে। তাই আমরা বলব তৈরী হন, যে কোনো সময়ে ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে কৃষকসমিতিকে শক্ত করুন, অস্ত্র ধরতে শিখুন। জেনে রাখুন আন্দোলন ছাড়া পথ নাই, রুখে দাঁড়ানো ছাড়া অত্যাচারের প্রতিকার নাই।'

অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, সেই রাত্রেই কাছারি আক্রমণ করতে যাওয়া

ঠিক হবে না। আরও কিছুটা সংগঠিত ও সুসজ্জিত হয়ে তবেই মুখোমুখি হওয়া ভালো কিন্তু সবাই পালানের প্রতি সমবেদনা জানাল। বলল, 'কোনো ভয় নাই, আমরা তো সবাই আছি। মরি একসঙ্গে মরব, ভয় পেয়ো না তুমি।'

আস্তে আস্তে সবাই ঘরে ফিরে গেল। সাবধান করে গেল পালানকে, 'আজকে রাতটা সজাগ থেকো। কিছু হলেই চীৎকার করে জানান দিও।'

গণপতিরা গেল অধীরের বাড়ীতে। অধীর, ভোলানাথ, শক্তিপদ, নীরেন এ গ্রামের কৃষকসমিতির নেতৃস্থানীয় চাষী।

এতক্ষণের কলরবের পর সবাই বিদায় নিতে চারিদিকে স্তব্ধতা যেন জমাট বেঁধে এল। অন্ধকার রাত্রি। সামনে আকাশ ছোঁয়া খোলা মাঠ। সেখানে কোথাও কোথাও আলেয়ার আলো চোখে পড়ছে। নিশুতি রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে। ঝিঁঝিঁর আর্ত চীৎকারের বিরাম নেই। শেয়ালের দল-বাঁধা ডাক ভেসে আসছে। মাঠের তালগাছের পাতায় পাতায় বাতাস ঘা খেয়ে অদ্ভুত শব্দ তুলছে। সব মিলিয়ে কেমন যেন ভয়-লাগানো অন্ধকার জমাট হয়ে বুকের ওপর চেপে বসে যেন।

ময়নাকে মাঝখানে রেখে শোবার ব্যবস্থা হল। পালানের বৌ পালানের গায়ের ক্ষতে তেল বুলিয়ে দিয়ে প্রদীপ নিভিয়ে দিলে শুয়ে পড়ল সবাই। মাথার কাছে থাকল দা, লাঠি, সড়কি।

হঠাৎ মধ্যরাত্রে দরজা ভাঙ্গার শব্দ শুনে পালানের ঘুম ভেঙ্গে গেল। পালান চেঁচিয়ে উঠতেই ঘরের সবাই জেগে উঠল। কাঁপা হাতে দেশলাই জ্বেলে পালান প্রদীপটা জ্বালল। অমনি যে যেমন পারল হাতে হাতে দা, সড়কি, লাঠি, বঁটি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল। ওদিকে দরজায় ধুস্ ধাস্ শব্দ হতে হতেই বাঁশের তৈরী দরজা ভেঙ্গে গেল। একদল লোক লাঠি আর বন্দুক নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। দারোয়ান হরি সিং বলল, 'ঐযে ঐ মেয়েটা।'

ময়নাকে পিছনে রেখে সামনে দাঁড়াল পালান আর তার কিশোর ছেলে। পালানের বৌ প্রাণপণে অব্যক্ত গোঙা স্বরে চেঁচাতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে লাঠি পড়ল পালানের মাথায়। গল্ গল্ করে রক্ত ঝরে পড়ল। রক্ত অগ্রাহ্য করে পালানও লাঠি চালাল। স্বল্প-পরিসর সেই

ঘরের মধ্যে ভয়াবহ কাণ্ড চলতে লাগল। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তপাতে পালান অবশ হয়ে যেতে লাগল। হাত যেন তার আর উঠতে চাইছে না। ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব যেন কুয়াশার মতো আবরণ তৈরি করছে চোখের সামনে। পা টলছে ওর। সহসা আর একটা লাঠি এসে পড়তেই পালান মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রক্তগঙ্গা বইতে লাগল মেঝেতে। পালানের ছেলে সড়কি চালিয়ে একজন গুণ্ডাকে খানিকটা আহত করেছিল। কিন্তু এক ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে ময়নার দিকে ছুটল জানোয়ারের দল।

ময়না হাতে বঁটি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘরের কোণে। মুহূর্তে ময়নাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে পিছন থেকে জাপটে ধরল একজন। ময়না কঁকিয়ে উঠল আর্তস্বরে। একজন ময়নার মুখ চেপে ধরল। ময়নার মাকে ঘুঁষি মারল আর একজন।

এদিকে গণপতি, সাগর, ইন্দ্র, বিহারী, অধীর, ভোলানাথ, নীরেন, শক্তিপদ চীৎকার শুনে ছুটে এসে পড়ল সেখানে। গ্রামের লোকও ছুটে আসছে একে একে। কয়েকজন গুণ্ডা দোর আটকে দাঁড়িয়েছিল হাতে ছোরা নিয়ে। তাদের সঙ্গে লড়াই লেগে গেল গণপতিদের।

ভিতরে পালানের বৌ আর ছেলে গুণ্ডাদের হাত থেকে ময়নাকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল। গুণ্ডারা ময়নাকে টেনে হিঁচড়ে জাপটে ধরে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ময়নার চুল হয়ে গেছে আলুথালু। শাড়ী লুটোচ্ছে, বিশৃঙ্খল বিস্রস্ত অবস্থা।

বাইরে তখন একে একে অনেক লোক জুটে গেছে। তারা যে যা পেয়েছে হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, দা কুড়ুল, লাঠি, বল্লম। রাত্রি অন্ধকার ব'লে কয়েকটি মশাল জ্বেলে এনেছে। মশালের দাউ দাউ আলোতে এক আদিম সমাজের ছবি ফুটেছে যেন। মানুষগুলিকে লাগছে অস্পষ্ট ছায়া ছায়া। আলোর সীমানার বাইরে মাঠ, গাছ, মানুষের ছবি ভীতিময় এক কুহকী পরিবেশ রচনা করেছে। ময়না, ময়নার মা আর ভাইয়ের আর্ত কান্না, ময়নার বাবার গোঙানি, গুণ্ডাদের গালাগালি, জনতার রোষ-গর্জন ও ধ্বস্তাধ্বস্তি সব মিলিয়ে মনে হচ্ছে শান্ত নিরীহ গ্রামটিতে সহসা যেন বিস্ফোরণ আরম্ভ হয়েছে। গুণ্ডাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই দিচ্ছে গ্রামের মানুষ।

ময়না শয়তানদের কবলে পড়ে এতক্ষণ কাঁপছিল বলির ছাগের মতো। দরদর করে ঘেমে নেয়ে উঠছিল সে। এত লোক দেখে সাহস পেয়ে প্রচণ্ড উন্মাদনায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করে হাত পা ছুঁড়ে আঁচড়ে কামড়ে প্রাণপণে চেষ্টা করল নিজেকে মুক্ত করতে। তখন চারদিক থেকে গুণ্ডাদের উপর আক্রমণ চলছে। গণপতি, সাগর, ভোলানাথদের প্রচণ্ড ঘুঁষিতে আর অস্ত্র-চালনায় অস্থির হয়ে উঠেছে তারা। ভাড়াটে গুণ্ডাগুলি আক্রমণের মোকাবিলা করতে বাধ্য হয়ে ব্যতিব্যস্ত আহত হয়ে ময়নাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো। ছাড়া পেয়েই ময়না বন্ধুকধারী দারোয়ানকে কিল, চড়, ঘুঁষি মারতে শুরু করল পাগলের মতো। বন্দুকওয়ালা হঠাৎ বন্দুক দিয়ে ময়নার পেটে এক গুঁতো মারতেই ময়না মর্মান্তিক চীৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রক্তে ভিজে উঠল ময়নার কাপড়।

জনতা যে যেদিকে পারছে আঘাত হেনে চলেছে গুণ্ডাদের উপর। বন্দুকধারী দারোয়ান হঠাৎ জনতার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়াতেই জনতাকে একটু থমকে যেতে হল। দাউ দাউ করে গোটা পাঁচছয় মশাল জ্বলছে, কালো ধোঁয়া উড়ছে, জনতা হঠাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। গুণ্ডাগুলো আর দারোয়ান এই সুযোগে ছুটতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে জনতাও দল বেঁধে তাদের পিছু ধাওয়া করল।

দারোয়ান আর গুণ্ডারা ঢুকে গেল কাছারির ঘরের মধ্যে। জনতা কাছারির দিকে আগিয়ে চলল।

গণপতি চীৎকার করে বলল, 'এখুনি কাছারি পুড়িয়ে দিতে হবে। নায়েব, দারোয়ান, গুণ্ডা সবগুলোকে সেই আগুনের চিতেয় তুলে দিতে হবে। চলো আরও জোরে চলো।'

এমনি সময় নায়েব অবনী ব্যানার্জি বন্দুক নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কাছারির দাওয়ায় উপর দাঁড়িয়ে বন্দুক তুলে ধরল। চেঁচিয়ে বলল, 'যদি আর এক পা কেউ এগোস, গুলী করে শেষ করে দোব।'

আবার একবার থমকে দাঁড়াতে হল জনতাকে।

সামনে থেকে গণপতির গলা শোনা গেল, 'গুলীর ভয় করলে চলবে না, কাছারি ভেঙ্গে ফেল, অত্যাচারী নিপাত যাক।'

জনতা কাছারির সামনে আগিয়ে যেতে লাগল। অমনি অবনীর

বন্দুক গর্জে উঠল। অন্ধকার রাতের বুকে বিদ্যুতের মতো আলোর ঝলক দিয়ে গুলী ছুটে এল। অগ্রবর্তী ভোলানাথ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

প্রবল গর্জনে ফেটে পড়ল জনতা, যেন জোয়ার-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, লক্ষ ফেনিলোচ্ছল ভয়ঙ্কর ঢেউয়ের ফণা তুলে কসফরাসের অগ্নিদীপ্তিতে লক্ষ বজ্রের গর্জনে ছুটে আসছে।

কাছারিকে মাঝখানে রেখে সবাইকে অর্ধবৃত্তাকারে গুড়ি মেরে ছড়িয়ে পড়তে নির্দেশ দিল গণপতি। মশাল দিয়ে কাছারির খড়ের চালে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। অবনীর দিকে ছুড়ে মারতে লাগল হাতে যা আছে। ওদিকে অবনীর বন্দুক আরও কয়েকবার আগুন উগরলো। কয়েকজন আহুত হয়ে মাটিতে পড়ল।

কাছারির চালের আগুন ছুটন্ত রাঙা ঘোড়ার পালের মতো দ্রুত গতিতে ধোঁয়ার ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে যেন।

অবনী গুণ্ডাদের ডাকল, 'তোমরা বেরিয়ে এস, লড়াই দাও।'

ক্ষতবিক্ষত গুণ্ডারা বেরিয়ে এসে জনতার রুদ্র রূপ দেখে ভয় পেল। আরও লোক ছুটে আসছে হাতে মশাল নিয়ে, লোক বেড়েই চলেছে। গুণ্ডারা ভিতরে ঢুকে গেল। অবনীও অদৃশ্য হল ভিতরে। তারপর অবনী আর গুণ্ডারা আর পাইক-পেয়াদা-দারোয়ান কাছারির পিছন দিকের খিড়কির দরজা দিয়ে বার হয়ে মাঠে মাঠে ছুটে পালাতে লাগল।

জনতাও ওদের পিছন পিছন ধাওয়া করে ছুটল: রাত্রি অন্ধকার, মশালগুলিও জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছিল, কাছারির চালের আগুনের আলোয় পথ দেখে খানিকদূর পর্যন্ত ওদের পিছনে ধাওয়া করল জনতার একটা অংশ। কিন্তু মাঝে মাঝে ওরা জনতাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ছিল। অবশেষে অন্ধকারে ওরা হারিয়ে গেল। গ্রামের লোকদের বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হলো।

ভোলানাথ মারা গেল। আরও অনেকেই আহত হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর ভয় ছিল না। ভোলানাথের মৃতদেহ কাঁধে করে গ্রামে নিয়ে আসা হলো। সেই মৃতদেহকে ঘিরে বসল গ্রামসুদ্ধ মানুষ। ভোলানাথের স্ত্রীপুত্রকন্যা ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল। আরও অনেকেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

গণপতি বলল, 'আমার চাষীবন্ধুগণ, আমার মা বোনেরা আজকে কাঁদায় দিন, আমাদের কাঁদতেই হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে-নায়েব ছুটে পালাল সে আবার ফিরে আসবে। এবার আসবে পুলিশ নিয়ে, অত্যাচারের বান ডাকিয়ে দেবে। তাই আমরা বলব তৈরি হোন, জোট বাঁধুন। অস্ত্র ধরতে শিখুন, কৃষকসমিতির সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলুন।'

পরের দিন অনেক বেলাতে পুলিশ এসে ভোলানাথের মৃতদেহ নিয়ে গেল।

গণপতি, সাগর, ইন্দ্র, বিহারী গ্রামের লোককে বারংবার সাবধান করে দিয়ে, তৈরি থাকতে বলে বিদায় নিল। বুধাখালিকে আসন্ন বিপদের মুখে ফেলে রেখে ওদের যাবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কয়েকদিন পরেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা আসবেন, চাষী কমরেডদের নিয়ে একটা সম্মেলন হবে, আসছে ধানকাটা মরসুমের সংগ্রাম-পদ্ধতি আর কর্তব্য অকর্তব্য নিয়ে আলোচনা হবে, না গেলেই নয় ওদের। তাছাড়াও সেখানে ভি. ডি. পার্টি, পাঞ্জাবি গুণ্ডা আর পুলিশে মিলে কি কাণ্ড বাধিয়ে রেখেছে তাই বা কে জানে। ফিরে হয়তো দেখবে ঘরবাড়ী ছাই ক'রে রেখে দিয়েছে।

॥ ৩৯ ॥

"সালিসি বোর্ড বা অন্য কোনো প্রশ্ন না তুলে লাটদার ও জোতদারদের কথামতো এক তরফা ভাগজমির উপর ১৪৪ ধারা জারি হতে লাগল। লয়ালগঞ্জ, বুধাখালি, রাধানগর প্রভৃতি গ্রামে পাইকারী হারে নানা রকমের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বেরল মেয়ে পুরুষ নির্বিশেষে। ভাগ-রেকর্ড কেটে ভাগজমি থেকে উচ্ছেদ ও পরোয়ানা জারির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দাঁড়ানো ছাড়া কৃষকের সামনে অন্য কোনো পথ নেই ব'লে (জমির উপর) দখল রেখে চাষ করার আন্দোলনে নেমে পড়েছিল সুন্দরবনের কৃষক। এই আন্দোলন অনেকাংশে সফলও হয়েছিল। স্থানীয় কৃষক-সমিতি থেকে ভাগ-জমি বিলির ব্যবস্থা হয়েছিল।"

কিন্তু ফসল উঠবার সময় জোতদাররা অনেক বেশি হিংস্র হয়ে উঠল। ফসলের উপর চাষীর খবরদারি তারা মেনে নিল না। পাইকারী হারে

১৪৪ ধারা, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আর বিনাবিচারে নিরাপত্তা আইনে কৃষক-নেতাদের আটক করবার জন্যে আর কৃষক-আন্দোলনকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠল জোতদার-এ্যাসোসিয়েশন।

এই অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা কৃষক-সমিতির নেতাদের নিয়ে পার্টির সম্মেলন করলেন। সে সম্মেলন চলল তিন দিন তিন রাত।

১৯৪৮ সালের ৫ই নভেম্বর (বাংলা ১৩৫৪ সালের কার্তিকের শেষাশেষি) দক্ষিণ চন্দনপিঁড়িতে অধীর মাইতির মাটির দুর্গের মতো ঘরের ভিতরে নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় বা শেষদিনের সম্মেলন চলছে। সে-সম্মেলনে চারজন কমিউনিস্ট নেতা আছেন আনন্দ রায়, বৃন্দাবন ঘোষ, মধু হালদার ও বিদ্যুৎ বসু। আর আছে কৃষক-সমিতির নেতারা। সম্মেলনে গত দুদিন ধরে কৃষকদের দাবি ও সংগ্রাম, কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন সম্পর্কে যে বিচিত্র মতামতের দ্বন্দ্ব ও সমাধান ধীর ও নিশ্চিত গতিতে আগিয়েছে আজ রাত্রেই সেইসব আলোচনাকে গুটিয়ে এনে স্থির ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

তিনটি হারিকেন জ্বলছে। এবং সেই আলোটুকু ঘিরে সকলে গোল হয়ে বসে বসে তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করছেন। বাইরে তখন কার্তিকের শীতরাত্রি দিকচিহ্নহীন হু হু-করা মাঠের উপরে ছড়িয়ে আছে। ঈষৎ কুয়াশাময় আকাশে লাখো লাখো তারার বাতি ঝিক ঝিক করছে। চাঁদ নেই, বিশাল মাঠে রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করছে।

এ দিকের গাঁগুলোর ধরণ হলো এখানে ওখানে দূরে দূরে ছড়ানো এক একখানি নির্জন দুর্গের মতো খড়ের চালের মাটির ঘর। গরান-ডালের জানলা, বাঁশের দরজা। জনবসতিগুলি এলোমেলো, এদিকে ওদিকে ছড়ানো।

অনেক রাতে সম্মেলন শেষ হলো।

চন্দনপিঁড়ির নদীতে ডিঙ্গিতে উঠলেন আনন্দ রায়, বৃন্দাবন ঘোষ, মধু ও বিদ্যুৎ। ডিঙ্গির মাঝি হলো কৃষকনেতা বিহারীলাল ঘড়ুই, মণিলাল ঘড়ুই আর নারায়ণ আড়ি। আনন্দ এবারে এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ক'দিন প্রবল জ্বর ভোগ করে কামদেব ঘড়ুইয়ের চিকিৎসায়

কিছুটা সুস্থ হয়েছেন। ডিঙিতে বিছানা করে তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হলো। এখনও তিনি ক্লান্ত ও দুর্বল। তাঁকে ঘিরে বসলেন বৃন্দাবন, মধু ও বিদ্যুৎ।

তখন লয়ালগঞ্জের অন্যতম জমিদার নুটবিহারী দাসের নায়েব মহিম ঘোষের কাছারিতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পার্টি নিষিদ্ধ। আনন্দ ও বৃন্দাবনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে। তাই গভীর রাত্রিতে তাদের নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে এখানকার কৃষক-নেতাদেরই।

গণপতি, কামদেব ঘড়ুই, সাগর, ইন্দ্র প্রভৃতি ডিঙি যাত্রা করিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে ফিরে এলো।

সপ্তমুখীর মুখ দিয়ে খাড়ি নদীতে ডিঙি নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে কমিউনিস্ট নেতাদের। সারারাত্রি প্রবল বেগে দাঁড় টেনে টেনে বঙ্গোপসাগরের মুখে সপ্তমুখীতে যখন ওরা পৌঁছল তখন সকাল হয়ে গেল। সপ্তমুখীর মুখে পৌঁছে ওরা দেখল পুলিশের লঞ্চ আসছে। মাঝিদের নির্দেশে নেতারা শুয়ে পড়লেন যাতে দূর থেকে তাদের দেখতে না পাওয়া যায়।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুলিশ কিছু জিজ্ঞাসা করলে কি বলবে তোমরা?'

বিহারী বলল, 'সে ঠিক বলব এখন। বলব বাঁশ কিনতে চললাম কঙ্কণদীঘি।'

বিহারী, মণি আর নারায়ণের বুক কাঁপছে সংশয়ে ও প্রতীক্ষায়।

সুন্দরবনের কৃষকসমিতি ওদের উপর দায়িত্ব দিয়েছে নেতাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবার। ওরা কি শেষ পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না? শেষ পর্যন্ত পুলিশ কি ওদের ধরে ফেলবে? ওরা শক্তমনের মানুষ। শক্ত হাতে দাঁড় টানছে। সমুদ্র উথালি-পাথালি। সমুদ্রের ঢেউ গর্জন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। জোয়ার আসছে। নৌকা দুলছে লক্ষ ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায়।

লঞ্চটা ওদের ডিঙি পেরিয়ে চলে গেল। লঞ্চ ভর্তি পুলিশ। জেলেদের ডিঙি মনে করে পুলিশরা কিছু জিজ্ঞাসা করল না।

বিহারী, মণি, নারায়ণ তিনদিন ধরে সমস্ত শক্তি দিয়ে দুজন করে

সমানে দাঁড় টেনেছে, একজন হাল ধরে থেকেছে। বিশ্রাম নেয় নি, ঘুমোয় নি। সুন্দরবন এখন বিপজ্জনক জায়গা হয়ে উঠেছে। এই ডিঙ্গিতে যেতে যেতে যে কোন সময়ে ওরা পুলিশের মুখোমুখি হয়ে যেতে পারে। যে কোন সময়ে গ্রেপ্তার হয়ে যেতে পারেন নেতারা। ওরা তাই বিশ্রাম নেয় নি, নৌকা থামায় নি। একজন করে হাল ধরে থেকেই খেয়ে নিয়েছে।

রাক্ষসখালি, পাথরপ্রতিমা, কুয়েমুড়ি, দাসপুর, জটাপঞ্চম, কঙ্কণদীঘি, রায়দীঘি, নলগড়া-অফিস এবং সরস্বতীপুর পার হয়ে নিরাপদ মাটির দিকে আগিয়ে যেতে হবে। অন্তহীন স্রোতোময় জলের কল্লোল, ঢেউ, জোয়ার-ভাটা, রাত্রি ও দিন, দিন ও রাত্রি।

৬ই নভেম্বর বেলা তখন দশটা। লয়ালগঞ্জে কৃষকসমিতির ঘরে দু'শ' আড়াই শ' জন কৃষক নরনারী জমায়েত হয়েছে। আজকের সভায় কৃষক-সমিতির নেতারা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত চাষীদের জানিয়ে দেবে।

গণপতি বলছিল, 'বন্ধুগণ, মা ও বোনেরা, আমরা কৃষকসমিতির সিদ্ধান্ত মতো কাজ আরম্ভ করেছি। দিনমজুরী আমরা দুটাকা করেছি ধর্মঘট করে। তেভাগা আদায় করার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। এস. ডি. ও. এনকোয়ারি করতে এসেছিল। তা আমরা সব ব্যাপার বুঝিয়ে বলেছি। তিনি কিছু না বলতে পেরে ফিরে গিয়েছেন। আমাদের জন্যে কিছুই করেন নাই। কেননা এস. ডি. ও. আসলে ধনীলোকের ছেলে, জমিদার-জোতদারদের বন্ধু।'

হঠাৎ গণপতির গলার স্বর উগ্র হয়ে উঠল. শান্ত ও নম্র প্রকৃতির মানুষটার মধ্যে ভীষণ হিংস্রতা ফুটে উঠল। সে বলতে লাগল, 'এখানকাব জমিদার-জোতদাররা আমাদের এই আন্দোলনকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। এর মধ্যেই ওরা জোতদার এ্যাসোসিয়েশন তৈবি করেছে। দালাল চাষীদের দিয়ে ভি. ডি. পার্টি করেছে। বাংলাতে তার নাম দিয়েছে সেবাদল। খুন যখম করে, রেপ করে ওরা চাষীদের সেবা করবে। মহিম ঘোষের কাছারিতে কাকদ্বীপ থেকে কিছু পুলিশ এসেছে। পুলিশ জোতদারদের কাছ থেকে প্রচুর ঘুষ খাচ্ছে। আর কাছারিতে দিব্যি আরামে আছে। এই জমিদার, জোতদার, নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ান,

পাইক, ওদের লেঠেল, পুলিশ আর সেবাদলে মিলে নানান ধরণের অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের গাঁগুলোতে। মেয়েদের সম্মান রক্ষা করা দায় হয়েছে। আমাদের ঘরে ওরা আগুন দিচ্ছে, লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে মারধোর করছে, খুন করবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু তাই বলে আমরা থামব না। আমাদের দাবি আমরা আদায় করে নোবই। তেভাগা চাই। দেড়াবাড় বন্ধ করতেই হবে। বাজে আবওয়াব বন্ধ করতেই হবে। চাষীকে বেআইনী উচ্ছেদ করা চলবে না। আমরা একতাবদ্ধ হয়েছি। আজ কোনো চাষী বিপদে পড়লে, কারও জমির ধান জোতদাররা জোর করে কেটে নিতে এলে, কারও ঘরে আগুন দিতে এলে, একবার শাঁখ বাজিয়ে দিলেই আমরা সব গাঁয়ের মেয়ে মরদ সেখানে অস্ত্র হাতে নিয়ে ছুটে যাই। যে জোতদার চাষীর জমির ধান জোর করে কেটে নিয়েছে আমরা রাতের বেলা তার জমির ধান দল বেঁধে কেটে নিয়ে এসেছি। আশি বিঘে জমির ধান রাতের বেলা আমরা দুঘণ্টাতে কেটেছি এমন ব্যাপারও ঘটেছে।

তাছাড়া পুলিশ. জমিদার, জোতদার, নায়েব, সেবাদলের মুখোমুখি রুখে দাঁড়াবার জন্যে আমাদের তীর-কাঁড় আর বল্লম-বাহিনী আছে। এ বাহিনী দুর্বল নয়। আমরা পুলিশের সঙ্গেও লড়তে পারব। আমাদের শ' শ' ধারালো তীর আর বল্লমের মুখে ক'খানা পুলিশের খানকয়েক বন্দুক কতক্ষণ টিকবে। আমরা ধ্বংস করে দোব জমিদার জোতদারদের, যদি তারা অত্যাচার বন্ধ না করে। সেইজন্যে আমরা এইখানে দাঁড়িয়ে শপথ নোব যে, আমরা এক হব, আমরা আর কোনো রকম ভয় করব না, আমাদের ভয়ের কিছু নাই, আমাদের হারাবার কিছু নাই। তেভাগা আদায় করতেই হবে, যারা আমাদের মা-বোনেদের ইজ্জত নিল, আমাদের মেহনতের ধান কেড়ে নিল, আমাদের ঘরে আগুন দিল, আমাদের অকারণে চাবকাল, তাদের অত্যাচারের শোধ নোব, তাদের শ্মশান তৈরি করব সুন্দরবনে।'

সভার মধ্যে একপাশে মেয়েরা বসেছিল। তাদের মধ্যে থেকে একজন মাঝবয়সী মেয়ে উঠে বলল, 'তোমরা বলো আমরা জমিদারের নায়েব ঐ শুয়োরের বাচ্ছা মহিম ঘোষকে শেষ করে দিই। না হলে ও পালাবে।

ও পুলিশ নিয়ে এসেছে।'

কামদেব বলল, 'না আমরা তো মারামারি করতে চাই না। আমরা আমাদের ন্যায্য দাবি পেতে চাই। মারামারি করে লাভ কি।'

অর্জুন বলল, 'ওরা মারলে আমরা মারব। তা না হলে মারব না। আমরা গুণ্ডা নই, খুনী নই।'

আর একজন মেয়ে উঠে বলল, 'যে লোক মেয়েদের ইজ্জত নিয়েছে, পৌষমাসের শীতের রাতে ন'জন মানুষকে ল্যাংটো করে গোরুর গোঁজে বেঁধে মারধোর করেছে। চাষীদের উচ্ছেদ করেছে, তোমরা তাকে কিছু বলবে নি?'

গণপতি অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, মহিম ঘোষের কথায় লক্ষ্মীর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল ওব। লক্ষ্মী একটা রহস্যময় ব্যাপার হয়ে রইল। লক্ষ্মীকে মনে পড়লেই কি সব অদ্ভুত ব্যাপার চলতে থাকে গণপতির শরীরে মনে। অসহ্য কষ্ট বোধ হয়, চোখ ফেটে জল এসে পড়তে চায়। রক্তের তাল যেন হঠাৎ দ্রুত হয়ে ওঠে। লক্ষ্মীকে কি মহিম খুন করে কোথাও পুঁতে ফেলেছে, নাকি অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলেছে, কিংবা কে জানে হয়তো বেশ্যার ব্যবসাদারের কাছে বেচেই দিয়েছে। মহিমের মুখোমুখি একদিন হতেই হবে ওকে, লক্ষ্মীকে খুঁজে বার করতেই হবে।

নরেন বলল, 'এখন মাথা গরম করো না তোমরা, সময় হলে আমরা সবই করব।'

গণপতি ভাবছিল, 'পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের আবেগ আর উৎসাহ কত বেশি!' ওদের কষ্ট বোঝে গণপতি। লক্ষ্মীব মনের কষ্ট সে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে অনুভব করে।

এমন সময় মধ্যবিত্ত জোতদার বীরেন দাস এসে হাজির হলো। বীরেন দাস কৃষকসমিতির সমর্থক। জোতদারদের অনেক ষড়যন্ত্রের খবর নিয়ে এসে সে কৃষকসমিতির নেতাদের গোপনে জানিয়ে যায়।

বীরেন বলল, 'গণপতি, খবর পেলাম আজ সকালের দিকে এক লঞ্চ পুলিশ এসেছে। ওদের (জোতদারদের) কোন বদ মতলব আছে।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল গণপতি। দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল সমস্ত মেয়ে পুরুষের মনে।

গণপতি ভাবল, 'চন্দনপিঁড়িতে কমিউনিস্ট সম্মেলন হচ্ছিল। নিশ্চয়ই কোন বিশ্বাসঘাতক সে-খবর দিয়েছে পুলিশকে। আর সেইজন্যেই এত তাড়াতাড়ি বেশি পুলিশ পাঠিয়েছে স্বাধীন দেশের কংগ্রেস সরকার।'

মুখে বলল, 'দেখা যাক্ কি হয়।'

ঠিক এমনি সময় গুলীর শব্দ ভেসে এল দক্ষিণ চন্দনপিঁড়ির দিক থেকে। চন্দনপিঁড়ির নদীর দুই কূলের বনের পাখিরা আর্ত চীৎকার করে আকাশে উড়ল। দুপুরের খাঁ খাঁ মাঠে মাঠে গুলীর শব্দ অশুভ সংকেতের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে গেল।

লয়ালগঞ্জ, হরিপুরের লোকেরা ছুটতে ছুটতে এসে জমা হলো চন্দন-পিঁড়ির নদীর বাঁধের উপরে। ওদিকে শিবরামপুর রাজনগরের লোকও একই বাঁধের উপর এসে মিলল। মাঝ আকাশে সূর্য। শীতের রোদ চন্ চন্ করছে। হু হু করে ছুটে আসছে উত্তুরে হাওয়া। দিক্‌রেখা পর্যন্ত মাঠ-ভরা অনতিপক্ক হলুদ ও ধূসর রঙের ধান। গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষের মনে উদ্বেগ আর উত্তেজনা থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল।

বাঁধের উপরে জনতা বলে উঠল, 'চলো চন্দনপিঁড়ি।'

নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই। নদীতে কুমীর আছে। আগে কুমীরের মুখে গোরু-বাছুর, কখনো দু একটা মানুষও মরেছে। নদী একেবারেই নিরীহ নয়। দুই কূলে তার সুন্দরবনের অতীত মূর্তি ঘন অরণ্যের আভাস। নদী গভীর, জোয়ার-ভাটায় খরস্রোতা। সেই নদীতেই দল বেঁধে সব ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওপারের তীরে উঠে বন পার হয়ে ছুটল যেখান থেকে বহু মানুষের আর্ত কান্নার মর্মান্তিক চীৎকার ভেসে আসছে।

কৃষক নেতারা আর যোদ্ধারা ঘটনার জায়গায় যেতে পারল না। কেননা ওদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই হয়তো ওয়ারেণ্ট আছে। ওখানে পুলিশ আছে। এখনও সমস্ত অঞ্চলেই সংগঠন দুর্বল, ভাবাবেগ বেশি, রাজ-নৈতিক চেতনা এখনও জাগে নি, এখন ধরা দেওয়া চলে না। বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ওরা সংবাদের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে একজন নদী সাঁতরে পার হয়ে ছুটতে ছুটতে ওদের কাছে এসে হাঁপাতে লাগল।

নরেন বলল, 'বসে দম নাও খানিক, তারপর বলো কি হয়েছে?'

কিন্তু সে অপেক্ষা করতে পারল না। হাঁপাতে হাঁপাতেই বলতে লাগল, 'দক্ষিণ চন্দনপিঁড়িতে সেনেদের কাছারির কাছে গুলী চালিয়েছে পুলিশ। নায়েব ভবেশ দাসের চক্রান্তে পুলিশ গুলী চালিয়েছে। গুলীতে ছাব্বিশ জন পড়েছে। তার মধ্যে ন'জন সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেছে।'

'তাদের নাম জেনেছ?'

'হ্যাঁ।'

'বলো।'

'সরোজিনী, অহল্যা, বাতাসী, অশ্বিনী, গজেন আর নাম জানতে পারি নাই। অহল্যা পোয়াতী ছিল। চার জন মেয়ে আর পাঁচজন পুরুষ সঙ্গে সঙ্গেই মরে গিয়েছে।'

গণপতি চীৎকার করে উঠল, 'কি করা যায়, কি করব আমরা? রেণুপদ, অর্জুন, বীর, নরেন, সিন্ধু, অজয়, বলো আমরা এখন কি করব! ন'জন চাষী মেয়েপুরুষকে গুলী করে খুন করল! অনেক অত্যাচার তারা সহ্য করেছে। এখন আবার গুলী চালাচ্ছে ওরা? এর শোধ চাই। আমরা খুনখারাপি করতে চাইনি। কিন্তু রক্তের বদলে রক্তও চাই। খুনের বদলি খুন নিতেই হবে।'

গণপতির চোখ জ্বলছে রাগে উত্তেজনায়। বন্ধুরাও উত্তেজিত। রাগে, ঘৃণায়, উত্তেজনায় ওরা অস্থির হয়ে উঠেছে।

বেলা তখন তিনটে। এমন সময় ওরা লক্ষ্য করল, একজন লোক বলরাম কাজলীর বাড়ীর দিকে আগিয়ে চলেছে। সে চারদিকে সন্তর্পণে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন চোরের মতো পালাচ্ছে।

সাগর বলল, 'ওটা কে যাচ্ছে?'

গণপতি বলল, 'নিশ্চয়ই জমিদারের চর, ওকে ধরে আনো।'

কিছুলোক ছুটে গিয়ে লোকটাকে ধরে নিয়ে এল। ইতিমধ্যে চন্দনপিঁড়ি থেকে লোকজন ফিরতে আরম্ভ করেছে। অনেকেই চিনতে পারল, লোকটা সেনের কাছারির কর্মচারী।

নরেন জিজ্ঞাসা করল, 'এই কোথাকে যাইছিলি?'

'এমনি ওদিকে।'

'এমনি যাচ্ছিলি? বেশি চালাকি করবি না, শুয়োরের বাচ্চা, বল্

কোথা যাচ্ছিলি ?'

'সত্যি বলছি ।'

গণপতি বলল, 'সত্যি বলছিস ? আসল কথা না বললে তোকে ছাড়ব না। বল্ জমিদারের কুকুর, জারজ ।'

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। গণপতি ঠাস করে এক চড় কশাল তার গালে। অমনি সে ককিয়ে উঠল. 'আমাকে রক্ষা কর, আমি বলছি।'

'হ্যাঁ, বল্ ।'

তোতলামি করে নিচু গলায় বলল লোকটা, 'আমি বলরাম কাজলীর বাড়ী যেছিলাম ।'

'কেনে ?'

'ওখানে ত্রিশ চল্লিশজন জোতদার মিলে মিটিং করছে।'

'কি জন্যে যেছিলি ?'

'চন্দনপিঁড়িতে গুলী চালানো হয়েছে, সেই খবর দিতে ।'

'তোকে পাঠিয়েছে কে ?'

'নায়েববাবু ।'

'নায়েববাবু কে ?'

'পরেশ দাস ।'

'ও, তাহলে খবর টবর দেবার কাজও তুই করিস ? তা আমাদের ন'জন মানুষ আজ প্রাণ দিয়েছে চন্দনপিঁড়িতে। বল্ শুয়োরের বাচ্ছা, তাদের কাছে খবর কে নিয়ে যাবে ? তাদের কাছে কে খবর দিয়ে আসবে যে, আমরা তাদের মৃত্যুর শোধ নোব ।'

লোকটা ভয়ে কেঁদে ফেলল, 'আমাকে রক্ষা কর ।'

'আচ্ছা বল এবার, কেন গুলী চলল ? চন্দনপিঁড়িতে কি হয়েছিল ?'

ভয়ে ক্যাকাশে হয়ে গিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় ঢোক গিলে গিলে চোখ পিট পিট করতে করতে লোকটা বলে গেল, 'সেনেদের কাছারির তিনটে নায়েব পঁচিশজন পুলিশ নিয়ে দক্ষিণ চন্দনপিঁড়ির ঘরে ঘরে অত্যাচার করছিল।'

'কি অত্যাচার ?'

'অত্যাচার যা করে ।'

'কি করে, বল্ সুমুন্দির বেটা।'

'জিনিসপত্র লুট করছিল, ঘর ভেঙ্গে দিল, মারধোর করল, আর, আর আমি জানি না।'

'তুই জানিস না? ইন্দ্রকে ধরে মারে নাই? সতীশকে ধরে পেটে নাই?'

'হ্যাঁ।'

'তুই তাতে ছিলি?'

'না।'

'আবার মিথ্যে কথা বলে? নিশ্চয়ই তুইও তাতে ছিলি।'

হঠাৎ লোকটার গালে একটা দারুণ থাপ্পড় কষাল নৃপতি।

গণপতি বলল, 'দাঁড়াও, আগে ওকে সব বলতে দাও।'

জিজ্ঞাসা করল, 'তুই ছিলি কিনা বল্।'

'ছিলাম।'

'হুঁ, তাই বল, তুইও নির্দোষ নোস, খানকীর ছাওয়াল। তারপরে বলে যা।'

ঠিক এমনি সময় একটি লোক ভিড় ঠেলে ওদের কাছে এসে বলল, 'আমি দক্ষিণ চন্দনপিঁড়ি থেকে আসছি। ইন্দ্র আর সতীশকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। ওরা তোমাদের কাছে খবর দেবার জন্যে আমাকে পাঠিয়ে দিল।'

গণপতিরা ওকে ধরে বসাল। বলল, 'বসো একটু, দম নাও, কি হয়েছে বলো।'

সাগর বলল, 'জমিদারের ঐ দালালটাকে বেঁধে রাখি আগে।'

একজন দড়ি আনতে গেল।

যে লোকটি ইন্দ্রদের খবর নিয়ে এসেছিল, সে জল খেতে চাইল ব'লে একজন জল আনতে গেল।

জমিদারের পাইকটাকে পিঠ-মোড়া ক'রে বেঁধে বসিয়ে রাখা হলো।

গণপতি ইন্দ্রের পাঠানো লোকটিকে বলল, 'কি নাম তোমার বলো।'

'আমার নাম অবিনাশ, আমিও কৃষকসমিতির সদস্য।'

'ঠিক আছে, সব ব্যাপারটা খুলে বলো।'

লোকটা বলে গেল, 'অধীরের বাড়ীতে কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলন শেষ হয়ে গেলে তোমরা চলে গেলে। সেই রাত্রেই মহিম ঘোষের কাছারির পুলিশরা, ভি. ডি. পার্টির লোকেরা, আর সেনেদের লেঠেলরা অধীরের বাড়ী চড়াও হলো। নেতাদের কাউকে না পেয়ে অধীরকে মারধোর করল, ওর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল, বাড়ীটা শাবল দিয়ে ভেঙ্গে দিল। তারপর চন্দনপিঁড়ির ঘরে ঘরে অত্যাচার করতে লাগল। ভি. ডি. পার্টির লোকেরা চাষীদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঢুকে মারপিট করতে লাগল, জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলল, লুটতরাজ করতে লাগল। ইন্দ্র আর সতীশের ঘরে আগুন দিয়ে দিল, কৃষকসমিতির লোকেদের বাড়ীতেই বেশি অত্যাচার করতে লাগল ওরা।'

বীরেন্দ্র দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'তারপর?'

'তারপর পুলিশ আর ভি. ডি. পার্টির লোকেরা মেয়েদের টেনে নিয়ে গিয়ে পাশবিক অত্যাচার করতে লাগল। একটা পাড়াতে কয়েকঘর মাত্র চাষী ছিল, সেখানে ওরা মজা করবার জন্যে সমস্ত মেয়েদের টেনে বার করে এনে জোর করে কাপড় কেড়ে নিয়ে ল্যাংটো করে দাঁড় করিয়ে রেখে হেসে হেসে মজা দেখছিল, অশ্লীল গালাগাল করছিল, তাদের সামনে কাপড় তুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোমর নাচাছিল।'

গণপতি চীৎকার করে উঠল, 'আমাদের খবর দিলে না কেন?'

'তখন আর খবর দোব কেমন করে? হঠাৎ ওরা আক্রমণ করেছিল। আমরা কি করব না-করব বুঝতে পারছিলাম না। ওরা মার-ধোর করছিল আর বলছিল, 'যা এবার ধান কাট গিয়ে, দেখি তোদের কত হিম্মত হয়েছে।' তারপর অত্যাচার দেখে ইন্দ্র, সতীশ, অধীররা বাড়ী বাড়ী ঘুরে বলে এল, বাঁধের কাছে গিয়ে সবাই একসঙ্গে জমায়েত হও, না হলে আমরা এ অত্যাচার রুখতে পারব না।'

সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে একসঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন সকাল হয়ে গিয়েছে, রোদ উঠে গিয়েছে। তারপরে গোপাল জানার বাড়ীতে পুলিশ সার্চ করতে যায়। তার ঘরে একটা টিনের সুটকেসে চন্দনপিঁড়ি কৃষকসমিতির চেকমুড়ি (রসিদ বই) পেয়ে দারোগা সুটকেসটা হাতে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। সেই চেকমুড়িতে কৃষকসমিতির সমস্ত সদস্যের

নাম পাওয়া যাবে ভেবে চাষীরা সবাই খুব ভয় পেয়ে যায়। দারোগা দিবাকর সরকারের পাশে পাশে যাচ্ছিল নায়েব ভবেশ দাস। মেয়ে পুরুষ দল বেঁধে ওদের পেছনে পেছনে যেতে লাগল। হঠাৎ মেয়েরা এক ঝটকায় দারোগার হাত থেকে সুটকেসটা ছিনিয়ে নিল। দারোগা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চাষীদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তখন ভবেশ দাস দারোগাকে বলল, 'দেখলেন তো হুজুর, আপনার হাত থেকে বাক্স ছিনিয়ে নিচ্ছে, তাহলে আমাদের কথাটা একবার ভাবুন।' দারোগা আর ভবেশ আবার চলতে লাগল। মেয়েরা তখন খেপে উঠেছে, মনে হল দারোগাকে আর ভবেশকে ওরা হয়তো হঠাৎ মেরেই বসবে।'

• গণপতি চিন্তা করে ওর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে লাগল, 'সুন্দরবনের এই আন্দোলনকে মেয়েরাই বেশি সমর্থন করেছে। কেননা এখানে মেয়েরাই সব থেকে বেশি কষ্ট সহ্য করেছে। সংসার চালাবার কষ্ট তারাই ভোগ করেছে বেশি, তারাই জোতদার আর নায়েবদের কাছে লাঞ্ছিত হয়েছে বেশি, ঘরে পুরুষের ঠ্যাঙানি খেয়েছে আর সেইজন্যেই ওরা এত বেপরোয়া আর দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে।'

অবিনাশ বলে যেতে লাগল, 'দেখতে দেখতে আরও বহু চাষী মেয়েপুরুষ জড় হতে লাগল। ছত্রভঙ্গ মেয়েপুরুষ বানের জলের মতো এসে মিলতে লাগল একসঙ্গে। পুলিশ ছিল পঁচিশজন। আর জনতা অনেক। আর প্রত্যেকটি চাষী খেপে উঠেছে, মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা খিস্তি করছিল, গালাগাল দিচ্ছিল, তারা নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় কথাবার্তা বলছিল। আর আস্তে আস্তে দারোগা সমেত পঁচিশজন পুলিশকে ওরা ঘিরে ফেলতে লাগল। যে পুলিশরা রাত্রিতে চন্দনপিঁড়ির ঘরে ঘরে অত্যাচার চালিয়েছে তারা এখন ভয় পেয়ে গেল। দারোগা তখন বলল, 'তোমরা আমাদের ছেড়ে দাও।' জনতা কথা বলল না। শুধু অনেক জোড়া জ্বলন্ত চোখ ওদের দিকে নজর রাখল। তখন ভয় পেয়ে দারোগা বলল, 'তোমরা আমাদের বন্দুক নিয়ে নাও, আমাদের ছেড়ে দাও।' পুলিশের কাছ থেকে চাষী মেয়েপুরুষ বন্দুকগুলো নিয়ে নিল। পুলিশরা তখন বিনা বন্দুকে জনতার ঘেরাও থেকে কিছুটা বাইরে গিয়ে বলল, 'বন্দুকগুলো সরকারী বন্দুক। বন্দুকগুলো আমাদের ফেরত দাও। আমরা চলে যাব।'

তখন জনতা আবার বন্দুক ফিরে দিতে ওরা ভবেশ দাসের কাছারির দিকে চলতে লাগল। জনতা মিছিল করে ওদের পিছনে পিছনে স্লোগান দিয়ে দাবি জানাতে জানাতে আগাতে লাগল।'

অবিনাশ একটুখানি চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগল, 'ভবেশ দাসের কাছারিতে ঢুকে পড়ল দারোগা আর ভবেশ। শুনলাম সেইখানে ভবেশ নাকি দারোগাকে বলেছিল, 'আমি আপনাকে টাকা দিচ্ছি দারোগাবাবু, আপনি কিছু শুইয়ে দেন, নাহলে ওদের আন্দোলন দমন করা যাবে না।' ভবেশ দাস নাকি আটশ' টাকা ঘুষ দিয়েছিল দারোগাকে।'

গণপতি ভবেশের কাছারির সেই কর্মচারীটাকে পা দিয়ে এক গুঁতো মেরে বলল, 'এই দারোগাটার নাম জানিস?'

'হ্যাঁ, বাবু।'

'কি নাম?'

'কাকদ্বীপ থানার ছোট দারোগা দিবাকর সরকার।'

'আচ্ছা, সত্যি করে বল দেখি, ভবেশ কতটাকা ঘুষ দিয়েছিল দারোগাকে?'

'আটশ টাকা।'

'তারপর, টাকা নিয়ে দারোগা কি বলেছিল?'

লোকটা ভয়ে জড়সড়ো হয়ে বলল, 'দারোগা পকেটে টাকা নিয়ে 'ঠিক আছে' বলে মহিম ঘোষের কাছারিতে পুলিশদের নিয়ে চলে গিয়েছিল, সেখানে আজ ভোরে এক লঞ্চ পুলিশ এসেছে।'

'তাহলে তুই সবই জানিস বল্?'

সাগর অবিনাশকে বলল, 'অবিনাশ, বলো, তারপরে কি হলো?'

অবিনাশ বলল, 'মিছিল যখন বসন্ত সেনেদের বাঁধের উপর দিয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই মহিম ঘোষের কাছারির ক্যাম্প থেকে শতখানেক পুলিশ নিয়ে দারোগা আবার এসে হাজির হলো। মিছিলের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সেই পুলিশের লাইন। দারোগা পুলিশদের সামনে ছিল। চাষীদের মিছিলের সামনে ছিল, ইন্দ্র, সতীশ। দারোগা ইন্দ্রকে বলল, 'তোমরা বাঁধের একধার ধরে এসো, আমরা একধার ধরে ওদিকে যাব।' আশি-নব্বই জন চাষী মেয়েপুরুষের মিছিল। সেই মিছিলটা যেই পুলিশদের

সারিটা পার হয়ে গেল অমনি দারোগার হুকুমে জনতার উপরে পিছন দিক থেকে গুলী ছুঁড়ল পুলিশ। উনত্রিশ জন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার দশজন সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল।'

ভয়ার্ত পাণ্ডুরতা ফুটে উঠল অবিনাশের মুখে। সে আর্তস্বরে বলে উঠল, 'উঃ সে কি রক্ত! রক্তে মাটি ভিজে যাচ্ছিল। রক্তের কি রকম গন্ধ নাকে এসে লাগছিল। আর অহল্যা ছিল পোয়াতী। তার বুকে লেগেছিল গুলি। রক্তের যেন শেষ ছিল না। অত রক্ত বোধ হয় সন্তানের দুধ হবে বলে জমেছিল।'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মেয়েরা। ওরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল সহসা।

গণপতি বলল, 'বলো অবিনাশ, আরও বলো, তারপর কি হলো?'

'তারপর যারা মারা গেল, তাদের আত্মীয় স্বজনদের সে কি বুকফাটা কান্না!'

সমবেত জনতার মধ্যে থেকে একজন কে জিজ্ঞাসা করল, 'লাসগুলোকে কি করল?'

'আমি দেখে এলাম লাসগুলোকে লঞ্চে তুলল। বোধ হয় ডায়মণ্ড-হারবারে নিয়ে যাবে।'

গণপতি জমিদারের সেই চরটাকে বলল, 'এই হারামজাদা, তোর নাম কি?'

'আমার নাম দুর্জয় সিং।'

'আচ্ছা, নামের দেখি বাহার আছে। তা বাংলাদেশের ভাত মেরে মেরে সেই বাংলা বুলি তো শিখেছিস শালা। বল দেখি তুই কেনে বলরাম কাজলীর বাড়ী যাচ্ছিলি?'

'লাস লঞ্চে যখন তুলছিল, তখন বহু লোক জমে গেল। আর সব লোক খেপে উঠেছিল। তারা পাগলের মতো হয়ে গেল সবাই। ওরা বোধ হয় নায়েববাবুকে শেষ করে ফেলবে। আমি ভয় পেয়ে পালিয়ে আসছিলাম।'

'পালিয়ে এলি তো জোতদারদের মিটিংয়ে যাচ্ছিলি কেনে?'

'খবর দিতে।'

'কি খবর দিতে?'

'গুলী চলেছে, মানুষ মরেছে।'

'তুই তো সেনেদের কর্মচারী ?'

'হ্যাঁ।'

'বল দেখি ঠিক করে, ক'জন লোক মরেছে ?'

'কুড়ি জন।'

'কুড়ি জন ? তা হলে দশজনকে লঞ্চে তোলা হলো কেন ?'

'আমি জানি না।'

'জানিস না ?' বলে সাগর এক চড় কষাল তার গালে।

সে বলে গেল, 'আর দশজন পুলিশের কাছাকাছি পড়েছিল, তাদের পুলিশ টেনে নিয়ে গিয়ে তাদের উপরে তাঁবু খাটিয়ে দিয়েছে। আর তাঁবুর ভিতরে মাটি খুঁড়ে পুঁতে রেখেছে।'

অবিনাশ বলে উঠল, 'তাহলে আর দশজনকে ক্যাম্পের নীচে পুঁতে রেখেছে ! আমরা দশজনকে খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম বুঝি কোথাও পালিয়েছে।'

গণপতি বলল, 'জোতদারদের কাছে তুই খবর দিতে যাচ্ছিলি। তা শালা, ভবেশ দাসের কাছে দিনে ক'ঘা জুতো খাস, মাইনে পাস ক'পয়সা শালো ? চাষীদের উপর অত্যাচার করতে খুব মজা লাগে না ? তুই জমিদারের কর্মচারী, জমিদারের পাপের সহকারী। তুই তো চন্দনপিঁড়ির ঘরে ঘরে অত্যাচার করেছিস। মা-বোনেদের অপমান করেছিস, মানুষকে পশুর মতো ঠেঙ্গিয়েছিস। জারজ, তোকে দিয়ে আমরাও একটা খবর পাঠাতে চাই। যে কুড়িজন চাষী মেয়েপুরুষ আজ তোদের পুলিশের গুলীতে প্রাণ দিল তাদের কাছে খবর পাঠাতে চাই। তুই গিয়ে তাদের বলবি, তোমরা জেনে রেখো, চাষীরা তোমাদের মৃত্যুর শোধ নেবে। রক্তের বদলে রক্ত নেবে। তোমাদের অপমানের শোধ নেবে। তুই এ খবর তাদের কাছে নিয়ে যাবি।'

দুর্জয় সিং কেঁদে উঠল, 'আমাকে রক্ষা কর বাবা !'

অবিনাশ বলল, 'কেন এখন কান্না কেন শালা ? তোর অত্যাচারে আমরা চন্দনপিঁড়ির লোকেরা একটু শান্তি পাই নি রে শালা। খচ্চরের বজ্জাতির শেষ ছিল না।'

অভিমন্যু বলল, 'সিংজী তখন মনে ছিল না যখন মেয়েদের অপমান

করেছিস, মানুষকে ঠেঙ্গিয়েছিস। তোর বিচার করবে জনতা।'

সাগর বলল, 'ভাই সব, বন্ধুসব, মা ও বোনেরা বিচার করে বলুন, এর কী শাস্তি হওয়া দরকার।'

জনতা প্রায় একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, 'রক্তের বদলে রক্ত চাই।'

কেউ বলল, 'জমিদারের দালাল, দালালি ওর শেষ করে দিতে হবে।'

গণপতি বলল, 'জনতা তোর মৃত্যু-দণ্ড দিল। তোর অনেক পাপের আজ শাস্তি নে।'

তখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছে। সূর্যের শেষ আলো রক্ত ছড়িয়ে দিয়েছে সুন্দরবনের শোকার্ত আকাশে, মাঠ-ভরা ধানের ক্ষেতে।

তারপর কৃষকসমিতির নেতারা দুর্জয় সিংকে নিয়ে গেল চন্দনপিঁড়ির নদীর কূলে বনের মধ্যে।

তাকে ভোজালি দিয়ে হত্যা করা হলো।

তারপর অত্যন্ত গভীর করে মাটি খুঁড়ে মৃতদেহ পুঁতে দেওয়া হলো নদীর গর্ভে।

মানুষ বলল, 'ওকে এমন করে পুঁতে দিতে হবে যেন শেয়াল কুকুর ওকে ছুঁতে না পারে। ওর মাংস খেলে শেয়াল কুকুরও হজম করতে পারবে না।'

॥ ৪০ ॥

তারপর আস্তে আস্তে নেমে এল অন্ধকার রাত। কার্তিকের কুয়াশা ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে গেল আকাশে বাতাসে। ঝিঁঝিঁ পোকার কান্না বাজতেই লাগল মৃত্যুর চরণ-নূপুরের মতো। চন্দনপিঁড়ির মানুষের আর্ত বিলাপ, কান্না সমস্ত মানুষের প্রাণে প্রাণে দারুণ যন্ত্রণা, হাহাকার আর রাগ আগুনের মতো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিল। ঠাণ্ডা, ভারি অন্ধকারে চাপা রইল সুন্দরবন।

সে রাতে অনেকদিন আগে জারি-করা পি. ডি. এ্যাক্টের ওয়ারেণ্ট হাতে নিয়ে পুলিশ ঘুরল কমিউনিস্টদের বাড়ী বাড়ী। পুলিশ হিংস্র জানোয়ারের মতো ওত পেতে রইল এখানে সেখানে। আর এক রাত্রেই গ্রেপ্তার হলো কামদেব ঘড়ুই, সাধুচরণ এবং আরও অনেকেই।

কিন্তু সে-রাতে কৃষক-জঙ্গী বাহিনীর লোকেদের চোখেও ঘুম ছিল না। নিজের শ্রেণীর মানুষদের প্রতি গভীর সহানুভূতি আছে ওদের। যে কুড়ি জন মেয়েপুরুষ চন্দনপিঁড়িতে প্রাণ দিয়েছে, যাদের রক্তে সুন্দরবনের নোনা মাটি ভিজেছে, তাদের প্রতি যথা কর্তব্য এখনও করা হয় নি, একথা ওরা ভুলতে পারছিল না। জীবন নিয়ে ইঁদুরের মতো বাঁচবার ইচ্ছে ওদের কবেই শেষ হয়ে গেছে। এখন মরণকে ওরা থোড়াই পরোয়া করে। নিজেদের জীবনের চেয়ে অন্যের জীবন ওদের কাছে অনেক বেশী দামী বলে মনে হয়। সেন-জমিদারের নায়েব ভবেশ দাসকে শাস্তি না দিলে জনতার বন্ধু-শিষ্য নেতাদের মুক্তি নেই, স্বস্তি নেই।

ওরা মাঝ-রাতের অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ-ডাকা হু হু-করা মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে চলল। কারও হাতে বল্লম, কারও হাতে ছোরা, কারও হাতে ভোজালি। ও-অঞ্চলের রীতি অনুযায়ী মশাল জ্বেলে পথ আলো করার উপায় নেই। শত্রুর চোখ দেখতে পাবে। অন্ধকারেই সাপের ভয় অগ্রাহ্য করে বন পেরিয়ে পরনের কাপড় মাথায় পাগড়ির মতো বেঁধে চন্দনপিঁড়ির নদী সাঁতরে পার হয়ে ওরা চন্দনপিঁড়িতে গিয়ে পৌঁছল। নিঃশব্দে অনেক ঘোরা পথে পৌঁছল নায়েব ভবেশ দাসের বাড়ীর দরজায়। বাইরে পাহারায় রইল কয়েকজন। ভিতরে দরজা ভেঙ্গে ঢুকে গেল জনাকয়েক। একেবারে ভবেশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

মেয়ে গলা ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠল, 'কে ? কে ?'

এক কোণে একটা হারিকেন মিট্ মিট্ করে জ্বলছিল। আলোটা উসকে দিতেই ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠল তিনটি মানুষ, নায়েব ভবেশ, তার স্ত্রী আর তার শাশুড়ী। ভবেশ শুয়েছিল তক্তাতে। নীচে মেঝেতে শুয়েছিল শাশুড়ী আর বৌ। আজ ভবেশের ঘরে ওর শাশুড়ী আর বৌ ভবেশকে আগলে শুয়েছিল। ভবেশ কি নিজের অপরাধে নিজেই ভয় পেয়েছিল ? তাই তাকে সাহস দিতে শাশুডী বৌ দুজনেই তার ঘরে শুয়েছিল ?

একজন গিয়ে ভবেশের একটা হাত ধরে টান মারতেই তক্তা থেকে ভবেশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। দারুণ ভয়ে ওর মুখ সাদা হয়ে গেছে ; ওর শরীর কাঁপছে থর্থর্ করে। ভবেশের শাশুড়ী আর বৌ উঠে এসে

ভবেশকে জড়িয়ে ধরল।

তারপর ভবেশের শাশুড়ী ভবেশকে ছেড়ে হাত-জোড় করে চাষীদের বলল, 'না, না, ওকে তোমরা নিয়ে যেও না, আমাদের কাছ থেকে ওকে তোমরা নিয়ে যেও না। তোমাদের পায়ে পড়ি। আমরা তো কোনো দোষ করি নাই, তাহলে আমাদের কেন সব্বনাশ করবে? মা হয়ে আমি কেমন করে ওকে ছেড়ে দোব? তোমাদের পায়ে ধরছি (সত্যি সত্যি ওদের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল) তোমরা আমার মুখ চেয়ে ওকে ক্ষমা কর।'

'তা হয় না মা, ও মহাপাপী। পাপ করলে প্রাচিত্তির যে করতে হয়।'

ভবেশের বৌ কান্নাভাঙ্গা গলায় বলল, 'আমি হিন্দুর মেয়ে। সাবিত্রীর কোল থেকে সত্যবানকে যমে নিতে পারে নাই। তোমরা মানুষ হয়ে আমার কোল থেকে ওকে কেড়ে নিও না গো। না, আমি ওকে দোব না।' ব'লে আরও জোরে আঁকড়ে ধরল ভবেশকে।

একজন বলল, 'মা আপনারা ওকে ছেড়ে দেন। আমরা ওকে ছেড়ে দিতে পারব না। ও আজ কুড়িজন নির্দোষ চাষী মেয়েপুরুষের প্রাণ নিয়েছে। অহল্যাও মা ছিল। গভ্যে তার সন্তান ছিল। তাকেও ও খুন করিয়েছে। সে পাপের বিচার কে করবে?'

ভবেশের শাশুড়ী বলল, 'সে বিচার ভগবান করবেন বাবা। সে প্রাচিত্তির ও করবে। তোমরা কেন এসেছ? তোমরা যাও। আর ও তো মারে নাই, পুলিশ মেরেছে।'

'ও টাকা ঘুষ দিয়ে পুলিশকে গুলী চালাতে বলেছে। আর ভগবান বিচার করবে বলছেন!'

'হ্যাঁ বাবা ভগবানের বিচারের ওপর ওকে ছেড়ে দাও।'

'ভগবান নাই মা, দেব-দেবতা মিথ্যে। ভগবান থাকলে অন্যায় ক'রে, পাপ ক'রে, খুন ক'রে, অত্যাচার ক'রে, মেয়েমানুষকে ধরে এনে নষ্ট ক'রে সুন্দরবনের নায়েব জমিদাররা সুখে থাকতে পারত না। হাজার হাজার চাষীর জন্যে ভগবানের দরদ নাই। আজ কুড়িজনকে এক লহমায় খুন করল। তা দিনরাত ঠিকই চলছে। বাজ পড়ে নাই, ভূমিকম্প হয় নাই। ভগবান নাই মা, থাকলে সে বড়লোকদের পক্ষে। তার বিচারের ওপর

আমরা ভরসা রাখতে পারব না।'

ভবেশের শাশুড়ী বলল, 'আমরা ভগবান মানি বাবা, তোমরা চলে যাও। ভগবান ওর পাপের শাস্তি দেবেন। তাঁর বিচার ন্যায় বিচার।'

'ভগবান কি করবে না করবে জানি না, শাস্তি মানুষই দেয়।'

আর একজন ভবেশের চুলের মুঠি ধরে টানতেই ভবেশের শাশুড়ী আর বৌ তার পা চেপে ধরল, কাকুতি করতে লাগল, 'ওকে প্রাণে মেরো না, ওকে নিয়ে যেওনা!'

তখন একজন ভবেশের শাশুড়ীকে বলল, 'শুনুন মা, আপনার জামাই এতকাল চাষীমেয়েদের জোর করে কাছারিতে নিয়ে গিয়ে ইজ্জত নিয়েছে। পুলিশ, গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে চাষীর মেয়েদের ল্যাংটো করে দাঁড় করিয়ে মজা দেখেছে, মানুষ খুন করেছে, চাষীদের জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে, চাষীদের ধরে জুতো-পেটা করেছে, ঘরে আগুন দিয়েছে, ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে। গরীব চাষীরা কি অপরাধ ওর কাছে করেছিল? আপনার ছেলে প্রায়ই রাত্রিবেলা অসহায় গরীব চাষীর ঘরের বৌ-ঝিদের কাছারিতে ধরে এনে তার ধর্ম নষ্ট করেছে। মা ভেবে দেখুন, বিচার করুন, আজ যদি কোনো কাপুরুষ আপনার এই মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করে জোর ক'রে, তাহলে মেয়ে হয়ে ভেবে দেখুন, আপনার ইজ্জতও কি যায় না? ওকে ছেড়ে দেন, ওর বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নাই, দরকার নাই।'

ভবেশের স্ত্রীকে শুনিয়ে আর একজন বলল, 'মা, আপনি একবার ভেবে দেখুন, আপনার স্বামী গরীব চাষীদের ওপর কত অত্যাচার করেছে! রাতের পর রাত মদ খেয়েছে, কাছারিতে ধরে নিয়ে গিয়ে চাষীর বৌ-ঝিদের ধর্ম নষ্ট করেছে। আপনার স্বামী পুলিশ আর গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছে চাষীদের মেয়েদের ওপর অত্যাচার করতে। সেই মেয়েদের জায়গায় একবার নিজেকে ভেবে দেখুন, মা! দুঃশাসন কৌরবসভায় দ্রৌপদীর চুল ধরে টেনে এনে বস্ত্রহরণ করেছিল, তাই তার বুকের রক্ত ভীম পান করেছিল, সেই রক্ত দিয়ে দ্রৌপদীর চুল বেঁধে দিয়েছিল। আর দুর্যোধন দ্রৌপদীকে উরুত দেখিয়েছিল ব'লে তার উরু-ভঙ্গ করেছিল ভীম। মেয়েমানুষের অপমানে আপনার কি অপমান হয় না মা? অমন স্বামী থাকার চেয়ে বিধবা থাকলে এমন কি ক্ষেতি হবে মা? ওর পাপে আপনার জীবন জ্বলে পুড়ে যাবে। ওর

বিষ নিঃশ্বাসে আপনারাও নোংরা হয়ে যাবেন। ওরে ছেড়ে দেন, মা, ধরিত্তি ওকে আর সহ্য করতে পারছেন না।'

ভবেশের শাশুড়ী আর বৌ হঠাৎ কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে কাঁদতে লাগল। চাষীদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হারিকেনের অল্প আলোয় এই দুই রমণীর মুখে দেখা গেল হতাশা, লজ্জা, ভয় আর দুঃখের কালিমাখা যন্ত্রণা।

ভবেশকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে গেল ওরা। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল। ভবেশের মুখে শক্ত করে কাপড় বেঁধে, নিয়ে যাওয়া হলো নদীর পাড়ে।

সেখান থেকে ডিঙ্গিতে করে নিয়ে যাওয়া হলো তমলুকের চড়ায়। কুড়িজন চাষী মেয়েপুরুষকে খুনের অপরাধে তাকে মৃত্যু-দণ্ড দেওয়া হলো। তমলুকের চড়ায় গভীর জঙ্গলে লোক-চোখের আড়ালে একটা গাছের ডালে তাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো।

জঙ্গী কর্মীরা আবার তাদের যোগাযোগ কেন্দ্রে ফিরে চলল। রাত্রির তখন শেষ প্রহর। শীতের হাওয়া হাড় কাঁপিয়ে বয়ে চলেছে। শিশিরে ভিজে গেছে পথের ধুলো। অন্ধকার কালো আকাশেব লক্ষ লক্ষ তারার ক্ষীণ আলোকের বর্শা পৃথিবীতে নামছে। পতঙ্গের বিচিত্র ও বহুবিধ শব্দ বাতাসে ভেসে আসছে। ঝিল্লির আর্ত ঝঙ্কার বেজেই চলেছে। শিয়াল ডেকে উঠছে মাঝে মাঝে। চন্দনপিঁড়ির নীল নদী জোয়ারের জলে ঘোলা হয়ে গিয়ে দুই পাড়ের জঙ্গল ছাপিয়ে দুরন্ত বেগে ছলছলিয়ে উজানে বইছে।

॥ ৪১ ॥

তখন থেকে কৃষকসমিতির নেতারা আত্মগোপন করে থাকত। রাতের বেলা কোথাও মিলিত হয়ে আলোচনা পরামর্শ করত। গাঁয়ে গাঁয়ে মিটিং করবার চেষ্টা করত। কিন্তু সমস্ত অঞ্চলময় পুলিশ টহল নিয়ে বেড়াত, ভি. ডি. পার্টির লোকেরা ঘুরে বেড়াত, অনেকে গুপ্তচরের কাজ করত।

দুচারদিন পরেই মধু হালদার আবার এলেন। একদিন রাত্রে তিনি কৃষকনেতাদের নিয়ে বসলেন শিবরামপুরের নিমাই দাসের বাড়ীতে। সেই মিটিংয়ে পঞ্চাশজন উপস্থিত হলো।

সাগর বলল, 'বন্দুক না হলে আমরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠব না। ওরা দূর থেকে গুলী ছুঁড়ে আমাদের ঘায়েল করতে পারে, আমরা লাঠি বল্লম নিয়ে ঠিক সুবিধা করতে পারছি না। এদিকে মানুষজনের সঙ্গে ঠিকমতো যোগাযোগও করতে পারছি না। লুকিয়ে চুরিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, কি করব আমরা বলুন, কমরেড।'

বিহারী বলল, 'ঠিক তাই, এমনি করে লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন চলবে? ধানকাটার সময় এসে গেল। আর তো আমাদের লুকিয়ে থাকলে চলবে না। তাহলে একমুঠো ধান পাবে না চাষী। আর দুর্ভিক্ষ এসে যাবে আমাদের মাথার ওপর।'

ফরমান সেখ বলল, 'জোতদাররা মুসলমান চাষীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান জিগিরও তুলছে, কমরেড। মুসলমানরা হঠাৎ বেঁকে বসলে আন্দোলন দুর্বল হয়ে যাবে কিন্তু।'

গণপতি বলল, 'সুন্দরবনে যতগুলো বজ্জাত হারামজাদা আছে, এসো সব কটাকে ধরে ধরে শেষ করে দিই আগে, তারপর যা হয় হবে। তাতে ভবিষ্যতে আর কোনো অত্যাচার করতে সাহস পাবে না শালারা।'

মধু বলল, 'চাষীদের শক্তি সাহস আর ঐক্যবদ্ধ রূপ দেখাবার জন্যে আমাদের বিরাট মিছিল বার করতে হবে। লুকিয়ে থেকে কিছু হবে না।'

ঠিক হলো, তিনদিন পরে বিরাট মিছিল ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মানুষের ভয় কাটিয়ে দিতে হবে। সাহস দিতে হবে মানুষকে। আসছে ধানকাটার সময় যাতে চাষীরা ধানের উপর নিজেদের দখল কায়েম রাখতে পারে তার জন্যে সাহস আর আত্মবিশ্বাস আনতে হবে তাদের মনে।

দিন তিনেক পর শ'পাঁচেক চাষী মেয়ে পুরুষের একটা মিছিল বার করা হলো বেলা দুটো নাগাদ। রাধানগর থেকে মিছিল যাত্রা করল। রাধানগর গাঁটা ঘুরে আবার অন্যসব গাঁয়ের দিকে যাবে মিছিল, এই ঠিক করা হলো। লাঠির মাথায় লাল ফ্ল্যাগ বেঁধে, মাথায় সব লাল শালুর ফেটা বেঁধে, হাতে বল্লম, লাঠি, শড়কি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মধুর পরিচালনায় মিছিল চলেছে। সমুদ্র-গর্জনের মতো স্লোগান উঠছে ঢেউ দিয়ে দিয়ে:

১। তেভাগা চালু করতে হবে!

করতে হবে, করতে হবে!

প্রাণ দোব তো ধান দোব না !

ধান দোব না, ধান দোব না !

৩। জমিদারী ব্যবস্থা নিপাত যাক !

নিপাত যাক, নিপাত যাক !

৪। বাজে আবওয়াব বন্ধ কর !

বন্ধ কর, বন্ধ কর !

৫। চাষীকে বেআইনী উচ্ছেদ করা চলবে না !

চলবে না, চলবে না !

৬। দেড়াবার বন্ধ কর !

বন্ধ কর, বন্ধ কর !

৭। ভাগচাষীকে জমির স্বত্ব দিতে হবে !

দিতে হবে, দিতে হবে !

তখন রাধানগরের জোতদার জগৎ মণ্ডলের বাড়িতে পুলিশ-ক্যাম্প ছিল। সে সময়ে গ্রামে গ্রামে ক্যাম্প হয়েছিল। জোতদার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে অনন্ত শাসমল প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের কাছে আবেদন করে গাদা গাদা পুলিশ আনিয়েছিল সুন্দরবনে। কাছারিতে কাছারিতে পুলিশ ছিল। আর পুলিশের প্রধান ক্যাম্প ছিল মহিম ঘোষের কাছারিতে।

দুর্গাপুরের বুলবুল খাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে মিছিল যাচ্ছিল। রাধানগর ঘুরে চলে যাওয়া ছিল উদ্দেশ্য।

তখন জগৎ মণ্ডল আর বুলবুল খাঁ। ভি. ডি. পার্টির এই দুই ক্যাপটেন পুলিশকে ঘুষ দিল।

মিছিল শ্লোগান দিতে দিতে আগিয়ে চলেছে।

হঠাৎ মিছিলের সামনে তেমাথানির মোড়ে চৌদ্দজন পুলিশ এসে হাঁটু গেড়ে বসে মিছিলের উপর গুলি চালাল। শিবরামপুরের ব্রজেন দলুই সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেন। তারপর পুলিশরা আরও দু'তিনটে ফাঁকা আওয়াজ করল। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

তখন পুলিশ আর ভি. ডি. পার্টির লোকেরা মিলে বিরাশি জনকে ছুটে ছুটে ধরে গ্রেপ্তার করল। ধরা পড়ল কৃষকসমিতির চারজন নেতাও, নিমাই দাস, দেবেন ওঝা, বলাই বেরা, অধীর পাল।

মিছিল ভেঙ্গে গেল। চাষীরা ছুটে ছুটে প্রাণ ভয়ে পালাল। কৃষক-নেতারা আর মধু হালদার আত্মগোপন করল।

আর ক'দিন ধরে পুলিশ এবং সেবাদল বা ভি. ডি. পার্টির লোকেরা রাধানগর এবং দুর্গানগরের ঘরে ঘরে অত্যাচারের বান ডাকিয়ে দিল। কৃষকসমিতির লোকেদের বাড়ী বাড়ী ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করে দিল, লুট করে নিয়ে গেল। ঘরে আগুন লাগিয়ে ঘর ভেঙ্গে দিতে লাগল। চাষীদের বৌ-ঝিদের অরক্ষিত অবস্থায় পেলেই তাদের উপর বীভৎস নির্যাতন চালাতে লাগল।

এমনি ভাবে মিছিল ভেঙ্গে যাওয়াতে, এমনি ভাবে অত্যাচার হওয়াতে সাধারণ চাষীরা কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। চাষীদের রাজনৈতিক চেতনা তত পরিষ্কার ছিল না বলেই তারা ভয় পেল।

ওদিকে গণ্ডগোল করল বিশ্বনাথ। সে বলে বেড়াতে লাগল, 'সমস্ত জোতদারদের কাছ থেকেই তেভাগা আদায় করা হবে। বিধবা বা সামান্য জোতদারদেরও ছাড়া হবে না। জোতদার জাতের ওপর কোনো মায়া-মমতা, কোনো বিচার-বিবেচনা করার দরকার নেই। ওরা মরুক বাঁচুক তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না।'

বিশ্বনাথের এই ধরণের বক্তৃতা এবং কথা মধ্যবিত্ত ভাগচাষীদেরও ভয় পাইয়ে দিল। অনেকেই ভি. ডি. পার্টিতে যোগ দিতে লাগল। ভি. ডি. পার্টি বা সেবাদলে লোক বাড়তে লাগল।

ডিসেম্বর মাস পড়ে যেতেই ধানকাটার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। আবার মাঠে মাঠে সংঘর্ষ, রাত্রে দলবেঁধে ধানকাটা আরম্ভ হলো। কৃষকদের প্রতিরোধ শক্তি আবার সবল হয়ে উঠতে লাগল। শাঁখের শব্দ মানেই বিপদের সংকেত, শত্রুর আক্রমণের সংবাদ। শাঁখের শব্দ শুনলেই নানান গাঁয়ের চাষীরা ছুটতে লাগল সেই শব্দ লক্ষ্য করে।

হঠাৎ খবর এল, বুধাখালির সেই নায়েব অবনী ব্যানার্জী ফিরে এসেছিল অনেকগুলো পাঞ্জাবি গুণ্ডা নিয়ে। অনেক পুলিশ ক্যাম্প করেছিল তার কাছারিতে। আর অবনী ব্যানার্জী তার অপমানের শোধ নেবার জন্যে প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে পুলিশ আর পাঞ্জাবি গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়েছিল বুধাখালির ওপরে। তারা গুলী চালিয়ে কৃষকনেতাদের হত্যা করেছে,

গান্ধারীকে মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলেছিল, শক্তিপদকে সঙ্গিনের খোঁচা দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে, তার অবস্থা ভালো নয়। পুলিশ বা গুণ্ডারা পাড়াকে পাড়া ঘিরে ঘরে আগুন দিয়ে ঘর ভেঙ্গে দিয়ে অত্যাচার, খুন, লুট, ধর্ষণ চালিয়ে গিয়েছে, পঙ্গপালের মতো তছনছ করে দিয়েছে সারা গ্রামখানা। বুধাখালির কমিউনিস্ট নেতারা গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। বিশ্বনাথ এদিকের কাজ নিয়ে আছে। তবু জনতা প্রতিবাদ করেছে, কিছুটা লড়েছে বন্দুকের সঙ্গেই। গান্ধারী আর জমিলাবিবি সমেত অনেক লোককে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

॥ ৪২ ॥

এই সব ঘটনার পর আবার এল বিদ্যুৎ। চাষীদের মনোবল কি ভাবে ফিরিয়ে আনা যায়, কেমন করে পুলিশ আর ভি. ডি. পার্টিকে রোখা যায় তাই ঠিক করার জন্যে কৃষকসমিতির এক জরুরী মিটিং ডাকা হলো। এই মিটিংয়ে ছিল কৃষকসমিতির খাঁটি কর্মী আর বিশ্বাসী কমরেড চাষীরা। গোপন জায়গায় দরজা বন্ধ করে এই মিটিং বসেছিল। এ মিটিংয়ে ছিল মধু, বিদ্যুৎ, হীরক, গণপতি, রেণুপদ, অর্জুন, বীরচন্দ্র, নরেন, সিন্ধু, অজয়, অভিমন্যু, মাখনলাল, বিষ্ণু, ফরমান, কুমুদ, উমেশ, বিশ্বনাথ, তুলসীদাস, অনাদি, সাগর, সুবল হাঁসদা, মণি, শ্রীচরণ, অবিনাশ।

এই মিটিংয়ে মধু বলল, 'আমার মনে হয়, এবার আমাদের আন্দোলন গুটিয়ে নেওয়া উচিত। অনেক পুলিশ এসে গেছে সুন্দরবনে। জোতদার পার্টি অনেক পাঞ্জাবী গুণ্ডা ভাড়া করে নিয়ে এসেছে কলকাতা থেকে। তাছাড়া, ভি. ডি. পার্টি বা সেবাদল আছেই।'

একটু থেমে, একটুখানি ভেবে নিয়ে মধু আবার বলতে লাগল, 'এর পরে মিলিটারি আসবে। এই ভি. ডি. পার্টি, এই পাঞ্জাবী গুণ্ডা, পুলিশ, মিলিটারি আর আমাদের মধ্যেকার বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে সমানে লড়ে যাওয়ার মতো সংগঠন আমাদের নেই। এখনও বহু চাষীকে আমরা সশস্ত্র করতে পারি নি, কৃষক সৈন্যবাহিনী থেকেও অনেকে বিদায় নিয়েছে, মেয়েরা অস্ত্রবাহিনী তৈরি করতে পারে নি। মেয়ে আর শিশুদের রক্ষা করবার কোনো ব্যবস্থা নেই আমাদের, কাছাকাছি তেমন বন বা পাহাড় নেই

যেখানে লুকোতে পারি। অবশ্য সুন্দরবন আছে কিন্তু সমস্ত গাঁ তুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে লুকোনো যাবে না। সুন্দরবনে থকথকে কাদা, বাঘ, সাপ আর মশার ভয়, তাছাড়া সে রিজার্ভ ফরেস্ট, আমরা আমাদের লুকোতে পারব না সেখানে। তাই আমার মনে হয়, আপাতত আমাদের আন্দোলনকে থামিয়ে দেওয়াই ঠিক হবে। আর বেশি বাড়াবাড়ি করলে তাতে ভীষণ ক্ষতি হবে।'

পঁচিশ বছরের টাটকা যুবক বিদ্যুৎ খেপে উঠে বলল, 'আপনি ভীতুর মতো কথা বলছেন মধুবাবু। মধুবাবু, আপনি কেটে পড়ুন সুন্দরবন থেকে। আপনাকে দিয়ে বিপ্লবের কাজ হবে না। এতদিনের এই অত্যাচার, ধর্ষণ, লুণ্ঠনের প্রতিবাদে চাষীরা কিছু করবে না? এ হতে পারে না। যারা মা-বোনেদের ইজ্জত নিয়েছে, যারা হত্যা করেছে, লুঠ করেছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতেই হবে। মধুবাবু, আপনি দয়া করে এখন অহিংসা মন্ত্র দিতে আসবেন না। প্রয়োজন হলে গুলীর পরিবর্তে আমরাও গুলী চালাব। পার্টি থেকে আবার বুলেটিন আসতে শুরু হয়েছে। অস্ত্রের পরিবর্তে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। বুলেটের জবাবে বুলেট।'

গণপতি বলে উঠল, 'অস্ত্র কই? ওরা দূর থেকে আমাদের গুলী করে মারছে, আমরা পেরে উঠছি না। বন্দুক কে দেবে? বন্দুক কই?'

বিদ্যুতের পাশে একটা কাঠের বাক্স ছিল। বিদ্যুৎ বাক্সটা সঙ্গে করে এনেছিল এবার। সেই বাক্সটা খুলে একখানা ঝকঝকে নতুন বন্দুক তার থেকে বার করে ভাঁজ খুলে বন্দুক ছুড়বার ভঙ্গীতে ধরে বলল, 'এই তো অস্ত্র।'

উপস্থিত সকলেই হঠাৎ হকচকিয়ে গেল। খানিকক্ষণ কারও মুখে কোনো কথা সরলো না।

তারপর গণপতি আগিয়ে গিয়ে বিদ্যুতের কাছ থেকে বন্দুকটা নিজের হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল। বন্দুক ছুড়বার ভঙ্গীতে নানানভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

সাগর বলল, 'কিন্তু বন্দুক তো কখনো আমরা ছুঁয়েও দেখি নি, বন্দুক চালাতে শিখব কেমন করে?'

বিদ্যুৎ বলল, 'সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে, একজন আপকান্ট্রির সৈন্য-

বিভাগের লোক কালই এসে পড়বেন চাষীদের বন্দুক ছোড়া শেখাতে।'

বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করল, 'সৈন্যবিভাগের লোক মানে?'

বিদ্যুৎ বলল, 'মানে এখন তিনি রিটায়ার করেছেন। আগে সৈন্য-বাহিনীতে ক্যাপটেন ছিলেন। তিনি আসবেন, কালকে সন্ধে নাগাদ এসে যাবেন।'

বিহারী বলল, 'কি নাম তাঁর? কে নিয়ে আসবে?'

'নাম জানবার তো দরকার নেই। তিনি আমাদের অস্ত্রে দীক্ষা দিতে আসবেন। দ্রোণাচার্য তিনি। আমরা তাঁকে গুরুজী বলেই ডাকব।'

মধু জিজ্ঞাসা করল, 'কে নিয়ে আসবে?'

বিদ্যুৎ বলল, 'অভয় ডায়মণ্ডহারবার থেকে একটা ডিঙ্গি নৌকা ভাড়া করে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।'

বিদ্যুৎ বলতে লাগল, 'কৃষক সমিতির সব থেকে বিশ্বাসী আর সাহসী কমরেডরা আগে শিখে নেবে। তারপরে কৃষকসমিতি অন্য যে সব সদস্যকে বিশ্বাসী এবং সাহসী মনে করবে এরা আবার তাদের শেখাবে।'

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'গুলী পাব কোথা থেকে?'

বিদ্যুৎ বলল, গুলী সাপ্লাই দেবার ব্যবস্থা আছে, ভাববার কিছু নেই।'

একটু থেমে বিদ্যুৎ বলতে লাগল, 'পার্টির প্রাদেশিক কমিটি আমাকে দিয়ে নির্দেশ পাঠিয়েছে, কৃষকসমিতিকে অ্যাকশন কমিটি গঠন করতে হবে। আমাদের অঞ্চলে এক একটা অঞ্চল ধরে সাতটা কমিটি গঠন করলে ভালো হয়। প্রত্যেক কমিটিতে সাতজন করে সদস্য থাকবে। আর এখানে যে একুশজন চাষী কমরেড আছেন তাঁরা তিনজন করে প্রত্যেকটা কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন। আমি, মধুদা আর কমরেড হীরক সমস্ত কমিটিগুলি দেখাশোনা করব। এখানকার উপস্থিত কৃষক-কমরেডরা তাঁরা যে যে গাঁয়ের লোক সেই সেই গাঁ এলাকায় অ্যাকশন কমিটিতে থাকবেন।'

অ্যাকশন কমিটি সেইখানে বসেই গঠিত হলো। গণপতি লয়ালগঞ্জ-হরিপুর অঞ্চলের গণকমিটির নেতা হলো, সাগর হলো দ্বারিকনগর অ্যাকশন কমিটির নেতা, মাখন হলো শিবরামপুর অ্যাকশন কমিটির নেতা, অভিমন্যু হলো রাজনগর কমিটির নেতা, ফরমান রাধানগর কমিটির নেতা; এমনিভাবে যে যে-গাঁয়ের লোক সে হলো সেই গাঁ এলাকার অ্যাকশন

কমিটির লোক।

গণপতি বলল, 'বন্দুক এখন আমাদের দেবে নাকি বিদ্যুৎবাবু!'

'না, এখন নয়, আগে শেখা হোক, তারপর। এসব অস্ত্রশস্ত্র এখন কৃষকসমিতির জিম্মায় থাকবে। তবে তুমি কৃষকসমিতির সাধারণ-সম্পাদক, বলে তোমাকে একখানা পিস্তল দেওয়া হবে। পার্টি তোমাকে দিতে বলে দিয়েছে।' ব'লে বাক্স থেকে একটা পিস্তল বার করে গণপতির হাতে তুলে দিল।

গণপতি পিস্তলটাকে চুমু দিল। গায়ে বুললো, তারপরে দুই হাতে সযত্নে চেপে ধরল বুকে।

মধু বলল, 'গণপতি, আমরা কিন্তু সে-রকম প্রস্তুত হতে পারি নি। এই রকম সশস্ত্র লড়াইয়ে নামবার আগে অগ্রপশ্চাৎ ভালো করে ভেবে নিতে হবে।'

অনেকেই প্রতিবাদ করে উঠল, 'পার্টি নির্দেশ দিয়েছে। কেন হবে না? কটাই বা পুলিশ আছে? মিটিং করে আর মিছিল করে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হবে না।'

মধু তখন বলল, 'আমি আপনাদের সামনে বসে পার্টির কাছে একখানা চিঠি লিখতে চাই। পার্টি যদি তারপরেও আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামে নামতে বলে তখন আমরা নামব।'

সকলে পাথরের মতো চুপ করে বসে রইল। নানান দ্বন্দ্বে মনে মনে ভুগতে লাগল। সেই চুপ করে থাকা অত্যন্ত অস্বস্তিকর হয়ে উঠল। বিদ্যুৎ ধারালো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মধুর দিকে। আর মধু মাথা নিচু করে একখণ্ড সাদা কাগজের উপর কলম দিয়ে চিঠি লিখতে লাগল। মিনিট পনের পরে চিঠি লেখা শেষ হলে কাগজ থেকে মুখ তুলে সকলের উপরে চোখ বুলিয়ে মধু বলল, 'আমি পড়ছি, আপনারা শুনুন।'

'কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু

কমরেড,

সুন্দরবনে সশস্ত্র আন্দোলন আরম্ভ করার যে নির্দেশ আপনারা দিয়েছেন আমার মনে হচ্ছে সে-নির্দেশ বিপজ্জনক। কেননা আমাদের সংগঠন

তেমন বড় আর শক্ত হয়ে ওঠে নি। অথচ কংগ্রেস সরকার তার সমস্ত শক্তি পুলিশ, সেবাদল, মিলিটারি এই অঞ্চলের উপর ক্রমে ক্রমে লেলিয়ে দিচ্ছে। আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাদের চাপিয়ে দেওয়া নির্দেশ মেনে নিলাম বটে, কিন্তু কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ মিলিটারি আসবে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, আমরা তার সামনে দাঁড়াতে পারব না। আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, বিষয়টা আর একবার নানান দিক থেকে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের জানাবেন।

বিপ্লবী অভিনন্দনসহ

মধু হালদার

এই চিঠি সম্বন্ধে সভার মত চাওয়া হলো।

সভার অধিকাংশ সদস্য বলল, 'ঠিক আছে, চিঠি পাঠিয়ে দিন, তারপর কি জবাব আসে দেখা যাক।'

॥ ৪৫ ॥

সেই চিঠি পরের দিন পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

কিন্তু এক সপ্তাহ অপেক্ষা করেও কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

এদিকে গুরুজী এসে বসে আছেন। কিন্তু চিঠির উত্তর আর পাওয়া গেল না। তখন গুরুজী বললেন, 'পরে যা হয় হবে, এখন বন্দুক চালানোটা শিখে রাখলে ক্ষতি কি?'

তখন বিদ্যুতের কাঠের বাক্স থেকে আর গুরুজীর কাঠের বাক্স থেকে বেরল ৮টি স্টেন্‌গান্, ২৫টি রাইফেল, ২টি রিভলভার, ৫০০ কার্তুজ, পিতলের আর লোহার সিগারেটের টিনের গড়নের ৫০০ বোমা, ৬ টিন বারুদ।

তারপর বনের ধারে নির্জন মাঠে রাতের বেলা ট্রেনিং শুরু হলো। কিন্তু প্রথমে গুরুজী বন্দুক ধরা শেখাতে লাগলেন। বিনা-টোটায় ফায়ার করার কায়দা কানুন শেখাতে লাগলেন। টোটা ব্যবহার না করার কারণ হলো, শব্দ হলে পুলিশ জানতে পারবে, আর শেখাতে গিয়ে টোটা খরচ করে ফেললে আসল কাজের সময় টোটার অভাবে মুশকিল হতে পারে।

একশ জন চাষী এই ট্রেনিং নিতে লাগল। একা গুরুজীর পক্ষে

সবাইকে শেখাতে দেরি হচ্ছিল ব'লে কয়েকদিন পরে কলকাতা থেকে মিলিটারি ট্রেনিং নেওয়া কিছু ছাত্র এল।

স্টেনগান, বন্দুক, রিভলভার চালানো শেখানোর সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিংও দেওয়া হতে লাগল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত সেই বনের ধারে ফাঁকা মাঠে ট্রেনিং চলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে বোমা ছোড়া হয়, কেমন করে বোমা বাঁধতে হয় তাও শেখাতে লাগলেন গুরুজী ও ছাত্ররা।

চন্দনপিঁড়ির নৃপতি বোমা তৈরি করতে গিয়ে চোখ হারিয়ে অন্ধ হয়ে গেল, বোমাবাঁধতে গিয়ে রেণুপদর একটা হাত উড়ে গেল। এ অঞ্চলে ডাক্তার নেই। একটা অন্ধ আর একটা আহত মানুষকে নিয়ে কি করা যাবে ভেবে পেল না কৃষকসমিতি। যে গুরুজীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল সেই অভয় তখনও সেখানে ছিল। কৃষকসমিতির লোকেরা ডিঙ্গি ঠিক করল। অভয় নৃপতি আর রেণুপদকে নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে চলে গেল। ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে গোপন আশ্রয়ে তাদের রেখে বিশ্বাসী ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা চলতে লাগল।

একই জায়গাতে প্রতিদিন ট্রেনিং দেওয়া হতো না। বিভিন্ন জায়গাতে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হতো। সাতাশ দিন ধরে সবসুদ্ধ প্রায় একশ থেকে আরম্ভ করে দুশ জন চাষীকে ট্রেনিং দেওয়া হলো।

মোটামুটি বন্দুক-স্টেনগান ধরা, চালানো ইত্যাদি শিখিয়ে দিয়ে গুরুজী যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। কৃষকসমিতির সকলের কাছে বিদায় নিয়ে রাত্রিবেলা নৌকাতে উঠবার সময় গণপতির হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে গুরুজী বললেন, 'গণপতি, তোমাদের হাতেখড়ি দিয়ে গেলাম, এবার তোমরা নিজেরাই আস্তে আস্তে ওস্তাদ হয়ে উঠবে। দেখো আমার অস্ত্র-শিক্ষা দেওয়া যেন সার্থক হয়।'

চলে গেলেন গুরুজী

তারপর কৃষকসমিতির মিটিং ডেকে প্রোগ্রাম্ তৈরি করা হলো। দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হলো। ঠিক হলো :

১। কাছারি বাড়ী আর ২। যে স্কুলবাড়ীতে পুলিশের ক্যাম্প আছে সেগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হবে। ৩। জমিদার-নায়েবদের দালালদের

৪। বিশ্বাসঘাতকদের ৫। যারা গুপ্তচরের কাজ করবে তাদের ৬। অত্যাচারী জমিদার, জোতদার, নায়েবদের এবং ৭। ভি. ডি. পার্টির লোকেদের খুন করা হবে। ৮। প্রত্যেক বড় জোতদারের কাছ থেকে বিঘে প্রতি একমন করে ধান কৃষকসমিতির চাঁদা হিসেবে আদায় করতে হবে, না দিলে লুট করে নেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে ১০৭ ধারা, ১৪৪ ধারা জারি করেছে সরকার।

কৃষকসমিতি তার প্রোগ্রাম মতো কাজ শুরু করল। প্রথমেই ঠিক করা হলো চন্দ্রনগরের অগস্তী জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হবে।

অগস্তীর কাছারিতে পুলিশ ছিল না। অবশ্য মাঝে মাঝে পুলিশ-বাহিনী টহল দিয়ে সমস্ত অঞ্চলময় ঘুরে বেড়াত। দিনের বেলাতে কৃষকসমিতির লোকেরা দল বেঁধে গেল অগস্তীর কাছারিতে।

একজন লাঠিয়াল ওদের বাধা দিতে এলে কৃষকদের গুলীতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কাছারির অন্যান্য দারোয়ান লাঠিয়ালরা ভয়ে পালাল।

কৃষকসমিতির লোকেরা দেওয়াল ভাঙতে লাগল কাছারির। দেওয়াল ভেঙেচুরে ঘরের চালে দিল আগুন ধরিয়ে। নায়েব সেখান থেকে কেটে পড়েছিল আগেই। কাছারির ধানের গোলাও লুট করে নিল ওরা। সে ধান বিতরণ করে দিল ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে। কৃষকসমিতির ফাণ্ডেও কিছু ধান রেখে দিল।

একদিন কৃষকসমিতির মিটিংয়ে বিহারীলাল হঠাৎ বলে উঠল, 'বনমালী, তুমি গুপ্তচরের কাজ করছ।'

এখবর কৃষকসমিতি অনেকদিন থেকেই পেয়ে আসছে। বনমালী শিবরামপুরের একজন চকদার। সে এতদিন অভিনয় করছিল যেন সে কৃষকসমিতির লোক। কিন্তু আসলে সে করত গুপ্তচরবৃত্তি। জানা গিয়েছিল গুপ্তরের কাজ করে বলরাম কাজলী। সেও মাঝারি অবস্থার জোতদার। কিন্তু তার মুখোশ খুলে যাওয়ার পর থেকে আর সে কৃষকসমিতির লোকেদের ছায়া মাড়াত না। যে দুজন লোককে এখন সন্দেহ করা হচ্ছিল এবং যাদের সম্বন্ধে গুপ্তচরবৃত্তির প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে তারা হলো বনমালী গাঁথাই আর সহদেব মাইতি। বনমালী চকদার, কিন্তু সহদেব সাধারণ

অবস্থার চাষী, মহিম ঘোষের অনুগত ভাগচাষী।

বনমালী অবাক হয়ে বলল, 'কে বলেছে একথা? আমার নামে এমন মিথ্যা কথা কে বলেছে! বলো তার নাম বলো আমাকে।'

বিহারীলাল বলল, 'আমরা বাজে কথ বলি না বনমালী। তুমি জোতদার পার্টিকে চাঁদা দিয়েছ, সেবাদলের লোকদের উসকানি দিচ্ছ। তা বনমালী ত্বলালের কথা মনে আছে তো তোমার?'

বনমালীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তবু নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে সে আমতা আমতা করে বলতে লাগল, 'এসব কথা আমাকে বলার মানে কি? আমাকে তোমরা শুধু শুধু সন্দেহ করছ?'

'তুমি সত্যিকথা বল বনমালী, তুমি আমাদের খবর জমিদার-জোতদারদের জানাও না? তুমিই তো খবর দিয়েছিলে যে, চন্দনপিঁড়িতে কমিউনিস্ট নেতারা এসে মিটিং করছে। তোমার বাড়ীতে জোতদারদের মিটিং হয় নি রাত্রে?'

বনমালী রেগে গিয়ে বলল, 'ঠিক আছে আমি আর আসব না কৃষকসমিতিতে। তাই বলে আমাকে অপমান করবার তুমি কে? ভেবেছিলাম তোমরা মাঝারি চকদারদের পক্ষে তাই তোমাদের দলে এসেছিলাম। এ রকম ব্যবহার করলে বাপু তোমাদেব সঙ্গে থাকতে পারব না।'

এতক্ষণে গণপতি বলল, 'কৃষকসমিতিতে তোমাকে আর রাখাও হবে না। কিন্তু তুমি বোধহয় জানো, কৃষকসমিতি ঠিক করেছে যারা গুপ্তচরের কাজ করবে তাদের খুন করা হবে।'

বনমালী 'ঠিক আছে ভাই, আমি চলে যাচ্ছি।' ব'লে উঠে পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

এই ঘটনার পর সুন্দরবনের পুলিশেরা অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিল। গাঁগুলোতে সশস্ত্র সন্ত্রাস নিয়ে এল। আরও কিছু ঘর জ্বালিয়ে দিল। সন্ধেবেলা বাড়ী বাড়ী চড়াও হয়ে কিছু মেয়ের উপর অত্যাচার করল। কিছু কৃষককে মাঠ থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে মার-ধোর করল।

একধরণের লুকোচুরি লড়াই চলতে লাগল পুলিশ, ভি. ডি. পার্টি আর কৃষকদের জঙ্গীবাহিনীর মধ্যে। কৃষকসমিতির এই জঙ্গী লোকেরা দিনেরবেলায় লোক-চোখের সামনে পারতঃপক্ষে বেরত না। রাতের বেলা

গাঁ পাহারা দিয়ে দিয়ে আড়ালে আবডালে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু প্রতিটি রাত ভীষণ হয়ে উঠল। প্রতি রাত্রেই কালো আকাশের বুকে দাউ দাউ আগুন দেখা যেত। হয় কোনো চাষীর ঘর পুড়ত নয় কোনো কাছারি পুড়ত। মাঝে মাঝেই সুন্দরবনের নিথর নিঝুমতার বুকে বাজ-পড়ার শব্দের মতো গুলীর শব্দ চারিদিককে কাঁপিয়ে তুলত। হঠাৎ হঠাৎ মানুষের আর্ত কোলাহল ভেসে আসত। পরের দিন সকালে শোনা যেত ভি. ডি. পার্টির লোকেরা অথবা পুলিশ কোনো চাষীর বাড়ী ঢুকে মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে, কিংবা কোনো বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, নয়তো শোনা যেত কৃষকসমিতির জঙ্গীবাহিনী কোনো দালালকে শেষ করে দিয়েছে, কোনো কাছারিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি রাত ভয় উত্তেজনা আর হিংস্র লড়াইয়ে ভীষণ হয়ে উঠল। মানুষ সবসময়েই সজাগ থাকত, মুখোমুখি লড়াইয়ের জন্যে মনে মনে তৈরী হয়ে থাকত ওরা।

একদিন সন্ধেবেলা মোহিনী ওর দুই জা আর পাড়ার সখীরা মিলে গল্প করছিল। মরদ ওর ঘরে থাকে না আজ অনেকদিন। তাকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হয়। রাতের বেলা মাঝে মাঝে এসে সে দেখা দিয়ে যায়। সুযোগ সুবিধা বুঝে মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও আসে। সেদিন সন্ধে বেলা বাড়ীতে কোনো পুরুষ ছিল না। দুই দেওর কোথায় বেরিয়েছিল। জন সাতেক মেয়ে বসে বসে সুন্দরবনের নানান কথা আলোচনা করছিল। সন্ধে হয়ে গিয়েছিল বলে উৎকর্ণ হয়েছিল মোহিনী। হঠাৎ ফিস্ ফিস্ কথার শব্দ পেয়ে হাতে একটা বল্লম নিয়ে মোহিনী আস্তে আস্তে বাইরে গিয়ে দেখল দুজন লোক ওদের ঘরের পাশে কি করছে। মোহিনী চিনতে পারল ওরা ভি. ডি. পার্টির লোক।

মোহিনী বলে উঠল, 'কে তোমরা, এখানে কি দরকার?'

ওদের মধ্যে থেকে একটা লোক রগড় করে বলল, 'গণদা বাড়ীতে আছে নাকি?'

'কেন বলো দেখি?'

'এমনি একটা কাজে এসেছিলাম।'

'কি কাজ?'

'সে ছিল-একটা কাজ। তা রাতের বেলা বাড়ীতে কে কে থাকে?'

'তা জেনে কী হবে?'

'মানে চারদিকে বিপদআপদ হচ্ছে তো, তাই আর কি?'

'মতলবটা কি বলো দেখি বাপু, সোজা কথা বল দেখি।'

হেঁ হেঁ করে হেসে লোকটা বলে ফেলল, 'তাহলে তোমার কাছে আসতাম আর কি?'

'ওরে হারামজাদা, মুখপোড়া, শোরের বাচ্ছা।' ব'লে চেঁচিয়ে উঠল মোহিনী। আর ওর চীৎকার শুনেই ভিতরের মেয়েরা যে যা পারল হাতে নিয়ে ছুটে বাইরে আসতে লাগল।

লোকটা সবে মুখ দিয়ে বার করেছে, 'বেশি চেঁচাবি নি মাগী, তোকে এখ্‌খুনি ধরে নিয়ে গেলে কে তোকে রক্ষা করবে? গণপতি তো ফেরারী, ধরতে পারলে তাকে ফাঁসিতে লটকাব।'

তখনই আরও ছজন মেয়ে হাতে দা, বঁটি, ঝাঁটা, লাঠি নিয়ে লোক দুজনকে ঘিরে ফেলল। এবং আর কোনো কথা তাদের বলতে না দিয়ে মারতে আরম্ভ করল। একজন কোনো রকমে সেই মেয়েদের ব্যূহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে ছুটে পালালো। কিন্তু সেই রগুড়ে লোকটাকে মেয়েরা ঘিরে ধরল। আর পাগলের মতো যে যেদিকে পারল মারতে লাগল। লোকটাও হাত চালাতে লাগল। মেয়েদের কাপড় ধরে টেনে ওদের উলঙ্গ করে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। মেয়েদের অনেকের আঁচল লুটিয়ে পড়ল। ওপরের শরীব খুলে গেল অনেকের, চুল লুটিয়ে পড়ে এলোমেলো আলুথালু হয়ে গেল। মেয়েদের কয়েকজনের মুখে ঘুঁষিও পড়ল। কিন্তু ওরা নিরস্ত হলো না। শেষ পর্যন্ত লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মোহিনী বুকে পা দিয়ে দাঁড়াল সেই লোকটার তারপর বল্লম দিয়ে তার বুকে মারল এক খোঁচা। নিজেকে তখন ওর মা দুর্গা বলে মনে হচ্ছিল, যেন ও অসুর-নিধনে মেতেছে। পাগলের মতো পিটতে পিটতে অস্ত্র দিয়ে খোঁচা দিতে শেষ পর্যন্ত লোকটা মারা পড়ল। ওরা সাতজন মেয়ে ঘরে ফিরে এসে কেউ শুয়ে কেউ বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল। এতক্ষণের উত্তেজনার পর ভয়ে বুক যেন কাঁপতে লাগল। মোহিনীর দুই দেওর আর পাড়ার কয়েকজন লোক এসে পড়ল। মেয়েদের কাছে সব কথা শুনে ওরা বাইরে গিয়ে লাসটাকে নিয়ে গিয়ে নদীর গাবায় পুঁতে

দিয়ে এল।

পরে গণপতি জানতে পেরেছিল যে, ভি. ডি. পার্টি ঠিক করেছিল ও-দিন রাত্রে গণপতির ঘর চড়াও হয়ে, ঘরে আগুন দিয়ে, মেয়েদের ওপরে অত্যাচার করে চলে যাবে।

কিন্তু মোহিনীদের অত সাহস দেখার পর আর একটা লোক হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ার পর ওরা আর সে-কাজ করতে সাহস পায় নি।

এবারে গণপতি আর ওর ভাইরা ধান ঝেড়ে হরেন্দ্রকে বলেছিল, 'রসিদ দিয়ে ধান নিয়ে যাবেন।'

জমিদারদের পরামর্শে হরেন্দ্র রসিদও দেয় নি ধানও নেয় নি। তখন থেকে ধান গণপতির খামারে গোলাতেই ছিল। যখন চাষীদের সঙ্গে পুলিশ আর সেবাদলের যুদ্ধ একটা ভয়ঙ্কর অবস্থাতে এসে পৌঁচেছে, গণপতিদের একটু লুকিয়ে চুরিয়ে থাকতে হচ্ছে তখন একদিন হরেন্দ্র অনেক পাঞ্জাবী শিখ গুণ্ডা আর পুলিশ নিয়ে এসে গণপতির গোলা থেকে ধান দখল করে এক মহাজনের কাছে সেই ধান বিক্রি করে দিল।

মৌসুমীর নদীতে নৌকায় যখন ধান তোলা হচ্ছে তখন সেখানে পুলিশ বা গুণ্ডা ছিল না। মোহিনী অনেকগুলি মেয়ে পুরুষকে জুটিয়ে সেই মহাজনকে ধরে নিয়ে এল ওদের পাড়াতে। কৃষকসমিতির লোকেরা খবর পেয়ে এসে হাজির হয়ে মহাজনকে আচ্ছা করে পিটে সেই ধান কেড়ে নিয়ে এল আবার। মহাজন হরেন্দ্রর কাছে গিয়ে অনেক কষ্টে টাকা ফেরত পেয়ে সুন্দরবন ছেড়ে পালাল।

কিন্তু সেইদিন রাত্রেই হরেন্দ্রের ভাড়াটে পাঞ্জাবী গুণ্ডারা আর সেবাদলের লোকেরা এসে গণপতির ভাই আর বৌ ছেলেমেয়েদের ঘর থেকে বার করে দিয়ে ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে, মজুর দিয়ে ঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে জমি করে ফেলল, আটাশ বলদ, দুটো গাইগরু খুলে নিয়ে চলে গেল গণপতির গোয়াল থেকে, গণপতির খামার থেকে আবার সব ধান নিজের কাছারিতে নিয়ে চলে গেল হরেন্দ্র। কৃষকসমিতির যোদ্ধারা সে-রাত্রে অন্য জায়গায় থাকতে বাধ্য হয়েছিল। গণপতির বাড়ীর ঘটনা সে- রাত্রে তারা জানতে পারে নি। মোহিনী ছেলেমেয়ে দুই জা আর দুই দেওরকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশীদের বাড়ীতে আশ্রয় নিল। (স্বাধীনতা

পত্রিকায় এ রিপোর্ট বেরিয়েছিল)

পুলিশের দারোগাকে অনেক টাকা দিয়ে বেশ কিছু পুলিশ আনিয়ে নিজের কাছারিতে রেখে দিল হরেন্দ্র। পুলিশ, পাঞ্জাবী গুণ্ডা আর সেবা-দলের লোকেদের পুষতে লাগল হরেন্দ্র। আর অনেকটা নির্ভয়ে থাকল নিজের কাছারির ভিতরে উপপত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে।

॥ ৪৪ ॥

এই ঘটনার পরই হঠাৎ সস্ত্রীক পুলিসের এস. পি. এলেন সুন্দরবন পরিদর্শন করতে। স্বাধীনতা পত্রিকার খবর এবং সমালোচনা বিরক্ত করে তুলেছিল বাংলার গভর্ণমেণ্টকে। এস. পি.র সঙ্গে এল জন দুই আই. বি. অফিসার। এস. পি. রইলেন লঞ্চে। হরেন্দ্র প্রচুর খরচ-পত্র করে এস. পি.কে তোয়াজ করতে লাগল।

তারপর এস. পি. এলেন গণপতির ভাঙ্গা ভিটে দেখবার জন্যে। পাড়ার লোকেরা ভিড় জমালো।

এস. পি. জিজ্ঞাসা করলেন, 'এইটেই কি গণপতি-সীতাপতিদের ঘর ?'

লোকেরা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।'

'গণপতিবাবুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো। এ্যারেস্ট করব না, বিচার করব।'

গোপন জায়গায় কৃষকসমিতির মিটিং বসল। সেই মিটিংয়ে বিশ্বনাথ বলল,' এস. পি.র সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া আমাদের উচিত নয়। গেলেই এ্যারেস্ট করবে আমাদের।'

গণপতি বলল, 'আমার মনে হয়, যাওয়া দরকার। বাস্তব ঘটনাটা এস. পি.কে জানাতে হবে। আমি বলি. আগে মেয়েদের পাঠানো হোক। ওরা গিয়ে সমস্ত অন্যায় অত্যাচারের কথা বলুক। তখন যদি এস. পি. আমাদের যেতে বলে তখন আমাদের মধ্যে দু একজন যাব।'

বিশ্বনাথ রাজী হলো না, বলল, 'গেলেই এ্যারেস্ট করবে এস. পি.।'

গণপতি আবার বলল, 'যদি সে এ্যারেস্ট করে তবুও সত্যি ঘটনা বলা ভালো।'

প্রায় চার পাঁচশ লোক জমেছিল। তখন সকলের মতামত চাওয়া

হলো। না-যাওয়ার পক্ষে দশজন হাত তুলল। আর পক্ষে হাত তুলল বাদবাকী সবাই। তখন বিশ্বনাথ এস. পি. র সঙ্গে দেখা করতে যেতে রাজী হলো। পরের দিন সকাল সাতটায় এস. পি.র সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা ঠিক হলো।

পরের দিন সকাল সাতটায় গণপতি আর ত্রিশজন মেয়েপুরুষ নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে মিলিত হলো, কিন্তু বিশ্বনাথ এল না। আরও কয়েকজন কৃষকসমিতির সদস্য এল যাদের যাবার কথা ছিল। বিশ্বনাথ এল না। তবুও ওরা এস. পি. র দরবারে গিয়ে হাজির হলো।

কাছারির দাওয়ায় একটা টেবিলের ওপাশে তুটি চেয়ারে এস. পি. আর এস. পি. র স্ত্রী বসেছিলেন। আই. বি. তুজন দাঁড়িয়েছিল এক পাশে।

গণপতিরা এপাশে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল।

এস. পি. জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম গণপতি হালদার? আপনারা তিন ভাই এখানে থাকেন?'

গণপতি বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনার ঘর পুড়িয়ে ভেঙ্গে সমান করে দিয়েছেন হরেন্দ্রবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনেছি 'স্বাধীনতা' কাগজে সে খবর বেরিয়েছে। 'স্বাধীনতা' কাগজে ঠিক খবর দেয়। রাতের বেলা আমার বাড়ী চড়াও হয়ে মেয়েদের ঘর থেকে বার করে দিয়েছে, আমার গাইগরু বলদ সব খুলে নিয়ে দিয়েছে। ধান চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ঘরে আগুন দিয়ে ভেঙ্গে জমি করে দিয়ে এসেছে। আর আপনার পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে সেই কাজে সাহায্য করেছে হরেন্দ্রবাবুকে।'

এস. পি. বললেন, 'এখানকার জোতদাররা পুলিশ চেয়েছিল ব'লে হাজার খানেক পুলিশ আমি এখানকার তুটো ইউনিয়নে দিয়েছিলাম। 'কিন্তু প্রতিদিন 'স্বাধীনতা' থেকে পড়ি, পুলিশ দাঁড়িয়ে থেকে চাষীদের ঘর ভাঙ্গাচ্ছে। বাস্তব ঘটনাটা বলুন। জমিদারদের কাছে যা যা শুনলাম সেই ভাবেই কি মুভমেণ্ট হচ্ছে? হরেন্দ্রবাবু কেন এইভাবে ঘর ভাঙলেন?'

এমন সময় দেখা গেল একদল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে হরেন্দ্র সেইদিকেই আসছে।

আই. বি. দের মধ্যে একজন ছুটে গিয়ে পুলিশদের আসতে নিষেধ

করে এল।

পুলিশরা ফিরে গেলে হরেন্দ্রকে সঙ্গে করে নিয়ে এল আই. বি.।

হরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন এস. পি., 'আপনি গণপতিবাবুর ঘর ভেঙ্গে দিয়েছেন?'

হরেন্দ্র স্বীকার করল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।'

হরেন্দ্রের হাঁটুর উপরে ময়লা কাপড়। ছোট করে ছাঁটা খোঁচা খোঁচা চুল। কয়েকদিনের আকামানো দাড়ি মুখে। গায়ে ময়লা ফতুয়া, পায়ে পুরনো এক জোড়া ধুলো-নোংরা চটি জুতো। ঠোঁটের কষে ওর সাদাটে শালুক, চোখে পিঁচুটি, সেই চোখ আবার পিট পিট করে ও কথা বলে। বেঁটে খাটো উদ্ভট চেহারা। এই নিরীহ গোবেচারা মতো লোকটা যেন সত্যিই অমন কাজ করতে পারে তা এস. পি. হঠাৎ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

গণপতি বলল, 'ওকে (হরেন্দ্র) জিজ্ঞাসা করুন না হুজুর ও কতটাকা পুলিশকে ঘুষ দিয়েছে। উনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন কাকদ্বীপ থানার ছোটো দারোগা দিবাকর সরকারের হাতে।'

এস. পি. জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি পুলিশকে কতটাকা ঘুষ দিয়েছেন? পঞ্চাশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছেন নাকি?'

হরেন্দ্র উত্তর দিল, 'না, না, ওসব মিথ্যে কথা হুজুর, আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা কেন ঘুষ দিতে যাব! আমি চল্লিশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়েছিলাম।'

এস. পি. শব্দ করলেন, 'উম্!'

নরেশ বলল, 'হুজুর ওকে জিজ্ঞাসা করুন ও কুড়ি হাজার টাকা পুলিশের সিগারেট-খরচ দিয়েছে কিনা।'

এস. পি. জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি আপনি কুড়ি হাজার টাকা পুলিশের সিগারেট-খরচ দিয়েছেন?'

হরেন্দ্র চোখ পিট্ পিট্ করেতে করতে বলল, 'আজ্ঞে না হুজুর, ওরা মিথ্যে কথা বলছে, আমি আটারো হাজার টাকা পুলিসের সিগারেট-খরচ দিয়েছি।

বিহারীলাল বলল, 'আর জিজ্ঞেস করুন হুজুর, জোতদার এ্যাসোসিয়ে-

শনের প্রেসিডেণ্ট অনন্তবাবু আর সম্পাদক মহিমবাবুকে ও কতটাকা চাঁদা দিয়েছে ?'

এস. পি. জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত টাকা চাঁদা দিয়েছেন ওদের ?'

হরেন্দ্র দারুণ ভয়ে ঘন ঘন চোখ পিট্ পিট্ করতে করতে বলল, 'আজ্ঞে হুজুর সে অনেক টাকা।'

'কত টাকা ?'

'আজ্ঞে তা আশি হাজার টাকার মতো আমি ওদের দিয়েছি।'

তারপর চাষী মেয়েরা এস. পি. কে জানাল পুলিশ এবং ভি. ডি. পার্টির লোকেরা চাষীমেয়েদের ওপর কি দারুণ অত্যাচার করছে, ইজ্জত নষ্ট করছে, অপমান করছে। আর তাদের টাকা ঘুষ দিচ্ছে এই হরেনবাবু আর জমিদার, জোতদাররা।

এস. পি. র স্ত্রী এতক্ষণে চুপ করে বসেছিলেন।

এবার তিনি বলে উঠলেন, 'হরেন্দ্রকে এ্যারেস্ট কর তুমি, মহাশয়তান তো লোকটা।'

এস. পি. বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা', আমি দেখছি কি করা যায়।'

এস. পি. চাষীদের বললেন, 'আপনারা আজ যান, কাল আমি একটা ব্যবস্থা করব।'

হঠাৎ এস. পি. র স্ত্রী বললেন, 'আমরা থাকতে থাকতে ওয়ারেণ্ট বার করে দাও। না হলে আসামীরা পালাবে।'

পরের দিন সকাল বেলায় এস. পি. র নির্দেশে জমিদার, জোতদার এবং কৃষক প্রতিনিধিরা গেল মজুমদারের কাছারিতে এস. পি. র কাছে।

এস. পি. চাষীদের সমস্ত অভিযোগ এবং দাবি শুনে বললেন, 'প্রত্যেক ভাগচাষীকে লাঙ্গল পিছে দেড় বিঘে জমি দিতে হবে ঘর বাঁধবার জন্যে, চাষীদের যে সব ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে তা দেওয়াল দিয়ে তুলে দিতে হবে। তাদের যে সব জিনিসপত্র লুট করা হয়েছে তা ফিরে দিতে হবে। কাছারির ক্রীতদাস করে রাখা চলবে না চাষীকে· চাষীদের অন্নদাস করে রেখে তার ঘরের ইজ্জত নষ্ট করবার কোনো রকম চেষ্টা করা চলবে না। তবে তেভাগা সম্বন্ধে আমি কোনো কথা বলতে পারব না। এতে যদি আপনারা দুপক্ষ রাজী থাকেন, তাহলে বলুন।'

হরেন, মহিম, বীরেন দিন্দা প্রমুখ কয়েকজন জমিদার, জোতদার, নায়েব রাজী হয়ে শর্তের কাগজে সই করে দিল।

এস. পি. বলে দিলেন, 'ছ'মাসের মধ্যে চাষীদের দাবিগুলো যেন জমিদার, জোতদাররা মিটিয়ে দেন।'

গণপতি বলল, 'কিন্তু এখন আমরা কোথায় থাকব? আমাদের অনেকেরই যে ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে।'

এস. পি. বললেন, 'গভর্ণমেণ্ট থেকে তাদের পঁচাত্তর টাকা করে দোব, হোগলার ঘর করে এখন থাকো।'

'আর যদি জমিদার জোতদাররা ঘর তুলে না দেয়।'

এস. পি. বললেন, 'ঘর না তুলে দিলে, ঠিকানা দিয়ে যাচ্ছি, আমাকে জানাবে। না করে দিলে ওদের ছ'মাসের জেল দোব।'

এস. পি. জোতদারদের কাছ থেকে তখনই কিছু কিছু টাকা আদায় করে দিলেন।

হরেন্দ্র গণপতিকে দু'শ টাকা, পঞ্চাশ মন ধানের দাম দিল। তের জন ঘরহারা চাষী তাদের জমিদারদের কাছ থেকেও কিছু কিছু টাকা এবং ধানও পেল। এবং জমিদাররা বলল, চাষীদের ঘর তুলে দেবে আর সব পাওনা মিটিয়ে দেবে।

হরেন্দ্রর কাছারি থেকে পুলিশ তুলে নিল এস. পি.। তখন স্পেশাল ক্যাম্প ছিল বিপিন দাসের কাছারিতে। তারপর এস. পি. লঞ্চে উঠে সুন্দরবন ছেড়ে চলে গেলেন।

॥ ৪৫ ॥

অনন্ত শাসমলের কাছারিতে এক দুপুর বেলায় জোতদার এসোসিয়েশনের জরুরী মিটিং বসেছে। ঘরের ভিতরে একটা বিরাট শতরঞ্চির উপর সারি সারি সব জমিদার জোতদাররা বসেছে। যে সব জমিদার কলকাতায় থাকে তারা এবার আসতে পারে নি। তাদের নায়েববা এসেছে।

অনন্ত বলে উঠল, 'হরেনবাবু, আপনার কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই?'

হরেন্দ্র অপরাধীর মতো ভীরু হাসি হেসে বলল, 'কেন, কেন আমি কী

করেছি অনন্তবাবু ?'

'আপনি কেমন করে এস. পি. র সামনে বললেন যে, আপনি টাকা ঘুষ দিয়েছেন ? আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে পারত জানেন ?'

'না, তাতো আমি জানি না। সাহেব শুধোল, আমি যা জানি তাই বললাম।'

'সাহেব শুধোল, আর আপনি বলে দিলেন, এই করে আপনি জমি রাখবেন, আর আপনারা সই দিতে গেলেন কেন ?'

বীরেন দিন্দা বলল, 'কি করব বলুন, সাহেবের সামনে না বলতে পারলাম না।'

অনন্ত বলল, 'যাক গে, ও সইয়ের কোনো দাম নেই। চাষীদের দাবি এমনি করে মেনে নিলে শেষ পর্যন্ত ওদের পায়ের তলায় থাকতে হবে, তা ভেবে দেখেছেন ?'

মহিম বলল, 'অনন্তবাবু, তাড়াতাড়ি একটা কিছু ভালো ব্যবস্থা করুন। এমনি করে ভয়ে ভয়ে আর থাকা যায় না। চাষারা যা খুশি তা-ই করছে। এর মধ্যে চারজনকে তারা খুন করে গাপ করে দিয়েছে, সত্যিকার কোনো প্রমাণ নেই। দিনের বেলা কাছারি পুড়িয়ে দিয়েছে ওদের ভয়ে ফাঁকাতে বেরবার উপায় পর্যন্ত নেই আমাদের।'

অনন্ত বলল, কমিউনিস্টরা খুব হৈ চৈ লাগিয়েছে। প্রফুল্ল ঘোষ মিনিষ্ট্রি থাকতে তিনি পি. ডি. এ্যাক্ট চালু করে কিছু চাষা লোককে জেলে ভরে রেখেছেন। এখন যে সরকার হয়েছে সে-সরকার এখনও আমাদের ঠিকমতো সাহায্য দিচ্ছে না। মিলিটারি ছাড়া এ আন্দোলন দমানো যাবে না।'

শিবরামপুরের চকদার বনমালী বলল, 'একটা যা হোক কিছু ব্যবস্থা করুন অনন্তবাবু। সেদিন কৃষকসমিতি আমাকে খুন করবে বলে শাসালে। আর ওরা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে কাছারি, পুলিশ-ক্যাম্প জ্বালিয়ে দেবে। জমিদার, জোতদার, নায়েব, দালাল, বিশ্বাসঘাতক, গুপ্তচর আর ভি. ডি. পার্টির লোকেদের সুযোগ পেলেই খুন করে ফেলবে।'

অনন্ত বলল, 'এতদূর পরিকল্পনা নিয়েছে নাকি ওরা ? আচ্ছা আচ্ছা, আমার নামও অনন্ত, কত ধানে কত চাল হয় আমিও দেখাচ্ছি।'

একটু থেমে বলল, 'দেখুন, আমাদের রক্ষা করবার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে। সেইজন্যে আমি বলি কি, কলকাতা থেকে আরও অনেক বেশি পাঞ্জাবী গুণ্ডা নিয়ে আসি আমি। আর প্রত্যেকটি বেয়াদব গাঁয়ের ওপরে অত্যাচারের বান ডাকিয়ে দিই। প্রত্যেকটি ঘর জ্বালিয়ে দিই। তাহলেই হারামজাদারা জব্দ হয়ে যাবে। কাছারিতে কাছারিতে আরও বেশি করে গুণ্ডা রাখতে হবে।'

একটু থেমে ফের বলল, 'দিনকতক সবুর করুন, কি রকম সব ঠাণ্ডা হয়ে যায় দেখবেন চাষীরা। তখন এই আমাদের পা ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকবে।

আগ্রহ প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করল যামিনী চক্রবর্তী, 'কেন, কেন, কেমন করে?'

'চাষীরা তো মশায় কোর্ট বর্জনের আন্দোলন করছে। মহকুমা কোর্টে আমরা যতগুলো কেস করেছি সবগুলোতে জিতব আমরা তখন ওদের উচ্ছেদ করতে কতক্ষণ লাগবে। এক তরফা ডিক্রি পেয়ে যাব আমরা।'

মহিম ঘোষ বলল, 'অনন্তবাবু আপনি গভর্ণমেণ্টকে বলুন পুলিশ দিক, মিলিটারি পাঠাক। গুলী চালিয়ে একদিনে ঠাণ্ডা করে দিক ওদের বদমাইশি।'

অনন্ত বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা আমি করবই। এখুনি আমরা সরকারের কাছে দরখাস্ত লিখে ফেলছি। আসুন আমরা সবাই দরখাস্ত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিই।'

সকলেই এ পরামর্শ মেনে নিল।

অনন্ত ইংরেজিতে আবেদন লিখল সরকারের কাছে। সকলকে দিয়ে সই করাল। অনেকগুলি কপি করা হলো। তারপর ঠিক হলো, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে এস. ডি. ও. পর্যন্ত সকলের কাছে এই দরখাস্ত পাঠানো হবে।

অনন্ত বলল, 'আর যাতে সুন্দরবনের কৃষকদের বিরুদ্ধে শহরে কোনো প্রতিবাদ মিছিল টিছিল করা যায় তারও ব্যবস্থা আমি করব।'

সেদিন আর কেউ বেশিক্ষণ থাকতে চাইল না। বিকেলের আগেই নিজের নিজের ডেরায় পৌঁছনো চাই। কেন না সন্ধের পর সুন্দরবনের

রাস্তাঘাট একেবারেই নিরাপদ নয়। যে কোনো সময় কৃষকসমিতির ভলান্টিয়ার বাহিনীর মুখোমুখি পড়ে যেতে হতে পারে। তখন প্রাণে মরতে হবে!

॥ ৪৬ ॥

কয়েকদিন পরে অনন্তের কারসাজিতে মহকুমা সদর ডায়মণ্ডহারবারের দেওয়ালে দেওয়ালে আর কোর্টে কংগ্রেসী ছেলেরা বড় বড় করে পোস্টার লটকে দিল :

'কাকদ্বীপের কমিউনিস্ট গুণ্ডাদের ধ্বংস কর।'

'সুন্দরবনের কমিউনিস্টদের গুণ্ডামিকে দমন কর।'

'সুন্দরবনে অকারণে মানুষ খুন করছে কারা?
কমিউনিস্ট গুণ্ডারা আবার কারা?'

'কমিউনিস্ট গুণ্ডারা নিপাত যাক!'

আর অনন্ত শাসমল কলকাতা থেকে আরও পঞ্চাশ জন পাঞ্জাবী শিখ গুণ্ডা আমদানি করল সুন্দরবনে। তার কিছু দিল হরেনের কাছারিতে। কিছু কিছু দিল বিভিন্ন কাছারিতে। বাকী বেশির ভাগ গুণ্ডাকে রাখল নিজের কাছারিতে।

আবার এক দফা ঝড়ের মতো অত্যাচার করে নিল জোতদাররা। অত্যাচারের সেই একই কায়দা। ঘর-পোড়ানো, ঘর-ভাঙা, নারী-ধর্ষণ, লুণ্ঠন, হত্যা।

কৃষকসমিতির মিটিংয়ে বিশ্বনাথ বলল, 'কি গণপতি, এস. পি. সাহেব যে সব মিটমাট করে দিয়ে গেল, জমিদার জোতদাররা নাকি সই সাবুদ করে দিল। তা এসব কি হচ্ছে বলো দেখি।'

গণপতি মাথা নিচু করে খানিকক্ষণ বসে থেকে বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারি নি বিশ্বনাথ, তবে একথাও ঠিক অফিসারদের সম্বন্ধে যেটুকু মোহ লোকের আছে সেটুকুও কাটিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল।'

বিদ্যুৎ প্রায় সব সময়েই গণপতির সঙ্গেই থাকত। এবং একমাত্র বিদ্যুৎই সুন্দরবন আন্দোলনের সঙ্গে লাগাতর জড়িয়ে ছিল। মধু, হীরক এরা এসেছে আবার মাঝে মাঝে তাদের দেশে চলে গেছে, কিন্তু বিদ্যুৎ কখনো গণপতিদের ছেড়ে যায় নি। বিদ্যুৎ যখন সুন্দরবনে এসেছিল সে

ছিল কলেজের ছাত্র। সুন্দরবনের কৃষক আন্দোলনকে বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত করার জন্যে দিনরাত সে পরিশ্রম করত।

বিদ্যুৎ বলল, 'বিশ্বনাথবাবু, গণদা এস. পি. র সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ঠিকই করেছিল। চাষীদের যেটুকু মোহ ছিল সেটুকুও ঘুচিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। এবার দেখবেন চাষীদের পাল্টা আক্রমণ কত বেশি হবে।'

বিদ্যুৎ গণপতিকে সঙ্গে নিয়ে দিনেরাতে অজস্র বৈঠকী মিটিং করে বেড়াতে লাগল। আগুনঝরা ভাষায় বলতে লাগল বিদ্যুৎ, 'শোধ নাও, শোধ নাও, তোমরা, শেষ করে দাও জমিদার, জোতদার আর নায়েবদের। যারা আমাদের শোষণ করে, অপমান করে, আমাদের বৌ-ঝিদের ইজ্জত নেয়, আমাদের ঘরে আগুন দেয়, আমাদের খিদে নিয়ে ইয়ার্কি করে, আমাদের দিয়ে যা খুশি তাই করায় তাদের অত্যাচারের শোধ নাও। আমাদের কত লোককে ওরা আজ পর্যন্ত মেরেছে তা কি তোমরা জান না? চন্দনপিঁড়িতে কুড়িজনকে ওরা গুলী করে হত্যা করেছে, বুধাখালির তিনজনকে খুন করেছে। এসব খুনের শোধ নেবে না তোমরা? যারা প্রাণ দিয়েছে তারা তো তোমাদের সকলের জন্যেই জীবন দিয়েছিল। তাহলে তাদের কথা কি আমরা ভুলে যাব? তার মৃত্যুর প্রতিশোধ কি নোব না আমরা?'

এই কথা, এই একই কথা আগুনের ভাষায় বলে বেড়াতে লাগল বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের কথা শুনলে, বিদ্যুতের বক্তৃতা শুনলে মানুষ গরম হয়ে ওঠে। বিদ্যুৎকে কাছে পেলে ওরা পরম আশ্বাস পায়।

আবার ঝিম-ধরা ভাবটা কেটে উঠল। এদিকে শীত পেরিয়ে বসন্ত এসে পড়েছে। শীতের ঠাণ্ডার জড়তাও কেটে যাচ্ছে। আবার চাষীদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। শোধ নেবার জন্যে, পাল্টা আক্রমণ করবার জন্যে তৈরি হতে লাগল চাষীরা।

বিদ্যুৎ মিটিংয়ে মিটিংয়ে বলল, 'সরকার যে আমাদের জন্যে কিছু করবে না তার প্রমাণ আপনারা পেয়েছেন। এস. পি. জোতদারদের সাহায্য করবার জন্যে দু'হাজার পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমরা যে সাহেবের কাছে আমাদের দুঃখের কথা জানালাম তাতে সাহেব কটা ছেঁদো কথা বলে কেটে পড়ল। এর থেকেই তো বোঝা হয়ে গেল। কাকুতি-মিনতি করে পায়ে ধরে কোনো লাভ হবে না। নিজেদের শক্তিতে নিজেদের

হিম্মতে যদি লড়ে না বাঁচাতে পারি, তাহলে আমাদের কেউই বাঁচাতে আসবে না।'

এইভাবে যখন বিদ্যুৎ আর গণপতি উল্কার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে গাঁয়ে গাঁয়ে তখনই একটা ঘটনা ঘটে গেল। একটা জনসভা ডাকল ওরা শিবরামপুরের কাছে বিশালাক্ষ্মী তলায়। বিকালে মিটিং বসল। সেই মিটিংয়ে আশে পাশের গাঁ থেকে বহুলোক ভেঙ্গে এল। সেই মিটিংয়ে আসছিল শিবরামপুরের শৈলেন দলুই। শিবরামপুরের চকদার বনমালীর ঘুষ খেয়ে পুলিশ তাকে দূর থেকে গুলী করল তারপর পুলিশ বিহারীলালের বাড়ীতে ঢুকে মেয়েদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল, খানা তল্লাসীর নামে জিনিস-পত্র সব তছনছ করে দিয়ে গেল। এ খবর আগুনের ফুলকির মতো এসে পৌঁছল মিটিংয়ে। সমস্ত জনতা উন্মাদ হয়ে উঠল। সভাপতি ছিল বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ উঠে বলল, 'ভাইসব, মা ও বোনেরা আপনারা শান্তভাবে বসুন! আপনাদের নিজেদের সংগঠন কৃষকসমিতির পক্ষ থেকে বলছি, আমরা এ মৃত্যুর শোধ নোব এবং যত শিগ্রি পারি। আপনাবা এখন শান্ত হয়ে বসে মিটিং শুনুন।'

গুন গুন গুঞ্জন চলতেই লাগল জমায়েতের মধ্যে।

বিদ্যুতের সঙ্গে গোপনে পবামর্শ করে কৃষকসমিতিব জনকয়েক জঙ্গী কর্মী মিটিং থেকে গোপনে বার হয়ে গেল। তখন বিকেল শেষ হয়ে সন্ধের আবছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

জঙ্গী কর্মীরা নিখুঁতভাবে সব সংবাদ পেয়েছিল, তারা জেনেছিল, বনমালী গাঁথাই শৈলেনকে খুন করিয়েছে। ওরা রাত্রি একটু বাড়লে বনমালীর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। বাইরে পাহাবায় থাকল জন পনের লোক। ভিতরে চলে গেল কয়েকজন। যে ঘরে বনমালী থাকে তার দরজায় একজন হিন্দুস্থানী সেপাই ছিল। বনমালী বডি-গার্ড হিসেবে তাকে চাকরি দিয়েছিল। প্রথমে তাকে শেষ করতে হলো। কেননা সে চাষীদের বাধা দিতে এসেছিল। তারপর দরজা ভেঙ্গে ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখল ওরা, বনমালী ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে বিছানাতে বসে আছে। ভয়ে তার চোখ স্থির হয়ে গেছে। ঠক ঠক করে কাঁপছে সে।

ঘরের ভিতরে একটা হারিকেন জ্বলছিল। আলোটা হাতে নিয়ে

একজন বনমালীর মুখের সামনে ধরে মুখটা দেখে নিল।

কৃষকসমিতির জঙ্গী কর্মীদের দেখে বনমালী হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, 'মাইরি আমার কোনো দোষ নাই। আমি তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে প্রাণে মেরো না। আমি তোমাদের অনেক টাকা দোব, যা চাইবে তাই দোব, আমি সুন্দরবন ছেড়ে পালাব, তোমরা আমাকে প্রাণে মেরো না।'

একজন বলল, 'তোমাকে চিনতে বাকী নাই বনমালী। সাপকে আমরা কাঠি ঘা দিয়ে ছাড়ি না। অনেক সব্বনাশ করেছ তুমি আমাদের। বিশ্বাসঘাতককে শেষ করে না দিয়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কি দশা হয়েছিল জান না তুমি?'

'তোমাদের পায়ে ধরি, আমাকে প্রাণে মেরো না—'

এসব কান্নাকাটি গ্রাহ্য করবার সময় ছিল না ওদের। বনমালীর মুখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ওকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে ওর বুকের উপরে রিভলভার চেপে ধরে ওকে গুলী করা হলো।

তারপর বনমালী আর তার বডিগার্ডের লাস দুটো বস্তায় ভরে নিয়ে এল বাইরে।

তখন অন্ধকার রাত্রি নেমে এসেছে। মাঠে লোকজন নেই। সবাই ঘরে ফিরে গেছে।

বডিগার্ডকে শিবরামপুরের খালের পাঁকের তলায় পুঁতে দেওয়া হলো।

আর বনমালীর দেহটা বস্তাবাঁধা অবস্থাতেই বিশালাক্ষীতলার বটগাছের ডালে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হলো। উদ্দেশ্য হলো, অন্য সব দালাল আর গুপ্তচর আর বিশ্বাসঘাতকদের শিক্ষা দেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো লোক কৃষকসমিতির বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করতে না পারে। পুলিশ, জোতদার আর বিশ্বাসঘাতকরা শিক্ষা লাভ করুক। কি পরিণাম হতে পারে তাদের কৃষকসমিতির পাল্লায় পড়লে।

পরের দিন থেকে পুলিশ, পাঞ্জাবী গুণ্ডা আর সেবাদল বীভৎস আক্রমণ আরম্ভ করল চন্দননগর, রাধানগর, শিবরামপুর, রাজনগর, দুর্গানগর, হরিপুর, মহারাজগঞ্জ, লয়ালগঞ্জের উপর। চন্দননগরে অনন্ত পাণ্ডা, বিহারী গিরি, কামদেব গিরি, বরেন মাইতির ঘরের সর্বস্ব লুঠ করে পুড়িয়ে দিল।

বিষ্ণুপদ শাসমলের সব জিনিস লুটে নিল। রাধানগরের গোবর্ধন প্রধানকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ, সে আক্রমণ রুখতে চেয়েছিল ব'লে। গোপাল, চিন্তা, কানাই, গোবর্ধন আর মহাদেব গুড়িয়ার ধান খড় তৈজসপত্র পুলিশ ও সেবাদলে মিলে লুটে নিল। কানাইয়ের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করে দিল। পুলিশ বনবিহারী বেরা ও ষড়ানন বেরার স্ত্রীর উপর নির্যাতন চালাল। শিবরামপুরে ডাক্তার নিতাই দাস, কামদেব ঘড়ুই, বিহারীলাল ঘড়ুইয়ের ধান চাল তৈজসপত্র লুট করল।

জোতদাররা চাষীদের নামে মিথ্যা দেনার মামলা করল কোর্টে।

কৃষককর্মী ব্রজেনকে ডায়মণ্ডহারবারে ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দিল।

রাজনগরে নারায়ণ কামিলা, অভিমন্যু সাউ, উপীন দাসের ঘর লুট করে পুড়িয়ে দিল পুলিশ। উপেন দাসের কিশোর ছেলেকে নির্মম ভাবে মারধোর করে ক্ষত বিক্ষত করে দিল। অনন্ত উপীনদাসেব সম্পত্তি ক্রোক করে নিল। দুর্গানগরে হেমন্ত মুনিয়ার সর্বস্ব লুট করল, তার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিল। হরিপুরে নিবারণ কুঁতি, মহেন্দ্র কুঁতি ও রামচন্দ্র শাসমলের ধান চাল থালা ঘটি বাটি সবই লুট করল। মহারাজগঞ্জের শচীন আদকের ও বঙ্কিম মণ্ডলের সর্বস্ব লুট করল।

লয়ালগঞ্জের রমানাথ মণ্ডল, রাধানাথ মণ্ডল, শম্ভু হালদার, শিবেন মণ্ডল, হালি বেওয়া, প্রফুল্ল প্রধান, নারায়ণ কামিলা, সুধীর দলপতি, সিন্ধু বেরা, কুমার ঘড়ুইয়ের জিনিসপত্র লুট কবল গুণ্ডা-পুলিশ আর সেবাদলের লোকেরা। যোগী দাস, রেণুপদ কামিলা, রতন কামিলা, অভয় সাঁতরা, নরেশ জানা, আর প্রেমচাঁদের সব লুট করে তাদের ঘবৰাড়ীর চিহ্ন পর্যন্ত লোপ করে দিল। রেণুপদর বুড়ো মা আর ছোট ভাইকে পুলিশ ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে মারপিট করল। শ্রীনিবাস দলুইকে ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশ মেরে তার হাত পা ভেঙ্গে দিল।

মহিম ঘোষ তার কাছারির কাছের কৃষকদের পাড়াটা আগুন লাগিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিল, বাড়ী চড়াও হয়ে এক বিধবাকে ধর্ষণ করল। তাছাড়াও জমিদার জোতদাররা কৃষকসমিতির লোকেদের নামে গাদা গাদা মিথ্যা মামলা রুজু করল মহকুমা কোর্টে। এই সমস্ত অত্যাচার আর অন্যায়ের

নেতৃত্ব দিল অনন্ত আর মহিম। কিন্তু তারপর?

"অতি শীঘ্রই সমস্ত গ্রামগুলিতে শত শত কৃষক প্রচণ্ড ঘূর্ণি ও ঝটিকার গতিতে অভ্যুত্থানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এই অসাধারণ দ্রুত গতি সম্পন্ন ও প্রচণ্ড মারণ শক্তিকে ধ্বংস করতে পারে এমন ক্ষমতা সে-ক্ষমতা যত বড়ই হোক না কেন—কোথাও ছিল না। সমস্ত রকম শেকল যা তাদের এতদিন বেঁধে রেখেছে সে-সব ভেঙ্গেচুরে উদ্দাম গতিতে মুক্তির পথে সে এগিয়ে গেল। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী, যুদ্ধবাজ, ঘুষখোর আমলা, স্থানীয় গুণ্ডা, ভাড়াটে গুণ্ডা, বদ-বাবুমশায়রা সবার স্থান নির্দেশিত হলো গোরস্থানে। সমস্ত বিপ্লবী পার্টি, সব বিপ্লবী কমরেডদের তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা দেবার সময় এসে গেল। কাদের তারা গ্রহণ করবে, কাদের তারা ছুঁড়ে ফেলে দেবে—সব নির্ভর করবে তাদের সিদ্ধান্তের উপর।"

কাছারির পর কাছারিতে আগুন জ্বালাতে লাগল কৃষকেরা।

কাছারিব ধান লুট করে নিয়ে কৃষকসমিতির ফাণ্ডে জমা দিতে লাগল। তারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল গুপ্তচর ধীরেন প্রামাণিককে।

সহদেব মাইতি এতদিন কৃষকসমিতির ভিতরে থেকে গুপ্তচরের কাজ করত। তখন সে ভি. ডি. পার্টির লোক হয়ে গিয়েছিল। কৃষকসমিতিতে আসা বা কৃষকসমিতির লোকজনেব সঙ্গে যোগাযোগ রাখা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল। ক্রমশ সে ভি. ডি. পার্টির মস্তান হয়ে উঠেছিল। এখানে সেখানে অত্যাচার করে বেড়াচ্ছিল। একদিন রাত্রে ভি. ডি. পার্টি হরিপুরেব একজন কৃষকসমিতির চাষীর বাড়ীতে চড়াও হয়েছিল। কৃষক-সমিতির জঙ্গী কর্মীরা খবব পেয়ে ঘিরে ফেলল তাদের, সেদিন সহদেবও ধরা পড়ে গেল। ভি. ডি. পার্টির আর যে ক'জন ধরা পড়ল, তাদের আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো। কিন্তু সহদেবকে ছাড়া হলো না। তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মহিম ঘোষের কাছারির কাছাকাছি একটা উঁচু গাছে টাঙ্গিয়ে দিয়ে আসা হলো।

হরেন্দ্র সামন্তর কাছারি ঘেরাও করা হলো একদিন রাত্রিবেলা। কাছারিতে পুলিশ ছিল না। কেননা আগেই পুলিশ তুলে নেওয়া হয়েছিল। ছিল জনা কুড়ি কলকাতা থেকে আনা পাঞ্জাবী শিখ গুণ্ডা। এক যোগে আক্রমণ করল জঙ্গী কৃষকবাহিনী। ভাড়াটে গুণ্ডারা প্রথম খানিকটা রুখবার চেষ্টা

করে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে তাদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হলো। তারপর চাঁদা করে পিটতে লাগল চাষীরা। সে কি দারুণ মার! মারের চোটে অজ্ঞান হয়ে গেল কয়েকজন। কয়েকজনের কশ বেয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। তারপর টানতে টানতে লাশগুলোকে ফেলে দিয়ে এল অনেকদূরে। হরেন্দ্রের কাছারি, ধান, গোরু, পুকুরের মাছ, তৈজসপত্র সব কিছুই চাষীদের দখলে এসে গেল। চাষীরা সেইখানে ঘাঁটি তৈরি করল। হরেনের কাছারির চালে লাল ফ্ল্যাগ উড়িয়ে দেওয়া হলো। হরেন আগেই তার উপপত্নীকে নিয়ে পালিয়েছিল। তাকে পাওয়া গেল না।

সেদিন রাত্রে কাছারিতে মাছ ধরে রান্না করে ফীস্ট করল কৃষকবাহিনী। এবং সেই কাছারিতেই সাহস করে ঘাঁটি গেড়ে বসল। পরের দিন এল পঞ্চাশজন পুলিশ। কৃষকবাহিনীর লোকেরা বন্দুকহাতে একটা পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে-থাকা পুলিশদের বলল, 'আর এক পা এগোলে গুলী করে শেষ করে দোব। যাও ফিরে যাও।' পুলিশরা ফিরে গেলে হরেন্দ্রের কাছারি পুড়িয়ে দিয়ে কৃষকবাহিনীর লোকেরাও সেখান থেকে চলে এল।

এরপর ঠিক করা হলো, অনন্ত শাসমলের কাছারি আক্রমণ করা হবে, যে অনন্ত সমস্ত নাটের গুরু, যে অনন্ত জোতদার আর জমিদারদের নেতৃত্ব দিয়েছে, যে অনন্ত গুণ্ডা আমদানি করেছে সুন্দরবনে, সমস্ত অত্যাচার আর পীড়নের বুদ্ধি যে দিয়েছে। জমিদার জোতদারদের সেই মাথাকে ভেঙ্গে দেবার সঙ্কল্প নিয়ে কৃষকবাহিনী সকাল বেলাতেই যাত্রা করল অনন্তর কাছারির দিকে। কেননা ওরা খবর পেয়েছিল অনন্ত এসেছে এবং যে কোনো মুহূর্তেই পালাতে পারে। হয়তো সেইদিনই পালাবে। এই আক্রমণের নেতৃত্বে রইল মধু, বিদ্যুৎ, গণপতি। লাঠির ডগায় লাল পতাকা লাগিয়ে বল্লম সড়কিতে সজ্জিত হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে কৃষকবাহিনী অনন্তের কাছারি ঘিরে ফেলল। শাঁখের শব্দ শুনে গাদা গাদা লোক এসে জমতে লাগল। তখন বেলা দশটা বাজে। অনন্তের গুণ্ডারা ব্যাপার স্যাপার দেখে ছুটে পালাতে চেষ্টা করল। তাদের পুঁটলি-পোঁটলি জিনিসপত্র সব পড়ে রইল। দুচারজনকে ধরে ফেলল কৃষকসমিতির লোকেরা আর আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে সেই মহাকায় পাঞ্জাবীদের বাপের

নাম ভুলিয়ে ছাড়ল। দাড়িতে জেলে দিল দেশলাই। টান মেরে পাগড়ি নিল খুলে। যারা পালাল কৃষকবাহিনী তাদের পিছনে দৌড়ল না। কেননা তখন তাদের লক্ষ্য অনন্তের দিকে। অনন্তকে ধরবার জন্যেই ওরা এসেছে। অন্যদিকে এখন শক্তি নষ্ট করলে চলবে না। কাছারিতে পুলিশের ক্যাম্পও ছিল। পনের ষোল জন পুলিশও ছিল। কিন্তু এই মারমুখী বিশাল জনতা দেখে পুলিশরা গুলী করতে সাহসও পেল না। চাষীদের কাছেও বন্দুক ছিল। প্রকৃত পক্ষে সে সময়ে সুন্দরবনের জমিদার, জোতদার, নায়েব, পুলিশ সবাই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। অনেক জমিদার এবং জোতদার এবং নায়েব সুন্দরবন ছেড়ে পালাচ্ছিল। অনেক কাছারিতে লোক ছিল না।

কাছারির ভিতরে ঢুকে চাষীরা অনন্তকে ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এল। কৃষক জনতা উল্লাসে বাগে চেঁচিয়ে উঠল। অনন্তকে দাওয়ার নীচে নামিয়ে এনে জামা খুলে নিয়ে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চিত করে ফেলে দেওয়া হলো রৌদ্রে। তখন গরম পড়ে গেছে। রৌদ্রের তাত চড়তে আরম্ভ করেছে।

রাজনগরে যাদের বাড়ীতে বাড়ীতে অনন্তের নিজস্ব গুণ্ডারা অত্যাচার চালিয়েছিল তাদের বলা হলো, 'দে তোরা হারামজাদা শুয়োরটার (অনন্তর) মুখে পেচ্ছাব করে দে।'

বড়োরা লজ্জা পেল। দু একটা ছেলে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনন্তের মুখে ছড়ছড়িয়ে পেচ্ছাব করে দিল।

গণপতি ওর হাতের বল্লম নিয়ে 'হুঁম্' করে শব্দ করে দম নিয়ে অনন্তকে এফোঁড় ওফোঁড় করতে গেল। মধু ছিল কাছে, ছুটে এসে সে গণপতির হাতটা চেপে ধরল, বলল, 'করছ কি গণপতি, এত লোকের মাঝখানে?'

গণপতি কিছুতেই মধুর কথা শুনতে চায় না, মধু তখন গণপতিকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এত লোকের সামনে খুন জখম করলে জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ থেকে যাবে।'

'যাইই হোক, ফাঁসিকে আমি ভয় করি নাকি, ও পাঁঠাকে আমি বলি দোবই।'

অনেক কষ্টে মধু তাকে নিরস্ত করল। তখন গণপতি কোমরে দুই হাত

দিয়ে প্রাচীন বীরদের মতো দাঁড়িয়ে নিজের মুখে থাবাড়ি দিতে দিতে ঢেউ-খেলানো চীৎকার তুলল, 'ও-ও-ও-ও-ও-ও এবার দে অনন্ত শালার সাধের কাছারির চালে আগুন ধরিয়ে। যে পারিস লুটে নে ওর ধান। আর কাছারি বাড়ীটাকে মাটির সঙ্গে সমান করে মিশিয়ে দে।'

শ'য়ে শ'য়ে চাষী ওর কাছারির চালে আগুন ধরিয়ে দিল। শত শত কোদাল, গাঁইতি আর শাবলের ঘায়ে জমির সঙ্গে সমান করে মিশিয়ে দিল কাছারিটাকে। কাছারি নিশ্চিহ্ন করে দিল কয়েক ঘণ্টায়।

তখন মাথার উপরে সূর্য। চিত করে পড়ে থাকা অনন্তবাবুর মুখে টিখ্‌খর সূর্য এসে পড়েছে। গণপতি গিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে বলল, 'কি অনন্ত-বাবু বড্ড কষ্ট লাগছে না? বড়ো সুখের শরীল যে! আহা চুক্ চুক্! তা চাষীদের ব্যাখন এমনি করে বেঁধে রাখেন ত্যাখন কেমন লাগে একটু দেখুন। আর দেখুন মানুষকে মারলে কেমন লাগে।' বলে দাঁতে দাঁত কড়মড়িয়ে এক লাথি ঝাড়ল অনন্তের পাছায়। অনন্ত কেঁদে উঠল।

গণপতি আবার বলল হিসিয়ে হিসিয়ে, 'শাল্লা, চোখের জল তাহলে আছে তোমার! বানচোত আমি ভেবেছিলাম তোরা কাঁদতে জানিস না, তাই মানুষের কান্নার কোনো দাম নাই তোদর কাছে!'

তারপর বলল, 'বলো অনন্ত তুমি বাঁচতে চাও, না, মরতে চাও?'

অনন্ত জবাব দিল না। লাল চোখে তাকিয়ে রইল গণপতির দিকে।

গণপতি আবার বলল, 'যদি বাঁচতে চাও, চাষীদের যার যা লুট করেছিস ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে, প্রত্যেকের ঘর তোলার টাকা দেবে। না হলে শেষ তোমাকে করবই। এটা যেন খেয়াল থাকে, তোমার কোনো বাবা তোমাকে বাঁচাতে পারবে নি। এখন থেকে সুন্দরবন চাষীদের। তারা মেহনত করে রক্ত-জল-করা ঘাম ঢেলে সুন্দরবনের মাটিকে সোনা করেছে।'

'বল, জবাব দাও ফেরত দেবে কিনা চাষীদের সবকিছু?'

অনন্ত শুকনো গলায় কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, 'দোব ফেরত দোব।'

'এক সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দেবে।'

'দোব।'

'আর ফেরত না দিয়ে এখান থেকে যাবে না। যাবার চেষ্টা করলে

বিশেষ সুবিধা হবে না।'

তারপর অনন্তের কাছারির ধান কৃষকসমিতির লোকেদের ঘরে ঘরে চালান দেওয়া কাজ শেষ হলে অনন্তকে সেই চিত করা অবস্থায় রোদ্দুরে ফেলে রেখেই কৃষকরা ফিরে গেল। তাদের স্লোগানে সুন্দরবনের গ্রীষ্ম-দগ্ধ আকাশ গমগমিয়ে উঠল :

জমিদারী ব্যবস্থা নিপাত যাক!

নিপাত যাক, নিপাত যাক!

এমনি করে যখন কৃষকসমিতি সমস্ত সুন্দরবনে এক মহাসন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, যখন জমিদার-জোতদার-নায়েবরা সুন্দরবন ছেড়ে পালাচ্ছে, কৃষকদের বর্শামুখ যখন সমস্ত রকম গ্রামীণ শোষক জমিদার, জোতদার, মহাজন, নায়েব, গোমস্তা, দারোয়ান, পাইক, দালালের দিকে, যখন প্রত্যেকটি গ্রামাঞ্চলে চাষীরা ভীতির শাসন কায়েম করতে সফল হয়েছে, জমিদারদের সমস্ত ক্ষমতাকে উচ্ছেদ করে ছেড়েছে, সীমা অতিক্রম করতে পেরেছে, কৃষকদের মুক্ত অঞ্চল যখন প্রায় তৈরি হয়ে গেছে সুন্দরবনের এই অঞ্চলে তখন 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'র মতো কৃষকসমিতির কিছু লোক কৃষকসমিতির নাম ভাঙিয়ে কৃষকসমিতির বিরুদ্ধেই কাজ করেছে। কৃষকসমিতির সহকারী কোষাধ্যক্ষ রমেন বারুই, কেষ্ট দিন্দা, শিবেন মণ্ডল আর সুখেন শি ভিতরে ভিতরে ফাণ্ড আত্মসাৎ করতে আরম্ভ করল। এই চারজন জঙ্গীবাহিনীর লোক। বন্দুকও ধরে এরা। এদের উপরেও পুলিশ অত্যাচার করেছে। ভি. ডি. পার্টির লোকেরা এদের ঘর লুট করেছে। তবুও এদের মধ্যে বদ বুদ্ধি জেগে উঠল।

অনন্তের কাছারি পোড়ানোর পর একদিন রাজনগরের জমিদার মোহন গিরি এসে দেখা করল রমেন বারুইয়ের সঙ্গে, বলল, 'রমেন ভাই, আমার ধান তোরা কেড়ে নিস না, দেখ আমি তো তোদের কোন ক্ষতি করি নাই।'

রমেন বলল, 'সে হবে না গিরিমশাই, কোনো জমিদার-জোতদারকে আমরা ছাড়ব না।'

মোহন বলল, 'রমেন তুই একটা ব্যবস্থা কর ভাই, আমি তোকে পাঁচশ টাকা দোব কেউ জানতে পারবে না।'

রমেনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল, বলল, 'আপনি পরে একবার আসবেন, আমি পরে আপনাকে বলব।'

'দেখিস ভাই, আমি আবার আসব।' বলে মোহন চলে গেল। আর রমেন গেল তার তিন সহকর্মী কেষ্ট দিন্দা, শিবেন মণ্ডল আর সুখেন শির কাছে। তিনজনকে এক জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে মোহন গিরির প্রস্তাবের কথা বলল।

শিবেন বলল, 'সেটা কি ভালো হবে!'

'খারাপ কি হবে, ধানের বদলে পাঁচশ টাকা নোব আমরা, কৃষকসমিতি আমাদের কাছে টাকা চাইলে দোব।'

সুখেন বলল, 'সমিতি আবার টাকা চাইছে! বলে কে কোথায় তার ঠিক নাই। টাকা চাইবে! এই তালে জমিদার জোতদারদের কাছ থেকে কিছু টাকা বাগিয়ে নিতে হবে।'

অনেক আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো, টাকাই নেওয়া হবে এবং ওরা চারজন ভাগ করে নেবে। কোষাধ্যক্ষ বিশ্বনাথকে তা জানাবার দরকার নেই।

তখন কেষ্ট দিন্দা বলল, 'কিন্তু ধর, আমরা টাকা নিলাম, তারপরে যদি গণপতিরা গিয়ে গিরির ধান লুটে আনে। তখন কি হবে?'

সুখেন বলল, 'বলে দিলেই হবে, বিপদ বুঝলে ধান আমাদের কাছে রেখে যাবেন, ঝামেলা কেটে গেলে ধান ফেরত দোব।'

সেই রকমই কাজ হলো। পাঁচশ টাকা ওরা চারজনে গাপ করল কৃষকসমিতিকে না জানিয়ে।

তারপর থেকে ওরা একা একা ব্যাপার করতে লাগল। কোনো জোতদারকে একজন বলল, 'আমি হচ্ছি কৃষকসমিতির ফাগুশাখার লোক। আমাকে পাঁচশ' টাকা দিলে তোমাকে বাঁচিয়ে দোব।'

প্রাণের ভয়ে জোতদার হয়তো তাকে পাঁচশ টাকা দিল, আর তিন বন্ধুদের না জানিয়ে টাকাটা সে একাই হজম করে ফেলল। জমিদার জোতদাররা কৃষকসমিতির কিছু কিছু লোককে হাত করবার চেষ্টা করছিল। এই চারজনকে হাতে পেয়ে তাদের সুবিধা হয়ে গেল। অনেক জমিদার জোতদার চাষীদের হাত থেকে ধান রক্ষা করতে পারবে না এই ভয়ে

ওদের কাছে ধান জমা রাখত। সেই বিপর্যস্ত ডামাডোলের বাজারে সে ধানও ওরা মেরে দিত।

ওদের কাণ্ডকারখানা কিছু জানতে পারল গণপতি, বিশ্বনাথ। একদিন রাত্রে মিটিং ডেকে গণপতি ওদের বলল, 'কৃষকসমিতি জমিদার জোতদারদের কাছ থেকে অনেক ধান আদায় করেছে। কত কি আদায় হয়েছে তার হিসেব দাও।'

রমেন হঠাৎ বলে বসল, 'হিসেব তোমাকে দোব কেন, হিসেব দোব সমিতিকে।'

গণপতি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমি সমিতির সাধারণ-সম্পাদক, আমার কাছেই হিসেব দিতে হবে।'

বিশ্বনাথ বলল, 'হ্যাঁ, হিসেব দাও তোমরা। কৃষকসমিতির কর্মীরা কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। প্রত্যেককে আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হচ্ছে, তারা ঠিক মতো খেতে পরতে পাচ্ছে না. অনেকের জামা কাপড় ছিঁড়ে গেছে। টাকা দাও তোমরা।'

সুখেন বলল, 'শত খানেক টাকা দিচ্ছি।'

গণপতি বলল, 'একশ' টাকায় কি হবে। তাছাড়া তোমরা হিসেব দিতেই বা চাইছ না কেন?'

রমেন বলল, 'হিসেব চেয়ে তুমি আমাদের অপমান করছ গণপতি।'

গণপতি বলে উঠল, 'অপমান! তোমরা কৃষকসমিতির এক নম্বরের সভ্য। তোমরা বন্দুক রাখো কাছে। তোমাদের আমি অপমান করব! কিন্তু তোমাদের হাতেই সমিতির সব ফাণ্ডের দায়িত্ব; হিসেব না দাও, অনেক টাকা যে দরকার। কর্মীরা কি না খেয়ে কাজ করবে?'

সুখেন বলল, 'এতদিন পরে যদি আমাদের অবিশ্বাস কর, তাহলে আমাদের তাড়িয়ে দাও। কিংবা যদি বল, আমরাই পদত্যাগ পত্র দিয়ে দিতে পারি।'

চারদিকে তখন হাঙ্গামা। এ নিয়ে বিচার বিবেচনা করবার আর সময় ছিল না।

গণপতি বিশ্বনাথকে বলল, 'কমরেড, তুমি এদিকে এবার নিজে নজর দাও।

বিশ্বনাথ তখন থেকে ফাণ্ড বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু রমেন, শিবেন, সুখেন আর কেষ্ট কৃষকসমিতির নাম ভাঙ্গিয়ে জমিদার জোতদারদের কাছ থেকে টাকা ঝাড়তেই লাগল। ওদের ব্যাপার শুনতে পেয়ে কোনো জোতদার হয়তো ওদের কারও কাছে এসে প্রাণে বাঁচবার জন্যে হাতে পায়ে ধরে কাকুতি করতে লাগল। তখন রক্ষা করবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ওরা টাকা বাগাত। এমনি করে নিতান্ত সাধারণ অবস্থার ভাগচাষী হয়েও ভিতরে ভিতরে ওরা চারজন টাকা চুঁষে চুঁষে মোটা হয়ে উঠতে লাগল। কৃষকসমিতির জঙ্গী কর্মীরা তখন চারিদিকের ব্যবস্থা, মিটিং, আণ্ডার গ্রাউণ্ড, টাকাপয়সা, খাওয়া পরা, মেয়ে ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, নতুন যোদ্ধা সংগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে এত ব্যস্ত এবং ছড়ানো ছিটোনো হয়ে পড়েছিল যে সহকারী এই চার কোষাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো ব্যবস্থাই ওরা করতে পারল না। সঠিক কোনো প্রমাণও ওদের হাতে ছিল না।

অতএব রমেন, কেষ্ট, শিবেন, সুখেন ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে মজাসে বাণিজ্য করতে লাগল।

॥ ৪৭ ॥

কমিউনিস্ট নেতারা একে একে উধাও হয়ে গেল সুন্দরবন থেকে।

বৃন্দাবন ঘোষ, আনন্দ রায় আগেই গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছেন। মধুর মতামতের সঙ্গে কৃষকসমিতির নেতাদের এবং বিশেষ ভাবে তরুণ বিদ্যুতের মতামতের দারুণ বিরোধ হতে লাগল। মধু কৃষকদের এতটা বাড়াবাড়ি সমর্থন করছিল না। বলছিল, 'ভীষণ বিপদ আসছে, তখন মহামুশকিল হবে। এখ্‌খুনি আন্দোলনের রাশ টেনে ধরা উচিত।'

একদিন বিদ্যুৎ মধুকে ধমকে উঠল, 'আপনি বিদায় হন তো এখান থেকে। যত সব গান্ধীবাদী ধ্যানধারণা নিয়ে এসেছেন এখানে কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে। কোনো বিপদ হলে আন্দোলন ব্যর্থ হলে আপনি তার জন্যে দায়ী। দিনরাত ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে আপনি কৃষকদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে চান। সেদিন অনন্তকে আপনিই মারতে দিলেন না। অনন্তকে বাঁচাতে দেওয়া আমাদের উচিত হয় নি। জানেন, ও হারামজাদা আমাদের কতবড়

ক্ষতি করতে পারে। আমি শুনেছি ও কংগ্রেসের উপর মহলে তদ্বির করছে যাতে সুন্দরবনে মিলিটারি পাঠানো হয়।'

মধু বলল, 'ও তদ্বির না করলে বুঝি মিলিটারি পাঠাত না গভর্ণমেণ্ট? মেদ্নীপুরে ৪২-য়ের আন্দোলনে বোধহয় মিলিটারি পাঠানো হয় নি?'

বিদ্যুৎ খেপে গিয়ে বলল, 'আপনি কেবলই কৃষকদের হাত চেপে ধরছেন, নেতা সাধারণ মানুষের চেয়ে আগে আগে যাবে, তা নয় আপনি সাধারণ মানুষের পিছনে পিছনে কেবলই খোঁড়াচ্ছেন আর ওদেরকে পেছিয়ে দিতে চাইছেন। দেখছেন না, কি বিরাট শক্তি জেগে উঠেছে! এযুদ্ধ চলবে যতদিন না এখানে মুক্ত অঞ্চল তৈরি হয়।'

মধু বলল, 'বিদ্যুৎ তুমি পাগলের মতো বকছ, আমাদের এ অঞ্চলে লোকসংখ্যা বেশি নয়। এই লোকসংখ্যা নিয়ে একটা বিরাট রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বেশিদিন লড়া যায় না।'

বিদ্যুৎ বলল, 'আপনি জনগণের শক্তিকে বোঝেন না তাই হতাশার কথা বলেন।'

মধু বলল, 'ঠিক আছে, তুমি নেতৃত্ব দাও। কৃষকসমিতি তোমার কথাকেই বেশি দাম দেয়। অন্তত গণপতি তোমাকেই বেশি পছন্দ করে. আমি বিদায় নোব।'

বিদ্যুৎ আর কোনো কথা বলে নি। মধু সুন্দরবন ছেড়ে চলে গেছে। হীরক মাঝে মধ্যে আসত, বক্তৃতা দিত, গাঁয়ে গাঁয়ে সংগঠন করবারও চেষ্টা করত। এখন আর সেও আসে না।

কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ কৃষকসমিতির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। বিশ্বনাথকে তখনও গ্রেপ্তার করতে পারে নি পুলিশ। আর আন্দোলনের কাজে যোগ দিয়েছিল কলকাতার কলেজের বি. এ. ক্লাসের একটি ছাত্র নাম গোপীনাথ মণ্ডল। এই অঞ্চলেরই ভূমিহীন ছোটো ভাগচাষীর ছেলে। কলকাতায় একজন কমিউনিস্টের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনো করতে করতে কমিউনিস্ট হয়েছিল। সেও যোগ দিয়েছিল এই আন্দোলনে। কিন্তু বিদ্যুৎই নেতা, আন্দোলনের হাল বিদ্যুতেরই হাতে এসে পড়ল। বিশ্বনাথ কমিউনিস্ট হিসেবে বিদ্যুতের সাহায্যকারী হয়ে রইল।

তারপর একদিন লঞ্চ ভর্তি হয়ে মিলিটারি আসতে লাগল সুন্দরবনে। এক হাজার স্পেশাল ক্যাম্প বসল সারা সুন্দরবন জুড়ে। সর্বসমেত পাঁচ হাজার মিলিটারি নামল সুন্দরবনের মাটিতে। মিলিটারি ডাক্তার এলো, অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এলো। তুটো ইউনিয়নে ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ঘুঘুডাঙ্গা কাকদ্বীপ পর্যন্ত এক হাজার ক্যাম্পে পাঁচ হাজার মিলিটারিকে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। এক হাজার আর্মড্ পুলিশ তো সমস্ত সুন্দরবন জুড়ে আগে থেকেই ছিল। সাতরকমের মিলিটারি এলো, নেপালী, শিখ, গুর্খা, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মারাঠী।

ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট্ এলেন একদিন তাঁর সুন্দর লঞ্চ নিয়ে। সুন্দরবনের কৃষকদের উপর মিলিটারি অত্যাচার চালানোর প্রস্তুতি হিসেবে ১০৮০ বর্গমাইল এলাকাকে কর্ডন করা হলো আর কারফিউ আদেশ জারি করা হলো। কর্ডন এবং কারফিউর ফলে সমস্ত কাকদ্বীপ-সুন্দরবনকে গোটা তুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো। সভ্য জগতের কোনো মানুষ যাতে কংগ্রেসী সরকারের বর্বর নির্যাতনের কোনো খবর না পায় সেজন্যে সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ হলো। এমন কি কোনো আত্মীয়-স্বজনকে এই এলাকায় ঢুকতে হলে মিলিটারি ক্যাম্প থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে, এই ব্যবস্থা হলো। কারফিউ কার্ড ছাড়া যখন তখন যেখানে-সেখানে চলাফেরা করা মানে মিলিটারির বুলেটে প্রাণ দেওয়া।

তারপর শুরু হলো চাষীদের উপর অত্যাচার।

মিলিটারি, পুলিশ, ভি. ডি. পার্টি (সেবাদল) আর গুণ্ডারা মিলে বীভৎস নরক করে তুলল সুন্দরবনকে। এক একটা গাঁয়ে ঢোকে ওরা, এলোমেলো ছড়ানো ছিটনো বাড়ীগুলোতে ঢুকে পড়ে, বাড়ীর পুরুষদের মারধোর করে, মেয়েদের বর্বরের মতো ধর্ষণ করে, আর জিনিসপত্র লুটে নিয়ে পালায়। মধ্যবিত্ত, ছোটো জোতদাররাও এই অত্যাচার থেকে রেহাই পেল না। বড়ো জমিদার, বড়ো জোতদাররা পুলিশ ও মিলিটারি ক্যাম্পে আশ্রয় নিল। কয়েকদিনেই চার পাঁচশ মেয়েই শুধু ধর্ষিত হলো। অনেক মেয়ে এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে প্রাণ হারালো। মাঠে, বনে উলঙ্গ মৃত নারীদেহ পড়ে থাকতে দেখা গেল। সি-প্লটে লাটদার ভুবন ধর তার ঘেরিতে কৃষকসমিতির লোকেদের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিল। জোতদার

অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অনন্ত শাসমল অকথ্য অত্যাচার চালাতে লাগল চারদিকে।

আর শত শত চাষীকে বৃদ্ধ-মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রেপ্তার করা হতে লাগল। মেয়েরা কোলের সন্তান নিয়েই জেলে যেতে লাগল। শত শত চাষীকে ১১০ ধারার আসামী করে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হতে লাগল। মেয়েদের ধরা হতে লাগল ৫৪ নং ধারায় বিপ্লবীদের সহায়তা করেছে এই সন্দেহে। জঙ্গী চাষীরা লুকিয়ে চুরিয়ে পশুর মতো বেড়াতে লাগল। কমিউনিস্ট নেতা বিশেষ কেউ নেই। বিশ্বনাথও ধরা পড়ে গেছে। নেতা শুধু বিদ্যুৎ আর গণপতি আর সাগর।

মোহিনীর বাড়ীতে একদিন দুজন পুলিশ এসে বলল, 'তোমাকে ক্যাম্পে ডেকে পাঠিয়েছে।'

মোহিনী বলল, 'আমি একলা মেয়ে মানুষ, ক্যাম্পে যাব কেমন করে?'

'তা জানি না যেতে বলেছে।'

মোহিনীকে প্রায় ধরেই নিয়ে গেল পুলিশ দুটো। মহিম ঘোষের কাছারিতে তখন ক্যাম্প। সৈন্য পুলিশে ভর্তি।

ওকে নিয়ে যাওয়া হলো কাছারির একটা ঘরের ভিতরে। ভয়ে মোহিনীর বুক কাঁপতে লাগল। দেখল, একটা টেবিলের সামনে একজন গম্ভীর লোক বসে আছে, প্যান্টকোট্-পরা। তাকে ঘিরে একগাদা পুলিশ।

প্যান্টকোট-পরা ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কি?'

মোহিনী বলল, 'আমার নাম মোহিনী হালদার।'

'তোমার স্বামীর নাম কি?'

'আমার স্বামীর নাম গণপতি।'

'হুঁ, তা গণপতি আসে বাড়ীতে?'

'না বাবু, সে আজ পাঁচবছর আগে বাড়ী ছেড়ে গিয়েছে।'

'তাহলে তোমার চলে কেমন করে?'

'আমার দেওররা আছে, তারাই চাষবাস করে।'

'গণপতি কোথায় আছে বলতে পার?'

'না বাবু, কেমন করে জানব?'

'উম্।'

হঠাৎ মোহিনী বলে বসল, 'বাবু, আপনি যে পুলিশ পাঠিয়েছিলেন তারা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছিল, যা তা বলছিল। বাবু, আমার তো দোষ নাই, তা আমার সঙ্গে কেনে এমন করবেন আপনারা?'

মোহিনী জানত না যে, ভদ্রলোক ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, চেহারা ভাবভঙ্গী দেখে একটা কোনো কেউকেটা বলে মনে করেছিল মোহিনী।

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হঠাৎ গর্জে উঠলেন, 'আমি কতবার বলেছি, গেরিলাদের পরিবারের সঙ্গে কেউ কোনো রকম খারাপ ব্যবহার করবেন না, যে-কোনো মুহূর্তে যে-কেউ তাহলে খুন হয়ে যেতে পারে, জোতদার জমিদারদেরও তাহলে আরও অনেককেই মরতে হবে। তাদের ধরবার চেষ্টা করুন, তাদের বৌদের কিছু বলবেন না।'

একজন পুলিশ অফিসার কাছেই বসেছিল, বলল, 'ঠিক আছে স্যার।'

ম্যাজিস্ট্রেট আবার বললেন, 'মিলিটারি ক্যাপটেনকেও আমি বলে দিয়েছি।'

ম্যাজিস্ট্রেট মোহিনীকে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

একজন অফিসারকে বললেন, 'ওকে ক্যাম্প এরিয়াটা পার করে দিয়ে আসুন।'

মোহিনী বেরিয়ে এল। ক্যাম্পের এলাকা পার হয়ে মাঠে পড়ে তবে ওর বুকের টিপ টিপোনি খানিকটা যেন কমলো।

সেইদিনই রাত্রে দরজায় টোকার শব্দ শুনে বিনিদ্র মোহিনী ভিতরকার ঘরে থেকে বেরিয়ে এসে সীতাপতিকে ডেকে তুলে বলল, 'দেখো তো ঠাকুরপো, কে দরজায় টোকা দিচ্ছে। বল্লম হাতে নিয়ে তৈরী হও। সবাইকে ডেকে তোলো।'

বল্লম হাতে নিয়ে সীতাপতি দরজার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

শুনতে পেল গণপতির গলা, 'আমি গণপতি, সীতো, তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দে।'

সীতাপতি দরজা খুলে দিলে গণপতি ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোর বৌদি কোথায়?'

সীতাপতি বলল, 'ঐ তো বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে আছে।'

গণপতি বলল,' চলো ঘরে যাই।'

মোহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে মোহিনীকে কঠিন আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল গণপতি। মোহিনীর ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। তারপর মোহিনীকে কাছে নিয়ে বসল।

মোহিনী বলল, 'তুমি কেমন করে এলে, চারদিকে যে পুলিশ আর মিলিটারি থিক্ থিক্ করছে।'

'খবর পেলাম, তোমাকে আজ ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তাই একবার দেখতে এলাম।'

'হ্যাঁ, ধরে নিয়ে গিয়ে শুধোল, তুমি বাড়ীতে আস কিনা, কোথায় আছ?'

'কি বললে!'

'বললাম, সে পাঁচবছর বাড়ী ছেড়ে গেছে। আর, কোথায় আছে আমি জানি না।'

'ঠিকই বলেছ, কিন্তু আমি তো তোমার কাছে প্রায়ই আসি।'

'সেই কথা কি বলব ওদের?'

'তোমাকে অপমান করে নাই তো?'

'না, একটা ভদ্রলোক মতো হোমরা চোমরা কেউ হবে বোধ হয়, বললে তোমাদের বৌদের যেন কিছু না বলা হয়, তাহলে নাকি দারুণ বিপদ হবে।'

'হ্যাঁ আমিও শুনেছি। ও ডি. এম.। গেরিলাদের পরিবারের গায়ে হাত দিতে বারণ করে দিয়েছে ডি. এম.।'

মোহিনী হঠাৎ বলে উঠল, 'কি হবে গো, কি করবে তোমরা এখন!'

'কিছুই জানি না মোহিনী। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তবু এখন তো আর কিছু করবার নাই। আমরা প্রাণপণে লড়ে যাব। তারপর যা হয় হবে।'

'কোথায় আছ তোমরা এখন?'

'অনেকেই কে কোথায় ছিটিয়ে পড়েছে। অনেকেই এ্যারেস্ট হয়ে গেছে। আমরা এখনও শতখানেক ঠিক আছি। আমি থাকি তমলুকের চড়ায় মানে লুধিয়ানা দ্বীপের জঙ্গলে। গাছে শুয়ে বসে আমাদের দিন কাটে। তবে আমরা চেষ্টা করছি, শীঘ্রি একটা আক্রমণ চালাব।'

মোহিনী ভয়ে জড়িয়ে ধরল গণপতিকে। গণপতি মোহিনীকে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'মোহিনী, কে জানে হয়তো আর আমাদের দেখা হবে না, হয়তো তোর সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা।'

তারপর ঘণ্টা দুয়েক পরে মোহিনীর কাছে বিদায় নিল গণপতি। ঘুমন্ত ছেলেকে আর মেয়েকে চুমো খেয়ে গণপতি ঘর থেকে বেরিয়ে আবার অন্ধকার বিশাল মাঠে মিলিয়ে গেল। ছোটো গবাক্ষ দিয়ে মোহিনী গণপতিকে দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু এত অন্ধকার, শুধু অন্ধকার, গণপতিকে ও দেখতে পেল না।

॥ ৪৮ ॥

মিলিটারি, পুলিশ, ভি. ডি. পার্টি আর গুণ্ডাদের দলবদ্ধ আক্রমণের প্রথম চোটটা সামলে নিতে খানিকটা সময় লাগল কৃষকসমিতির। তখন অনেক কৃষককর্মীকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। তারপর কৃষকসমিতির নেতারা এক জায়গাতে মিলিত হলো। ঠিক করল, নানান ভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে পুলিশ মিলিটারিদের অসুবিধা করা যায়। আর এবার থেকে কৃষকসমিতির গেরিলাবাহিনী লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে না। ওদের পিছন থেকে আক্রমণ করতে হবে। ওদের নাজেহাল করে তুলতে হবে। ওদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পুকুরে বিষ মিশিয়ে দিতে হবে।

বিদ্যুৎ বলল, 'আগে একবার মিটিং করব, মিলিটারিদের কাছে আমরা বলব. আমাদের ন্যায্য দাবি দাওয়ার কথা।'

সাগর বলল, 'মিটিং করতে গেলেই ধরা পড়তে হবে।'

বিদ্যুৎ বলল, 'তবু রিস্ক নিতে হবে। মিলিটারিদের খানিকটা অংশকে নিষ্ক্রিয় না করতে পারলে চলবে না।'

বিহারী বলল, 'যদি এ্যারেস্ট করে আমাদের তাহলে তো সবই ফুরিয়ে গেল।'

'না, আমাদের এ্যারেস্ট করতে পারবে না। সব পুলিশ বা মিলিটারি তো এক জায়গায় থাকে না। শিবরামপুরের ঐ বিশালাক্ষী থানেই আমরা মিটিং করব। আমাদের কৃষকবাহিনী ছাড়াও হাজার হাজার চাষী থাকবে সে মিটিংয়ে, সেখানে পুলিশরা কিছু করতে সাহস করবে না। আমাদের

গেরিলাবাহিনীর লোকেরা পঁচিশ জন ক'রে ক'রে ভাগ হয়ে চারদিকে পাহারা দেবে। প্রত্যেক পঁচিশজনের ওপর একজন করে ক্যাপ্টেন থাকবে। যাতে জনতার গায়ে হঠাৎ ওরা হাত দিতে না পারে তেমনিভাবে পাহারা দিয়ে থাকতে হবে। আর দেখতে হবে, মিটিংয়ে যেন কর্মীদের এ্যারেস্ট করতে না পারে। আমাদের মধ্যে অনেকেই লুকিয়ে নিয়ে যাবে স্টেন্‌গান্, বোমা। বাঁশী বাজলেই যেন ফায়ার করা হয়।'

ঠিক হলো, বিদ্যুৎ বক্তৃতা দেবে আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে হিন্দীতে ও বাংলাতে আর গণপতি সুন্দরবনের আন্দোলন নিয়ে বাংলাতে বলবে।

প্ল্যান ঠিক করে নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ঢেঁড়ি দেওয়া হলো যে, বিশালাক্ষী তলায় জনসভা, সমস্ত চাষী যেন যায়, কৃষকসমিতি এই মিটিংয়ে সবাইকে যেতে বলছে। ঢেঁড়ি দিয়ে বলা হলো, কৃষকসমিতি মিলিটারিদেরও কিছু বলতে চায়, মিলিটারিরা যেন মিটিংয়ে আসে। কেননা তারাও গরীব ঘরের ছেলে, গরীবের দুঃখের কথা তারা যেন শুনতে আসে।

চাষীরা বিশালাক্ষী থানের কাছে একটা মাটির গম্বুজ মতো করল, যার ভিতরে বসে গুলি ছোড়া যায়।

মিটিংয়ের খবর শুনে জমিদাররা ডি. এম. কে বলল, 'এবার তো হাজার হাজার কর্মীকে এ্যারেস্ট করা যায়, স্যার।'

ডি. এম. বললেন 'না, তার দরকার নেই। এত বড় যাদের স্পর্ধা তাদের কত বড় ক্ষমতা ভাবুন। এখন ওদের কিছু বলব না। যদি পিটুনি কর আদায় করে দেন তাহলে আবও মিলিটারি আনবার ব্যবস্থা করব।'

সেদিন বেলা তিনটের পর বহু লোক জমল বিশালাক্ষী তলায়। মিটিং-য়ের মঞ্চ করবার জন্যে মাটি দিয়ে ওখানে আগেই একটা উঁচু বেদী করা হয়েছিল। সেই বেদীতে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে বিদ্যুৎ হিন্দীতে বক্তৃতা করল আধঘণ্টা তারপর তার বাংলা করে দিল। তার বক্তব্যের বিষয় ছিল:

চীন দেশে কমিউনিস্টরা দেশের সাধারণ মানুষের রাষ্ট্র তৈরি করবার জন্যে জাপান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। দেশের শত্রু চিয়াং-কাইশেকের সঙ্গে লড়ছে। আমরাও শ্রমিক কৃষক আর গরীব সৈন্যদের রাষ্ট্র গড়বার জন্যেই এই সুন্দরবনে আন্দোলন করছি। সৈন্যরা তো গরীব চাষীর ছেলে, গরীবের ছেলে, তাহলে কেন তারা বড়লোকদের স্বার্থরক্ষা

করবার জন্যে গরীব কৃষকদের উপর অত্যাচার করবে? ইংরেজ দেশ ছেড়ে গেল কিন্তু তাতে কি সাধারণ গরীব মানুষদের কোনো উপকার হয়েছে? তাদের জন্যে তো কংগ্রেস কিছু করে নি? কংগ্রেস করেছে বড় লোকদের জন্যে। তাহলে কেন বড়লোক আর কংগ্রেসীদের কথা শুনে গরীব সৈনিকরা গরীব চাষীদের উপর গুলী চালাবে?

বিদ্যুতের বক্তৃতা শেষ হলে গণপতি উঠে দাঁড়াল।

মিটিংয়ের একদিকে বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী সৈন্য প্রায় শতখানেক এসে জমায়েত হয়েছে। তারা বন্দুক হাতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের কথা শুনেছে। এবার গণপতির কথাও শুনতে চাইছে বলে মনে হলো।

, গণপতি বলতে শুরু করল, 'বন্ধুগণ, ১৩৪৯ সাল থেকে আমরা মুভমেণ্ট করেছি। ১৩৫৪ সালে দেশ স্বাধীন হলো তখনও সুন্দরবনে পুলিশ ছিল, তারাই নিরীহ চাষীদের ওপর অত্যাচার করেছে। এখানে মিলিটারি যাঁরা এসেছেন তাঁরা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত ও দবিদ্র পবিবারের ছেলে। আমরা তাঁদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনাবাই বাষ্ট্র পরিচালনার শক্তি। আপনাদের বিচাব করতে হবে। আপনাদেব চিন্তা কবতে হবে। এবং দেশের সন্তান হলে বাক্-স্বাধীনতা প্রকাশ করবেন। কে দোষী বলুন? কৃষকরা যদি অন্যায় করেছিল, যাবা অন্যায় করেছিল সেই দু একজনকে এ্যারেস্ট করলেই হতো। কিন্তু সমস্ত লোক আমাদেব সমর্থন করেন, সেইজন্যেই বিধান রায়ের পুলিশ ধবতে পারে নি। কৃষকদের শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট হচ্ছিল। মিলিটাবি তখনই প্রয়োগ হয় যখন কোনো ব্যাপার হাতছাড়া হয়ে যায়। সুন্দরবন কি জহবলাল নেহরুব হাত থেকে চলে গিয়েছে? ১৩৫৪ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। ঐ দিনেব অনেক আগে থেকে বৃটিশের সময় থেকে ১৯৪২ সাল থেকে মুভমেণ্ট হচ্ছে। ক্ষেতমজুবরা দু আনার পরিবর্তে দু টাকা মজুরী চেয়েছে, ভাগচাষীবা তেভাগা চেয়েছে, বাজে আবওয়াব দিতে চায় নি। তা মিলিটারি আর পুলিশ সম্বন্ধেও তো মাইনে বাড়ানোর দাবি হয়েছে। আমাদের দাবি অন্যায় কি ন্যায় আপনারা বলুন। আমি ডি. এম. কে চ্যালেঞ্জ করছি, তিনি এখন এখানে আছেন, তিনি বলুন। এস. পি. এখানে এসেছিলেন। বাস্তব ঘটনা শুনে তিনি জমিদারদের ডেকে কথা বলে, তারা মীমাংসা করবে বলে গিয়েছিলেন।

হরেন সামন্তর ধান গণপতি তুলেছিল। এস. ডি. ও. এসেছিলেন। তাঁকে সব কথা বলা হলো, তিনি জবাব করতে পারেন নি। আর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রফুল্ল ঘোষ, তারপর বিধান রায় পুলিশ পাঠিয়েছিল। মিলিটারি আসবার আগে এক হাজার পুলিশ এসেছে এখানে। হরেন সামন্ত একশ' গুণ্ডা দিয়ে গণপতির ঘর ভেঙেছে। হরেন্দ্র স্বীকার করেছে সাড়ে ছ' লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। এস. পি. সাহেব সাহায্য দোব বলেছিল। রাধামোহন গিরি, মহিম ঘোষ, ভুবন ধব, হরেন সামন্ত আর এস. পি. সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করছি, তারা সত্যিকথা বলুন। এস. পি. কিছু টাকা আদায় করে দিয়ে গিয়েছেন চাষীদের। জমিদাররা চাষীদের ক্ষতিপূরণ দোব বলেছিল। সেই হরেন সামন্ত বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল। তার কাছারি দখল করা হয়েছে, গুণ্ডারা পালিয়েছিল স্পেশাল ক্যাম্পে। হরেন্দ্র আসে নি। হরেন্দ্রের কাছারি দখল করা হলে, কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করে নি। কেননা অধিকাংশ মানুষ আমাদের সমর্থন করে। আপনারা বিচার করে দেখবেন।

১৩৫৪ সালে চন্দনপিঁড়িতে পুলিশ কুড়িজন মানুষকে হত্যা করেছিল। ওদের তিনজন কর্মচারী তিনজনকে মেরেছে। ভুবন লাটদার ঘরদোর জ্বালিয়েছে, রাধানগরে গুলী চলেছে, চাষী মরেছে। বুধাখালিতে পাঁচজনকে মেরেছে, আঠারো বছরের এক ছেলে তার বোনকে গুণ্ডাদের হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। এখানে হরেনের কাছারি দখল করেছি, কিন্তু অন্যত্র মুভমেণ্ট শান্তিপূর্ণ ছিল। এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে মিলিটারি পাঠিয়েছে স্বাধীন দেশের সরকার। বিধান রায় পুলিশ পাঠিয়ে কিছু করতে পারে নি। নেহরুর হাতে আপনারা থাকেন। আর চাষীদের এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে আপনাদের পাঠিয়েছে। আপনারা চাষী মেয়েদের ইজ্জত রাখছেন না। ভুবন লাট-দারের ঘেরিতে চাষীদের ঘর পুড়ে গেছে, আপনারা দাঁড়িয়ে দেখেছেন।

হাজার হাজার জনতা আর সহ্য করতে পারছে না! তারা বিনা অস্ত্রেই যুদ্ধ করতে রাজী। যারা নরহত্যা করেছে, ঘর জ্বালিয়েছে, তাদেরও ঘর পুড়বে। আপনারা যদি কৃষকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন তাহলে আপনারা আপনাদের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরবেন। আর কৃষকসমিতির কর্মীদের হত্যা করলে কৃষকদের বাঁচার দাবির মুভমেণ্ট নষ্ট হয়ে যাবে। এসব বিচার করে

গুলী করবেন।'

বাঙ্গালী মিলিটারিদের উপরে এদের বক্তৃতার কিছু প্রভাব পড়ল। কিন্তু পাঞ্জাবী শিখ সৈন্যরা গোঁফে চাড়া দিতে লাগল।

সেদিন মিটিংয়ে কোনো বিপদই ঘটল না। দিনকয়েক পরে আবার মিটিং হলো অন্যত্র। সেই মিটিংয়ে কৃষকসাধারণের কাছে অ্যাকশনের ঘোষণা করা হলো। মিটিং থেকে বলা হলো যে, আগামী কাল থেকে সৈন্য পুলিশদের বিরুদ্ধে কৃষকসমিতির অ্যাকশন শুরু হবে।

তখন ডি. এম., এস. পি., এস. ডি. ও. সবাই ছিলেন সুন্দরবনে। পুলিশ-মিলিটারির প্রধান ক্যাম্পে সৈন্যরা জিজ্ঞাসা করেছিল যে, চাষীরা যা বলল ঠিক কিনা। এস. পি., এস. ডি. ও. স্বীকার করেছিলেন সত্যি ব'লে। এই কথা মিলিটারিদের মধ্যে দ্রুত চাউর হয়ে যাওয়াতে সুন্দরবনের সর্বত্র মিলিটারিরা নিরস্ত্র লোকেদের উপর গুলী চালাতে অস্বীকার করতে লাগল। সমস্ত সুন্দরবন ও কাকদ্বীপ এলাকায় ছড়ানো বারশ' মিলিটারি মহিম ঘোষের কাছারির ক্যাম্পে চলে এলো। বিপিন দাসের কাছারির ক্যাম্পের তিন হাজার বিঘে মাঠে সব জমে গেল।

গণপতি লক্ষ্মীকে আজও ভুলতে পারে নি। চারদিকের এই বিপদ, এই দুশ্চিন্তা এবং মারামারির মধ্যেও যখনই একটু অবসর পায় তখনই লক্ষ্মী জেগে ওঠে ওর মনে।

তমলুকের চড়ায়, কিংবা চন্দনপিঁড়ির নদীর ধারের বনের মধ্যে কিংবা সুন্দরীকা দোয়ানিয়ায়, হাতানিয়া দোয়ানিয়ায়, চাতলা দোয়ানিয়ায় রাত দুপুরে যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকে, বন্ধুরা যখন ঘুমিয়ে নেয় আর ও জেগে পাহারা দেয় তখন মনে পড়ে লক্ষ্মীকে। এ অঞ্চলের প্রায় সব অত্যাচারী জোতদার আর নায়েবকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মহিম ঘোষকে এখনও তার পাওনা মিটিয়ে দেওয়া হয় নি। এদিকে মিলিটারি আর পুলিশের নজর এড়িয়ে সুন্দরবনে চলাফেরা করাও মুশকিল হয়ে গেছে। গণপতি ঠিক করল, যত বিপদের ভয়ই থাক, আগে মহিমের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে। আর মহিম ঘোষের কাছারিই হচ্ছে প্রধান ঘাঁটি, সেই ঘাঁটিও অন্ধকার রাতে ভাঙ্গতে হবে।

পাঁচজনের একটা দল নিয়ে এক সন্ধেয় মহিম ঘোষের কাছারিতে হানা

দিল গণপতি। সঙ্গে বন্দুক, স্টেনগান আর বোমাও নিয়ে গেল। এই প্রথম কোনো কাছারিতে হানা দেবার সময় আগ্নেয়-অস্ত্র কাজে লাগাবার জন্যে তৈরি হলো ওরা।

মহিম ঘোষ তিন জমিদারের নায়েব। সে হাজরা জমিদারদের নায়েব, বিপিন দাসের নায়েব, অটলবিহারী দাসের নায়েব। মহিম নিজে থাকে সাধারণতঃ হাজরাদের কাছারিতে। সেখানে সে অনেক লাঠিয়াল আর গুণ্ডা রেখেছে। বিপিন দাসের কাছারিতে তো মিলিটারি আর পুলিশের যেন ক্যাম্প হয়েছে।

হাজরা জমিদারদের কাছারিতে তখন পঞ্চাশ জন মুসলমান লাঠিয়াল আর ভাড়াটে গুণ্ডা ছিল জনা দশেক। জনা পাঁচেক গেরিলা নিয়ে গণপতি কাছারিটা ঘিরে ফেলল। তারপর গণপতি নিজে কাছারির চালে পিচকিরি দিয়ে পেট্রল ছড়িয়ে একটা মশাল জ্বালিয়ে সেই মশাল দিয়ে চালে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুন খানিক জ্বলে উঠতেই সেই আগুনের আলোয় বিপ্লবীরা দেখতে পেল চল্লিশ পঞ্চাশজন লাঠিয়াল গুড়ি মেরে মেরে আগিয়ে আসছে। হঠাৎ লাঠিয়ালরা গেরিলাদের আক্রমণ করতে ছুটে এলে একজন গেরিলা স্টেনগান চালাল। তাতে তিনজন লাঠিয়াল মরল। কিছু লাঠিয়াল আহত হলো। তারপর গেরিলারা বোমা চার্জ করতে করতে ছুটে চলে এলো।

মহিম হাজরাদের কাছারি থেকে চলে এসে এরপর থেকে বিপিন দাসের কাছারিতেই থাকতে লাগল।

গেরিলারা এরপর বিপিন দাসের কাছারির স্পেশাল ক্যাম্প জ্বালাবার পরিকল্পনা করল। তিনজন যাবে কাছারি জ্বালাতে। যখন আগুন ধরে যাবে তখন তিনটে বড় বোমে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে, যাতে পুলিশ বা মিলিটারি ওদের পিছু ধাওয়া না করতে পারে। যে তিনজন আগুন লাগাতে যাবে তাদের রক্ষা করবার জন্যে তাদের পেছনে আটটা স্টেনগান নিয়ে আটজন যাবে, তারা দূরে দূরে গোল হয়ে বসে থাকবে। গণপতি খানিক তফাতে হরিপুরের স্কুলের কাছে থাকবে। কাজ শেষ করে সেইখানে ফিরে আসবে এগারো জন।

তখন রাত বারোটা। জমিদারদের নিয়ে ডি. এম. তখন বিপিন দাসের

কাছারিতে মিটিং করছিলেন।

এগারো জন গেরিলা তিনটে পিতলের পাঁচসেরী বোম, আটখানা স্টেনগান নিয়ে চলে গেল। দলের নেতা হয়ে গেল সাগর জানা। হরিপুরের স্কুলের কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল গণপতি। তখন ফাল্গুনমাসের প্রথম দিক। বেশ শীত আছে। আর ধোঁয়ার মতো ঘন কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে গিয়েছে। স্যাঁতসেতে হয়ে গেছে চারদিক। একে অন্ধকার তাই জমাট-বাঁধা কুয়াশা। দশ হাত দূরের জিনিসও ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। গাছের পাতা থেকে টপ্ টপ্ করে কুয়াশার জল ঝরছে।

ওদিকে সাগররা গুড়ি মেরে মেরে পিছন দিক থেকে গিয়ে পিচকিরি দিয়ে পেট্রল ছড়িয়ে দিল কাছারির খড়ের চালে। তারপর পাটের কাঠি জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল চালে। কুয়াশায় ভিজে আছে বলে আগুন ছড়াতে দেরি হতে লাগল। কিন্তু একটু পরেই আগুন রুখে উঠল। গণপতি দেখতে পেল আগুন জ্বলে উঠল। বোম তিনটে সাজিয়ে লম্বা পলতে টেনে টেনে ওরা পিছিয়ে গেল অনেকখানি। তারপর পলতেতে দেশলাই ধরিয়ে দিল। কিন্তু কুয়াশা-ভিজে ঘাস-মাঠের উপর দিয়ে পলতে বেয়ে যেতে গিয়ে আগুন কেবলই নিভে যেতে লাগল। বারংবার জ্বালাতে হলো আগুন। কিন্তু ততক্ষণে ক্যাম্পের ভিতরে গার্ডরা সন্দেহ করেছে কিছু ঘটেছে। দ্রুতবেগে পুলিশ আর মিলিটারি কাছারি বাড়ীটাকে ঘিরে দাঁড়াল। তখনই দুটো বোম ফেটে উঠল। ভয়ঙ্কর শব্দ নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে বহুদূর অবধি ছুটে গেল। আর একটা বোমার পলতের আগুন বোধ হয় নিভে গেছে। সৈন্যেরা গুলী চালাতে লাগল। এরাও স্টেনগান চালাতে চালাতে পিছু হটে হটে সর্বসাকুল্যে মিনিট পনের পরে গণপতির কাছে ফিরে এলো। তখন চালের আগুন মিলিটারিরা নিভিয়ে ফেলতে লেগে গিয়েছে। গণপতিরা বারো জন ছুটতে ছুটতে নদীর ধারের ঘন বনের ভিতরের আস্তানায় ঢুকে পড়ল। সেখানে বিদ্যুৎও ছিল।

এই ঘটনা চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। বহু জায়গায় চাষীরা আবার কাছারি পুড়িয়ে দিতে লাগল। স্পেশাল ক্যাম্পে গেরিলারা হানা দিয়েছে, বোমা ফাটিয়েছে, স্টেনগান চালিয়েছে, এই ঘটনা দারুণ প্রেরণা আর সাহস নিয়ে এলো সমস্ত সুন্দরবনের চাষীদের মধ্যে।

কিন্তু আবার মিলিটারিদের পাঠিয়ে দেওয়া হতে লাগল বিভিন্ন কাছারিতে। গণপতিরা খবর পেল নামখানা, মথুরাপুর এলাকাতেও আন্দোলন ছড়িয়ে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় চাষীরা একশটা ক্যাম্প জ্বালিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় একশ'জন আহত হয়েছে, পঁচিশ জন মারা গিয়েছে। চারদিকে পাইকারী হারে গ্রেপ্তার চলতে লাগল।

ডি. এম. দেড় হাজার লোককে গ্রেপ্তার করলেন। গণপতি খবর পেল, মোহিনীও ছেলেমেয়ে নিয়ে জেলে গিয়েছে। তার ভাই আর ভাইদের বৌদেরও এ্যারেস্ট করা হয়েছে। কিন্তু ক্যাম্পে কাজ করতে আর কোনো চাষী রাজী হয় না। সৈন্য পুলিশদের ব্যবহারের পুকুরের জলে কৃষকরা বিষ মিশিয়ে রাখে। খাবার জলের রিজার্ভ ট্যাঙ্কের জলে বিষ মিশিয়ে রেখে দেয় গোপনে। মাছ তরকারি ইত্যাদি কোনো চাষী ক্যাম্পে বেচতে যায় না। কেউ মজুরের কাজ করতে চায় না ক্যাম্পে। তখন প্রতিদিন কলকাতা থেকে ছুটি করে লঞ্চ খাদ্য আর জল নিয়ে আসতে লাগল ঘুঘুডাঙ্গা ক্যাম্পে। তাই আবার বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সৈন্য এবং পুলিশ-বাহিনী নানান অসুবিধায় ভুগতে লাগল। অধিকাংশ জমিদার জোতদার নায়েব সুন্দরবন ছেড়ে পালালো। ডি. এম. ঘুঘুডাঙ্গার মেন-ক্যাম্পে চলে গেলেন।

একদিন সকাল বেলা এস. ডি. ও. একদল উড়িয়া পুলিশ নিয়ে কাজলীর বাঁধের উপর দিয়ে মার্চ করে যাচ্ছিল। তারা যাচ্ছিল বিভিন্ন জোতদারদের সাহস এবং আশ্বাস দেবার জন্য। জঙ্গলের ভিতরে বিদ্রোহীরা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। বেলা দশটার সময় দুজন পুলিশকে সেই বাঁধের উপব দিয়েই ফিরে আসতে দেখা গেল। গণপতি রিভলভার বাগিয়ে ধরল। তার ইঙ্গিতে জঙ্গলের ভিতরে থেকেই স্টেনগান চলল পুলিশ দুটোকে লক্ষ্য করে। মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুটে গেল। কিন্তু পুলিশদের না লেগে বাঁধের গায়ে লাগল। পুলিশদের গায়ে একশ আটটার একটিও গুলী লাগল না। স্টেনগানে একসঙ্গে একশ আটটা গুলী ফায়ার করা যায়। কিন্তু ট্রেনিং ভালো ছিল না ব'লে লক্ষ্য কারও ভালো ছিল না। স্টেন্‌গানের ফট্‌ ফট্‌ শব্দ হতেই পুলিশ-দুটো বাঁধের ওধারের নীচে নেমে গেল।

তখন গেরিলারা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দিয়ে অনেকদূর গিয়ে আর একটা জঙ্গলে লুকিয়ে থাকল। খানিকক্ষণ পরে অনেক পুলিশ আর মিলিটারি এসে যে জায়গা থেকে গুলী ছোড়া হয়েছিল সেই জায়গাতে গুলী চালিয়ে তছনছ করে একেবারে চষে ফেলল। যে বনটা থেকে গণপতিরা গুলী ছুড়েছিল সে বনটা প্রায় এক মাইল লম্বা এক রশি (আশি হাত) মতো চওড়া। সেই বনটাতে মিলিটারি আর পুলিশ মিলে আগুন ধরিয়ে দিল। দাউ দাউ করে কাঁচা ডালপাতা আর শুকনো লতাপাতা পুড়িয়ে বন জ্বলতে লাগল। ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার করে লকলকে শিখা তুলে বন পুড়তে লাগল।

তারপর গাঁ থেকে চাষীদের জোর করে ধরে এনে চন্দনপিঁড়ির নদীর ধারের জঙ্গলগুলো কাটাতে লাগল মিলিটারিরা। কোথাও বনে আগুন দিতে লাগল, কোথাও চাষীদের দিয়ে জোর করিয়ে বন হাসিল করাতে লাগল। কুড়ুলের শব্দে আর হু হু গর্জনে আকাশ বাতাস ভরে উঠল। শিউরে উঠতে লাগল মাঠ, দিক্‌রেখা।

ধীরে দিন শেষ হয়ে বিকেল হলো। তখনও চাষীদের বন কাটাতে লাগল মিলিটারিরা। কেউ কাজে গা'ফিলতি করলে নিষ্ঠুরভাবে পিটতে লাগল তাকে মিলিটারিরা। এমনি করে সূর্য ডুবে গিয়ে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

চন্দনপিঁড়ির নদীর ধারে বনের ভিতরে তখন অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় স্টেনগান বন্দুক বোমা ইত্যাদি নিয়ে পনের জন গেরিলা বসে ছিল। রাত্রির অপেক্ষা করছিল ওরা।

বিদ্যুৎ এই কদিনের দারুণ অনিয়মে কৃশ এবং দুর্বল হয়ে গেছে। চুলে তেল-চিরুনি না পড়াতে আগুনের মতো লেলিহান হয়ে পড়েছে বড়ো বড়ো রুক্ষ চুল। মুখ দাড়ি-গোঁফে ভর্তি, জামা-কাপড়ে ময়লা চিট পড়ে গেছে। পায়ের স্যাণ্ডেল ছিঁড়ে যাওয়াতে ফেলে দিয়েছিল। এখন সে খালি পায়েই থাকে। চোখের নীচে কালি পড়েছে। সন্ধে উতরে গেলে কয়েকজন চলে গেল, যারা পুলিশ আর মিলিটারিদের কাছে খুব বেশি পরিচিত নয়। রইল গণপতি, অর্জুন, রেণুপদ।

হঠাৎ বিদ্যুৎ বলে উঠল, 'গণপতি, চলো আমরা পালিয়ে যাই। চলো

অর্জুন, রেণুপদ, আমরা সুন্দরবন ছেড়ে পালিয়ে যাই চলো।'

গণপতি চমকে গেল যেন, বলল 'কি বলছ বিদ্যুৎ? তুমি এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। তুমি কমিউনিস্ট পার্টির লোক, এখন তুমি পালাবার কথা বলছ?'

বিদ্যুৎ বলে উঠল, 'কমিউনিস্ট পার্টি! পার্টির যদি এই নিয়ম হয় যে, চাষীদের বিপদে ফেলে কেটে পড়বে, সংগ্রামে নামিয়ে দিয়ে আর কোনো খোঁজ নেবে না, সাহায্য করবে না—একে তো গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া বলে—তাহলে তেমন পার্টির বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করব।'

অর্জুন বলল, 'কি বলছ তুমি বিদ্যুৎ?'

'হ্যাঁ ঠিকই বলছি। আজ ছ'মাস পার্টির কোনো খবর নেই। মধু, হীবক পালিয়েছে, তারা আর আসছে না। পার্টি আমাকে পাঠালো আর কোনো খবর নেই, কোনো নির্দেশ নেই, আমাদের কার্তুজ ফুরিয়ে এসেছে। কি দিয়ে লড়ব আমরা? এদিকে হাজার হাজার কৃষক মেয়ে পুরুষ ছেলে বুড়ো সব এ্যারেস্ট হয়ে যাচ্ছে, আমরা কেমন করে লড়ব? আমি বুঝতে পারছি, আমাদের মরতেই হবে। চলো পালিয়ে যাই, গণপতি।'

গণপতি বলল, 'কে কি দোষ করেছে সে ভাববার, বিচার করবার সময় এখন আমাদের নাই। হারি জিতি আমাদের শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে। আমি পালাতে পারব না। তার থেকে মরা অনেক ভালো।'

বিদ্যুৎ বলল, 'গণপতি, তুমি কেমন করে লড়বে বলো? মানুষ নিয়ে তো লড়বে, তা যে অত্যাচার আর ধর-পাকোড় হচ্ছে তাতে সবাইকে তো জেলে পুরে ছাড়বে গভর্ণমেণ্ট। কমিউনিস্ট পার্টি কোনো সাহায্যই পাঠাচ্ছে না। নেতারা সব জেলে। আর যে চারশ' পাঁচশ' জন গেরিলা ছিল, তাদেরও অনেকে ধরা পড়ে গেছে। অনেকে সব কোথায় কোথায় যে পালিয়েছে! ছড়িয়ে ছিটিয়ে হারিয়ে গেছে। এই অবস্থায় আর কিছু করা যাবে না গণপতি। আর আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমার শরীর খুব খারাপ। আমি আর পারছি না এমনি করে বনে-বাদাড়ে ঘুরতে।'

গণপতি বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে তুমি চলে যাও। তুমি বড়োলোকের শিক্ষিত ছেলে, তুমি যাও। আমি যাব না, আমরা যাব না। এ সুন্দরবন আমার মা। মাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব! আর যে বন্দুক একবার

পেয়েছি তাকে ছেড়ে দিয়ে তো যেতে পারব না বিদ্যুৎ। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি লড়ে দেখব। আমরা চেষ্টা করব এই মুভমেণ্টকে সাগর আর ক্যানিংয়ের দিকে জাগিয়ে তুলতে। সে সব জায়গায় বিদ্রোহ ধুঁইয়ে উঠেছে। আমরা জ্বালিবে তুলব।'

বিদ্যুৎ বলল, 'তাহলে আমাকে পাঠিয়ে দাও। আমি আর বিশ্বাস করতে পারছিনা। আর আমার কোনো আশা ভরসা নেই।'

গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কবে যেতে চাও?'

'আজকে, এখুনি, এই রাত্রেই আমি চলে যেতে চাই। আমি এখানে আর এক মিনিটও থাকতে চাইনা। আমাদের মুভমেণ্ট ধ্বংস হয়ে গেছে। হেরে গেছি আমরা।'

'ঠিক আছে', বলে গণপতি অর্জুনকে পাঠালো একটা নৌকা ঠিক করে—জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা করতে।

অনেক রাত্রে বিদ্যুৎকে নৌকায় তুলে দিয়ে মাঝিদের বলে দিল কাকদ্বীপে পৌঁছে দিতে।

গণপতি বিদ্যুৎকে বলল, 'মাঝিরা বিশ্বাসী, ভাববার কারণ নেই।'

আর মাঝিদের বলে দিল, 'কোথাও এদিকে ডাঙ্গা ছোঁবে না, একেবারে কাকদ্বীপে গিয়ে নৌকা থামাবে।'

বিদ্যুৎকে নৌকায় তুলে দিয়ে সেই রাত্রেই গণপতি তার অবশিষ্ট সঙ্গীদের নিয়ে অবশিষ্ট অস্ত্রশস্ত্র, গুলী, বারুদ নিয়ে ডিঙ্গিতে করে তমলুকের চড়ায় (লুধিয়ানা দ্বীপ) পৌঁছল। তমলুকের চড়ায় সুন্দরবন। মাটিতে থকথকে কাদা, সাপ এবং নানান রকম বিষাক্ত কীট আছে জঙ্গলে। এই বনে বাঘ এবং হরিণও আছে। মার্কামারা জঙ্গী নেতারা সেখানে রইল। ১। গণপতি, ২। রেণুপদ, ৩। সাগর, ৪। অজয়, ৫। বীরচন্দ্র, ৬। অভিমন্যু, ৭। অর্জুন, ৮। নরেশ, ৯। শ্রীচরণ, ১০। কেষ্ট, ১১। নারায়ণ সাউ, ১২। ষড়ানন সাউ, ১৩। রাধানাথ সাউ বনের গাছে গাছে উঠে পড়ল। গণপতি প্রত্যেককে আগে গামছা দিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে তারপর নিজে গাছে উঠল।

নৌকার অনেক মাঝিও ছিল কৃষকসমিতির বিশ্বাসী লোক। যারা এখানে ওদের পৌঁছে দিল গণপতি তাদের বলে দিল, 'তোমরা একখানা

ছোটো ডিঙি নিয়ে এবার থেকে অনেক রাত্রে আসবে। আমাদের জন্তে ভাত আর জল নিয়ে এসো। কয়েকটা দড়ির শিকে নিয়ে এসো, জলের কলসী বা ভাতের হাঁড়ি গাছে টাঙ্গিয়ে রাখব। প্রতিদিন এসো না। চারদিকে চোখ রেখে মিলিটারি পুলিশের গতিবিধির খবর নিয়ে দু-তিন-দিন অন্তর অন্তর আসবে। আমরা এইখানে রইলাম। কাছাকাছি ডিঙ্গি ভিড়িয়ে তিনটে শিটি দেবে, ঠিক তিনটে, তাহলে আমরা বুঝব তোমরা এসেছ, শত্রুর নৌকো নয়, তখন আমরাও শিটি দোব। তখন তোমরা ভাত জল নিয়ে উঠে আসবে। আর আমাদের জন্যে একখানা ডিঙি কাল পাঠিয়ে দিও।'

তারা গণপতির নির্দেশ নিয়ে নৌকা নিয়ে চলে গেল।

পরের দিনটা সারাদিন প্রায় অভুক্ত এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে রইল ওরা। অনেক রাত্রে অরণ্যের নিস্তব্ধ অন্ধকার চিরে তিনটে শিটি বেজে উঠল। গণপতি বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে গাছ থেকে নীচে নেমে এলো। তারপর খোঁজ নিয়ে এসে গাছে উঠে উঠে অন্যদেরও বাঁধন খুলে দিল। একে একে সবাই নেমে এসে নৌকা থেকে এক হাঁড়ি ভাত আর দু'কলসী খাবার জল বয়ে নিয়ে এলো। কয়েকখানা থালাও এনেছিল ওরা। আর কুচো চিংড়ি-ভাজা। দুখানা দড়ির শিকেও এনেছিল। শুকনো পাতা কুড়িয়ে আগুন জেলে সেই আগুনের আলোতে বসে ওরা কুচো চিংড়ি দিয়ে খাওয়া সেরে নিল। বাকী ভাতে জল দিয়ে দিল। তারপর গাছের ডালে শিকে বেঁধে তাতে ভাতের হাঁড়ি আর জলের কলসী টাঙ্গিয়ে রাখল।

নৌকার লোকেদের গণপতি জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের ডিঙি কবে আনবে?'

ওরা বলল, 'ডিঙি এখনও যোগাড় করতে পারিনি। মিলিটারি, পুলিশ আর সেবাদল সকলের নৌকার দিকে চোখ রেখেছে। শীঘ্রিই ডিঙি নিয়ে আসব।'

ওরা চলে গেলে সবাই গাছে উঠে বসল। গণপতি সবাইকে বেঁধে দিয়ে নিজেকে বেঁধে বসে রইল গাছের ডালে গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে।

বনের অদ্ভুত গম্ভীর নীরবতার মধ্যে যেটুকু ঢেউ উঠেছিল মানুষের গলার শব্দে আবার তা মিলিয়ে গেল। ওরা ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। রেণুপদ বসেছিল গণপতির কাছেই।

ষেণপ্রদ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'বিড়ি আছে নাকি গণ ?'

গণপতি বলল, 'আছে দুটো। তুমি একটা নাও, আর আমি একটা ধরাই দেশলাই ফুরিয়ে এসেছে। কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি আর একটা দেশলাই আনিয়ে নিতে হবে।'

একটা কাঠি জ্বালিয়ে দুজনে দুটো বিড়ি ধরাল। বনের কালো অন্ধকারের মধ্যে বিড়ির লাল আগুনের ছটা যেন টর্চের মতো জোরালো মনে হতে লাগল।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করছে কাকে, 'এভাবে কতদিন চলবে! একটা উপায় তো কিছু করতে হবে।'

সাগর বলল, 'গণদা কি ভাবছো বলো, আমরা এরপর কি করব ?'

গণপতি বলল, 'আমিও তাই ভাবছি সাগর। আমি ডিঙি এলে কয়েকজনকে নিয়ে সাগর যাব। যদি ওখানে মুভমেণ্ট আরম্ভ করা যায় তার চেষ্টা করব। আর দেখ ভেবে, যদি আমাদের ক'জনকে বাদ দিয়ে কারও কোথাও এমন আত্মীয়স্বজন থাকে যে আশ্রয় দেবে তাহলে চলে যেতে বলব।'

একটু থেমে গণপতি আবার বলল, 'আজ ঘুমোও, না ঘুমোলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। এখন অসুখে পড়লে ভারি মুশকিল হবে।'

সবাই ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে ডালে বসে অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যেও ঘুম আসে শরীর এমনি শ্রান্ত এবং কাতর হয়ে আছে। মাঝে মাঝে কাঠ-পিঁপড়ে কামড়ে দেয়, তাই ঘুমের মধ্যেও মন যেন সজাগ থাকে। গেছো সাপেরও ভয় আছে। একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু গণপতি জেগে বসে রইল। বনের রাত্রি কি ভীষণ! ঘন জমাট-বাঁধা আলকাতরার মতো অন্ধকার। গাছের ঘন জটলার মধ্যে আছে বলে মাঝে মাঝে কপালে মুখে গায়ে ঘাম চটচট করে, কখনো কখনো নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। বনের তলায় রাত্রে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু হবার ভয় থাকে বলেই ওরা পাশাপাশি দুটি বড় ও মোটা গাছের অনেক উপরে বসেছে। ওপর দিকে তাকাল গণপতি। উপরের ডালপাতার ভিতর দিয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া আকাশ চোখে পড়ল। কয়েকটি তারা সেই আকাশের টুকরো গুলোতে ঝিকমিক করছে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভারি

একটা আরাম বোধ করল গণপতি। কিসের আরাম, কেন আরাম তা সে বুঝতে পারল না। ঘাড়ে লাগছিল বলে মাথা নিচু করল। চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু নানান অস্পষ্ট ও অদ্ভুত শব্দ কানে ভেসে আসতে লাগল। বনচর প্রাণীর শুকনো পাতার উপর দিয়ে ছপ ছপ করে হেঁটে চলার অদ্ভুত শব্দ, রাতের পাখির নানান ছেঁড়া ছেঁড়া ডাক, কোনো জন্তুর ছুটোপুটির সাড়া আর বাতাসের ধীর মন্থর রহস্যময় ভয়-করা ফিস্ ফিস্ ঝির্ ঝির্ একটানা আওয়াজ। এসব শব্দ যেন নীরব সমুদ্রের একটি ছুটি ঢেউয়ের মতো।

মনে পড়ল মোহিনীর কথা। ছেলেমেয়ের কথা। ওরা এখন জেলখানায় কি করছে কে জানে! মোহিনীকে দেখবার জন্যে সহসা যেন বড্ড ব্যাকুল হয়ে উঠল গণপতির মন। গণপতি জেনেছে, সুন্দরবনের যে সব মেয়েদের এ্যারেস্ট করা হয়েছে তাদের অধিকাংশকেই রাখা হয়েছে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। কিছু আছে ডায়মণ্ডহারবার জেলে। মোহিনীর কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে জেগে উঠল লক্ষ্মীর কথা। লক্ষ্মীকে কোনো সময়েই যেন ভোলা যায় না। মনকে সত্যি কথা বললে বলতেই হবে, মোহিনী ছেলেমেয়ে ভাই বন্ধুদের স্মৃতিকে ছাপিয়ে লক্ষ্মী ওর মনে বারংবার বড়ো যন্ত্রণা দিয়ে জেগে ওঠে। হাহাকার করে ওঠে সমস্ত প্রাণ। লক্ষ্মীর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না! মহিম ঘোষকেও ও ঠিক নাগালের মধ্যে পেল না। মহিম বড্ড চতুর লোক, সবসময়েই সে পুলিশ, লাঠিয়াল, গুণ্ডা, মিলিটারি দিয়ে নিজেকে ঘিরে রেখে দিল। কিন্তু লক্ষ্মীকে নষ্ট করে তাকে কি মেরে পুঁতে দিয়েছে? ও কি বেঁচে নেই? অত সুন্দর মেয়েকে একবার ভোগ করেই কি ছেড়ে দেবে মহিম? তাহলে লক্ষ্মী যদি বেঁচে থাকে তবে কোথায় আছে? কোন সে দেশ! কত দূরে? লক্ষ্মী সেখান থেকে গণপতির কাছে পালিয়ে এলো না কেন? ছুটো মেয়েকে নিয়ে থাকলে এখানে লোকে নিন্দে করে না। মোহিনী কষ্ট পেত? তা পেত। কিন্তু তবু এ মনের বিড়ম্বনা যে কিছুতেই ঘুচতে চায় না!

হঠাৎ, যত মেয়ে সতীত্ব হারিয়েছে, যত চাষী প্রাণ দিয়েছে এবং তার যে-সব মহাপ্রাণ সহকর্মীরা এই বনে গাছের উপরে বসে দারুণ ক্লান্তিতে যন্ত্রণার ঘুম ঘুমোচ্ছে তাদের সকলের জন্যে মন তার মোচড় দিয়ে উঠল।

গণপতির মনে হলো, তার এই বন্ধুরা, সুন্দরবনের চাষীরা, মেয়েরা ঐ মধু, ঐ বিদ্যুৎ, ওদের চেয়ে কত বড়ো মানুষ, কত বিরাট এদের আত্মত্যাগ আর দুঃখ সইবার ক্ষমতা !

গণপতি জানল না, এমনি কত কথা ভাবতে ভাবতে মধ্যরাত্রি অতিক্রম করে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নানান ধরণের অজস্র পাখির বিচিত্র কলকোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে গেল ওদের। গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে সূর্যের কিরণের ফলা এসে বনের ভিতরে আলোছায়ার রঙ্গ লাগিয়েছে। ওরা গাছ থেকে একে একে নেমে এলো। গণপতি সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ওদের দিকে তাকানো যায় না ! চোখে কালি পড়ে গেছে। খড়ের মতো শুকনো চুল উড়ছে, দাড়ি-গোঁফে ভরে গেছে মুখ। ময়লা কালকুটি কাপড়। শরীবে প্রত্যেকের নানান জায়গায় ক্ষত ঘা।

সকাল বেলায় খাবার জন্যে সবাই বসেছে, সাগর আর গণপতি ভাতের হাঁড়ি আর জলের কলসী নামাতে গিয়ে দেখল, ভাতের হাঁড়ি আর জলের কলসী মাটিতে কুচি কুচি হয়ে পড়ে আছে। শূন্য শিকে দুটো ঝুলছে। ওদের আর্ত কাতরানি শুনে সবাই চমকে তাকিয়ে দেখল ব্যাপারটা। বোধ-হয় শেয়ালে লাফিয়ে উঠে হাঁড়ি দুটো ফেলে দিয়েছে। ভাত চেটেপুটে খেয়ে গিয়েছে, খাবার জলও নেই। আবার সারাদিন উপোসের জন্যে তৈরী থাকতে হবে। আবার কবে ভাত জল নিয়ে নৌকা আসবে তার ঠিক নেই। শুকনো মুখে বসে, ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাতে লাগল ওরা।

গণপতি বলল, 'এক কাজ করো, কেওড়া ফল গাছ থেকে পাড়ো, তাই খেয়ে থাকব।'

কেওড়া ফল আর পাখিরালা জল খেল ওরা।

কালীবাণী, পেয়ারাবানী পাখিদের বিষ্ঠা খেতে নদীর যে সব কাঁকড়া ডাঙ্গায় উঠে আসে সেই কাঁকড়া পুড়িয়ে খেল সন্ধেবেলা। পাখি মেরে খাওয়া যেত। কিন্তু হাতের টিপ ওদেব ভালো ছিল না, বাজে ব্যাপারে সামান্য যা গুলী আছে খরচ করা ঠিক হবে না, তাছাড়া গুলীর শব্দ এই নির্জন নিস্তব্ধ অঞ্চলে ওদের সন্ধান শত্রুকে জানিয়ে দিতে পারে।

এমনি ভাবে কেওড়া ফল আর কাঁকড়া পুড়িয়ে খেয়ে চারদিন কাটল।

পাঁচদিনের দিন রাতের বেলা গাছের উপরে হতাশ ভাবে বসে বসে ওরা যখন নানান রকম ভাবছে তখন রাত্রির অন্ধকারকে চমকে দিয়ে তিনবার শিটি বেজে উঠল। সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠল। গণপতি তিনবার শিটি দিয়ে জবাব দিল। সবাই মিলে নেমে গিয়ে নৌকা থেকে ভাত আর জল নিয়ে এলো। প্রথমেই খেতে বসে গেল। খাওয়া শেষ হলে গণপতি নৌকার লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল। ওদিকে সাগর নরেশকে সঙ্গে নিয়ে নৌকার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নরেশ তখন মাত্র পনের বছরের কিশোর। তার বিধবা বুড়ী মাকেও তখন জেলখানায় ধরে নিয়ে গেছে। তার ছোটো ভাই কোথা আছে সে জানে না।

সাগর বলল, 'নরেশ এই তমলুকের চড়ায় আমি আর থাকতে পারব না, আমি চলে যাব। তুই যাবি আমার সঙ্গে!'

'হ্যাঁ কাকা, আমাকে তুমি নিয়ে চলো, আমি মরে যাব এখানে থাকলে।'

'গণদাকে বললে কিন্তু যেতে দেবে না, আয় আমরা নৌকার খোলের মধ্যে শুয়ে পড়ে থাকি।'

সাগর আর নরেশ নৌকায় উঠে খোলের মধ্যে শুয়ে রইল।

এদিকে গণপতি তখন নৌকার লোকেদের জিজ্ঞাসা করছিল, 'কল্যাণ, বলো, আমাদের অঞ্চলের খবর বলো।'

নৌকার মাঝি কল্যাণ আর যোগেশ সুন্দরবনের অবস্থা বর্ণনা করল।

গণপতিরা তমলুকের চড়ায় চলে আসার দিন দুই পর থেকে এক একটা করে গ্রাম পুলিশ দিয়ে ঘিরে ফেলল। গ্রামকে গ্রাম ধরে নিয়ে চলে গেল স্পেশাল ক্যাম্পে। ভাগের জমির বিঘে প্রতি দুটাকা করে আদায় করল। সেবাদলের কর্তা করে দিয়েছে জোতদারদের। সাধারণ চাষীদের অনেককে মারধোর করল, যারা অধীনতা স্বীকার করল তাদের সেবাদলে ঢুকিয়ে দিল। অর্জুন, রেণুপদ, আর গণপতিকে চিনিয়ে দেবার জন্যে পুলিশের লঞ্চে নৌকায় লোক রেখেছে। অবশ্য সেবাদলের কোনো কোনো চাষী নিজের বাড়ীতে গেরিলাদের কাউকে কাউকে লুকিয়ে রেখেছে। গেরিলারা খুব কষ্টেই লুকিয়ে থাকে। অনেকে মেদিনীপুর বা উত্তরে পালিয়েছে। অনেকে এখনও আত্মগোপন করে বেড়াচ্ছে। সাধারণ লোকেরা প্রাণপণে তাদের লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে বলেই তারা কোনো রকমে এখনও

পুলিশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছে।

বলল, 'আর একটা খবর আছে।'

গণপতি বলল, 'কি খবর?'

কল্যাণ বলল. 'লক্ষ্মী ফিরে এসেছে।'

'লক্ষ্মী! লক্ষ্মী ফিরে এসেছে? কোথায়? কেমন আছে সে?'

কল্যাণ বলে যেতে লাগল, 'সে আছে এখন মহিম ঘোষের কাছারিতে। লোকে বলাবলি করছে, তাকে নাকি মহিম কলকাতাতে কোথায় রেখেছিল, এখন গণপতি শেষ হয়ে গেছে, তাই লক্ষ্মীকে আবার নিয়ে এসেছে।'

গণপতি খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল। অদ্ভুত অজানা সব অনুভূতি ওর সমস্ত শরীরে মনে পক্ষাঘাতের মতো ছড়িয়ে পড়ল যেন। নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে গণপতি বলল, 'আমাদের জন্যে ডিঙি কবে আনবে বলো?'

যোগেশ বলল, 'যে সব কাণ্ড চলছে সুন্দরবনে, পুলিশের চোখ এড়িয়ে বার হওয়াই মুশকিল। তবে কালকে বোধহয় শম্ভু আর সুধীর ডিঙি নিয়ে আসবে।'

কল্যাণ আর যোগেশ ডিঙি নিয়ে চলে গেল। অনেক রাত হয়েছিল, ওরা গাছে উঠবার জন্যে তৈরি হচ্ছে যখন, তখন হঠাৎ খেয়াল হলো সাগর আর নরেশ নেই। ভারি মুশকিলে পড়ল গণপতি আর তার বন্ধুরা। কোথা গেল ওরা! একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছে।

বীর বলল, 'আমার মনে হয়, সাগব নরেশকে নিয়ে নৌকোতে উঠে চলে গেছে। ও আমাকে কাল বলছিল, আমি আর থাকতে পাবব না!'

গণপতি বলল, 'আমাদের বলে যাওয়া উচিত ছিল।'

কাউকে গালাগালি করবার মতো কিংবা কারও বিচার করবার মতো মনের অবস্থা ছিল না গণপতির। সবাইকে গাছের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে নিজেকে বেঁধে নিয়ে ও বসে পড়ল। কিন্তু ওর সমস্ত অনুভূতি জুড়ে লক্ষ্মীর স্মৃতি দপ্‌ দপ্‌ করতে লাগল। কত কি মনে হতে লাগল গণপতির। লক্ষ্মী যদি কলকাতাতে ছিল, কেন সে চলে আসতে পারে নি! তার তো হাত পা বাঁধা ছিল না। কিংবা কে জানে হয়তো তাকে পাহারা দিয়ে রেখে দিয়েছিল। লক্ষ্মীকে একবার দেখতেই হবে। যত বিপদই থাক,

তবু সে যাবে লক্ষ্মীকে দেখতে। ওকে না দেখে কেমন করে থাকবে সে! যদি ওকে সারাজীবন জেলে থাকতে হয়, যদি ফাঁসিতে যেতে হয়, হয়তো এ জীবনে লক্ষ্মীকে আর কখনও দেখতে পাবে না! লক্ষ্মীকে দেখতেই হবে একবার।

পরদিন সকালবেলা গাছ থেকে নেমে এলো সবাই। সূর্য উঠছে। আলো এসে পড়েছে বনের ভিতরে। গণপতি বলল, 'আমরা সবাই বসে একটা আলোচনা সেরে নিই এসো।'

নারায়ণ বলল, 'কি আলোচনা?'

রেণুপদ বলল, 'আমরা এখন কি করব কি না-করব, এই ভাবে তমলুকের চড়ায় আর বেশি দিন থাকা যাবে না। যারা নৌকো নিয়ে আসছে তাদের গতিবিধির ওপর আই. বি.রা নজর রেখেছে। হয়তো ওরা আর আসতে পারবে না, হয়তো আমরা একসঙ্গে সবাই ধরা পড়ে যাব।'

সবাই গোল হয়ে বসল।

অভিমন্যু বলল, 'গণদা, আগে তুমি বলো, তুমি কি করতে চাও?'

গণপতি বলল, 'আমি ঠিক করেছি, আমি কয়েকজনকে নিয়ে সাগর যাব। সেখানে মুভমেণ্ট তৈরি করবার চেষ্টা করব। আমার মনে হয়, আন্দোলনটা বড্ড ছোটো জায়গাতে হয়েছে বলে পুলিশ মিলিটারি এত সহজে আমাদের কাবু করে ফেললে। তাই আন্দোলনটাকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে।'

নারায়ণ বলল, 'এখনও তুমি আশা রাখো, আমরা লড়তে পারব?'

গণপতি বলল, 'হ্যাঁ, আমি আশা রাখি।'

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে কাকে তুমি সঙ্গে নিতে চাও?'

গণপতি বলল, 'কে কে আমার সঙ্গে যেতে চায় বলো?'

ওরা প্রত্যেকেই বলল, 'আমি যাবো, আমি যাবো।'

তাই ঠিক হলো যে, সবাই যাবে সাগর দ্বীপে।

সেদিন রাত্রে ডিঙ্গি নিয়ে এল সুধীর আর শম্ভু। ওরা সবাই সেই নৌকাতে উঠে বসল।

গণপতি বলল, 'নৌকাতে জাল টাঙ্গিয়ে দাও, যাতে মনে হয় জেলে ডিঙি। চারজন পালা করে দাঁড় টানবে, আটজন স্টেনগান নিয়ে থাকবে।

স্টেনগান নিয়ে কম্বল গুটিয়ে শুয়ে থাকবে। পুলিশের লঞ্চটঞ্চ সামনে পড়ে গেলে লঞ্চের বুকের সোজা মাস্তুল ধরে থাকবে। লঞ্চের গা ঘেঁসে চলে যাবে। যদি লঞ্চ থেকে পুলিশ নেমে সার্চ করতে চায় নৌকো, আমার বাঁশি দেবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেনগান চালাবে। সার্চ না করলে ঠেলে বেরিয়ে যাবে নৌকো নিয়ে।'

বকখালি দিয়ে কাকদ্বীপে পৌঁছে লঞ্চের সামনে পড়ল নৌকা।

গণপতি বলল, 'ফিস্ ফিস্ করো না কেউ। ফিস্ ফিস্ করে লাভ নেই।'

লঞ্চের পাশ কাটিয়ে নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেল নৌকা।

সাগর দ্বীপের ধবলাটে গিয়ে হাসরাগাঙে তেরশ'বিঘে জমিতে গিয়ে উঠল ওরা। ওখানেও কিছু কিছু আন্দোলন তৈরি হয়েছিল। ওরা নিজেদের ছদ্মনাম ঠিক করে নিল। রিপোর্ট শুনল চাষীদের কাছে যে, সাগর থেকেও জমিদার জোতদাররা সব পালিয়েছে। সাগর দ্বীপের অপরিণত কৃষক-সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে দেখা করে গণপতি নিজের পরিচয় দিল। বলল, 'সুন্দরবনের চাষীদের বাঁচাতে হলে এখানেও জোরালো মুভমেণ্ট করা দরকার।'

সাগরদ্বীপের কৃষকনেতারা রাজী হলো। একটা মিটিং ডাকা হলো। তাতে অনেক লোক মিলিত হলো। গণপতি সুন্দরবনের অবস্থা বর্ণনা করল। তারপর বলল, 'ধান সব গাদা হয়ে পড়ে আছে। জমিদার, জোতদাররা পালিয়েছে। তা তোমরাও তেভাগা দাবি কর। জমিদার যদি ভাগ না নিতে আসে ভূমিহীন গরীব চাষীদের মধ্যে ধান বিলিয়ে দাও। তারা বাঁচুক।'

সাগরে নতুন করে কৃষকসমিতি তৈরি করা হলো। যে সব দালাল কৃষকসমিতিতে থেকে জমিদারদের কাছ থেকে টাকা লুটবার ফন্দি করছিল সাগরে, তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

একটা ঘরোয়া মিটিংয়ে সাগরের চাষীরা বলল, 'আমরা কি নিজেরা আন্দোলন চালাতে পারব?'

গণপতি বলল, 'লেখাপড়া না শিখলেও আন্দোলন করা যায়, কেননা চাষীরা লড়তে জানে। মধ্যবিত্তরা হাজার লেখাপড়া শিখলেও দোদুল্যমান।

জুলুম এলে কি তারা সহ্য করতে পারবে ?'

একজন চাষী বলল, 'তাহলে বুদ্ধি পরামর্শ দেবার জন্যে একজন লেখাপড়া জানা লোক না হলে চলবে কি ?'

গণপতি বলল, 'আপনারা নেতৃত্ব না দিতে পারলে চলবে না। লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকরা পারবে না। ওরা লেখাপড়া শিখেও মূর্খ। কৃষক মজুর ছাড়া নেতা হতে পারে না। আপনাদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে সাহস করে নেতৃত্ব দিয়ে কাজ করতে পারবেন ?'

পঞ্চাশজন চাষী বলল, 'আপনি বুদ্ধি যোগান, আমরা কাজ করব।'

গণপতি বলল, 'আমরা এখানে পাঁচজনকে রেখে যাব। শ্রীচরণ, কেষ্ট, নারায়ণ, ষড়ানন, রাধানাথ এখানে থাকবে। ওদের সাহায্যে আপনারা কাজ করতে পারবেন।'

সাগরদ্বীপে কুড়ি পঁচিশটা সংগঠন তৈরি ক'রে গণপতি, রেণুপদ, অজয়, বীরচন্দ্র, অভিমন্যু, অর্জুন আর দুই মাঝি সুধীর ও শম্ভু আবার সাগর থেকে বকখালিতে ফিরে এলো। নৌকাতে গণপতি আর অর্জুন থাকল, আর সবাই বকখালিতে মাটিতে নেমে চলে গেল। কথা থাকল, তিনদিন অন্তর অন্তর ফ্রেজারগঞ্জের কাছে এই বকখালিতে এসে ওরা রসদ জল দিয়ে যাবে।

তিনদিন পরে বীরচন্দ্র এলো চিঁড়ে মুড়ি আর জল নিয়ে বকখালিতে।

বীরচন্দ্র বলল, 'সাগর ধরা পড়ে নি। কিন্তু নরেশ ধরা পড়ে গেছে, তাকে পুলিশ অকথ্য পিটেছে। চন্দনপিঁড়ির ইন্দ্রকে জেলখানাতে দারুণ অত্যাচার চালিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, বাড়ী ফেরার পরদিনই সে মারা গেছে। শিববামপুরের সুরেন দাসকে ডায়মণ্ডহারবার জেলে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। নরেশের বুড়ী মাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে জুতো দিয়ে পিষেছে, নরেশের ছোটো ভাইকে অকথ্য মারধোর করেছে। চিনিবাসের (শ্রীনিবাস) হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে পুলিশ। গণপতির ভাগের জমি হরেন্দ্র সব কেড়ে নিয়েছে। গেরিলাদের জমি জোতদাররা কোর্টের রায়ের জোরে ক্রোক করে নিয়েছে। রেণুপদ, অভিমন্যু, অজয় এ্যারেস্ট হয়ে গেছে।'

গণপতি বলল, 'বীর, তুই আজকেই আমার জন্যে একটা শাড়ী, একটা ব্লাউজ, আর কয়েক গাছা গিল্টির চুড়ি যোগাড় করে দিয়ে যা। হয়তো তুইও আর আসতে পারবি না, আমাকেই মেয়ে সেজে রসদ যোগাড় করতে

যেতে হবে। একদিন তো মিলিটারি যাবে তখন আবার মুভমেণ্ট করব।'

সেদিন অনেক কষ্টে শাড়ী, ব্লাউজ আর কয়েকগাছা গিল্টির চুড়ি যোগাড় করে নিয়ে এলো বীরচন্দ্র। বীরচন্দ্র বলল, 'পুলিশ, মিলিটারি, সেবাদলের লোকেরা আবার মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করছে।'

গণপতি বলল, 'বীর, তোমরা মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে চেষ্টা কর। কোনোরকমে কোনো পুলিশ বা মিলিটারি বা সেবাদলের লোককে আলাদা ভাবে পেলেই কোপ দেবে।'

বীর চলে গেল। গণপতি আর অর্জুন ডিঙি নিয়ে কখনো বালুচর, কখনো নারকেল-ভাঙ্গা, কখনো তমলুকের চর, কখনো রিজার্ভ ফরেস্টে ঘুরে বেড়াতে লাগল। খাদ্য ও জল ফুরিয়ে এলো। ওদিকে সুন্দরবনের মানুষদের জন্যে দুজনেরই বুকে বড় যন্ত্রণা। আর গণপতি একবার দেখতে চায় লক্ষ্মীকে।

গণপতি আর অর্জুন একদিন সকালবেলা রসদ সংগ্রহ করবার জন্যে ফ্রেজারগঞ্জে নৌকা থামালো। নৌকায় অর্জুনকে রেখে গণপতি মাটিতে নামল। বালির চড়া পেরিয়ে ফ্রেজারগঞ্জের নারকেল-বাগানে উঠতেই প্রশান্ত হাইতের সঙ্গে মুখোমুখি পড়ে গেল গণপতি।

প্রশান্ত গণপতির খুবই পরিচিত। প্রশান্ত ফ্রেজারগঞ্জ পোস্টঅফিসের পোস্ট-মাষ্টার।

প্রশান্ত আঁতকে উঠল, 'কে গণপতি না!'

গণপতি বলল, 'হ্যাঁ, আমি।'

'কি ব্যাপার, তুমি এখানে? এদিকে ডি. এম. অর্ডার দিয়েছে, তোমাকে দেখতে পেলেই যেন গুলী করে তোমার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেওয়া হয়: যে বা যারা তোমাকে ধরে দিতে পারবে তাদের পাঁচ হাজার টাকা আর একটা করে বন্দুক উপহার দেবে গভর্ণমেণ্ট।'

গণপতি বলল, 'তা তুমিও কি টাকা আর বন্দুক পেতে চাও নাকি?'

'ছি, ছি, কি যে বলো তুমি!'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গণপতিকে দেখে প্রশান্ত বলল, 'তা এখানে কি জন্যে, কোনো দরকার আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, কিছু চিঁড়ে মুড়ি বা খাবার আর জল চাই।'

'চলো আমার বাড়ীতে।'

'চলো, কিন্তু তোমার বাড়ীতে কোনো বিপদ হবে না তো?'

'আরে না, না, এখানে পুলিশ টুলিশ কিছু নাই।'

প্রশান্তর বাড়ীতে দাড়ি-গোঁফটা কামিয়ে নিল গণপতি। প্রশান্তর বাড়ী থেকে চাল, মুড়ি, দেশলাই আর জল নিল গণপতি। তখনও গণপতির কাছে কিছু টাকা ছিল, প্রশান্তকে টাকা দিতে গেল।

প্রশান্ত জিব কেটে, ছি ছি করে উঠল, উপদেশ দিল, 'একটু সাবধানে থাকবে আর এদিকে এলে আমার কাছে আসতে কোনো সঙ্কোচ কোরো না। এদিকে পুলিশ মিলিটারি বিশেষ আসে না। কোনো ভয় নাই।'

গণপতি খাদ্য আর জল নিয়ে নৌকায় ফিরে এলো। নৌকায় সেই সব খাবার আর জল নামিয়ে গণপতি ধুতি ছেড়ে শাড়ী আর ব্লাউজ পরল, হাতে চুড়ি পরল। দিয়ে অর্জুনকে বলল, 'অর্জুন তুমি এখানে এই বনের আড়ালে অপেক্ষা কোরো, আমি একবার লয়ালগঞ্জ থেকে ঘুরে আসব।'

তখন বেলা দশটা বাজে। সেই চাষী-মেয়ের বেশে গণপতি মাঠের পথ ধরে লয়ালগঞ্জের দিকে হেঁটে চলল। লয়ালগঞ্জের কাছাকাছি আসতেই ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল, জায়গায় জায়গায় মিলিটারি পুলিশ দলবেঁধে পাহারা দিচ্ছে। হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠল স্পেশাল ক্যাম্পে। অমনি দেখল, মিলিটারিরা মার্চ করে ক্যাম্পের দিকে যাচ্ছে। গণপতি দেখল, মিলিটারিরা মার্চ করে ওর কাছেই যেন আসছে। যদি চিনে ফেলে, যদি মেয়ে মনে করেই ওকে ধরতে গিয়ে ওকে চিনে ফেলে! গণপতি তাড়াতাড়ি উবুড় হয়ে মাঠে বসে পড়ল। এমন ছল করল যেন ও চূড়াধান কুড়োচ্ছে। ওর কাছ দিয়ে মার্চ করে যেতে যেতে মিলিটারিরা অশ্লীল ভাষায় খিস্তি করতে লাগল, 'খানকী মাগী, ঢঙ দেখো। আর কত ঘোমটা দিয়েছে দেখো।'

মিলিটারির সেই লাইন যেন শেষ হতেই চায় না। কালঘাম ছুটতে লাগল গণপতির। প্রায় দশ মিনিট পরে তবে ওকে পেরিয়ে গেল মিলিটারির দল।

লয়ালগঞ্জে ঢুকে দেখল, পথে পথে পুলিশ আর মিলিটারি যখন তখন টহল দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গণপতি জানাশোনা একজন চাষীর বাড়ীতে

ঢুকে পড়ল। গণপতিকে দেখে চমকে উঠল বাড়ীর লোক।

গণপতি বলল, 'আগে একটু জল দাও।'

তারা জল দিলে জল খেয়ে গণপতি সমস্ত অঞ্চলের খোঁজখবর নিতে লাগল। তখন সে বাড়ীর গিন্নী বলল, 'লক্ষ্মী ফিরে এসেছে।'

গণপতি বলল, 'লক্ষ্মীকে একবার এখানে নিয়ে আসতে পার? একবার দেখব।'

গিন্নী বলল, 'লক্ষ্মী আসে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী। দাঁড়াও বুড়ীকে পাঠাই একবার।' বলে তার বুড়ী শাশুড়ীকে বলল, 'লক্ষ্মীকে নেমন্তন্ন করে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। বলবে, আজকে আমাদের বাড়ীতে লক্ষ্মী পুজো, তাই নেমন্তন্ন।'

বুড়ী বেরিয়ে গেল। গণপতি কম্পিত বুকে অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে বসে রইল। সময় যেন কাটে না!

ঘন্টাখানেক পরে লক্ষ্মী বুড়ীর সঙ্গে এসে ঘরে ঢুকল। গণপতি ঘোমটা দিয়েই বসেছিল। বুড়ী গণপতিকে দেখিয়ে লক্ষ্মীকে বলল. 'চিনতে পারিস না তো? চিনে নে, ভাব কর।' বলে বুড়ী বেরিয়ে গেল।

গণপতির সঙ্গে লক্ষ্মীর আগেক র প্রেমের কথা অনেকেই জানত। তবে ওরা যে বিশালাক্ষ্মীকে সাক্ষী রেখে স্বামী-স্ত্রী হয়েছিল, একথা শ্রীচরণই শুধু জানে।

গণপতি ঘোমটার আড়াল থেকে খানিকক্ষণ লক্ষ্মীর মুখের দিকে মুগ্ধ খুশিতে তাকিয়ে রইল।

লক্ষ্মী বলল, 'তোমাকে তো চিনতে পারছি না গো।'

গণপতি বলল, 'আমাকে তুমি চিনলে না লক্ষ্মী!'

লক্ষ্মী ছুটে গিয়ে গণপতির বুকে হাত রেখে বলল, 'তুমি! তুমি তুমি!! হায় রে, তোমাকে দেখবার জন্যে আমি যে কতদিন ধরে বসে আছি!'

লক্ষ্মীর ভাষা এখন অনেক পালটে গেছে। দীর্ঘ দিন কোথায় ও ছিল কে জানে! ওর কথা, চেহারা, ভঙ্গী কেমন সুন্দর কিন্তু করুণ হয়ে উঠেছে যেন। তীব্র আবেগে লক্ষ্মীর চোখ ফেটে জল ঝরে পড়ে ওর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

গণপতি বলল, 'লক্ষ্মী! তোমাকে একবার দেখবার জন্যে আমার মন

হাহাকার করছিল। এত বিপদ মাথায় নিয়ে আমি তোমাকে একবার দেখবার জন্যে না এসে পারলাম না।'

লক্ষ্মী বলল, 'কেন এলে? আমার মতো হতভাগীর মুখ কেন দেখতে এলে তুমি? এ পোড়ামুখ আমি কেমন করে তোমাকে দেখাব!'

'হয়তো আর কখনো দেখা হবে না! ধরা পড়ে গেলে আমাকে ফাঁসিতে লটকে দেবে কংগ্রেস সরকার। যদি জীবনে আর কখনো তোমাকে দেখতে না পাই, তাই, তাই না এসে পারলাম না বৌ!'

'বৌ! তুমি আমাদে বৌ বললে!' খুশিতে জ্বলজ্বলিয়ে উঠল লক্ষ্মীর সুন্দর চোখ।

গণপতি বলল, 'লক্ষ্মী, তুমি কোথায় ছিলে, কি হয়েছিল আমাকে বলো। আমি সমস্ত সুন্দরবন, আশেপাশের শহর-গাঁ সব জায়গাতে তোমাকে খুঁজেছি। আমি তোমার জন্যে কত বছর ঘুমোই নি, কতদিন পাগলের মতো কেটেছে আমার! এই যে আজ আমাকে ধরার জন্যে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে সরকার, সেও তোমারই জন্যে। তোমাকে হারানোর পব আমি ভগবানেও বিশ্বাস হারিয়েছি আর জমিদারী শোষণ আর অত্যাচারের শোধ নিতে চেয়েছি। আমার আপসোস থেকে গেল, মহিমকে আমি হত্যা করতে পারলাম না।'

লক্ষ্মী বলল, 'কি হবে জেনে!'

'তবু বলো, বলো কেন এলে না আমার কাছে! তুমি কি জানতে না তোমার জন্যে তুনিয়া খালি হয়ে গিয়েছিল আমার চোখে!'

লক্ষ্মী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর বলল, 'তোমাকে বলব বলে কতদিন ধরে বসে আছি, তবু বলতে গিয়ে কে যেন গলা টিপে ধরছে।'

'বলো লক্ষ্মী, আমাকে বলো!'

লক্ষ্মী ভারি গলায় বলতে লাগল, 'সেদিন রাতে আমাকে মুখে কাপড় দিয়ে মহিম ঘোষের লেঠেলরা ওর কাছারিতে ধরে নিয়ে গেল। আমাকে মহিম ঘোষের কাছারির খাস কামরার মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ওরা বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ভেতরে একটা হারিকেন জ্বলছিল। সেই আলোতে আমি দেখলাম মহিম ঘোষ একটা চেয়ারে বসে মদ খাচ্ছে। আমি মুখের বাঁধন খুলে চেঁচাতে চেঁচাতে দরজা খুলতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। হঠাৎ মহিম ঘোষ উঠে এসে আমার টুঁটি টিপে ধরে মুখের ভিতরে একটা রুমাল গুঁজে দিল। আমার গায়ের কাপড় টেনে খুলে ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে ওর বিছানায় ছুড়ে দিলে। আমার উপরে এসে পড়ল, আমি ওকে ঘুঁষি মারলাম, খামচে দিলাম। ও লোকটা আমার মুখে কপালে ভীষণ জোরে ঘুঁষি মারল, আমি ওর সঙ্গে পারলাম না, ও আমাকে নষ্ট করল।'

কাঁদতে লাগল লক্ষ্মী, চোখ মুছে আবার বলতে লাগল, 'সেই দিন রাত্রেই আমার হাত পা বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে একটা পালকির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নদীর ঘাটে নিয়ে গিয়ে নৌকায় তুলে হাজিপুরে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে একটা ছোটো মোটরে করে কলকাতা নিয়ে গিয়ে বেশ্যাপাড়ায় একটা বাড়ীতে তুলল। আমি তখন জানতাম না বেশ্যা পাড়া, পরে জেনেছি। অচেনা লোকেরা আমাকে কলকাতা নিয়ে গিয়েছিল। মহিম ঘোষ কদিন পরে গিয়েছিল। আমাকে পাহারা দেবার জন্যে একটা বুড়ী ঝি আর একটা হিন্দুস্থানী দারোয়ান রেখে এলো। আমি মহিম ঘোষের রাখনী হয়ে গেলাম। আমার পালিয়ে আসবার কোনো উপায় ছিল না। আমাকে নিয়ে লোকটা যা খুশি তাই করত! লোকটার কাছেই শুনেছিলাম, সুন্দরবনের চাষীরা খেপে উঠেছে, আর তুমি তাদের নেতা। আমি ওর দুটি পা ধরে বলেছি আমাকে সেখানে নিয়ে চলো। ও কিন্তু কিছুতেই আনলো না। তুমি হেরে গেছ জেনে তবে আমাকে এতদিন পরে নিয়ে এসেছে।' লক্ষ্মী মাথা নিচু করে চোখ মুছতে লাগল।

গণপতি লক্ষ্মীর মাথায় হাত রাখলো। লক্ষ্মী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'তুমি কেন হেরে গেলে! কেন হেরে গেলে বলো!'

গণপতি বলল, 'কি জানি কেন হেরে গেলাম! মূর্খ চাষী আমি, জানি না তো কেমন করে নেতৃত্ব দিতে হয়।'

লক্ষ্মী বলতেই লাগল, 'তোমার বৌকে যে ডাকাতি করে নিয়ে গিয়ে নষ্ট করল তুমি তার ওপর শোধ নিতে কেন পারলে না গো! কেন হেরে গেলে তুমি?'

অসহ্য কষ্টে যেন সে কাঁদতেই লাগল, বলল, 'দাদার খোঁজও পাইনি

ঠিক, শুনলাম সে নাকি এই দিকেই কোথাও লুকিয়ে আছে। পুলিশ তাকে ধরতে পারে নি। দাদা কি আমার মুখ দেখবে আর?'

'তোমার তো কোনো দোষ নাই লক্ষ্মী।'

'দোষ নাই!'

'না!'

লক্ষ্মী গণপতির চোখের দিকে তাকালো, গণপতি তৃষিতের মতো পান করতে লাগল লক্ষ্মীর দৃষ্টির অমৃত।

লক্ষ্মী বলল, 'এখন আমি কি করব!'

'কি করবে! তা তো এখন বলতে পারছি না লক্ষ্মী। মোহিনী যদি কখনো ফিরে আসে তাকে জিজ্ঞাসা কোরো।'

লক্ষ্মী বলল, 'আমার জন্যে এত বিপদ মাথায় করে আর এসো না। আমার তো মরণ হলেই ভালো।'

'না অমন কথা বলো না, যদি বেঁচে থাকি আবার তোমাকে দেখতে পাব। তোমাকে দেখতে পেলে আমার মন জুড়িয়ে যায়, আমার জন্যেই তুমি বেঁচে থাকবে। আমি না মরলে তোমার যেন মরণ না হয়!'

একটু থেমে গণপতি বলল, 'দিন থাকতে থাকতে আমাকে যেতে হবে লক্ষ্মী। রাতের বেলা মেয়েমানুষের বেশে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে সন্দেহ করবে, আমি এবার যাব।'

লক্ষ্মী নীরবে তাকিয়ে রইল।

গণপতি উঠে দাঁড়ালে লক্ষ্মী ওর বুকের কাছে এলো। গণপতি লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরে ওর ঠোঁটে চুমু খেল কয়েকবার, তারপরে বিদায় নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

ঘরের ঘুলঘুলিতে চোখ লাগিয়ে সজল চোখে লক্ষ্মী দেখল গণপতি একটি গেঁয়ো বৌয়ের মতো মাথায় ঘোমটা টেনে পথ চলছে।

॥ ৪৯ ॥

ফেজারগঞ্জের কাছাকাছি এসে গণপতি নিশ্চিত হলো, ওকে দুজন লোক অনুসরণ করছে। তখন সন্ধে প্রায় হয়ে এসেছে। গণপতি ঘোমটার

ফাঁক দিয়ে বিকেলের অস্পষ্ট আলোতে লোক দুটোকে ঠিক চিনতে পারল না। কিন্তু গণপতি বুঝতে পারল না কী করবে। বৌ সেজে ছোটা যায় না। ছুটলে সে বকখালিতে পৌঁছতে পৌঁছাতে বহুলোকের চোখে পড়ে যাবে। আর লোক দুটোও হয়তো ছুটতে আরম্ভ করবে। ফ্রেজারগঞ্জের প্রশান্ত হাইতের বাড়ী অনেক কাছে এসে পড়েছে দেখে একটু জোরে হাঁটতে লাগল গণপতি। আর শত খানেক হাত বাকী আছে প্রশান্তের বাড়ী। এমনি সময় অনুসরণকারী লোকদুটো ওর দিকে ছুটে আসতে লাগল। ওদের সন্দেহ দৃঢ় হয়েছে। গণপতি ছুটে গিয়ে প্রশান্তের বাড়ী ঢুকে পড়ে ভিতর থেকে খিল দিয়ে দিল।

প্রশান্ত বলল, 'কি ব্যাপার? একি সাজ!'

গণপতি বলল, 'টিকটিকি পিছু নিয়েছে।'

গণপতি ঘরে গিয়ে ঢুকল। প্রশান্ত জানলা খুলে দাঁড়িয়ে রইল।

খানিকক্ষণ পর কথা বলতে বলতে দুজন লোক প্রশান্তর জানলার কাছে এসে বলল, 'একটা মেয়েছেলেকে এদিকে আসতে দেখেছেন?'

প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কতক্ষণ আগে?'

'এই মিনিট কুড়ি আগে।'

'কি রকম দেখতে?'

'দেখতে কেমন বলতে পারব না। দেখি নি ঠিক। একটু ঢ্যাঙা মতো, পরনে সবুজ শাড়ী।'

প্রশান্ত বলল, 'কই? দেখি নি তো।'

লোকদুটো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, 'কোথায় যে লুকোলো এইটুকুর মধ্যে!'

প্রশান্ত বলল, 'কি ব্যাপার কি?'

একটা লোক বলল, 'ব্যাপার কিছু নয়। কেমন যেন সন্দেহ হলো মেয়েটাকে।'

নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে তারা চলে গেল। গণপতি ঘরের কোণে বসে সব শুনল।

অনেকক্ষণ পর প্রশান্তর বাড়ী থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে ফ্রেজারগঞ্জের সমুদ্র সৈকতের উপর দিয়ে একা একা হেঁটে হেঁটে গণপতি বকখালিতে

পৌঁছল। অর্জুন তখন গণপতি সম্পর্কে প্রায় আশা ছেড়ে দিয়ে ডিঙ্গিতে একা একা হতাশ হয়ে বসেছিল। গণপতি কাছে এলে হঠাৎ সে যেন চমকে উঠল, তারপর আশ্বস্ত হলো।

গণপতি ডিঙ্গিতে উঠে বসে বলল, 'কিছু খেতে দে দেখি অর্জুন।'

অর্জুন ওকে গুড় আর চিঁড়ে এগিয়ে দিল। তাই চিবিয়ে খানিকটা জল খেয়ে গণপতি বলল, 'অর্জুন, আমরা কেন হেরে গেলাম!'

অর্জুন বলল, 'আজ সারাদিন তুমি ডিঙিতে ছিলে না। বকখালির এই জঙ্গুলে খালে ডিঙিতে বসে বসে আমি সে কথাই ভেবেছি।'

'কি মনে হলো তোমার?'

'অনেক কথা মনে হলো, কিন্তু পষ্ট করে তো বুঝতে পারলাম না!

'তবু বলো শুনি।'

'আমি ভাবলাম, আরও বেশি জায়গা জুড়ে আন্দোলন আরম্ভ করা উচিত ছিল। মাত্র দশখানা গাঁয়ে আমরা সংগঠন তৈরি করতে পেরেছিলাম। আমাদের আশেপাশের জায়গায় আমদের আন্দোলনের তাত লেগেছিল, কিন্তু সংগঠন ভালো হয় নি। আমরা যখন মরণ-পণ লড়ছি আমাদের চারদিকের অঞ্চল তখন প্রায় চুপ করেই ছিল। দশখানা মাত্র গাঁয়ে এই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল বলেই কংগ্রেস অত তাড়াতাড়ি আমাদের আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিতে পারল।'

'আর কি মনে হয়েছে তোমার?'

'আর আমার মনে হয়, শেষের দিকে ক্ষেতমজুররা আমাদের ভালো করে সাহায্য করে নি। ওরা দুটাকা মজুরী আদায় করেই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে এ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ভাগচাষীদেরই আন্দোলন হয়ে গেল।'

'তুমি ঠিকই বলেছ।'

'তারপরে আমাদের মেয়েরা শুধু অত্যাচারিতই হলো, কিন্তু ওরা অত্যাচারকে রুখতে পারল না। মেয়েদের সৈন্যবাহিনী করতে পারলাম না আমরা। মোট লোকসংখ্যার অর্ধেক মেয়ে, তারা যদি নিজেদের রক্ষা করবার খানিকটা দায়িত্ব নিতে পারত, তাহলে আমাদের অত ব্যতিব্যস্ত হতে হতো না।'

'আমাদের এ বিষয়ে আরও ভালো করে ভাবা উচিত ছিল।'

'এ ছাড়া আমাদের ভিতরে অনেক বিশ্বাসঘাতক ঢুকে গিয়েছিল। উল্টোদিকে একটু চেষ্টা করলে যারা বন্ধু হতে পারত এমন অনেক লোকের ওপর অত্যাচার করে আমরা তাদের শত্রু করে দিয়েছি।'

গণপতি বলল, 'কেন হারলাম তা আমি ভাবছি অনেকদিন থেকে অর্জুন। আমার মনে হয়েছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওরা আমাদের বিপদের মুখে ঠেলে দিল, আমরা অগ্রপশ্চাৎ ভালো করে ভাবতে পারলাম না, ওদের কথা মতো বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়লাম, তখন ওরা পালিয়ে গেল। আমার মনে হয়েছে, অর্জুন, অস্ত্রধারণের আগে মানুষকে খুব ভালো করে বোঝানো দরকার। মানুষ যদি ঠিক থাকে, তাহলে বিনা অস্ত্রেও লড়াই চালানো যায়। আগে অস্ত্র ধরতে লোক চাই, তারপরে অস্ত্রের লড়াই। আমরা বোধহয় একটু আগেই আরম্ভ করে ফেলেছিলাম।'

'কিন্তু কি করতে তুমি! কত সামান্য কারণে ওরা চন্দনপিঁড়িতে গুলী চালালো।'

'সত্যিই তো, আমরা অস্ত্র না ধরে কিই বা করতে পারতাম! আচ্ছা অর্জুন, আমাদের সংগঠনও খুব শক্ত ছিল না মনে হয়?'

'হ্যাঁ, আমাদের সংগঠন একটু ঢিলেঢালা ছিল; এমন ভীষণ কাজে আমরা নেমেছিলাম, কিন্তু সে রকম শক্ত সমিতি ছিল না আমাদের।'

'হ্যাঁ, আমরা অনেক আবোলতাবোল কাজ করে ফেলেছি। আমরা যুদ্ধ করতে জানি না। আমাদের পরিবারগুলোকে লুকিয়ে ফেলার কিংবা সরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করিনি আমরা।'

অর্জুন বলল, 'আর একটা ব্যাপার, জমিদার-জোতদারদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত লড়তে হলে যে অনেকদিন লড়তে হবে, এ আমরা অনেকেই ভাবি নি। অনেকেই আমাদের সঙ্গে এসেছিল তেভাগার লোভে।'

গণপতি বলল, 'কিন্তু তবু আমার মনে হচ্ছে এমনি করে হেরে যাওয়ার মধ্যে কোথায় একটা মস্ত গলদ আছে। যদি দশখানা গ্রামের সবাই লড়বার জন্যে তৈরী থাকত তাহলেও কি হেরে যেতাম?'

অর্জুন বলল, 'দশটা গাঁয়ের লোক খুব বেশি হলে দশ হাজারই হোক।

কিন্তু দশটা গাঁয়ে দশ হাজার লোক নাই। পাঁচ হাজারের মতো বোধ হয় লোক ছিল। ওরা পাঁচ হাজার মিলিটারি আর এক হাজার পুলিশ পাঠিয়েছে, শ পাঁচেক ভি. ডি. পার্টির লোক আছে। দরকার হলে ওরা আরও মিলিটারি পাঠাত। তখন তুমি কি করতে?'

গণপতি বলল, 'তাহলে আরও বড় অঞ্চল জুড়ে আন্দোলন আরম্ভ করা উচিত ছিল। মিলিটারি আর পুলিশ তাতে নাজেহাল হয়ে যেতে পারত।'

'আমার তাই মনে হয়।'

'কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি কেন আমাদের সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করল?'

'আমি জানি না কেন? কেন মধু পালাল, বিদ্যুৎ পালাল? আসলে ভদ্রলোকদের উপর বিশ্বাস করা যায় না। ওদের সাহস নাই, কৃষকদের ওপর ওদের খাঁটি দরদ নাই।'

তারপর ওরা ভরা জোয়ারের নদীর মতো চিন্তার গুরুভারে নির্বাক হয়ে বসে রইল। রাত্রি বাড়তে লাগল। চারদিকে গাঢ় নিস্তব্ধতা আরও নিবিড় হয়ে এল। বাতাস হু হু করতে লাগল। সমুদ্রের বজ্রগম্ভীর কলধ্বনি কানে এসে বাজতে লাগল। ডিঙ্গির উপরে ও চারপাশে আলোছায়া ছড়িয়ে পড়ল। আকাশে কখন চাঁদ উঠেছে।

পরের দিন ওরা সাগরে যাচ্ছিল। নদীর বুকেই এক জেলে নৌকার মাঝির কাছে ওরা খবর পেল সাগরদ্বীপেও অনেক পুলিশ গেছে। কিছু কিছু কৃষকদের এ্যারেস্টও করেছে। জেলে ওদের চিনত না। জেলে বলে গেল, 'পুলিশ সাগরে গণপতি আর অর্জুনকে খুঁজছে। সবাই নাকি ধরা পড়েছে। শুধু ঐ দুজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে ওদের।'

অগত্যা গণপতি আর অর্জুন আবার বকখালিতে ফিরে এলো। আবার সেই সমুদ্রের গম্ভীর হু হু শব্দ, বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে ডিঙ্গির উপরে বসে থাকা। তৃতীয় দিনে খাদ্য আর জল ফুরিয়ে গেল। সন্ধে হলে ওরা বকখালি থেকে ডিঙ্গি নিয়ে ফেজারগঞ্জের বালুচরের বনের ধারে সমুদ্রের কিনারায় ডিঙ্গি ভিড়িয়ে বালুচরে নেমে এলো।

গণপতি বলল, 'অর্জুন, তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি প্রশান্তের

কাছ থেকে রসদ নিয়ে আসি।'

অর্জুন বলল, 'প্রশান্ত বাবু তোমাকে বিপদে ফেলবে না তো?'

'কি জানি, জানি না। তবে খাবারও তো চাই। তুমি এখানে থেকো। আমি দেরি করব না।'

ছোটো ছোটো ঝাউ ও গেয়ো গাছের দীর্ঘ জঙ্গলের পাশ দিয়ে সমুদ্রের কিনারে কিনারে বালুচরের উপর দিয়ে নিঃশব্দে পা ফেলে গণপতি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

প্রশান্তর বাড়ীর দরজা বন্ধ ছিল। গণপতি বাইরে থেকে কড়া নাড়ল। প্রশান্ত দরজা খুলে হারিকেন হাতে দাঁড়াল, গণপতিকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, 'কে গণ, এসো, ভিতরে এসো।'

গণপতি প্রশান্তর সঙ্গে ভিতরে ঢুকে নিজেই দরজা লাগিয়ে দিল।

প্রশান্ত বলল, 'কি ব্যাপার গণপতি?'

'রসদ ফুরিয়েছে, নিতে এলাম। আজ কিন্তু তোমাকে টাকা নিতেই হবে। এখনও আমার কাছে কিছু টাকা আছে।'

প্রশান্ত নিচু গলায় বলল, 'বিপদ হয়েছে। বোধহয় জানতে পেরেছ?'

'কি করে বুঝলে?'

'পরশুদিন জন দুই পুলিশ আমার বাড়ীতে এসে নানান রকম জিজ্ঞাসাবাদ করে গেল।'

'তাই নাকি? কি করে জেনেছে বলছে?'

'হ্যাঁ, তুমি নাকি মেয়ে সেজে লয়ালগঞ্জ গিয়েছিলে, ভি. ডি. পার্টির লোকেরা সন্দেহ করে সেইখান থেকেই তোমার উপর নজর রেখেছিল।'

'তাহলে তো আর এখানে আসা যাবে না।'

'না, আর আসা যাবে না। এখানে তোমার আর এক সেকেণ্ড থাকা উচিত নয়। তুমি এক কাজ করো, বালুচরে চলে গিয়ে ওখানে থাকো বনের ভিতরে। অস্ত্রঅস্ত্র গুলো বালিতে লুকিয়ে রেখো। আর একটু রাত হলে আমি নিজে একটা জনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে এক বস্তা চাল, মুড়ি, তেল, নুন আর জল দিয়ে আসাব।

'তাহলে টাকা নাও।'

'দাও।' ব'লে গণপতির কাছে টাকা যা ছিল নিয়ে নিল।

প্রশান্ত বলল, 'দাঁড়াও' ব'লে নিজে দরজা খুলে আগে বাড়ীর কাছাকাছি চারদিক দেখে ফিরে এসে গণপতিকে বলল, 'চারদিক দেখে এসেছি, ঠিক আছে, তুমি চলে যাও। নিশ্চিন্ত থেকো। খানিক রাত হলেই আমি যাব তোমার কাছে।'

গণপতি দ্রুতপায়ে সেই নির্জন রাত্রির বুকে একাকী হেঁটে চলল। অচিরেই সে সমুদ্রের বালি-বিছানো সৈকতে এসে পড়ল। পিছনে ফেজার সাহেবের নারকেল কুঞ্জ আকাশে শত শত মাথা তুলে বাতাসে দুলছে, ঝর্ ঝর্ শব্দ করছে, বাঁদিকে বেঁটে বেঁটে ঝাউ আর গেঁওয়া গাছের দূরবিস্তৃত বন, বালিয়াড়ি আর ডানদিকে সমুদ্র লক্ষ ঢেউ নিয়ে ছুটে ছুটে এসে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমে। এখনও চাঁদ ওঠে নি। সমুদ্র থেকে উঠে-আসা মস্ত আকাশে তারারা ঝিকমিক করছে, অন্ধকারে সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফস্‌ফরাসের ঝলকানি চাপা আগুনের মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে।

আনমনে ক্লান্ত পায়ে হেঁটে হেঁটে বালুচরের নৌকার কাছে এসে পৌঁছল গণপতি। অর্জুন বালুচরে বসে বসে সমুদ্রের ঢেউয়ের খেলা দেখছিল।

অর্জুন বলল, 'কি হলো, রসদ দিল না?'

'রাত হলে দিয়ে যাবে বললে, টাকাও নিলে।'

'ও! বিপদ হবে না তো?'

'জানি না!'

'যাকগে যা হবার হবে। সেই সকালে আধপেটা খাওয়া হয়েছে। সারাদিন উপবাস, ঘুম আসছে বড্ড।'

গণপতি দুখানা স্টেনগান আর ওর নিজের রিভলভারটা আর কার্তুজগুলো বালুচরে পুঁতে দিল। অর্জুনকে বলল, 'এই গাছটা নিশানা, এর সোজাসুজি পুঁতে রাখলাম।'

অর্জুন বলল, 'পুঁতলে কেন?'

গণপতি বলল, 'প্রশান্ত তাই বললে, একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আসবে, সে যদি এসব দেখে ফেলে, আমাদের সন্দেহ করে? তাছাড়া আমরা ক্লান্ত হয়ে আছি, যদি ঘুমিয়ে পড়ি আর কোনো রকমে যদি অস্ত্রগুলো খোয়া যায়?'

ওরা দুজনে ডিঙ্গি ভালো করে নোঙর করে ডিঙ্গিতে গিয়ে উঠল।

তারপর আকাশের দিকে মুখ করে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। তখন গ্রীষ্মকাল। হু হু করে দক্ষিণের হাওয়া দমকে দমকে ছুটে আসছে। বালিগুলি বাতাসের ঝাপটায় উড়ে উড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সমুদ্রের অশান্ত ঢেউয়ের দোলায় ডিঙ্গিটা দুলছে।

গণপতি আস্তে বলল, 'আজ রসদ পেয়ে গেলে আমরা মেদ্‌নীপুরের দিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করব। এখানে থাকার আর কোনো মানে হয় না। ক'দিন আছি, কেউ তো যোগাযোগ করতে এলো না।'

অর্জুন বলল, 'আমিও তাই ভাবছি। আবার ভাবছি, যদি কেউ আসে কোনো আশা নিয়ে, সমস্যা নিয়ে? কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা যদি এসে আবার আন্দোলনকে জাগিয়ে তোলে, গুরুজী যদি আসেন? তখন আমরা না থাকলে অসুবিধা হবে।'

'আমি তাও ভেবেছি, তাই তো সুন্দরবন ছেড়ে যেতে পারছি না।'

অর্জুন বলল, 'তবু মনে হচ্ছে, আর থাকার কোনো মানে হয় না, হয়তো রসদের অভাবেই আমরা শেষ হয়ে যাব। খাবার এলে আজ রাত্রেই মেদ্‌নীপুরের দিকে পাড়ি দোব। পথে ধরা পড়ার ভয় আছে! নদীতে পুলিশের লঞ্চ ঘোরে।'

'তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব।'

ওরা আর কোনো কথা বলল না। আবার নিজের নিজের ভাবনায় ডুবে গেল।

সমুদ্রের গর্জন গান বাজতেই লাগল। বাতাস হু হু করতে লাগল। ফাঁকা আকাশে রাত্রির হাহাকার শব্দ সন্ সন্ করে ছুটে ছুটে বেড়াতে লাগল শূন্যে। এক সময়ে চাঁদ উঠে এলো সমুদ্র থেকে সমুদ্রের বুকে সোনা ছড়িয়ে পুবের আকাশে। উড়ন্ত বালির ঝাপটা চাঁদের আলোয় সূক্ষ্ম মসলিনের মতো মনে হতে লাগল। এ নির্জন, নিঃশব্দ বিশাল আকাশ, বন, সৈকতভূমি আর সমুদ্র অদ্ভুত মায়াময় কুহকী রূপ ধারণ করল। ওদের ক্লান্ত শরীর, ভাঙ্গা মন যেন সম্মোহিত হয়ে যেতে লাগল। কখন সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় সমুদ্রের গম্ভীর গুরু গুরু গান শুনতে শুনতে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল গণপতির। চোখ মেলে দেখল, চাঁদ মাথার

উপরে। জলের শব্দ, বাতাসের হাহাকার যেন ঝাঁপিয়ে আসছে। হঠাৎ বুঝে উঠতে পারল না কোথায় আছে। ধীরে ধীরে মনে পড়ে গেল, সে শুয়ে আছে বালুচরে সমুদ্রের কিনারায় ডিঙ্গির উপরে। অপেক্ষা করছে প্রশান্তর জন্যে। সহসা অনেক মানুষের ফিস্ ফিস্ কথা কানে এলো। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ডিঙ্গিটাকে ঘিরে প্রায় জনাদশেক লোক চাঁদের আলোয় বালির উপরে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মধ্যে প্রশান্তও আছে।

প্রশান্ত বলে উঠল, 'জেগে গেছে, দেরি করো না।'

গণপতি তাড়াতাড়ি উঠে বসতেই জনা পাঁচেক লোক এসে ওকে জাপটে ধরল।

গণপতি চীৎকার করে উঠল, 'তোমরা কে? কি ব্যাপার কি?'

চীৎকার শুনে অর্জুনও জেগে উঠে বলে উঠল, 'কে? কি ব্যাপার গণপতি?'

সঙ্গে সঙ্গে বাকী পাঁচজন লোক অর্জুনকে ধরে ফেলল। তারপর দুজনকে টেনে হিঁচড়ে বালিতে নামিয়ে আনল। সেখানেই পাকানো কাছি পড়ে ছিল, তাই দিয়ে দুজনকে শক্ত করে বাঁধতে লাগল।

গণপতি বলল, 'প্রশান্ত, এসব কি ব্যাপার?'

প্রশান্ত বলল, 'কি করব ভাই, ভি. ডি. পার্টির লোকেরা তোমাদের গতিবিধি জেনে গিয়েছে।'

গণপতি হিসিয়ে উঠল, 'বিশ্বাসঘাতক, শুয়োর, বেজম্মা কোথাকার।'

প্রশান্ত জুতো-সুদ্ধ-পায়ে বাঁধা গণপতির বুকে মারল এক লাথি।

অর্জুন বলল, 'আমরা ধরা পড়ে গেলাম গণপতি!'

ভি. ডি. পার্টির একটা লোক অর্জুনের গালে মারল একটা চড়; বলল, 'না. তোমাদের বে দিতে বেঁধেছেঁদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বড্ড সুপাত্তর কিনা।'

লোকগুলো হো হো হেসে উঠল।

গণপতি লোকগুলোকে এবার পরিষ্কার করে চিনতে পারল, গুনে দেখল, মোট এগারো জন লোক আছে। তার মধ্যে দশজন ভি. ডি. পার্টির লোক আর প্রশান্ত। গণপতি বুঝল, প্রশান্ত প্ল্যান করে ওদের অপেক্ষা করতে ব'লে ভি. ডি. পার্টির লোকেদের খবর দিয়ে ওদের ধরতে এসেছে, ধরার

পুরস্কারটা নিজে বাগাবে ব'লে।

ভি. ডি. পার্টির একটা লোক গণপতির সামনে এসে বলল, 'এই যে কৃষকসমিতির সম্পাদক মশায়, বলুন দেখি যন্তর-টন্তরগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?'

গণপতি বলল, 'কিসের যন্তর?'

'যা দিয়ে গুলী ছুড়ে পুলিশ মারতে গিয়েছিলেন?'

'যন্তর আমার কাছে ছিল না।'

'এখনও মিথ্যে কথা?' ব'লে গণপতিকে টেনে এক চড় কষাল লোকটা।

প্রশান্ত বলল, 'ডিঙ্গির খোলটা একবার ভালো করে দেখো, তারপরে এই কাছাকাছি বালিগুলো একটু খুঁচিয়ে দেখো।'

তাই করল ওরা। আগে নৌকার খোলটা দেখল। তারপর কাছা-কাছি জায়গার বালি খোঁচাতে লাগল। আধঘণ্টা পরিশ্রম করে ওরা হতাশ হয়ে পড়ল।

গণপতি, অর্জুন দুজনেরই পেট জ্বলে যাচ্ছে। অনেকদিন থেকে ভালো করে খাওয়া হয় নি। আজ সেই সকালে দুটো করে চিঁড়ে চিবিয়েছে। সারাদিন উপবাসে যাচ্ছে। এখন প্রায় মাঝরাত। পেটে খিদের জ্বালা, তেষ্টায় ছাতি ফাটছে, তার উপর আষ্টেপৃষ্ঠে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধেছে। তবু নির্বিকার ভাবে বসে রইল ওরা। উঠবার উপায়ও নেই এমন করে বেঁধেছে।

হঠাৎ ভি. ডি. পার্টির একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'পেয়েছি, আমার পায়ে কি যেন ঠেকল।' বালিতে হাত ডুবিয়ে সে চকচকে মতো একটা জিনিস তুলল। একটা স্টেনগান।

প্রশান্ত বলল, 'তাহলে বালিতেই সব আছে।'

আবার ওরা দারুণ উৎসাহে খুঁজতে লাগল। কিন্তু অনেকক্ষণ পরিশ্রম করেও আর খুঁজে পেল না।

প্রশান্ত বলল, 'ঐ একটাতেই হবে। আর খুঁজতে হবে না, চলো।'

তারপর ওরা গণপতি আর অর্জুনের পায়ের বাঁধন একটু ঢিল করে দিল যাতে হাঁটতে পারে। চারজন করে লোক এক একজনকে দুপাশ থেকে শক্ত ক'রে ধরল, তারপর ফেজারগঞ্জের দিকে চলতে লাগল।

ফ্রেজারগঞ্জ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট যামিনী চক্রবর্তীর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হলো গণপতি আর অর্জুনকে। সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হলো স্পেশাল ক্যাম্পে। মিলিটারিদের আগেও খবর দেওয়া হয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ফ্রেজারগঞ্জে এসে হাজির হলো। মিলিটারিরা ফাঁকা ফায়ার করতে লাগল। চারদিকে গুলী ছুড়তে লাগল। দেখতে দেখতে চারশ' পাঁচশ' মিলিটারি এসে যামিনী চক্রবর্তীর বাড়ীটাকে ঘিরে রেখে দিল।

সকাল হলো। কাছের দূরের গাঁ থেকে দলে দলে নরনারী ছুটে আসতে লাগল। হাজার চারেক লোক জমে গেল। মেয়েরা কাঁদছে, পুরুষরাও অনেকে কাঁদতে লাগল। জোতদাররা ফুর্তি করতে লাগল। গণপতি, অর্জুনের সামনে এসে একজন জোতদার বলল, 'কি গণপতি, কৃষকবিদ্রোহ করো এবার? বড্ড বেড়েছিলি, এবার বুঝবি।'

দুজন আই. বি. এসে গণপতি আর অর্জুনকে নানান রকম জেরা করল। ওরা বিশেষ জবাব দিল না। ডি. এম. কে 'ওয়্যার-লেস' করা হয়েছিলো। ডি. এম. ঘুঘুডাঙার মেন ক্যাম্প থেকে বেলা বারোটার মধ্যে এসে পড়ল। বাঁধা অবস্থায় গণপতি আর অর্জুনকে দেখে ভারি নিশ্চিন্ত হলো ডি. এম.। অধস্তন অফিসারদের বলল, 'এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যে ওদের ধরা না দিয়ে কোনো উপায় ছিল না।'

ডি. এম. বলল, 'যারা ধরেছে তারা মোট পাঁচহাজার টাকা পাবে, একটা করে বন্দুক পাবে আর অর্জুনকে ধরার জন্যে পাঁচশ' টাকা পাবে।'

প্রশান্ত হাইতকে বন্দুক আর রিভলভার দেওয়া হলো।

তারপর গণপতি আর অর্জুনকে বাঁধন খুলে লঞ্চে তুলে দেওয়া হলো। কিন্তু একটানা ঘুঘুডাঙ্গা নিয়ে যাওয়া হলো না। বিভিন্ন জায়গায় ওদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে পরদিন বেলা আটটায় নামখানা পেরিয়ে ঘুঘুডাঙ্গা স্পেশাল ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো।

স্পেশাল ক্যাম্পের ভিতরের একটা দরজা দিয়ে নিয়ে গিয়ে ওদের কাছি দিয়ে বেঁধে ফেলল। কিছুক্ষণ পরে একজন পুলিশ অফিসার এলো, জিজ্ঞাসা করল, 'গণপতি কে?'

পাহারায় যে ছিল সেই সেন্ট্রি বলল, 'ইনি।'

'আপনার নাম গণপতি হালদার? ক্যাম্প জ্বালালেন কেন?'

'ইচ্ছা হলো তাই।'

'কে জ্বাললো?'

'কে জানে?'

সেই অফিসার চলে গেল। আবার একজন এলো, জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ঘরদোর জ্বালিয়েছেন?'

'বেশ করেছি।'

একটা চড় মারল গণপতির গালে। আবার একটা চড় মারল। সে লোকটাও চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে গণপতিদের খেতে দেওয়া হলো। খাওয়া শেষ হবার কিছুক্ষণ পরে তুজন নেপালী সৈন্য এসে গণপতিকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেল। একটা চেয়ারে বসতে দিল। গণপতি এখন ভয় ও কষ্টের অতীত অবস্থায় গিয়ে পৌঁচেছে। শরীর মন এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁচেছে, যেন অনুভব-শক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। যে-কোনো কষ্ট, যে-কোনো অত্যাচার সহ্য করবার জন্যে নিজেকে সে প্রস্তুত করতে লাগল। তবু মোহিনীকে মনে পড়ল, নিজের সমস্ত জীবনটা একবার ওর স্মরণে ভেসে উঠল। তারপর সব কথা মন থেকে মুছে দিয়ে ও শক্ত হয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে য়ুনিফর্ম-পরা পুলিশের একজন অফিসার ঘরে ঢুকল। গণপতির সামনে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল, তারপর বলল, 'নিন, সিগারেট খান।'

গণপতির সিগারেটটা একটা কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দিল, নিজেও একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। তারপর যেন হঠাৎ কিছু একটা মনে হয়েছে এমনি ভাব করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি সত্যি কথা বলবেন?'

গণপতি ঘাড় নাড়ল, কোনো উত্তর দিল না।

অফিসার বলল, 'জম্বুবানের চড়া, তমলুকের দ্বীপে তুবার গিয়েছি। আপনাকে পাই নি তো? তা স্পেশাল ক্যাম্পটা জ্বালালেন কি করে?'

গণপতি বলল, 'আমি সকলের মধ্যেই থাকতাম। কি ভাবে পুড়িয়েছিলাম আজ আর মনে নেই।'

'আপনারা নাকি স্টেনগান ছুড়েছিলেন? বালুচরে একটা স্টেনগান তো পাওয়াও গিয়েছে।'

একটুখানি ফিচেল হাসি হাসল অফিসার, তারপর চোখ মেরে বলল, 'কোথায় পেলেন মাইরি ?'

গণপতি বলল, 'আপনারা অফিসাররা নিশ্চয় দিয়েছেন, না হলে কোথায় পাব ?'

'বলবেন না ? অত সহজে কেউ কিছু বলে না। যাক গে—তা ঐ কখানা বন্দুক নিয়ে ভারত-গরমেণ্টের সঙ্গে লড়া যায় ? এই সব মতিচ্ছন্ন বুদ্ধি তোমাদের মাথায় ঢোকালো কে হে ?'

'আপনি' থেকে 'তুমি' তে চলে এলো অফিসার।

গণপতি বলল, 'দুবছর সময় পেলে পশ্চিমবঙ্গ দখল করে নিতাম। জাহাজ আসবার পথ বন্ধ করে দিতাম সুন্দরবনে।'

অফিসার ধমক দেওয়ার ভঙ্গীতে গণপতির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হাতের গিঁট খুলে নেওয়া হবে তোমার !'

তারপর আরম্ভ হলো অত্যাচার, নির্যাতন। দুজন গুণ্ডামতো লোক এসে গণপতিকে দুপাশ থেকে ধরল। দুজন দুহাত দুপাশে ধরে দাঁত কড়মড়িয়ে লোহার রড দিয়ে ইস্ত্রি করার মতো চাপ দিতে লাগল গণপতির দুই বাহুতে। হাত দুটো অবশ হয়ে নেতিয়ে পড়ল গণপতির, শক্তিহীন হয়ে ছেড়ে পড়ল। অজ্ঞান হয়ে গেল গণপতি। জ্ঞান ফিরলে অনুভব করল দুহাতে সর্বাঙ্গে ভীষণ যন্ত্রণা। কাছি দিয়ে বাঁধা আছে সে। আবার তেমনি ভাবে ওর দুহাতের উপর দিয়ে লোহার রড দিয়ে ইস্ত্রি করার মতো চাপ দেওয়া হলো। এমনি করে তিনবার মূর্ছিত হয়ে পড়ল গণপতি।

জ্ঞান ফিরলে ওকে চান করতে পাঠানো হলো। খেতে দেওয়া হলো। একটা ছোটো ঘরে বাঁধা অবস্থাতেই শুতে দেওয়া হলো। বিকেলবেলা আবার সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। একটা চেয়ারে বসতে বলা হলো। একজন অফিসার ওর সামনে একটা চেয়ারে বসে বলতে লাগল, 'মেনে কিনা বলো :

১। —তারিখে—সময় স্পেশাল ক্যাম্পে আগুন দেওয়া।

২। —তারিখে—সময় পুলিশের দিকে স্টেনগান ছোড়া।

৩। —তারিখে—সময় ধীরেন প্রামাণিককে হত্যা।

৪। —তারিখে—সময় ভবেশ দাসকে হত্যা।'

তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'স্টেনগান কে দিয়েছিল? তাদের নাম কি? কোন কোন কমিউনিষ্ট নেতা আসত?'

গণপতি বলল, 'আমি এসবের কিছুই জানি না। আমি তেভাগা চেয়েছিলাম। রসিদ না পেলে ধান দোব না বলেছিলাম।'

'তাই নাকি, মাইরি?'

ব'লে ফস্ করে সিগারেট ধরাল। খানিকক্ষণ টেনে হাত-পা-বাঁধা গণপতির গালে সিগারেটের ছেঁকা দিতে লাগল আর বলতে লাগল, 'কি? কি রকম লাগছে? এ্যাঁ, তুমি কিছুই জান না, কেমন করে আর বলবে বলো?'

অফিসারটি হাঁক পাড়তেই জনাকতক ষণ্ডামার্কা লোক ঘরে ঢুকল। তারা, গণপতির হাতের নখের ফাঁকে ছুঁচ ঢুকিয়ে দিতে লাগল। যন্ত্রণায় চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল গণপতি। জ্ঞান হলে আবার হাতে ছুঁচ নিয়ে ওর কাছে দাঁড়িয়ে অফিসার জিজ্ঞাসা করল, 'কি? স্বীকার করবে?'

'কী স্বীকার করব?'

'অ, না কিছু না।' ব'লে অর্ডার করতেই কেমন একটা ফাঁসিকাঠের মতো জিনিস ভিতরে আনা হলো। উপরের কাঠটার সঙ্গে হাত দুটো বেঁধে দিল গণপতির। তারপর ব্যাটারি চার্জ দিতে শুরু করল। গণপতির সমস্ত মুখ, শরীর ঘামে ভিজে উঠতে লাগল। শরীর ঝনঝনিয়ে শিকড়-কাটা শাকের মতো লুটিয়ে পড়তে লাগল।

ওরা যা বলে গেল সেই অবস্থায় গণপতি সব সত্যি বলে মেনে নিল।

তারপর অনেকদিন ধরে বিচারাধীন আসামী হয়ে রইল গণপতিরা।

কয়েক হাজার মেয়ে পুরুষকে এ্যারেস্ট করেছিল, তারা ধীরে ধীরে ছাড়া পেতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মতো জেলে আটক থেকে গেল।

দীর্ঘ তিনবছর পরে অনেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু গণপতি, অর্জুন প্রভৃতি ন'জনকে ফাঁসির আসামী করা হলো। কমিউনিস্ট পার্টির বহু চেষ্টায়, দেশের লোকের অর্থ সাহায্যে, অন্ধ ব্যারিস্টারের বুদ্ধি ও আইন প্রয়োগের শক্তির গুণে গণপতিরা শেষপর্যন্ত ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলো। গণপতি, রেণুপদ, অর্জুন, হীরক,

বীরচন্দ্র, নরেন্দ্র, সিন্ধু, অজয় আর অভিমন্যু এই ন'জন যাবজ্জীবন কারা-দণ্ডের আসামী হলো। কোর্ট আর হাজত যাতায়াত বন্ধ হলো। যাবজ্জীবন বন্দীজীবন যাপন করবার জন্যে ওদের আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হলো।

সেদিন হাহাকার করে উঠেছিল গণপতির সমস্ত মন। যে মুক্তির জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে সে সংগ্রাম করল, তার থেকে সে আমৃত্যু বঞ্চিত থাকবে! কতদিন তাকে এই কারাগারে থাকতে হবে! ক্রীতদাসের মতো পরাধীন জীবনে চাবুকের ডগায় চলতে হবে!

॥ ৫০ ॥

যখন গণপতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আসামী হয়ে জেলে আছে তখন একদিন মোহিনী ওর ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গণপতির সঙ্গে জেলে দেখা করতে এলো। সুন্দরবন থেকে আলিপুর, পথ অনেক। অনেক হাঙ্গামা করে তবে আসতে হয়েছে মোহিনীকে। লোহার জালের সামনে দাঁড়িয়েছিল মোহিনী। খানিকক্ষণ পরে গণপতি জালের ও ধারে এসে দাঁড়াল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। মাথায় বড়ো বড়ো চুল। পরনে জেলের পোশাক। গণপতিকে দেখেই মোহিনীর মনের ভিতরে জমে-থাকা সমস্ত ব্যথা ও বিরহ হঠাৎ যেন কূল ছাপিয়ে গেল। হু হু করে কেঁদে ফেলল মোহিনী।

গণপতি বলল, 'কেঁদো না মোহিনী, তুমি এমনি করে বাইরে কাঁদলে আমি সারাজীবন কেমন করে এখানে থাকব! আমি তো খারাপ কাজ করে জেলে আসি নি, তাহলে কেন তুমি কাঁদবে?'

মোহিনী বহুকষ্টে নিজেকে সংযত করল।

গণপতি বলল, 'খবর বলো। কেমন আছ, কেমন করে দিন চলছে?'

মোহিনী গণপতির দিকে জালের বাধার মধ্য দিয়েই অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'হরেনবাবু তোমার ভাইদের কাছ থেকে সব জমি কেড়ে নিয়েছে। ওদের অবস্থাই এখন শোচনীয়, তবু আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করে।'

'ছেলে মেয়ে নিয়ে কি করে বেঁচে আছ?'

'মুষ্টিভিক্ষা নিই চাষীদের কাছে, গাছতলায় ইঁট পেতে রান্না করি। তবে চাষীরা আমার জন্যে একটা ছোট কুঁড়ে তুলছে। বর্ষাকালে কষ্ট পেতে হবে না।'

'কোথায় থাক?'

'সীতাপতিদের ঘরেই এককোণে থাকি। ছোট কুঁড়ে একটা ওরা তুলেছে। জায়গাতে কুলোয় না।'

গণপতি নিজের চোখের ঝরে-পড়া জল তাড়াতাড়ি মুছে গলা-খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'রাজবন্দীদের বৌরা আর কে কেমন আছে?'

• 'তাদের অনেকের বড্ড কষ্ট হয়েছে। কেউ কেউ ভিক্ষা করছে, কেউ কেউ চুরি ধরেছে, পেটের দায়ে কেউ আবার খারাপ লোকের পাল্লায় পড়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে।'

আঁতকে উঠল গণপতি, 'সে কি বৌ, এত কষ্ট! এত সংগঠন, এত মারামারির এই পুরস্কার! কমিউনিস্ট পার্টি কোথায়? কোথায় কৃষক-সমিতির আর সব লোকেরা? তারা কেউ দেখছে না ওদের? কৃষকসমিতির ফাণ্ড যে অনেক ছিল!'

মোহিনী বলল, 'তাদের কথা আর বলো না, সুখেন, শিবেন, রমেন, কেষ্ট কৃষকসমিতির এই চার ভাণ্ডারী ছিল গরীব চাষী, এখন জমিজমা কিনে, ঘরদোর বেঁধে, ভালো চাষের মোষ কিনে জমিয়ে বসেছে। তাদের কাছে চাষীরা কতবার গিয়ে রাজবন্দীদের পরিবারের জন্যে টাকা চেয়েছে, তা তারা হাঁকিয়ে দিয়েছে।'

গণপতি ফুঁসে উঠল, 'আমি থাকলে, আমি থাকলে হাঁকাতাম! ভবেশের কাছে পাঠিয়ে দিতাম!'

মোহিনী বলল, 'আর, কমিউনিস্ট পার্টি চারজনকে মাসে পাঁচ টাকা করে সাহায্য করে। আমাকে, অন্ধ নৃপতিকে, অভিমন্যুর মাকে, আর কাদম্বিনীকে।'

'পার্টি তাহলে সাহায্য করে কিছু!'

'হ্যাঁ, সাধুচরণ সেই টাকা কলকাতা থেকে নিয়ে আসে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের দেয় না। তবে শুনছি, কামদেব নাকি টাকাটা এবার

থেকে নিজে আনবে। আর, কিছুদিন পর থেকে আমাদের চারজনের জন্যে পঞ্চাশ টাকা করে দেবে পার্টি।'

গণপতি বলল, 'আর সব কি খবর বলো। সব কি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে? এখনো জমিদার, জোতদার, নায়েবরা তেমনি অত্যাচার করে?'

'হ্যাঁ গো, সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু জমিদার-জোতদার-নায়েবরা আর অত্যাচর করতে, ব্যভিচার করতে সাহস করে না।'

একটু যেন সান্ত্বনা পেল গণপতি, বলল, 'তাহলে আমাদের আন্দোলনে কিছুটা কাজ হয়েছে!'

'হ্যাঁ, বাজে আবাব (আবওয়াব) বন্ধ হয়েছে। কিন্তু দেড়াবার বন্ধ হয়নি, তেভাগাও পায় না চাষীরা।'

মোহিনী আবার বলল, 'বাধ্য হয়ে, দায়ে পড়ে সুন্দরবমের ভাগচাষীরা এখন হাজিপুরের (ডায়মণ্ডহারবার) কোর্টে যায়, সর্বস্বান্ত হয়ে জোতদারদের সঙ্গে জমি নিয়ে মামলা লড়ে। আর শুনি, চাষীদের রক্তের টাকায় উকীল, মোক্তার আর মুহুরীদের পেট ভরছে, বাড়ী উঠছে।'

'কৃষকসমিতির আর সকলের খবর বলো।'

'বিশ্বনাথবাবু বসে গিয়েছেন, আর গোপীনাথ চাকরির লোভে মুচলেকা দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে, সরকারী চাকরি পেয়েছে, বিয়ে থা করেছে; আবার শুনি, কোন ঝিয়ের সঙ্গে কি করে ধরা পড়েছে, গাঁয়ের লোকের মার খেয়েছে।'

'যে বিপ্লব করতে এসেছিল তার এতখানি অধঃপতন কেমন করে হলো!'

গণপতি ভাবছিল, 'কেন, কেন ওরা এমন হয়ে গেল? আগুন হঠাৎ খুব বেশি জ্বলে উঠলে কি একেবারেই সব পুড়ে শুধু ছাই বাকী থাকে? কে জানে!'

তারপর গণপতি বলল, 'থাক, ওসব কথা থাক এবার। মোহিনী, বলো তুমি কেমন আছ!'

মোহিনী বলল, 'আমি? আমি ভালো নাই। আমি কেমন করে একা একা ছেলেমেয়েকে মানুষ করব! জানিনা আবার কবে তোমার সঙ্গে দেখা করব?' বলে হুহু করে কেঁদে ফেলল মোহিনী।

যে অফিসার ওখানে দাঁড়িয়েছিল, সে বলে উঠল, 'সময় পার হয়ে গেছে, এবার আপনাকে যেতে হবে গণপতিবাবু।'

গণপতি বলল, 'আর একটুখানি, বহুদিন পরে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। আর একটু সময় দেন।'

কিন্তু আর কী কথা বলার আছে! জালের ফাঁক দিয়ে গণপতির একটা আঙুল ছুঁল মোহিনী, জিজ্ঞাসা করল, 'জেলে কী খেতে দেয়? মারে? খাটায় খুব?'

'না, না, বেশ আছি একরকম। শুধু পরাধীনতা আর তুমি ছেলে-মেয়ে কাছে নেই। তোমাদের জন্যে বড্ড মন কেমন করে! মনে মনে সেই সুন্দরবনে আমাদের ঘরে তোমার কাছে চলে যাই আমি।'

মোহিনী বলল, 'জেলের গেটে তোমার জন্যে দুধ আর মিষ্টি দিয়ে গেলাম খেয়ো যেন!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাব বৈকি।'

'এখানে তুমি একা আছ?'

'না, না, আমরা ন'জনই এখানে আছি।'

'সবাই ভালো আছে?'

'হ্যাঁ, সকলের খবর দিও দেশে ফিরে।'

অফিসার আবার বলল, 'গণপতিবাবু এবার চলুন, অনেক সময় পেয়েছেন।'

গণপতি বলল, 'তাহলে যাই মোহিনী!'

মোহিনী কথা বলতে পারল না, বড় বড় জলের ফোঁটা ওর চোখ বেয়ে ঝরে পড়ে গাল ভিজিয়ে দিতে লাগল। গণপতি সজল চোখে তাকিয়ে রইল মোহিনীর দিকে।

গণপতি চলে গেল। মোহিনী ছেলেমেয়ের হাত ধরে চোখের জলে ঝাপসা দৃষ্টিতে জেল গেট থেকে আস্তে আস্তে ক্লান্ত বিধ্বস্ত পায়ে হাঁটতে লাগল।